মহিলার ত্রয়োদশ বর্ষের নির্ঘণ্ট।

স্বর্গগতা দেবী হামিদা।

(১০ম পৃষ্ঠা)

Mohila press.

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৩শ ভাগ] শ্রাবণ ১৩১৪ ; আগষ্ট ১৯০৭। [১ম সংখ্যা।

স্ত্রীনিতিসার।

পরিবারমধ্যে গৃহিনীর নানা বিষয়ে দায়িত্ব ও কর্ত্তৃত্ব। তাঁহাকে পরিবাররূপ ক্ষুদ্র রাজ্যের রাণী বলা যায়; পরিবারে তিনি মা, তিনি কর্ত্রী। সন্তান সন্ততির শাসন সংরক্ষণের ভার বিধাতা তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। কখন তাঁহাকে মাজিষ্টারের কাজ, কখন বা জজের কাজ করিতে হইয়া থাকে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নানা বিষয়ে ঝগড়া হয়। সেই সকল বিবাদের মীমাংসা তিনিই করিতে বাধ্য হন। ভাই ভগিনী পরস্পর ঝগড়া করিয়া বিচারনিষ্পত্তির জন্য মায়ের নিকটে যাইয়া নালিশ করে। সুমাতা শান্ত নিরপেক্ষ ভাবে সস্নেহহৃদয়ে বাদী প্রতিবাদীর বক্তব্য শুনিয়া বিচার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন, এবং অপরাধীকে দণ্ডদান করেন। মা অশান্ত ক্রুদ্ধ প্রকৃতি হইলে চিত্ত-চাঞ্চল্য-বশতঃ বিচারে অন্যায় করিয়া অপরাধীকে কঠিন শাস্তি দেন, তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ও কটূক্তি করিয়া থাকেন, তাহাতে অতিশয় মন্দফল হয়, ছেলে মেয়ের স্বভাব বিকৃত হইয়া যায়। অতি সাবধানে তিনি সন্তান লালনপালন শাসন সংরক্ষণ করেন, বিধাতার এই নির্দ্দেশ।

দাস দাসীকে শাসনে রাখা এবং তাহাদিগের দ্বারা সুনিয়মে কার্য্য সম্পাদন করিয়া লওয়া গৃহকর্ত্রীর গুরুতর কর্ত্তব্য। তাঁহার অমনোযোগ ও অবহেলা হইলে দাস দাসী প্রশ্রয় পাইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করে, ক্রমে দুশ্চরিত্র হইয়া উঠে, মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও চৌর্য্য কার্য্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত ও শাসিত রাখিতে হইবে। কোন অপরাধের জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিতে হইলে ন্যায় ও দয়া যেন কোন রূপে অতিক্রম করা না হয়।

পরিবাররাজ্যশাসনের ভার প্রাপ্ত গৃহিণীর এইরূপ অনেক বিষয়ে গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে। সাধ্বী সুনীতিপরায়ণা গৃহিণী বিধাতার ইঙ্গিত মতে সেই সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া নিজে ধন্য হন, পরিবার-মধ্যে শান্তি কুশল স্থাপন করেন।

মহিলার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের করুণায় বর্ত্তমান শ্রাবণ মাসে মহিলা দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষে উপনীত হইলেন। গতবর্ষে ইনি যে নানা বিঘ্ন পরীক্ষা অতিক্রম করিয়া যথাসাধ্য বঙ্গমহিলাদের সেবা করিতে পারিয়াছেন তজ্জন্য সিদ্ধিদাতা বিধাতাকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ করি ও তাঁহার চরণে প্রণত হই।

আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার স্রোত বঙ্গীয় নব্য শ্রেণীর নারীসমাজে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে পাশ্চাত্য নানা দুর্নীতির স্রোত প্রবেশ করিয়া উক্ত শ্রেণীর মহিলাদিগের নৈতিক জীবনকে আহত ও বিপর্য্যস্ত করিতেছে। ভারতার্য্য ললনাদের স্বভাবসুলভ ভক্তি বিনয় লজ্জাশীলতা গৃহকর্ম্ম-নৈপুণ্য বিলাস ভোজনাদিতে বীতরাগ বর্ত্তমান অনেক নব্য মহিলার জীবনে পরিলক্ষিত হয় না। তাহাতে মহিলা অতিশয় ব্যথিত। তজ্জন্য তিনি সেবিষয় উল্লেখ করিয়া অনেক সময় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। মহিলা জাতীয় সুনীতির একান্ত পক্ষপাতিনী; বিলাতের কুনীতি ও কুনিয়মকে ঘৃণা করেন। বিলাতের কতকগুলি কুনীতির অনুসরণ করিয়া কেবল বাহ্যিক ভাবে জীবন যাপন করিলে বঙ্গীয় নারীসমাজের পরিণাম যে কত দূর শোচনীয় হইবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইয়ুরোপে সতী সাধ্বী ধার্ম্মিকা রমণী অনেক ছিলেন ও আছেন, তাঁহারা ভক্তির পাত্রী। আমাদের এদেশের ভগিনী ও কন্যাগণ তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা, সদাচার ও সুচরিত্রের এবং অন্যান্য সদ্‌গুণ ও সুদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া চলিলে অশেষ কল্যাণ এবং বঙ্গীয় নারীসমাজের মুখোজ্জল হইতে পারে। অন্তর্দৃষ্টি-শূন্য হইয়া কেবল সেদেশের সাধারণ স্ত্রীলোকদিগের ভোজ্য পরিচ্ছদাদির বিলাসিতা, বাহ্যিক আড়ম্বর ও আমোদ প্রমোদের অনুসরণ করিয়া চলিলে অচিরে বঙ্গকন্যাদের অধঃপতনেরই সম্ভাবনা। ধর্ম্ম ও নীতি ভিন্ন কোন কালে কোন জাতির প্রকৃত উন্নতি হয় নাই ও হইবে না। অনীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার কুফল অবশ্যম্ভাবী। নিরীশ্বর শিক্ষা ও সভ্যতার ভিতরে সাঙ্ঘাতিক বিষ রহিয়াছে, অনেক মহিলা সেই বিষে জর্জ্জরিত। ইহা কে অস্বীকার করিবে? মাংসাদি আহারবিষয়ে চিরকাল এদেশের প্রাচীন শ্রেণীর মহিলাদিগের একান্ত বীতরাগ। এবিষয়ে তাঁহারা অতিশয় সংযমী। এমন কি প্রাচীন শ্রেণীর শাক্ত পুরুষগণও মাংসভোজনে মিতাচারী। অধিক মাংসভোজনে যেমন ক্রোধাদি নীচ প্রবৃত্তি প্রবল হয়, এরূপ অন্য কিছুতেই হয় না, ইহা প্রমাণিত। সুচিকিৎসকগণ সমধিক মাংসভোজনের অপকারিতাবিষয়ে মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্যদান করেন। এক্ষণ নব্য শ্রেণীর বহু মহিলা প্রত্যহ বিলাতী প্রণালীতে পশু পক্ষ্যাদির মাংস ভোজন করেন, পর্য্যাপ্ত মাংস ভোজন না করিলে তাঁহাদের অনেকের ভোজনই হয় না, এবং দেহ রক্ষা হয় না, তাঁহাদের এইরূপ সংস্কার। কিছু কাল হইল পাশ্চাত্য সভ্যতানুরাগিণী নব্য

শ্রেণীর একটী বিদুষী মহিলা একান্ত আগ্রহ ও ব্যস্ততার সহিত বিলাতী প্রণালীতে মাংস ভোজন করিতেছিলেন, তখন এক খণ্ড বৃহৎ অস্থি উদরস্থ করিতে যাইয়া, তিনি মহাবিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠনালীতে উহা আবদ্ধ হইয়াছিল, কিছুতেই অধঃকৃত বা বহির্নিসারিত হইতে ছিল না। অনেক সুনিপুণ ডাক্তার তৎপ্রতীকারে অক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবন রক্ষার আশা ছিল না। পরে এক জন সুযোগ্য ডাক্তার বহু ক্লেশে তাঁহাকে বিপন্মুক্ত করেন। উক্ত বিপন্না কন্যার কোন পরিচয় দান না করিয়া মহিলা দুঃখ সহকারে এই সংবাদটিমাত্র সম্বাদস্তম্ভে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে মহিলা বিলাতী সভ্যতানুরাগিণী জ্ঞানাভিমানিনী মহিলাদিগের বিষম কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন। মাংসভোজনের সঙ্গে বিবীদিগের ব্যবহার্য্য হজমী আরক অনেক বঙ্গ মহিলা যে পান করেন না ইহা কি সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে? ভারতীয় আর্য্যকন্যাদের পক্ষে এরূপ বিবিয়ানা আচরণ বিষম ভীতিজনক। ঈদৃশ বিলাতী অসদাচরণের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গিয়া মহিলা তাঁহাদের অপ্রিয়ভাজন হইয়াছেন। মহিলার দায়িত্ব বোধ আছে। স্বেচ্ছাচারের পোষকতা করিতে এবং এক শ্রেণীর লোকের মনস্তুষ্টির জন্য কেবল কতকগুলি অসার গল্প উপন্যাস দ্বারা কলেবর পূর্ণ করিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই।

এদেশের প্রাচীন আর্য্য নারীগণ ধর্ম্মপ্রাণা ছিলেন। তাঁহারা পূজা আহ্নিক, যোগ তপস্যা এবং নানা প্রকার ব্রতনিষ্ঠার প্রভাবে অতিশয় উচ্চ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহাদের জীবনের সকল কার্য্যের যোগ ছিল। পবিত্র আর্য্য বংশের কন্যা বর্ত্তমান যুগের প্রাচীন শ্রেণীর মহিলারাও উক্ত আর্য্যনারীদিগের উচ্চ জীবনের অনেক দূর অনুসরণ করিয়া চলিতে যত্ন করিয়া থাকেন। ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক পূজা, ব্রতোপবাস দেবভক্তি গুরুজন-ভক্তি তাঁহাদের চরিত্রের ভূষণ। আচার ব্যবহারে অনেক নব্য মহিলাকে সেই বংশের কন্যা বলিয়া প্রতীতি হয় না। তাঁহারা সেই উচ্চ আদর্শানুসারে জীবনকে পরিচালিত করেন না। প্রাচীন শ্রেণীর মহিলাগণ সকল বিষয়ে যে সত্যাশ্রিতা ও কুসংস্কারবিবর্জ্জিত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। কিন্তু তাঁহাদের সদাচার সুনীতি নব্য মহিলাগণ কেন গ্রহণ করিবেন না? তাঁহারা প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, ধর্ম্মচিন্তা, পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন; নব্য শ্রেণীর অনেক মহিলাকে এক বেলাতেও যে পূজার্চ্চনা করিতে দেখা যায় না। অনেক দিন সায়ংকালে তাঁহারা Teaparty ও Garden-partyতে উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে যোগদান করেন। একদিনও সায়াহ্নে তাঁহাদিগকে হরিপ্রসঙ্গ ও হরিগুণকীর্ত্তন এবং যোগধ্যানাদি করিতে দেখা যায় না। তাঁহাদের ঘর বাড়ী হরিশূন্য, তথায় কেবল সাংসারিক প্রসঙ্গ ও বিলাসামোদের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এসকল উল্লেখ করিয়া মহিলা অনেক সময় দুঃখ প্রকাশ

করিয়াছেন, তাহাতে অনেক নব্য মহিলা তাঁহাদের হিতৈষিণী মহিলাকে বিষদৃষ্টিতে দর্শন করেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, সকল নব্য মহিলা এইরূপ উক্তির লক্ষ্য নহেন। এই শ্রেণীতে অনেকে আছেন যে, নিজেদের সদাচার ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় সকলের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করেন।

এক্ষণ যেমন অনেক বঙ্গীয় নব্য যুবতী স্বাধীন ভাবে একাকিনী যথাতথা গমনাগমন করেন, অপর পুরুষের সঙ্গে অসঙ্কোচ ভাবে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ প্রসঙ্গ করিয়া থাকেন, পরিণামদর্শী প্রবীণ লোকমাত্রেই তাহা পছন্দ করেন না। এইরূপ স্ত্রীস্বাধীনতায় অনেক স্থলে ঘোরতর বিপদ্ ঘটিয়াছে ও ঘটিবার সম্ভাবনা। এদিকে কিন্তু মহিলা প্রাচীন শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের দৃঢ়তর অবরোধে স্থিতির পক্ষপাতিনী নহেন, তাহা অস্বাভাবিক ও নারীজীবনের অতিশয় অনিষ্টজনক বলিয়া স্বীকার করেন, তাহার তদ্বিপরীত বিজাতীয় স্ত্রীস্বাধীনতাকে সর্ব্বথা অনুমোদন করেন না। এই দুই বিপরীত নিয়মের বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে তাঁহাকে দুই চারি কথা বলিতে হইয়াছে। তাহাতে তিনি হয়তো উক্ত উভয় মহিলাদিগের বিরাগভাজন হইতেছেন।

ভারতীয় আর্য্যজাতি চিরকাল হইতে রাজভক্ত প্রজা। আর্য্যজাতি রাজাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকেন। পিতাকে ভক্তি করা যেমন সন্তানের পক্ষে স্বাভাবিক, রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় পিতৃস্বরূপ রাজাকে ভক্তি করা প্রজার পক্ষে তদ্রূপ স্বাভাবিক। আমরা প্রজা, রাজা আমাদের ধন মান জীবনের সংরক্ষক পিতৃস্থানীয়। পিতার দোষ দুর্ব্বলতা থাকিলেও যেমন তিনি সন্তানের ভক্তির পাত্র, তিনি সন্তানের নিন্দাভাজন ও বিদ্বেষভাজন হইতে পারেন না, রাজাও তদ্রূপ। কোন দোষ ত্রুটির জন্য তাঁহাকে দ্বেষ হিংসা ও নিন্দা কটূক্তি করা প্রজাপুঞ্জের কোন অধিকার নাই, হিংসা বিদ্বেষ ও নিন্দা কটূক্তি করা তাহাদের পক্ষে পাপ। প্রজাগণ রাজাকে ভক্তি করিবে, নিজেদের দুঃখ অভাব তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া তন্মোচনের জন্য আবেদন করিবে, তাহাদের পক্ষে বিধাতার এই নির্দ্দেশ। হিন্দু জাতি পিতার ন্যায় রাজাকে ঈশ্বর-নিয়োজিত বলিয়া বিশ্বাস করেন। রাজা বা রাজপ্রতিনিধিদের সম্বন্ধে কোন কারণে দ্বেষ হিংসা অন্তরে পোষণ করা এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে নিন্দা ও অপবাদ রটনা করা স্বদেশী ভাব নয়, বিদেশী ভাব। উপস্থিত স্বদেশী আন্দোলনে রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় রাজা ও রাজপ্রতিনিধিদিগের বিরুদ্ধে নানা কার্য্য হইয়া গিয়াছে, নিন্দা কটূক্তির এক শেষ হইয়াছে। বহু বঙ্গ মহিলা রাজবিরোধী পুরুষদিগের উত্তেজনায় রাজা ও রাজপ্রতিনিধিদিগের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদের সভা সমিতিতে যোগ দান করিয়াছেন, তজ্জন্য মহিলা বিশেষ ব্যথিত।

ইংরাজ রাজার নিকটে আমরা অশেষ ঋণে ঋণী। ইংরাজাধিকার হওয়া অবধি এদেশে জ্ঞানবিজ্ঞান সুখ সভ্যতা ও শান্তি কুশল সম্পদ্‌সমৃদ্ধি কল্পনাতীত বৃদ্ধি হইয়াছে, পূর্ব্বে ইহার কিছুই ছিল না। বিশেষতঃ

ইংরাজাধিকারে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার প্রসার, জ্ঞানোন্নতি ও সম্মান বৃদ্ধি যেরূপ হইয়াছে, এরূপ এদেশে কখনও হয় নাই। ইংরাজাধিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে মোসলমানাধিকার ছিল, পরস্পর তুলনা করিলে আলোক অন্ধকারের ন্যায় ভিন্নতা প্রতীয়মান হয়। তজ্জন্য এদেশীয় রমণীগণ কি ইংরাজ রাজা ও ইংরাজজাতির নিকটে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন না? অকৃতজ্ঞতা মহা পাপ, অকৃতজ্ঞতা আমাদের স্বদেশী ভাব নহে, বিদেশী ভাব। বর্ত্তমান আন্দোলনস্রোতে পড়িয়া অনেক বঙ্গবালার ধৃষ্টতা ও কৃতঘ্নতার ভাব হওয়াতে মহিলা মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তাঁহারা মহিলাকে স্বদেশীর বিরোধিনী মনে করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহাদের অত্যন্ত ভুল। বরং মহিলা স্বদেশী ভাব, আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির পূর্ণ পক্ষপাতিনী। নিন্দাবাদ দ্বেষ হিংসাপরিহার পূর্ব্বক বিলাতের জ্ঞানোন্নত প্রবল পরাক্রম জাতির সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া নানা উপায়ে সকলে স্বদেশের শিল্প বাণিজ্যাদির উন্নতি বিধান করেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়। মহিলা বিবাদ বিসংবাদ নিন্দা কটূক্তি অপ্রেম ও অকৃতজ্ঞাদি বিদেশীয় নীচ কার্য্য ও নীচ ভাবকে কদাচ সমর্থন করেন নাই, করিতে প্রস্তুত নহেন। রাজা বা রাজজাতির দোষ ত্রুটি থাকিতে পারে বা আছে, তজ্জন্য নিন্দা কটূক্তি করিলে উপকার নাই, বরং অপকার যথেষ্ট হয়। শাস্ত্রে আছে, "অসাধুতা দ্বারা পরাজিত হইও না, কিন্তু সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে পরাজয় করিও।"

ভারতবর্ষ যোগভূমি, বর্জ্জন বিচ্ছেদ এদেশের প্রকৃতিমূলক নহে। এদেশের শাস্ত্র এই;—

"অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা লঘুচেতসাং উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।"

অর্থাৎ ইনি বন্ধু ইনি পর ক্ষুদ্রচিত্ত লোকদিগের গণনা, উদার চরিত্র লোকদিগের পক্ষে সমস্ত পৃথিবীর লোক আত্মীয়।

লোকের গুণগ্রহণ না করিয়া কেবল ছিদ্রান্বেষণ করা যোগ ও প্রীতি স্থাপন না করিয়া তদ্বিপরীত বর্জ্জন করা অধর্ম্ম। শাস্ত্র এই যে;—

"প্রীতি প্রতিবাসীর কোন অনিষ্ট করে না, অতএব প্রীতিই ধর্ম্মের সাধন।

"ঈশ্বর প্রীতিস্বরূপ, অতএব যে প্রীতিতে অধিবাস করে, সে ঈশ্বরেতে অধিবাস করে, এবং ঈশ্বর তাহাতে অধিবাস করেন।"

"যে প্রীতি করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রীতিস্বরূপ।"

—"আমরা যেন মুখে প্রীতি না করি, কার্য্যেতে ও সত্যেতে।"

বর্ত্তমান আন্দোলনব্যাপারে এই যোগ ও প্রীতির বিপরীত ভাব বর্জ্জন ও পরিত্যাগে কিরূপ দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে আমরা তাহার একটি উদাহরণ প্রদান করিতেছি। কিয়দ্দিন হইল আমরা বহরমপুরে গিয়াছিলাম, তথায় যাইয়া শুনিতে পাই কিছুকাল পূর্ব্বে স্বদেশীর বড় বক্তা সেস্থানে বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার অনুগামী বহু ভলাণ্টিয়ার যুবা ছিলেন। বক্তৃতাস্থলে কাশীমবাজারের রাজবাড়ী হইতে আনীত একটী

বৃহৎ শামিয়ানা টাঙ্গান হইয়াছিল, এবং শ্রোতৃবর্গের বসিবার জন্য কতকগুলি চেয়ার রক্ষিত ছিল। বক্তার ভলাণ্টিয়ারগণ তাহা দেখিয়া বলিলেন, "শামিয়ানা বিলাতী কাপড়ে প্রস্তুত, এই শামিয়ানার নিম্নে বক্তৃতা হইবে না, আমরাও বসিব না, এই সকল চেয়ারও বিলাতী; চেয়ারে বসা হইবে না।" এবিষয়ে মহা গোলযোগ উপস্থিত করা হয়, শামিয়ানা স্বদেশী কাপড়ে প্রস্তুত, এরূপ প্রমাণিত হইয়া যায়, কিন্তু চেয়ার স্বদেশী কাষ্ঠে নির্ম্মিত বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। তজ্জন্য বক্তার অনুগামিগণ চেয়ারে না বসিয়া নীচে উপবিষ্ট হন। ইহা বিলাতী বর্জ্জনের অন্তর্গত ব্যাপার! আমরা জিজ্ঞাসা করি, কলিকাতা হইতে বহরমপুর পর্যন্ত ৭ ঘণ্টার পথ যে ট্রেণে চড়িয়া সুখে সচ্ছন্দে গমনাগমন হইয়াছিল, সেই রেলগাড়ী বিলাতী, না স্বদেশী? ট্রেণ ভাড়া যে দেওয়া হইয়াছিল সেই ভাড়ার টাকা স্বদেশী লোকে পাইয়াছে, না বিলাতের লোকের হস্তগত হইয়াছে? এইরূপ স্বদেশী ও বিলাতীর সামঞ্জস্য কোথা? যদি বিলাতী বর্জ্জন প্রতিজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে সমুদায় বিলাতী দ্রব্যের সংস্রব পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। পদব্রজে বা গো শকটারোহণে ৭।৮ দিনে বহরমপুরে যাওয়া উচিত ছিল। ইংরাজী ভাষা অবশ্য বিলাতী, উক্ত ভাষায় বক্তৃতা না করিয়া স্বদেশী বাঙ্গলা ভাষায় বা হিন্দিতে বক্তৃতা করা কর্ত্তব্য ছিল। ভলণ্টিয়ার সাজা কি বিলাতী অনুকরণ নয়? স্বদেশী পাইক সাজিয়া গেলে সঙ্গত ছিল। এরূপ সুবিধানুসারে বিলাতী বর্জ্জন নিতান্ত হাস্যজনক ব্যাপার।

ন্যায়সঙ্গত কথা, সত্য কথা বলিতে গেলে অনেক আত্মীয় বন্ধুরও বিরাগভাজন হইতে হয়। এদেশ ইংরাজ রাজ্য, এদেশের সমস্ত বিষয়ে ইংরাজরাজের একাধিপত্য ও প্রভুত্ব, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ জাতির সঙ্গে অসদ্ভাব করিয়া তাঁহাদের বিরাগভাজন ও অবিশ্বাসভাজন হইয়া জোর জবরদস্তিতে নিজেদের স্বার্থ সাধন করিবার সাধ্য নাই, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি ও অবনতিরই সম্ভাবনা; পদে পদে নানা বিষয়ে বিপদ্ ঘটিবারই কথা। গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে যে সকল উচ্চ অধিকার পাওয়া হইয়াছে, ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে চটাইলে অচিরে সেই সকল উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়া অসম্ভব নহে। তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। গুণ গ্রহণ ও উপকার স্বীকার না করিয়া কেবল কুট বুদ্ধিযোগে ছিদ্রান্বেষণ করিয়া চলিলে, নিজেদের দোষ ত্রুটির প্রতি সম্পূর্ণ অন্ধ হইলে, কোন কালে সদ্ভাব সম্মিলন হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না, দেশের দুর্গতি ও অবনতি অবশ্যম্ভাবী। সমস্ত কার্য্যের মূলে সম্মিলন ও সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিলে সর্ব্বোতোভাবে কুশল ও কল্যাণ হইতে পারে। কতিপয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোকের চেষ্টায় ও যত্নে স্বদেশী বস্ত্রাদির উন্নতি ও অধিক কাটতি হইতেছে, গরিব শ্রমজীবী ও শিল্পজীবীদিগের উপার্জ্জনের পথ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রমুক্ত হইয়াছে, তাহারা আর অন্ন বস্ত্রাভাবে ক্লিষ্ট নহে, ইহা অতিশয়

সুখের বিষয়। কিন্তু মূলে প্রীতি ও সদ্ভাব রক্ষা করিয়া স্বদেশের শিল্পবাণিজ্যাদির উন্নতি সাধন মহিলা প্রার্থনা করেন। তাহাতে স্থায়ী উন্নতি হইতে পারে; ধর্ম্মোন্নতি ও নৈতিক উন্নতি সর্ব্বাধিক প্রার্থনীয়। তাহা না হইলে স্বদেশের প্রকৃত উন্নতি সুদূর পরাহত। হিংসা বিদ্বেষ ও কটূক্তি ধর্ম্মাভাব ও নৈতিক অবনতির পরিচয় দান করে। বিধাতা নারীজাতিকে কোমল উপাদানে গঠন করিয়াছেন। স্বভাবতঃ তাঁহাদের হৃদয় প্রেমার্দ্র ও সুকোমল। তাঁহারা তীব্র কঠোর প্রকৃতি পুরুষদিগের সঙ্গে যোগদান করিয়া প্রবল প্রতাপ রাজার বিরুদ্ধে, গণ্যমান্য উপকারী জনের বিরুদ্ধে রসনা সঞ্চালন করিলে নিতান্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার হয়। হিতাহিত জ্ঞানবিমূঢ় উদ্ধত পুরুষদিগের দ্বারা অনেক সময় স্বদেশের হিতের পরিবর্ত্তে নানা প্রকার অহিত সাধিত হইয়া থাকে। নারীজাতি সেই ভূমিতে দণ্ডায়মান হইলে মাতৃদৃষ্টান্তে শিশু বালক বালিকারাও অস্বাভাবিক ভাব ধারণ করিবে, কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এজন্য মহিলা বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগকে সাবধান হইয়া চলিতে বলেন।

হিন্দুসমাজে বাল্য বিবাহ।

ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ এই;—

"অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাম্,
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্।"

অর্থাৎ যে বালিকা পতি-মর্য্যাদা ও পতিসেবা জানে না, এবং তৎকর্ত্তৃক ধর্ম্ম শাসন অবিদিত, পিতা এরূপ বালিকাকে বিবাহ দিবেন না।

শাস্ত্রের এই অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করিয়া বঙ্গদেশে হিন্দু পিতা সচরাচর এক প্রকার দুগ্ধপোষ্য অজ্ঞান বালিকাকে পাত্রস্থা করিয়া থাকেন, এবং স্বামী সহ একত্র বাস করিতে দিয়া থাকেন। বঙ্গদেশের পার্শ্বস্থ উৎকল ও বিহার প্রদেশে এইরূপ বাল্যকালে কন্যার বিবাহ হয় না। বাল্যকালে বিবাহ হইলেও সেই বিবাহ বাগ্‌দান স্বরূপ হইয়া থাকে। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে স্বামীর নিকটে প্রেরিত হয় না। উৎকলদেশে বিবাহিতা কন্যা বয়ঃস্থা হইয়া শ্বশুরালয়ে প্রেরিত হইলে তথায় যথাবিধি তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। তাহাকে পূর্ণ বিবাহ বলে। কন্যা সে পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে বাস করে। বিহার প্রদেশেও হিন্দুসমাজে এই নিয়ম। বাল্যকালে বিবাহ হইলেও তখনই কন্যাকে স্বামিসন্নিধানে পাঠাইবার নিয়ম নাই। সে যে পর্য্যন্ত বয়ঃস্থা না হয় পিত্রালয়ে বাস করে। বিবাহিতা কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে বিশেষ দিনে পিতামাতা তাহাকে সুসজ্জিতা করিয়া স্বামীর গৃহে প্রেরণ করেন। তখন আত্মীয় কুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয়, সকলে আসিয়া প্রীতিভোজন করেন, এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া কন্যাকে বিদায় দান করিয়া থাকেন। এইরূপে স্বামিসন্নিধানে কন্যার প্রথম গমনকে "গহেনা" বলে।

বঙ্গদেশে জ্ঞান সভ্যতার বড় আড়ম্বর ও বক্তৃতার ঘটা। এস্থানে পিতা মাতা ৮। ১০ বৎসর বয়ঃক্রম কালেও কন্যাকে বিবাহ

দিয়া তাহার স্বামীর নিকটে পাঠাইয়া থাকেন, সেই বালিকা স্বামীর সঙ্গে একত্র বাস করে। এই কুপ্রথার অপকারিতা কত দূর সকলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। জ্ঞানসভ্যতাভিমানী বাঙ্গালীদিগের এবিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই। বরং তাঁহারা উহাকে বিশেষ ভাবে সমর্থন করেন। পূর্ব্বতন রাজপ্রতিনিধি লর্ড ল্যান্সডাউন এই প্রথার বিষম অপকারিতা বুঝিয়া যখন এইরূপ বিধি প্রচলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যে, দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে বিবাহিতা বালিকাকে তাহার স্বামীর সঙ্গে একত্র বাস করিতে দেওয়া হইবে না। তখন এই কল্যাণকর বিধির বিরুদ্ধে রাজধানীর লক্ষ লক্ষ লোক তীব্র প্রতিবাদ করেন, রাজপ্রতিনিধির মত পরিবর্ত্তন উদ্দেশ্যে তাঁহারা মহাঘটা করিয়া কালীঘাটে কালীপূজা ও গড়ের মাঠে দলে দলে লোক মিলিত হইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহাতে কোন ফল হয় নাই। কালীপূজা ও হরিসঙ্কীর্ত্তনের পরের দিনই আইন বিধিবদ্ধ হয়। কিন্তু আইন হইলে কি হইবে? বাঙ্গালীদিগের প্রতিকূলতায় তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। বালিকাদিগকে অবাধে স্বামী সঙ্গে বাস করিতে দেওয়া হইয়া থাকে।

এদেশে আর একটি কুৎসিত নিয়ম বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, বরকর্ত্তার অর্থলোভ ও নিষ্ঠুর ব্যবহারে এক একটী বালিকাকে বিবাহ দিতে যাইয়া কন্যার পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকেন; তিনি চিরজীবনের জন্য ঋণ জালে জড়িত হন। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের প্রচলিত প্রথানুসারে কন্যাকে বাল্যকালে পাত্রস্থ না করিলে পিতা নিন্দাভাজন হন, তাঁহার উপর সামাজিক শাসন হইয়া থাকে, তাঁহার জ্ঞাতিকুল রক্ষা পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। সুতরাং পিতামাতা বাল্যকালেই কন্যাকে বিবাহ দিতে বাধ্য হন। কন্যার ৮।১০ বৎসর বয়ঃক্রম হইলেই তাহাকে বিবাহিত করিবার জন্য পিতামাতা ব্যস্ত হইয়া পড়েন, পাত্রান্বেষণ করিতে থাকেন, সহস্র সহস্র মুদ্রা বরপণদানাঙ্গীকারে পাত্র স্থির করেন। পশ্চিম বঙ্গে পাত্রের মূল্য যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে জানিতাম, এণ্ট্রেন্স পাশ করা পাত্রের মূল্য হাজার টাকা; ফাষ্ট আর্ট পাশ করিলে দুই হাজার, বি, এ পাশ করিলে তিন হাজার এম্ এতে চারি হাজার টাকা ব দক্ষিণা দান নির্দ্ধারিত। এক্ষণ ক্রমে তাহা অপেক্ষা বরপণ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্কুলের তৃতীয় বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে এমন বালককেও কন্যাদান করিতে হইলে নগদ ২।৩ হাজার টাকা দিতে হয়। তদ্ভিন্ন উপযুক্ত বস্ত্রালঙ্কার ও নানা তৈজস সামগ্রী না দিলেই নয়। অপিচ বিবাহের পর প্রতি বৎসর পর্ব্বাহাদি উপলক্ষে বিশেষ ভাবে তত্ত্ব না পাঠাইলে কন্যার পিতামাতা বরপক্ষের একান্ত বিরাগভাজন হন। এমন স্থলে অনেক বরকর্ত্তা পুত্রবধূকে তাহার পিত্রালয়ে যাইতে দেন না, চিঠী পত্রাদি লেখার সম্বন্ধও বন্ধ করিয়া দেন। যে সকল মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র গৃহস্থের তিন চারিটী কন্যা, বাস্তবিক তাঁহারা কন্যাদের বিবাহে সর্ব্বস্বান্ত হন। নূতন কুটুম্বিতায় সুখী হইবেন কি? কুটুম্বের

নিষ্ঠুরাচরণে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখেন। একদিকে কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতার দুর্দ্দশার শেষ নাই, অপর দিকে যাহার দুই চারিটি পুত্র সন্তান আছে, তিনি তাহাদিগকে বিবাহ দিয়া অচিরে বড়মানুষ হইয়া উঠেন। তাঁহাদের অর্থোপার্জ্জনের একটি প্রকৃষ্ট উপায় পুত্রের বিবাহ। ইহাকে অর্থলাভের ব্যবসায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই ব্যবসায়কে নিষ্ঠুর কসাইয়ের ব্যবসায় বলিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগের সভ্যতাভিমানী সুশিক্ষিত লোকেরাও এই ঘৃণিত কার্য্যে যোগদান করেন, বড় দুঃখের বিষয়। কিয়ৎকাল হইল স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে আমাদের পরিচিত একটি ব্রাহ্মণ বালককে বিবাহ দিয়া তাহার পিতা কন্যাকর্ত্তা হইতে নগদ তিন হাজার টাকা গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি এণ্ট্রাস পাশ করে নাই এমন একটি বালককে কন্যাদান করিয়া কন্যাকর্ত্তা বরকর্ত্তাকে দুই হাজার টাকা দান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই মহানগরীতে সচরাচর এইরূপ বিবাহ-বাণিজ্য হইতেছে। উক্ত দুই বালকই বিবাহ করিয়া লেখাপড়ার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছে, একজন সন্তানের পিতা হইয়াছে। এই রূপ বিবাহে অনেক স্থানে বাল্যকাল অতিক্রম না করিতেই কন্যা সন্তানবতী হয়, ১৬।১৭ বৎসর বয়সের বালক স্ত্রীপুত্রের ভার প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের প্রতিপালন ও ভরণ পোষণের জন্য ভাবনাগ্রস্ত হইয়া থাকে। তাহার আর লেখাপড়া শিক্ষা হইবে কি? অযুক্ত বয়সে অস্বাভাবিক পরিণয়জন্য বালক বালিকার উভয়েরই যাহার পর নাই শারীরিক মানসিক অবনতি হয়। তাহাদিগকে চিরকালের জন্য দুঃখ ও দুর্দ্দশার আবর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া পিতামাতা কিরূপে সুখী হন, এবং তাহাদের বিবাহে এত আমোদের ঘটা করেন, বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না।

সম্প্রতি আমরা ডিহিরিতে গিয়াছিলাম। শ্রুত হইল তথাকার ইঞ্জিনিয়ারিং আফিসের হেড ক্লার্ক বাবু ৪০ বা ৪৫ টাকা মাসিক বেতন প্রাপ্ত হন। তাঁহার নিবাস কলিকাতা অঞ্চলে, তাঁহার একটীমাত্র কন্যা, নগদ দুই হাজার টাকা বর-দক্ষিণাদানে তিনি সেই কন্যাকে পাত্রস্থা করিয়াছেন। ৩৲ সুদে তাঁহাকে টাকা ধার করিতে হইয়াছে, কন্যার মাতার অঙ্গে যে কিছু অলঙ্কার ছিল, তিনি বিবাহের সময় সমুদায় কন্যাকে দান করিয়াছেন, সধবার চিহ্নস্বরূপ লোহার খাড়ুমাত্র হস্তে ধারণ করিয়া আছেন। কন্যার শ্বশুর আজমিরে আছেন, বিবাহের পর হইতে কন্যা আজমিরে শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছেন। কন্যার পিতা অর্থাভাবে পর্ব্বাহাদিতে উপযুক্ত তত্ত্ব পাঠাইতে পারিতেছে না, ঋণজালে জড়িত, তাঁহার মাসিক ৪০৲ আয়, তিনি এই মহার্ঘের দিনে দুঃখ ক্লেশ নিয়মিত সাংসারিক ব্যয়ও নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারেন না, পর্ব্বাহাদিতে উপযুক্ত তত্ত্ব পাঠাইয়া বরকর্ত্তাকে আর কেমন করিয়া সন্তুষ্ট করেন? বরকর্ত্তা রাগ করিয়া পুত্রবধূকে পিতামাতার নিকটে আসিতে দেন না, এমন কি চিঠী পত্র লেখা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কন্যার পিতা-

মাতা বহুকাল কন্যার কোন সংবাদ না পাইয়া পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া উত্তরলাভে বঞ্চিত, তজ্জন্যে অতিশয় শোকাকুল; মাতা অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতেছেন। ইহা কি ভয়ানক নিষ্ঠুর ব্যাপার নয়? ইহা কি কুটুম্বিতা? আমি জানি কয়েক বৎসর হইল এখানে একটি ভদ্রলোক নগদ সাত হাজার টাকা দান করিয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়াছেন। তিনি রেভিনিউ বোর্ডের ক্লার্ক, এক শত বা দেড় শত টাকা মাহিয়ানা পাইয়া থাকেন; স্বীয় জীবনে যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন সমুদয় কন্যার বিবাহে উৎসর্গ করিয়াছেন। তাহার উপর ঋণের গুরুভার মস্তকে বহন করিতে হইতেছে। পাত্রের বিদ্যার দৌড় ফাষ্টআর্ট মাত্র। স্বদেশ উদ্ধারের জন্য বহু বক্তা বড় বড় বক্তৃতা করেন, বহু সম্পাদক প্রবন্ধ লিখেন, এসকল দুর্নীতি ও অত্যাচারনিবারণের জন্য কেহ কি দুটী কথা বলেন বা লিখেন? এসমস্ত স্বেচ্ছাচার ও দুর্নীতিসত্ত্বে স্বদেশের কল্যাণ কখনও হইবে না। বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থ জাতির মধ্যে কন্যার বিবাহে সাধ্যাতীত ব্যয় হইত বলিয়া গোপনে কন্যা-হত্যা হইতেছিল। তাহা নিবারণের জন্য সেদেশের জনহিতৈষী লোক সকল দলবদ্ধ হইয়া কত স্থানে কত সভাসমিতি ও আন্দোলন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে বিবাহের ব্যয় হ্রাস হইয়াছে। সকলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন যে, কন্যার বিবাহে অপরিমিত ব্যয় হইতে দিবেন না। জ্ঞান সভ্যতাগর্ব্বিত পশ্চিম বঙ্গনিবাসীদিগের কি এই কুনীতিনিবারণে একটু মনোযোগ হইবে না? পূর্ব্ববঙ্গে এই রূপ কুনিয়ম প্রচলিত নয়। হিন্দুসমাজভুক্ত পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী আমাদের এক জন আত্মীয় বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে সপরিবারে কটক নগরে বাস করিতেছেন। সম্প্রতি তথায় তাঁহার একটী কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিশেষ প্রতিবন্ধকতাবশতঃ তিনি সপরিবারে দেশে যাইয়া কন্যাকে বিবাহ দিতে পারেন নাই। ঢাকা হইতে বরের পিতা বরকে সঙ্গে করিয়া কটক নগরে গিয়াছিলেন। কন্যাকর্ত্তা আমাদিগকে লিখিয়া জানাইয়াছেন, "এই বিবাহব্যাপারে কন্যার অলঙ্কার ইত্যাদি লইয়া সাকল্যে আমার ৩৫০ তিন শত পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হইয়াছে।" কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই পশ্চিম বঙ্গের লোকের মধ্যে বিবাহ হইলে কন্যাকর্ত্তাকে তাহার দশ গুণ নগদ তিন হাজার পাঁচ শত টাকা বরদক্ষিণা দান করিতে হইত।

স্বর্গগতা দেবী হামিদা।

বিগত চৈত্রমাসে আমরা স্বর্গগতা দেবী হামিদার জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়াছি। তৎসঙ্গে তাঁহার কতকগুলি ধর্ম্মভাবপূর্ণ পত্রও যোগ করা গিয়াছে, গত জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার আরও কয়েক খানা পত্র এবং আষাঢ় মাসে একটি গভীর ভাবাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হইয়াছে। এবার উক্ত দেবীর দৈনন্দিন লিপিতে (Diary) তে লিখিত কতকগুলি প্রার্থনা এবং প্রিয়তম স্বামী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটে লিখিত কয়েক খানা পত্র তাঁহার স্নেহের কনিষ্ঠা

ভগিনী কল্যাণীয়া কুমারী শ্রীমতী সুজাতা দেবীর নিকটে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এবং দুই খানা পত্র শ্রীমান্ ভাই প্রথমলাল সেনের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে সে সকল প্রকাশ করা যাইতেছে।

আমরা পাঠিকাদিগের স্মরণার্থ দেবী হামিদার সঙ্ক্ষেপে পরিচয় দান করিতেছি, ইনি বাঁকিপুর নগরস্থ প্রসিদ্ধ ডাক্তার নববিধানবিশ্বাসী শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। ইঁহার প্রিয়তম স্বামী বিহার-ন্যাশেনাল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রীতিভাজন শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ। ইনি ২৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গতমার্চ্চ মাসের ১৩ই তারিখ স্বর্গগতা হইয়াছেন। ইঁহার বৈবাহিক জীবন দুই বৎসরমাত্র হইয়াছিল। ইঁহার প্রার্থনা, পত্র ও প্রবন্ধ সকল ইঁহার গভীর ধর্ম্মভাবের পরিচয়দান করে।

প্রার্থনা।

(দৈনন্দিন পত্র (Diary)।

১৮ই অক্টোবর ১৮৯৭।

দয়াময়, তুমি সহায় না হলে ত আর পারছি না। সহায় হও, সাহায্য কর, সুপথে হাত ধরে নিয়ে চল; কুপথে যেন ভুলিয়াও না যাই। তোমাকে যেন সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও না ভুলি, ভুলিলেই কুপথে গিয়া পড়িব। এই দীনের প্রতি দয়া কর, এই ভিক্ষা পূর্ণ কর।

১৯শে অক্টোবর ১৮৯৭।

দয়াময়, তোমার দিকে টান আরও হোক, তোমার সঙ্গে মিলি; যত ক্ষণ তোমার কাছে না আসি, কেবল মনে হয় কাজ শেষ হইল না, কাজ বাকি আছে, তোমার কাছে এসে যখন ফিরে যাই, মন ভাল হয়; তোমাকে যত ক্ষণ মনে রাখতে পারি তত ক্ষণ বেশ ভাল থাকি, মন বেশ শান্ত থাকে; আর তোমাকে যখন ভুলে যাই তখনই কুপথে যাই, রাগ অবাধ্যতা আমাকে জড়িয়ে ধরে। তবে তুমি দয়া কর, সহায় হও, সর্ব্বদা সঙ্গে থাক। এই ভিক্ষা তব চরণে।

২১শে অক্টোবর ১৮৯৭।

দয়াময়, তুমি সহায় হও। সকল লোকেরই দোষ থাকে জানি, কিন্তু দয়াময়, আমার যে সকল বড় বড় দোষ আছে সে সকল কি ভাল হইবে না? তুমি দয়া করিলে কি না হয়? যে মহাপাপী সেও উদ্ধার পায়। তবে আমার এই দোষ সকল হইতে তোমার দয়ায় তুমি আমায় উদ্ধার কর। এই ভিক্ষা।

৪ঠা নভেম্বর ১৮৯৭।

দয়াময়, তোমার প্রিয় যাঁহারা, যাঁহারা ভাল, তাঁহারাই তোমার সৎকন্যা ও সুকন্যা হইয়া তোমার ঐ অনন্ত ক্রোড়ে লুকাইতেছেন, আমিও তোমার সৎকন্যা সুকন্যা হইয়া তোমার ঐ অনন্ত ক্রোড়ে যাইব। তোমার নিকট বিনীত হৃদয়ে এই ভিক্ষা করি যাবার পূর্ব্বে যে উদ্দেশ্যেতে তুমি আমাকে এখানে পাঠাইয়াছ তাহা যেন এখন হইতেই কিছু কিছু বুঝিতে পারি, এবং সেই পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে এখন হইতে আরম্ভ করি, যেন

সে পথ ছাড়াইয়া বিপথে না যাই, এই ভিক্ষা।

৫ই নবেম্বর ১৮৯৭।

দয়াময় পরমেশ্বর, তোমাকে যেন এক তিলও না ভুলি, সর্ব্বদা তোমার হাত ধরে তোমায় জিজ্ঞাসা করে, এই সংসার-পথে যেন চলি। তুমি আমার সাথের সাথী হও। যখন কোন বিপথে পড়ে যাব বিনীত হৃদয়ে তখন যেন কেবল তোমাকেই ডাকি। বিবেক বাণী যেন শুনিতে চেষ্টা করি। তুমি আমার সহায় হও। এই ভিক্ষা তব চরণে।

৬ই নবেম্বর ১৮৯৭।

দয়াময়, এত করে তোমার নিকটে রোজ রোজ ভিক্ষা করিতেছি তাহা পূর্ণ হইতেছে না কেন? আমার অহঙ্কার আমিত্বকে চূর্ণ করে দাও। যেন সকলের নিকটে বিনীত নম্র হয়ে থাকিতে পারি, আপনাকে সকলের অপেক্ষা হীন মনে করি; তাহা হইলে আমার নিজের উপরে দৃষ্টি পড়িবে, এবং আমি আরও উন্নতি লাভ কবিব। তোমার নিকট বিনীত হৃদয়ে বার বার এই ভিক্ষা করি।

স্বামীর নিকটে লিখিত পত্র।

Howrah.

31st Oct. 06.

অনেক কথা মনকে ভরে দিচ্ছে, তা কার কাছে বলি, কে তা শুনবার জন্য ব্যস্ত? একলা যখন শুয়ে ভাবি, ভাবনার যেন শেষ থাকে না। ভগবান্ কতই ভাবনার বিষয় আমাদের সাম্নে রেখেছেন, তার কি অন্ত নেই? যখন নিজেকে প্রশ্ন করি এ সব ঘর, সংসার, স্বামী পৃথিবীর যত কিছু সম্পদ্ তার জন্য কি অভিলাষী হয়েছিলাম? বলি ভগবান্ কেন তুমি এত দিলে? যদি এ আস্বাদন দিলে তবে ইহার পরিতৃপ্তি দাও। ঘর সংসার পেলাম, কত দিন সংসার করিতে পাই? অসংসারী হইয়া সংসারের যত কিছু দায়িত্ব পূর্ণ করিতে দাও। শরীরে এক বিন্দু শক্তি দাও, স্বাস্থ্য দাও, সংযম দাও, অনাসক্ত কর।

আপনার হামিদা।

হাবড়া

২৪শে অক্টোবর, ০৬।

ইচ্ছে হয় ভাল দৃশ্যের মধ্যে বাগান গাছ পালা ফুল এসব দেখি, নির্জ্জনে কোথাও বসে থাকি। আর সেই ফুলের মত পবিত্র জিনিষ যাকে কেবলই মনে হয় নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য এ পৃথিবীতে স্পর্শ করিতে পাইলাম না; যাহাকে পাইয়াও পাইলাম না; কোথায় গেলে তাহার সুন্দর স্মৃতিতে প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারিব? এ অভাব আমার কে বুঝিবে? অনেক রোগ ভোগ করিলাম, জীবনে অনেক কষ্ট ও যন্ত্রণা বহন করিয়াছি। কিন্তু কখন মাতা হইয়া মায়ের দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝি নাই। যে অদৃশ্য শিশুর প্রতি ভগবান্ বক্ষে এত স্নেহ সঞ্চার করিলেন, দেখিবার আগে যাহাকে এত ভাল বাসিলাম, যাহার স্বর্গের হাসিটুকু দেখিবার জন্য কত আশা প্রাণে লইয়া এত

কষ্ট ভোগ করিলাম, আজ তাহারই চিন্তা, তাহারই কথা, তাহারই অভাব অন্তরকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। কষ্ট এই, এত ত্রুটি কেন করিলাম। এই সব ছোট বড় ত্রুটির জন্য বুঝি সে এ পৃথিবীর আলোক দেখিতে পাইল না। আর কত বলিব? আগের পত্রে অনেক দরকারী কথা লিখিয়াছিলাম, তাহার উত্তর এখনও পাইলাম না। আমার Children's Union এর কি হইল? George Mullar যেমন প্রার্থনা করিয়া সব পাইতেন, আমরা যেন তেমনি সরল ও ব্যাকুল প্রার্থনা করিয়া সকল অভাব পূর্ণ করিতে পারি। কাহারও সাহায্য চাহিব না।

উপাসনার ঘরের কি বন্দোবস্ত হইল? আমি যাবার আগে কি হইবে না?

আজ আর না।

আপনার হামিদা।

——

শান্তি কুটীর

৮ই ফেব্রুয়ারী, ০৬।

আমার মন বড় কঠিন, আমার ভাষা বড় তিক্ত। আমার উচিত অনুচিত জ্ঞান প্রাণকে এমনি দলন করে যে, সকল স্নেহ, সকল কোমলতা অন্তর হতে যেন অন্তর্হিত হয়। ইহাতে আমি যথার্থই ব্যথিত হই। কিন্তু ইহা যে নিতান্ত অমূলক ভাবে মনকে নিপীড়িত করে বলিতে পারি না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে সকল অকরণীয় যেন আমার করণীয় হয়, আর যেন অবস্থাকে ভৎর্সনা না করি।

"হইল না, পারিলাম না" এই অভাবে প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে। জানি না জগতে কত দিন আর থাকিতে পাইব। ইচ্ছা হয় যত শীঘ্র পারি মনের সাধ মিটাইয়া লই। আপনি উজ্জ্বল হয়ে-আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকুন। আপনার কাজ কর্ম্ম আপনার উদ্যম উৎসাহ পাইলেই আমি সুখী হইব। অন্য কোন সম্ভোগের প্রয়াসী নই। ভগবানের জন্য ব্যাকুল হন, আর ভগবানের অজানিত রহস্যের পরিচয় সকলের নিকট প্রকাশ করুন; যেন বিশ্রাম না থাকে। যদি এ সকল কথা আপনার আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে জানিব সকল সাধ মিটিবে। যদি আমার কথা আপনাকে ধর্ম্মের জন্য উত্তেজিত করিতে পারে জানিব সার্থক হইল।

আপনার হামিদা।

——

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটে লিখিত পত্র।

তোমার জন্য সর্ব্বদাই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া আছে। পথ পানে চেয়ে আছি কবে তোমার সুসংবাদ পাব। ভগবান্ তোমার সহায়, তিনিই তোমায় কুশলে রাখিয়াছেন। বিশ্বাসে ভর করিয়াই মানুষ বাঁচিয়া থাকে।

যখন শিশু ছিলাম, যখন জন্মে ছিলাম, ভাবিয়া দেখি তখন কত সুখী ছিলাম। সব কটী এক জায়গায়, মা বাপের স্নেহে আমরা ভাই বোনে কতই হাসিতাম, সে সরলতা, নির্দ্দোষ আমোদ সম্ভোগ করিবার অধিকার কোথায় হারাইলাম। সে স্নিগ্ধ মধুর প্রফুল্ল মুখ কেন মলিন বিষণ্ণ? শত ভাবনায় প্রাণ ভারাক্রান্ত,

পাপে তাপে মোহে মায়ায় আমার অন্তরের সেই বিমল ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইয়াছে। তাই কষ্টে, দুঃখে নিজেকে বড়ই অসহায় বোধ করিতেছি। ভগবান্ পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন। আমরা শান্ত ধীর হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে সক্ষম হই। তিনি বল দিন, তিনিই সহিষ্ণুতা দিন, তিনি সহায় হউন।

কালকের দিনের পবিত্র স্মৃতি কত হারাইলাম, কত পাইলাম, "ভগবান্, তোমার চরণ প্রান্তে একবার বিশ্বস্তচিত্তে তা স্বীকার করিতে দাও। তুমি ধন্য! ইহলোক পরলোকস্থ সকলের আশীর্ব্বাদ ও শুভ কামনার সহিত তোমার ইচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ মিশিয়া যাউক্।" তুমি আমার জন্য প্রার্থনা কর যেন এ বছরের নূতন আশা, নূতন উদ্দেশ্য, আমাদের সকলকে সুখী করিতে পারে। তোমাকে নমস্কার করি।

Exhibition Road.
Bankipore. 3. 3. 06.

——

Exihdition Roab.
16. 7. 05.

দাদা,

তোমার চিঠী আজ পেলাম, এ বাড়ীতে এসে পেলাম। আমি এখানে অনেক সময়ই একলা থাকি। আজ কাল day কলেজ, কাজেই সারাদিন বাড়ী থাকেন না। একলা একলাই দিনগুলি কেটে যাচ্ছে। কত সময় তোমার কথায় মনটা ভরে থাকে। তোমাকে যেন কাছে পাই, কত আনন্দে উৎসাহে প্রাণ খুলে বলি, এত প্রিয় তুমি কেন হলে? ভাল বলেই মনটা তোমার কাছে যেতে চায়, তোমারে কথা ভাবতে চায়। যখন তুমি আরও ভাল হবে, ভগবানের আরও নিকট হবে, আমাদের প্রাণ আরও কত বেশী তোমার পানে আগ্রহে পূর্ণ হয়ে যাবে, তোমাকে পেয়ে আমরা কত ধন্য কত কৃতার্থ,কে তা জানে? ইচ্ছে হয় এই যেমন আকর্ষণের বস্তু তুমি আমাদের কাছে, আর সকলের কাছেও তেমনি হও। তোমার সদ্‌গুণ দেখে লোকের ভালবাসা ও ভক্তি বাড়ুক, তুমি কোন লোককে অতিক্রম করিয়া যাইও না। সদ্ভাব দেওয়া নেওয়া এর ভেতর কি শান্তি, আরাম তা কে আর অনুভব করে নি। তোমার জন্য আমার এই কেবল একটি সাধ হয়, ইচ্ছা হয় তুমি ইহা পূর্ণ কর। আমার অন্তরের ভক্তি ও ভালবাসা গ্রহণ কর।

তোমার স্নেহের হাসিদা।

——

বাঁকিপুর।
১৪ই নভেম্বর,১৯০৪।

দাদা,

কত দিন তোমার চিঠী পত্র পাই নি। বুঝতেই পাচ্ছি তুমি কত ব্যস্ত থাক। দাদা মহাশয়কে কি রোজ দেখতে যেতে পার? তোমায় দেখে কি বল্লেন? তিনি ওখানে গিয়ে কেমন আছেন? কিছু কি ভাল লক্ষণ দেখ? সর্ব্বদা তাঁর জন্য মন উৎসুক ও বিষণ্ণ হয়ে থাকে; কিছু ভাল লাগে না। ভগবান্ আমাদের পথ দেখিয়ে দিন।

নিজেকে বড় অসহায় ও শ্রান্ত বোধ করছি। মাঝে আবার শরীরটা ভাল ছিল না। সামান্য একটু ভাবলেই মনটা শরীরটা অবসন্ন হয়ে যায়। কি করে সহ্য করি বল। আমার অন্তরের ভালবাসা ও ভক্তি গ্রহণ কর।

তোমার স্নেহের হামিদা।

বাঁকিপুর।
২রা জুলাই ১৯০৫,

দাদা,

আমাদের কথা ভেবে তুমি সম্পূর্ণ শান্তিতে বিশ্রাম করিতে পাও না, ইহা শুনিয়া যথার্থই দুঃখ হইল। কিন্তু আমরা যখনই ভাবি প্রকৃতির নির্দোষ অতুল সৌন্দর্য্য-রাশির ভিতর তুমি আত্মহারা হইয়া বিশ্রাম করিতেছ,আমরা যেন নিজেদের শ্রান্তি ভুলিয়া যাই। যদি একজনের জন্য অন্যে এই রকম করে সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী না হই, তবে আর ইহার ভিতর প্রকৃত বন্ধন কোথায়? প্রকৃত স্বার্থত্যাগ কোথায়? তোমার ক্লান্ত দেহ মনে প্রকৃতির নীরব সহানুভূতি এবং জগতের সৌন্দর্য্য হইতে যে আনন্দের উচ্ছ্বাস উত্থিত হয় তাহা তোমার চরিত্রকে গঠন এবং হৃদয়কে শুদ্ধ করিয়া দিক্। সেই পুষ্পময় নির্জ্জন পর্ব্বতের সমস্ত রমণীয়তা তোমার স্বভাবের ভিতর সংগ্রহ করিয়া আনিও। হৃদয়ে তোমার জন্য এই প্রার্থনা উঠিতেছে। তুমি সুখী হও, তুমি সকলকে সুখী কর।

কাল দক্ষিণা বিলাতে গেল, তোমার কথা মনে হইতেছিল। কবে এমনি করে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, ভেবে কষ্ট হচ্ছিল। আমার অন্তরের ভক্তি ও ভালবাসা লও।

তোমাদের আদরের হামিদা।

শ্রীমান্ প্রথলাল সেনের নিকটে লিখিত পত্র।

বাঁকিপুর
২৮শে নবেম্বর ১৯০৪।

শ্রীচরণেষু,

কাল সুজাতা আমায় জিজ্ঞেসা করিয়াছিলেন, আনন্দ কি করে হয়? মানুষের প্রকৃতি তিনটে জিনিষে গঠিত;—জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য। মানুষের সব বিষয় জানবার জন্য এমন অদম্য ইচ্ছা, যত জানা যায় পরেও ক্রমাগত জানিবার ইচ্ছা হয়, আর যত জানা যায় মনে কি আনন্দ কি উৎসাহ হয়। তেমনি প্রেম—লোকের একটু কিছু উপকার কল্লে কত সুখ হয়। সেই রকম একদিন সেবা করে মানুষের মনে তৃপ্তি হয় না; ক্রমাগত মনের ভেতর সেবা কর্তে, উপকার কর্তে, ভাল বাসতে, আদর যত্ন কর্তে কি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, তার কি নিবারণ হয়? লোকের ভাল কর্তে যে ইচ্ছা, আর করে যে সুখ এই হল প্রেমে আনন্দ। তার পর পুণ্য। লোকে অন্যায় করে কখনও চুপ করে থাকৃতে পারে না; দোষ কল্লে কতই অনুতাপ কতই গ্লানি হয়, কি করে তা হতে উদ্ধার হবে? একটু যদি পুণ্য করিতে পারলাম শান্তি হয়। কিন্তু সে শান্তি কি চির দিনের জন্য? মানুষ এক-

দিন ভাল হতে পারলে তার মনে আবার ইচ্ছা হয় আরও ভাল হই, আরও ভাল হই, তার যতই ধর্ম্মলাভ হোক, সে যতই পাপমুক্ত হতে পারুক,মনের এ অভাব যাইবার নয়। যতটুকু ভাল হতে পারলাম মনে সুখ হল, আনন্দ হল। কিন্তু পূর্ণতার জন্য মানুষের এ অদম্য ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা কোন্ দিন যাইবে?

আপনি যে "ভাবের" কথা বলেচেন আমি সে বিষয় ভাবছিলাম। ভাব যখন আসে তার কি ব্যবহার কর্ত্তে নেই? আমি ত অনেক সময় লিখি তাতে কি কিছু অপকার হয়? আমি দেখেছি একটা ভাব অনেক ক্ষণ মনে স্থায়ী হয় না। কিন্তু অনেক সময় ইচ্ছা হয় এ বিষয়টা মনে অনেক ক্ষণ থাকুক। তা কি হয়? এ সকল বিষয় আমাকে বলবেন।

আপনি Victoria College এ কি গিয়েছিলেন? আমরা ২। ৩টা কেন ৪। ৫ মাস ক্রমাগত ওখানকার lectures attend করেছিলাম। Senior Class এও পড়তাম, আমার ত খুব ভাল লাগত। আমি এখানকার মেয়েদের কাছে কতবার বলেছি, এমন সুন্দর করে পড়াতে আর কারোকে দেখি নি। Bunyans Pilgrims Progress আমাদের জন্যই দাদামশাই বেচে বলে দিয়েছিলেন। আমার মনে হয় আর সব মেয়েদেরও ভালই লাগত। আজ এই পর্য্যন্ত।

আপনাদের স্নেহের
হামিদা।

বাঁকিপুর
১লা ডিসেম্বর ১৯০৪।

শ্রীচরণেষু

অনেক কথা কাল থেকে মনে উঠছিল, তা কি আর এখন তেমন মনে আছে? আপনার ভাল বই, ভাল কথা পড়তে পড়তে আমাদের কথা মনে হয়। আমরাও কোন একটা ভাল জিনিষ দেখলে, ভাল বিষয় জানলে আপনাকে মনে পড়ে। যে রাজ্যে আপনার পরিচয় পেলাম সেখানে গোলমাল নেই, সাংসারিকতা নেই। সে রকম ধর্ম্ম ও জ্ঞান লাভ না হলে এ পরিচয় যথার্থ সত্য পরিচয় হবে না, তাই সকল সময় কেমন যেন একটা ভয় হয়; তাই যেন সকল কাজ কর্ত্তে ভরসা হয় না। আপনারাই যেন আমাকে সব রকম অন্যায় বলতে অন্যায় কর্ত্তে সকল সময় বাধা দিচ্চেন। আমার চরিত্রে যদি কোন সদ্‌গুণ থাকে তার মূলে আপনারা। এ কথা একেবারে সত্য কথা। আপনাদের এত আশীর্ব্বাদ এত শুভ ইচ্ছা পেয়ে যদি এত টুকু উপযুক্ত হতে পারি সে কিছুত বেশী নয়?

রোজ সকালে আচার্য্যের Prayers থেকে খানিকটা পড়ি, The Joy of Faith পড়িয়াছিলাম। তার পর Shakes pear থেকে খানিকটা পড়ি, তার পর বিকেলে মামীমার জীবনী পরিষ্কার করে লিখি। এ সবের ভেতরই কেমন একটা আকর্ষণ, কেমন একটা মিষ্টতা থাকে যে, সবই আমার ভাল লাগে।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম
আপনি জানবেন। আজ এই পর্য্যন্ত
আপনাদের স্নেহের
হামিদা।

ফুঙ্গিদিগের ভিক্ষায় যাত্রা।

আমরা ক্রমে হামিদা দেবীর আরো অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর পত্র প্রকাশ করিব, এরূপ ইচ্ছা করিয়াছি।

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

বর্ম্মদেশ।

৬ষ্ঠ।

টাঙ্গু ও ফিমুনগর।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজক ফুঙ্গিদিগের বৃত্তান্ত পূর্ব্ব কয়েক সংখ্যায় বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহার কোন সংখ্যায় এ কথারও উল্লেখ আছে যে, তাঁহারা ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। প্রত্যূষে ভিক্ষা-পাত্রসহ প্রত্যেক ফুঙ্গি বৌদ্ধ গৃহস্থদিগের দ্বারে বিনীত ভাবে উপস্থিত হন, যিনি অন্ন ব্যঞ্জনাদি যাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করেন তাহা গ্রহণ করিয়া আবাসে ফিরিয়া আসিয়া ভক্ষণ করেন। একাকী বা অনেকে দলবদ্ধভাবে ভিক্ষার জন্য ভিক্ষা-ভাণ্ড কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়া রাজপথ দিয়া যাত্রা করিয়াছেন, তাহা অনেক সময় নয়নগোচর হয়। টাঙ্গু নগরে বড় বড় পেগোডা ও ফুঙ্গিচাঁও বিদ্যমান, তথায় বহু ফুঙ্গি বাস করেন। সেখানে আমরা ভিক্ষাযাত্রিক অনেক ফুঙ্গিকে দেখিয়াছি। ভিক্ষার জন্য যাত্রা করিয়াছেন এমন এক দল ফুঙ্গির চিত্র প্রদর্শিত হইল।

টাঙ্গু পুরাতন নগর। উত্তর বর্ম্মা ইংরাজরাজ্যভুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে টাঙ্গু জিলাই ইংরাজ রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ ছিল। একটী স্রোতস্বতীর তীরে এই নগর, নদীটীর নাম সিটাং। নদীর উপর একটি দারুময় সেতু নির্ম্মিত হইতেছে, নদীর উত্তর কূলে নাতি দূরে পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। নগর হইতে পর্ব্বত ২৫ মাইল দূরে, পর্ব্বতের নাম ইয়ুমা, সে পর্য্যন্ত রাজপথ প্রসারিত আছে, গিরি-শ্রেণীতে অসভ্য শান ও কেরণ জাতি বাস করে। ইহার পূর্ব্বদিকে সানরাজ্য ও তাহার পূর্ব্বাংশে শ্যামরাজ্য, টাঙ্গু হইতে প্রায় ১৫ দিনের পথ। পীনমানা নগ-রের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে নাতি সমুচ্চ গিরি শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। সেই পর্ব্বত-মালার অপর পার্শ্বে উক্ত সাননামক ক্ষুদ্র রাজ্য, সেস্থানে প্রচুর গোল আলু উৎপন্ন হয়।

টাঙ্গু জিলার অধিকাংশ ভূমি অকৃষ্ট অরণ্যাকীর্ণ পতিত। ডোমরাঁও মহারাজের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান লালা জয়প্রকাশ লালের পুত্র হরিহরপ্রসাদ গভর্ণমেণ্ট হইতে টাঙ্গু জিলায় পনের হাজার একর অরণ্য-ময় পতিত ভূমি ৯৯ বৎসরের জন্য নিষ্কর প্রাপ্ত হইয়া বিহার ও নানা প্রদেশ হইতে লোক পাঠাইয়া চাষ আবাদ করাইতেছেন। এই সূত্রে বিস্তীর্ণ অরণ্যানী কৃষিক্ষেত্রে এবং গ্রাম ও পল্লীতে পরিণত হইতেছে। যাহারা পরিশ্রম করিয়া আবাদ করে তাহাদিগকে প্রথম দশ বৎসর ভূমি নিষ্কররূপে দেওয়া হইয়া থাকে। পরে কিছু করগ্রহণ, ক্রমে করবৃদ্ধি করার নিয়ম হইয়াছে। এক-র্য্যের জন্য একজন উপযুক্ত ম্যানেজার টাঙ্গু নগরে বাস করিতেছেন। বর্ম্মদেশের

স্থানে স্থানে এরূপ নিবিড় অরণ্য আছে যে, তাহাতে হস্তী গণ্ডার ব্যাঘ্র ভল্লুক দলে দলে বিচরণ করে। সেদেশের জঙ্গলে দ্বি খড়্গী গণ্ডার ও শ্বেতহস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ম্মদেশীয় লোকেরা শ্বেত হস্তীকে দেবাধিষ্ঠিত বলিয়া অতিশয় সম্মান করে।

টাঙ্গু নগরে একটি পুরাতন দুর্গ বিদ্যমান। এ নগরে ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে বহু চায়না লোক আসিয়া বাস করিতেছে। তাহাদের বড় বড় দোকান ও হোটেল আছে। অনেক চায়নাম্যান ছুতর মিস্ত্রীর কাজ করিয়া থাকে। একাজে তাহারা অতিশয় পটু। এখানকার মিয়ুনিসিপাল বাজারে সাধারণতঃ সকল প্রকার দ্রব্যজাত পাওয়া যায়। একদিন আমরা শ্রীমান্ সুরেন্দ্র নাথের সঙ্গে সেই বাজার দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি বর্ম্মরমণীদিগের পরিচ্ছদ লুঙ্গি ও এঙ্গি এবং তাহাদের ব্যবহার্য পাদুকা ফানা, তাহাদিগের বিচিত্র শিল্পদ্রব্য কাপড়ের ফুল কিছু ক্রয় করিয়া উপহারস্বরূপ আমাদিগকে দিয়াছিলেন, এবং সেদেশের অন্যান্য উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্য ও ফুঙ্গি দিগের পরিচ্ছদ ও ভিক্ষাপাত্রাদি রেঙ্গুণ নগর হইতে ক্রয় করিয়া কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য কিছু টাকা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। টাঙ্গুর বেগুন প্রসিদ্ধ, পীনমানাতে অবস্থানকালে টাঙ্গু হইতে বেগুন উপহারস্বরূপ প্রেরিত হইয়াছে।

টাঙ্গুনগরে ক্যাথলিক চর্চ্চের বিস্তৃত কার্য্য ক্ষেত্র বিদ্যমান। ছাত্রনিবাস বিদ্যালয় এবং গিরজা ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া এস্থানে অনেকগুলি মিশনারী বাস করিতেছেন। কিন্তু কোন বর্ম্মদেশীয় বৌদ্ধকে যে তাঁহারা খ্রীষ্টান করিতে পারিয়াছেন এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় নাই। বরং অনেক ইয়ুরোপীয় লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং কেহ কেহ ফুঙ্গি হইয়াছেন। আমরা গত বারে উল্লেখ করিয়াছি যে একজন সাহেব বৌদ্ধ, ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া টাঙ্গু নগরে এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুইটি পেগোডা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অসভ্য কেরণদিগের দ্বারা উল্লিখিত চার্চ্চ স্কুলে ও বোর্ডিং স্কুল ইত্যাদির কার্য্য চলিতেছে। দলে দলে কেরণ জাতীয় লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে ৫।৬ জন বাঙ্গালী বাবু সপরিবারে টাঙ্গু নগরে বাস করিতেছেন। চট্টগ্রামনিবাসী নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও মোসলমান এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ও পঞ্জাবের লোক এখানে অনেক আছে। নিম্ন শ্রেণীর মাদ্রাজী লোক টাঙ্গু নগরে ও বর্ম্মদেশের অন্যান্য নগরে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ধনকুবের চেটীরা মাদ্রাজী, ইহারা ঋণদাতা উত্তমর্ণ। বর্ম্ম দেশের সর্ব্বত্র গরিব দুঃখীদিগের উপর ইহাদের প্রভাব। বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজক ফুঙ্গিদিগের সঙ্গে আকৃতিগত ইহাদের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে, কিন্তু প্রকৃতিগত অত্যন্ত বিপরীত ভাব। ফুঙ্গিগণ গোঁপ শ্মশ্রুবিহীন মুণ্ডিত মস্তক, চেটীরাও তদ্রূপ। কিন্তু ফুঙ্গিগণ ঈষৎ পীতবর্ণ ক্ষীণাঙ্গ, তাহারা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ স্থূলাঙ্গ। গোঁপ শ্মশ্রুবিহীন মুণ্ডিত মস্তক কৃষ্ণবর্ণ স্থূলকায় কোন পুরুষকে দেখিলেই

সেই ব্যক্তি চেটী এইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে। ফুঙ্গিরা অর্থোপার্জ্জন, অর্থসঞ্চয় করেন না, ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করেন; চেটীরা প্রবল অর্থরাক্ষস, তাহারা উকিল মোক্তার প্রভৃতি ধনী বিষয়ী লোক হইতে অল্প সুদে টাকা ধার করে, অধিক লাভের প্রত্যাশায় কৃষিজীবী ও অন্যান্য গরিব লোকদিগকে টাকা ধার দেয়, ধান কাটা হইলে পর সুদে আসলে দশগুণ আদায় করে। বর্ম্মদেশীয় সাধারণ লোকেরা অতিশয় গরিব, পুরুষেরা অলস অকর্ম্মণ্য, ঘরে খাবার থাকিলে আর পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে চাহে না? বৎসরান্তে ধানের ফসলের উপর তাহাদের সকল আশা ভরসা। সেদেশের প্রধান শস্য ধান্য, ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। কৃষকদিগের অল্প পরিশ্রমেই ক্ষেত্রে প্রচুর ধান্য জন্মে। জন্মিলে কি হইবে? তাহার অধিকাংশই ঋণ পরিশোধের জন্য চেটীদিগকে দিতে হয়, সমস্ত শস্য দান করিয়াও অনেকের ঋণ পরিশোধ হয় না, চেটীরা তাহাদের ঘর বাড়ী গরু বাছুর জমী ইত্যাদি আত্মসাৎ করে। এইরূপে চেটীগণ গরিব দুঃখীর শোণিত পান করিয়া বড়লোক হয়। আদালতে টাকালগ্নীসম্বন্ধীয় চেটীদিগের মোকদ্দমাই অধিক, তাহাতে উকিলদিগের বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন হয়। বর্ম্মদেশীয় সাধারণ লোকদিগের গৃহে অন্নের সংস্থান বড় কম। স্ত্রীলোকে পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করে বলিয়া স্বামীদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। পুরুষদিগের জুওয়া খেলার অত্যন্ত নেশা, অনেকে জুওয়া খেলিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়, উপায়ান্তর না দেখিলেই অর্থগৃধ্নু চেটীদের নিকটে যাইয়া টাকা ধার করে। অধিকাংশ চেটী মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কোকনদ জিলার অধিবাসী।

বিগত ২৬শে ফাল্গুন রবিবার পূর্ব্বাহ্নে নবসংহিতামতে শ্রীমান্ সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবকুমারীর নামকরণ হয়, কুমারীর নাম প্রতিমা রাখা হইয়াছে। এই নামকরণ ক্রিয়া উপলক্ষে তত্র প্রবাসী কয়েক জন বাঙ্গালী বাবু নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন, এক জন ব্রাহ্ম সপরিবারে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রী মান্ বিনয়েন্দ্র নাথ ফিয়ু নগর হইতে আসিয়াছিলেন। আমরা ভোজনান্তে শ্রীমানের সঙ্গে ফিয়ুতে যাত্রা করি। ফিয়ু টাঙ্গুজিলার সব ডিবিসান। আমারা অপরাহ্ণে তথায় উপনীত হই।

ফিয়ু নগরটি ক্ষুদ্র হইলেও দেখিতে সুন্দর। বাড়ী ঘর সকল কাঠের, তখন সেই নগরে বিনয়েন্দ্র নাথ ব্যতীত অন্য এক জনও বাঙ্গালী বাবু ছিলেন না। কেবল এক জন বাঙ্গালী পোষ্ট মাষ্টার তত্রত্য পোষ্ট আফিসের কাজে এক সপ্তাহের জন্য স্বীয় ভ্রাতা সহ আসিয়াছিলেন। একজন বর্ম্মীর দারুময় বৃহৎ গৃহ বিনয়েন্দ্র ভাড়া করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। গৃহটি নবনির্ম্মিত সুন্দর। তাহাতে বড় বড় প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান। বিনয়েন্দ্র একাকী একটি ভৃত্য সহ সেই গৃহে স্থিতি করিয়াছিলেন। বিনয়েন্দ্র বি, এল্ উপাধি প্রাপ্ত চরিত্রবান্ উৎসাহী অবিবাহিত, নব যুবক, বর্ম্মদেশীয়

ভাষা অনর্গল লিখিতে পড়িতে ও বলিতে পারেন। ঈশ্বরানুগ্রহে তিনি অল্পদিনের মধ্যে নিজের কাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ভোজ্য পরিচ্ছদাদি সকলই সাদা সিদে আড়ম্বরশূন্য। তিনি ঘরে লুঙ্গি পরিয়া থাকেন, তাঁহার কোর্টের পোষাক স্বতন্ত্র, তিনি চা পান করেন না, সকালে এক প্যালা দুগ্ধ পান করিয়া মক্কেলদিগের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিয়া ও লেখা পড়ার কাজ করিয়া ভোজনান্তে কোর্টে চলিয়া যান। তিনি নিরামিষ ভোজন করেন *, বিকালে কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিলে কিছু মোহন ভোগ যোগে তাঁহার জল খাওয়ার ব্যবস্থা। তিনি অল্প দিন পূর্ব্বে পীনমানা নগরে পারিবারিক ব্রহ্মোৎসবে নব সংহিতানুসারে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, নিত্য ব্রহ্মোপসনা করিয়া থাকেন। আমরা অপরাহ্নে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া তন্দ্রাবেশে শয্যায় অবলুণ্ঠিত হইতে ছিলাম, শ্রীমান্ আমাদের শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন, আমরা নেত্রোন্মিলন করিলে আগ্রহপূর্ব্বক বলিলেন, এক্ষণ উপাসনা হইতে পারে কি? এ কথা শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। উপাসনা হইল, শ্রীমান্ সঙ্গীত করিলেন।

অপরাহ্নে শ্রীমানের সঙ্গে নগরভ্রমণে বাহির হওয়া গিয়াছিল। নগর-প্রান্তেই প্রসারিত প্রান্তর, উত্তর প্রান্তে অদূরে গিরিশ্রেণী, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চিত্তমুগ্ধকর। বর্ম্মদেশে শীত ঋতুর প্রকোপ নাই। এদেশ গ্রীষ্মপ্রধান, কিন্তু বৈশাখ মাস হইতে প্রায় ছয় মাসকাল বারিবর্ষণ হয়। ফাল্গুন মাসেই ফিয়ু নগরে বেশ শীতবোধ হইল। নিকটে পর্ব্বত বলিয়া এই স্থানে অধিকতর শীত। নগরভ্রমণ করিতে করিতে বর্ম্মীদিগের পল্লীর ভিতরে প্রবেশ করা হইয়াছিল। নপ্পির দুর্গন্ধে "বাবা, পালাও" বলিয়া সেই স্থান হইতে ছুটিয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। পরদিন ২৭শে ফাল্গুন সোমবার ভোজনান্তে বেলা ১০ টার গাড়ীতে তথা হইতে পেগুতে যাত্রা করা যায়। শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্র গাড়ীতে আমাদিগকে উঠাইয়া বিদায় হইয়া গেলেন। পেগুনগরে গমনের প্রস্তাব ছিল, তথাকার এডভোকেট অবিনাশ বাবুকে পত্র লিখিয়া এবং টেলিগ্রাফ করিয়া কোন উত্তর না পাওয়াতে তথায় যাওয়া হয় নাই। তাঁহারই গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করার কথা ছিল।

---

* শ্রীমান্ বলিলেন, আমি কোন Principleএর জন্য আমিষ ত্যাগ করি নাই। টাঙ্গু নগরে দাদার বাসায় গেলে মৎস্যাদি খাইয়া থাকি।

মহিলার রচনা।

দিনান্তে।

অনন্তে মিশিতে সুখে,
কত আশা ল'য়ে বুকে,
আসিয়াছি আমি পুন
তোমার চরণে।
সারাটি দিনের পরে,
এসেছি আবার ফিরে
বিরাম লভিতে পিতা
তব সন্নিধানে।

পেতে সুখ, নিতে শান্তি
পাসরিতে দুঃখ ক্লান্তি
হেরিতে আবার পিতা
তব ও বয়ানে।
অলক্ষিত আকর্ষণে
ডাকিতেছ প্রতিক্ষণে
আয় আয় বলে সব
পুত্র কন্যাগণে।
তোমার প্রেমের নীতি
জীব-সেবা বিশ্বপ্রীতি
শিখাবারে তুমি নাথ
সমস্তটি দিন ;
আশীর্ব্বাদ দিয়ে শিরে
জ্ঞানালোক দিয়ে করে
সংসারসঙ্গম পারে
রাখ নিশি দিন।
(তাই) ক্ষণে ক্ষণে প্রাণ
গেয়ে হরি নাম গান
দিনটা কাটিয়ে ;
সাঁজের বেলায় ছাতে
হরি নামগানে মেতে
দিবসের শ্রম ক্লান্তি
করি হে বিরাম।
কি সুখ চিন্তায় মোর
আনন্দেতে হয় ভোর
মধুর সুন্দর সেই
সন্ধ্যা বেলা টুকু।
দয়াময় নামগানে
কত সুধা ঢালে প্রাণে
প্রাণারাম হরিনামে
বিদুরিয়া দুখ
হরিনাম সুধারসে
পূর্ণ করে বুক।

কলিকাতা শ্রীমতী ব্র—

জাপানের বৃত্তান্ত।

১৬০০ হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৫০ বৎসর কাল জাপানীরা বিদেশীদের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া দেশের রাজকীয় সংস্কার এবং জাতীয় বলসঞ্চারে মনোনিবেশ করেন। এই ব্যাপারে সম্রাট্ ইয়েয়াসু বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। নাগাসাকি নগরস্থ ওলন্দাজদের প্রভাব তাহাদের অনেক বিষয়ে শিক্ষার সহায়তা করিয়াছিল। নব উন্নতি গ্রহণের জন্য তাহারা নীরবে আয়োজন করিতেছিল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাহাদের "নব সভ্যতার" সময় আরম্ভ হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার নৌযুদ্ধাধ্যক্ষ পেরী সাহেব কামান এবং অন্যান্য বহুবিধ দ্রব্য বোঝাই যুদ্ধ জাহাজসমূহ লইয়া বন্ধুভাবে জাপানে আগমন করেন। ঐ সমস্ত দ্রব্য পাশ্চাত্য বাণিজ্য বিজ্ঞানের এবং ধর্ম্মের উন্নতির পরিচায়ক। যথা, তাড়িৎবার্ত্তা, রেল, তাড়িৎযন্ত্র, লাঙ্গল, শেলাইর যন্ত্র, ল্যাম্প, তালা, পুস্তক ইত্যাদি। অধ্যক্ষ পেরী সাহেব জাপানকে পৃথিবীর বাণিজ্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া স্বীয় জড়তা পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। এ অবস্থাতে জাপানকে নূতন উন্নতির পথ গ্রহণ না করিলে নিশ্চয়ই স্বাধীনতা মহাধন হারাইতে হইত।

ব্যস্ততা সহকারে জাপান সম্রাট্ বিদ্যালয়সমূহে শিল্পবিজ্ঞান প্রসূত দ্রব্য প্রস্তুতি, ঢালাই কার্য্য এবং অন্যবিধ কারী গুরি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। বর্ত্তমান সম্রাট্ যখন যুবক ছিলেন, তখন তিনি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশীয়দের সঙ্গে বাণিজ্য-সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, এবং স্বদেশে প্রজা সাধারণের মতানুযায়ী রাজ্যশাসন, ন্যায় বিচার, সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন বিদেশীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান শিল্প শিক্ষা, এবং সত্যপথে রাজ্যের পুনর্ঘটন করিবেন বলিয়া এক চার্টারে স্বাক্ষর করেন, বিদেশ হইতে শিল্প, বিজ্ঞানের গুণী জ্ঞানী অধ্যাপক আনাইয়া জাপান দ্রুতগতিতে উল্লিখিত সোপান হইতে সোপানান্তরে উঠিতে লাগিল। ক্রমে ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা, স্থল ও জল যুদ্ধ, রাজস্ব এবং রাজনীতিতে জাপানের অধিকার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই উপলক্ষে তিন সহস্র বৈদেশিক বিদ্বান লোকের আগমন হয়। গ্রেটব্রিটেন হইতে রাজস্ব এবং রাজনীতি, ফ্রান্স হইতে যুদ্ধ প্রণালী, আমেরিকা হইতে শিল্পশিক্ষা এবং বাণিজ্যশিক্ষা লাভ হইয়াছিল। তিন হাজারের উপরে ছাত্র বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল এবং এখনও প্রতিবৎসর বহু ছাত্র বিদেশে জ্ঞানশিক্ষার্থে প্রেরিত হইতেছে।

পৃথিবীর মধ্যে জাপানের বিশেষত্ব এই যে, জাপান কোন দিন পরাধীনতা কাহাকে বলে তাহা জানে না, এবং একই রাজবংশ বরাবর রাজত্ব করিয়া আসিতেছে। দুই শ্রেণীর লোক এদেশে দেখা যায় ;—সামুরাই (ইহারা জাপানের উচ্চবংশীয়) এবং জনসাধারণ। জাতিভেদ নাই। তেমন নিম্ন অবস্থাপন্ন লোক পর্য্যন্ত গুণ দ্বারা অত্যুচ্চ পদ লাভ করিয়া থাকে। শিক্ষার দ্বার সমভাবে সকলের প্রতি উন্মুক্ত। পদদলিত হেয় শ্রেণীর লোক কাহাকে বলে তাহা সে দেশে জানা নাই। সমস্ত জাপানবাসী ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সমভাবে একত্র উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। জাপানের লোক ভারতের লোক সংখ্যার ষষ্ঠাংশ, অথচ জাপান পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ জাতি। তাহাদের প্রধান গুণ (১ম) স্বদেশানুরাগ, যে অনুরাগবশতঃ তাহারা স্বদেশের জন্য প্রাণদানে সদাই একান্ত উৎসুক, পিতৃ মাতৃ ভক্তিতে তৎপর এবং আত্মসংযমী।

ক্রমশঃ।

সংবাদ।

কলিকাতায় গোখাদকদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাহাদের উদরপূর্ত্তির জন্য প্রতিদিন পাঁচশত গরু কসাইদের হস্তে মারা যায়। এদিকে শক্তি ও পুষ্টিবৃদ্ধির প্রধান উপায় দুগ্ধের অভাব হওয়াতে দুর্ব্বল রোগী, শিশু এবং বৃদ্ধ লোকেরা মারা যাইতেছে। টাকায় পাঁচসের দরে দুগ্ধ বিক্রয় হইত, এক্ষণ ৪॥০ সের দাঁড়াইয়াছে। কয় জন লোকে এইরূপ অগ্নিমূল্যে দুগ্ধ ক্রয় করিয়া পান করিতে পারে? বাছুরের কোমল মাংস অনেকের প্রিয় হওয়াতে প্রত্যহ শত শত দুগ্ধপোষ্য বাছুর মারা যাইতেছে। গোখাদক ইংরাজ, ফিরিঙ্গি ও

মোসলমানদিগের দৌরাত্ম্যে উপায়হীন বৃদ্ধ রোগী ও শিশুগণ মারা যায়। দুর্ব্বল জীবের প্রতি তাহাদের দয়া নাই। তাহাদের দৌরাত্ম্যে দেশে বলদের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যাওয়াতে কৃষিকর্ম্মেরও বিশেষ বিঘ্ন হইয়াছে। বলীবর্দ্দের মূল্য দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলিকাতায় প্রতিদিন পাঁচশত গরু মারা যায়, মাংসাশীদিগের জঠরানল নির্ব্বাণের জন্য ছাগল ভেড়া মুর্গী যে কত হাজার২ মারা যায় তাহা গণনা করিয়া উঠা যায় না। এক শ্রেণীর ব্রাহ্ম এই নির্দ্দোষ নিরীহ জীবগুলির মাংসভক্ষণে মোসলমান ফিরিঙ্গিদিগকেও পরাস্ত করিয়াছেন। এদেশের হিন্দু বিবাহাদি উপলক্ষে আত্মীয় কুটুম্বভোজনে নিরামিষ লুচি তরকারী মিষ্টান্নাদির ব্যবস্থা হয়, আর শাক্ত ব্রাহ্মদিগের বিবাহাদি উৎসবের ভোজনে মাংস না হইলে চলে না। সেই আনন্দোৎসবে পশু পক্ষীর রক্তারক্তি হইয়া "জীবে দয়া নামে ভক্তি কর জীবনের সার, ওবে মন আমার" এই ব্রহ্মসঙ্গীতের সার্থকতা সাধন হয়।

বিহারপ্রদেশের সাধারণ স্ত্রীলোকেরা যেরূপ নোঙ্গরা বোধ করি পৃথিবীতে কোন লোক তদ্রূপ নয়। ইহারা স্নান করে না, কাপড় কাচে না, ইহাদের গায়ে দুর্গন্ধ, ঘরবাড়ী যাহার পর নাই জঞ্জালময় অপরিষ্কার। সে দেশে বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের পরিবারে ইহারাই দাই চাকরাণী। ইহাদের ছোওয়া কিছু খাইতে আমাদের ঘৃণা হয়।

বিগত আষাঢ় মাসে মহিলার দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, বর্ত্তমান শ্রাবণ মাসে নূতন বৎসর আরম্ভ। এপর্য্যন্ত অধিকাংশ গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের নিকট হইতে গত বৎসরের মূল্য পাওয়া যায় নাই। তাঁহাদের নিকটে সানুনয়ে নিবেদন যে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহারা অবিলম্বে নিজের নিজের দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া যেন আমাদিগকে উপকৃত করেন।

বিগত ৭ই জুলাই কলেজস্কোয়ারে বয়কটের (বিলাতী বর্জ্জনের) সাংবৎসরিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে বড় বড় বক্তৃতা ও মহাঘটা করিয়া রাজপথে প্রোসেশনাদি হইয়া গিয়াছে। আমাদের ধর্ম্মে বর্জ্জন নাই, কেবল গ্রহণ; কোন জাতি পর নয়, সকলে আত্মীয়।

গবর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে আন্দোলন ও নিন্দা কটূক্তির সুযোগে কলিকাতায় যুগান্তর, নবযুগ, নবশক্তি, বন্দেমাতরং সন্ধ্যা প্রভৃতি কতকগুলি নূতন পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি রাজবিদ্রোহিতাসূচক লেখার জন্য যুগান্তর পত্রিকার নবযুবক সম্পাদক এক বৎসরের জন্য কারাবাস দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন কোন বিরুদ্ধ লেখার জন্য পূর্ব্বেই তাঁহাকে সাবধান করা হইয়াছিল, তিনি গ্রাহ্য না করিয়া পুনর্ব্বার তদ্রূপ লিখিয়াছিলেন, তজ্জন্য আর ক্ষমা করা হয় নাই। বিদ্রোহিতা সূচক কোন চিঠী পত্র আছে বলিয়া বন্দেমাতরং পত্রিকার ছাপাখানা পুলিশ অনুসন্ধান করিয়াছে। সেরূপ চিঠী পত্র পাওয়া যায় নাই। শ্রুত হইল গত ৯ই

জুলাই কতিপয় মহিলা ডাক্তার নীলরত্ন সরকার মহাশয়ের আবাসে সভা করিয়া যুগান্তরসম্পাদকের মাতাকে "বীরপুত্রের মাতা" "বীর প্রসবিনী" বলিয়া প্রশংসা করিয়া অভিনন্দনপত্র দিয়াছেন। কুচবিহার বিবাহের ঘোরতর আন্দোলনের সময়ে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ ও নিন্দাবাদের এক শেষ হইয়াছিল। সেই সময়েও ব্রাহ্মসমাজের পুরুষদিগের দ্বারা অনেক মহিলা উত্তেজিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তিনি সমুদায় উপেক্ষা ও ক্ষমা করিয়া চুপ করিয়াছিলেন। এক্ষণ হইতে গবর্ণমেণ্ট কি আর উপেক্ষা করিয়া চলিবেন। আইনানুসারে কাহাকে অপরাধী পাইলেই নির্ব্বাসন বা কারাদণ্ড বিধান করিবেন। ইংরাজি অনুকরণে বক্তৃতা ও সংবাদপত্র এই দুটি মাত্র বাঙ্গালী পুরুষদিগের বন্দুক ও তরবারি, এই দুইই বিলাতী অস্ত্র, এদেশে পূর্ব্বে ইহা কখনও ছিল না। এই দুই অস্ত্র প্রবল প্রতাপ রাজশক্তিকে কতদূর প্রতিহত করিতে পারিবে আমরা জানি না। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে সহজেই ইহার চালনা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। বাঙ্গালীদিগের ভাগ্যে পরিণামে যে কি আছে ভগবান্ জানেন। পঞ্জাবের লাল লাজপথ রায়ের নির্ব্বাসনের পর রাজবিদ্রোহিতাসূচক আন্দোলনের জন্য অজিতসিংহ নির্ব্বাসিত হইয়াছেন।

উপায়হীন দরিদ্র বিধবাগণ অর্থকরী শিল্পবিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষা করিয়া যাহাতে নিজেদের ভরণপোষণ নিজেরা নির্ব্বাহ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী একটী বিধবাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। শুনিয়া আহ্লাদিত হওয়া গেল যে, উহার কার্য্য উত্তমরূপে চলিতেছে। অনেক নারীহিতৈষিণী উচ্চ পদস্থ মহিলা এই কার্য্যে হিরণ্ময়ী দেবীকে বিশেষ উৎসাহ ও সহানুভূতি দান করিতেছেন।

জাপানে ৬ হইতে দশ বৎসরের বালকেরা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। শতকরা ৯৭ জন বালক এবং ৯১ জন বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িয়া থাকে। ভারতে শতকরা ১০ জন বালক এবং ১৪৪ জনমধ্যে একজন বালিকা অধ্যয়ন করে। অর্থাৎ সহস্র জনে ১০ জন। এক পুরুষে জাপানীরা লেখাপড়া জানে এরূপ জাতিরূপে পরিণত। জাপানীরা প্রাথমিক শিক্ষার আদর জানে, এবং তজ্জন্য ব্যাকুল। অপর দিকে ভারতীয় জনসাধারণ সন্তানগণকে সাংসারিক কাজ হইতে অবসর দিয়া লেখাপড়া শিক্ষা দিতে অনিচ্ছুক। জাপানে প্রতি করদাতা শিক্ষার জন্য ১৷৹ কর দিয়া থাকেন। ভারত অপেক্ষা এই করভার অনেক গুরুতর বটে।

বিজ্ঞাপন।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

বঙ্গদেশে নারীশিক্ষার বিহিত প্রণালী *।

স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েই শিক্ষার্থী, কিন্তু দুইয়ের শিক্ষার ভিতরে ভিন্নতা আছে। নারীগণ একত্রে শিক্ষার্থী ও শিক্ষয়িত্রী। মৃচ্ছকটিক নাটকে কবি বলছেন, স্ত্রীলোকেরা স্বভাবসিদ্ধ পণ্ডিত, তাঁরা আপনা হইতেই পণ্ডিত, পুরুষেরা অনেক পুস্তক নাড়াচাড়া করে তবে পণ্ডিত হন। মানুষকে প্রথমতঃ কত দিন মাতৃক্রোড়ে থাকিতে হয়। সেখানেই তাঁহার আদিম শিক্ষা মাতা যেরূপ লালন পালন করেন, সন্তান সেইরূপে গঠিত হয়। স্ত্রীলোকের শিক্ষা ভিন্ন হওয়া আবশ্যক, তাঁহাদের শিক্ষার জন্য বিহিত উন্নত প্রণালী স্থির করা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, তাঁহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য স্থির হওয়া প্রয়োজন। কেবল অমনি কতকগুলি জ্ঞান লাভ করিলে কি ফল? জ্ঞান লাভ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে, জ্ঞানেই মুক্তি, যে জ্ঞানে মুক্তি হয় সে জ্ঞান বড় দুষ্প্রাপ্য, পূর্ণজ্ঞান হওয়া চাই, সে জ্ঞান অতি অল্প লোকেই লাভ করেন। এই পৃথিবীতে জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, এই কর্ম্মের জন্যই জ্ঞান আবশ্যক। কতকগুলি আয়োজন করে কতকগুলি বিষয় শিখে তবে মানুষকে কাজে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কর্ম্মের ভিতর দিয়া আমাদের তাঁহাকে পাইতে হবে, ধ্রুব প্রহ্লাদের কথা ছেড়ে দাও, তাঁরা সেই পূর্ণজ্ঞান পেয়েছিলেন, যাতে তাঁরা মুক্তি লাভ করেছিলেন। এই সৃষ্টির ভিতর দিয়া আমাদের পেতে হবে। জ্ঞান না হলে কর্ম্ম হয় না, একে অন্যের মুখাপেক্ষী, কর্ম্ম ও জ্ঞান পরস্পরকে সাহায্য করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ; জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য কর্ম্মদক্ষতা লাভ করা। জ্ঞানেরত সীমা নাই, জ্ঞান অনন্ত, কিন্তু আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তি, তাহা দ্বারা সমস্ত জ্ঞান অর্জ্জন করা সম্ভব নয়, এই জন্য আমাদের স্থির করে নিতে হবে, কোন প্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করা আবশ্যক। যে যেরূপে জীবন কাটাবে, তার উপযোগী জ্ঞান তার লাভ করিতে হবে, জ্ঞান লাভ করা অর্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করবার ক্ষমতা লাভ। স্ত্রীলোকদিগের কোন্ কোন্ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজনতা দেখা উচিত। আজ কাল পাশ্চাত্য জগতে এই একটি ভাব উঠিয়াছে যে, পুরুষেরা অন্যায় করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদিগের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে দুর্ব্বল অক্ষম করিয়া রাখিয়াছে। আজকাল পার্লামেণ্টে এই বিষয়ে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। আমার এই কথা মনে হয় যাঁর

---

* বিগত ৮ই জুলাই শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন তন্মূলক।

যে কাজ করিতে হইবে তাঁর জন্য জ্ঞান লাভ করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, ইহার পর যাঁর সময় আছে তিনি বিজ্ঞান সাহিত্য গণিত যে বিষয়ে ইচ্ছা জ্ঞান অর্জ্জন করুন। আমি তাহা নিষেধ করিতেছি না, কিম্বা ইহাও বলিতেছি না যে, বিজ্ঞান গণিত শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের শাস্ত্রে এরূপ নাই যে, স্ত্রীলোকেরা গণিত সাহিত্য চর্চ্চা করিবে না, এমন কি বিদ্যা অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী পুরুষ নন, নারী, লীলাবতী প্রভৃতি নারীগণ এ বিষয়ে পণ্ডিত। এক খানি গণিতের পুস্তক লীলাবতীর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। আবার শক্তির দেবী কালী, যখন দেবতাদের মধ্যে যুদ্ধ হয় কে তখন রক্ষা করিল, শিব, না শিবানী? আমাদের দেশের শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির এত প্রাধান্য। এগুলি যদিও আখ্যায়িকা, কিন্তু ইহার ভিতরে সত্য আছে, স্ত্রীজাতির মধ্যে শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, প্রয়োজন মত তাহার প্রকাশ হইতেছে স্ত্রীলোকেরা যত সহ্য করিতে পারেন, পুরুষেরা তত পারেন না, তাঁরা একটুতেই অধীর হয়ে পড়েন। প্রথমতঃ মেয়েদের শরীর বিষয়ে আর একটু জ্ঞান থাকা দরকার, শরীরটী বড় সামান্য নয়, শরীর না হলে কিছুই হয় না, শরীরকে যত্ন করতে হবে, শরীর যাতে ভাল থাকে তাই করতে হবে, আর মেয়েদের নিজেদের শরীরকে আর একটু যত্ন করা দরকার। যিনি রাজা তিনি উত্তম, এই জন্য সকলে রাজ ব্যবহার অনুকরণ করে। আমাদের দেশে এখন পোলাও একটী উৎকৃষ্ট খাদ্য, ইহা আমরা আমাদের মুসলমান রাজার নিকট হতে শিখিয়াছি। পোলাও শব্দই বলিয়া দিতেছে, ইহা এদেশের নয়। এখন ইংরাজদের আচার ব্যবহার আমরা অনুকরণ করিতেছি বাড়ীর মেয়েদের হাতেই পরিবারের ব্যবস্থা থাকে। আমরা সকলেই অনুকরণ প্রিয়, অনুকরণ করাটা যে মন্দ তা বলিতেছি না, অনুকরণ করাই উন্নতির উপায়। অপরের যা ভাল দেখিলাম, তাই অনুকরণ করিয়া আয়ত্ত করিয়া আমি উন্নত হইলাম, কিন্তু একটু বিবেচনা করে অনুকরণ করা দরকার, আমরা ইংরাজের সব বিষয় অনুকরণ করিতে যাই, তাদের কি সবই ভাল? কোন মানুষ সম্পূর্ণ নয়, ভগবান্ কাহাকেও পূর্ণ করিয়া সৃজন করেন নাই। আমরা তাঁহাদিগকে একটী বিষয়ে অনুকরণ করিতে যাই, আমাদের গরম দেশে সে জিনিষের একেবারেই প্রয়োজন নাই। একজন বড় সাহেব বলিয়াছেন, যে আমরাও সাহেব, আমাদেরও এদেশে সুরা পান করবার দরকার হয় না, গরমের দিনে একেবারেই নয়, এদেশে আট মাসই গরম। এ দেশের লোকের সুরা পান না করাই বিধেয়। তেমনি মাংসও আমাদের অপ্রয়োজনীয়, এদেশে নিরামিষ ভোজনই উচিত, তাহাতে যথেষ্ট বলাধান হইবে। মাংস খাইতে আমি নিষেধ করিতেছি না, কিন্তু যতটা কম খাওয়া যায় ততই ভাল, না খাইলে কোন ক্ষতি নাই। একজন বড় সাহেব ডাক্তার বলিয়াছেন যে তিনি এদেশে বাস কালে সপ্তাহে এক সেরের বেশী মাংস খাইতেন না। আমার মনে হয় বাল্যকাল হতে সন্তানদিগকে

মাংস আহারের অভ্যাস না করানই ভাল, নিরামিষ আহার করিলে অনেক প্রকার রোগ হইতে বাঁচা যায়। বাল্যকাল হইতে সন্তানকে কতকগুলি বিষয় শিক্ষা দেওয়া দরকার, ছেলেরা অনেক সময় তাহাদের যাহা ভাল লাগে তাই খাইতে চায়, কিন্তু যাহা পুষ্টিকর তাহা খাইবার অভ্যাস করা উচিত, তাহাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত যাহা শুভকর তাহাই সুখকর। অপর পক্ষে যাহা সুখকর তাহাই যেন শুভকর হয়। ভগবানের বিধানই এই যে, যাহা সুখকর তাই শুভকর হয়, কিন্তু আমরা যদি রুচিকে খারাপ করিয়া ফেলি, তখন যাহা সুখকর তাহা শুভকর হয় না। গোড়া থেকে ছেলেদের এইরূপ শিক্ষা উচিত যে, যাহাতে গায়ে জোর হয় তাই ভাল। একটী ছেলের এক হাতে যদি রুটী অন্য হাতে রসগোল্লা থাকে, যদি একটী ভিখারী এসে খাবার চায়, সে যেন রসগোল্লাটা দিতে পারে যে ওটা খেলেত পেট ভরবে না, এইটাই ক্ষুধা দূর করিবে ও বলকারী তার মনে ইহাই হইবে, এ ভিখারী এ কোথা হইতে ভাল খাবার পাইবে, একে রসগোল্লাটী দি, এইরূপে শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনের উন্নতি শিক্ষা দেওয়া দরকার। দয়া বৃত্তি উত্তেজিত করা দরকার, খাবারের সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষা দিতে হবে। তাহা না করে আমরা খাবার সময় স্বার্থপর করব। পুস্তকে পড়াইব, দয়া করিবে, তাতে কোন ফল হয় না। মাতৃ অঙ্কে যার পাশই প্রধান শিক্ষাক্ষেত্র। আর একটী কথা এই অসময়ে যখন তখন খেতে দেওয়া উচিত নয়, একটা ভাল জিনিষ পাইলেই যে খাইতে দিতে হবে তা নয়, বলিতে হইবে এখন নয়, সময় মত খাইবে। সাহেবেরা এসব বিষয়ে বড় নিয়মিত, আমরা কিন্তু ক্ষুধা বড় সহ্য করিতে পারি, ওরা তা পারে না। একদিন আমাদের একটা সভা হচ্ছে, আমার জেদ হচ্ছে যে, এ কাজটা আজ শেষ করে উঠব। খানিকটা রাত্রি হয়ে গেল, একটী সাহেব বল্লেন যে, আরত পারি না। আমি বলিলাম, সাহেব তুমিত দুটার সময় খেয়েছ, আমিত সেই ৯॥ টার সময় খেয়েছি, সাহেব বলিলেন, তোমরা বাঙ্গালী তোমাদের ওসব সহ্য হয়। কিন্তু ওরা ঠিক সময় মত খায় আমাদেরও ছেলেদের সময়মত খেতে দেওয়া উচিত। আমরা ছেলেদের জন্য বিলাতী বিস্কুট আনি, সে গুলি তারা নিজেদের দেশের জন্য করে, আমাদের গরম দেশে সে সব খাবার আনলে নষ্ট হয়ে যায়, অনেক সময় বিস্কুটের মধ্যে পোকা হয় এগুলি না খাওয়াই ভাল। আর টিনের মধ্যে যে সব খাবার আসে সে গুলিও নষ্ট হয়ে যায়। ওদের শীতের দেশে কিছু নষ্ট হয় না, কিন্তু এদেশে গরমে শীঘ্রই খারাপ হয়।

গ্রাসের বিষয় হল; আচ্ছাদনের কথা বলি। এদেশে শীত কম, তাই কাপড়ের ব্যবহার কম, তাই বলে যে লজ্জা নাই তা নয়। শরীর ঢাকা দরকার বটে, কিন্তু তাই বলে বেশী কাপড় ব্যবহার করা ভাল নয়। আজকাল অনেকে বড় বেশী কাপড় পরান, আর সর্ব্বদা ফ্লানেল পরান, ফ্লানেল পরিলে শরীর বড় অপটু হয়। একটুতেই

ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়। ফ্লানেলটা ওদের শীতের দেশের জন্য। সর্ব্বদা জুতা পরিবারও প্রয়োজন নাই, এমন কি ওদের দেশেও সকলে পরে না, আইরলাণ্ড দেশীয় দুগ্ধব্যবসায়ী স্ত্রীলোকেরা অনাবৃত পদে গমনাগমন করে, তাহারা অত্যন্ত সবল সুস্থ। আমাদেরও দেখা উচিত যে, অনাবৃত পদে বেড়ান কিছু মন্দ নয়। আজকালকার মেয়েরাও আর যেন ততটা স্বাভাবিক নাই। বেশভূষাতে আচার ব্যবহার শিক্ষা করে কৃত্রিম হয়ে পড়েছে, পূর্ব্বে যেমন সতেজে স্বাভাবিক ভাবে চলা ফেরা করিতেন, এখন সেরূপ নাই। আবরণ অর্থই সুন্দর, যাহা স্বাস্থ্যজনক তাহাই সুন্দর। গোড়া থেকে এই শিক্ষা দরকার। অর্থে মিতব্যয়িতা শিক্ষা করা দরকার, যতটুকু বাঁচাইতে পারা যায়, ততটুকুই লাভ। তোমার যদি যথেষ্ট থাকে তবে তাহা দ্বারা তুমি অপরের সাহায্য করিতে পার। তুমি যদি মিতব্যয়িতা দ্বারা একজন লোকের দুদিনের আহারের সংস্থান করিতে পার তাহা কি সামান্য কথা? সন্তানকে ধনের অধিকারী করা অপেক্ষা চরিত্রের অধিকারী করা অধিকতর প্রয়োজনীয়। পিতামাতা অতি কষ্টে যে ধন সঞ্চয় করিয়া যান, সন্তান তাহা অতি অল্প কালের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া নিঃসম্বল হয়। কিন্তু যদি তাহাকে চরিত্রবান করা হইত, সে ধনের অধিকারী না হইলেও সুখে কালযাপন করিতে পারিত। মনের শিক্ষাও মার কাছে হওয়া দরকার। যে স্ত্রীলোকের অবসর আছে তিনি যদি পারেন গণিত বিজ্ঞান শিক্ষা করুন, কিন্তু মাতার পক্ষে সন্তানকে গণিত শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা নৈতিক আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যকীয়। পিতা পরম দার্শনিক হইলেও সন্তানকে চরিত্রবান্ করা কঠিন। কর্ম্মশিক্ষা মাতার নিকটেই হয়। মাতার কথা মাতার দৃষ্টান্ত সন্তানের হৃদয়ে যত প্রবিষ্ট হয়, জীবনে যত কার্য্যকরী হয়, পিতার দৃষ্টান্তে তত নয়। আমি একজন লোকের কথা বলছি, তিনি বিদ্যাশিক্ষায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন, পরীক্ষাতে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিতেন, তাঁর শেষ পরীক্ষার সময়ে তিনি রাত্রি জাগিয়া, ভয়ানক পরিশ্রম করিয়া পাঠ করিতেন। কারণ সেই পরীক্ষাতে তাঁর সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দী একটী যুবক ছিল, উভয়েরই প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। তাঁহার মাতা একদা বলিলেন, "তুমি এরূপ পরিশ্রম সহকারে কেন পাঠ করিতেছ, শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবে, পরীক্ষা দিতে পারিবে না, তুমি ঐ যুবকটীর সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিতেছ, তাহা কখনও করিও না, সেও আমাদের আত্মীয়, তার হিতও আমরা চাই, এবারে না হয় তাহাকেই সর্ব্ব প্রথম হইতে দাও, তোমার আত্মোন্নতি করিতে হইবেক বটে, কিন্তু প্রতিদ্বন্দিতা দুরাকাঙ্ক্ষা মনে স্থান দিও না, আমি কেবল আজকার এই ঘটনার কথা বলিতেছি না, কিন্তু তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর চিরদিনের মত এই প্রতিদ্বন্দিতা পরিত্যাগ করিবে।" মাতার এই কথাগুলি তাঁহার অন্তরে চিরদিনের মত গ্রথিত হয়, এবং তিনি যদি উহার পরে কখনও দুরাকাঙ্ক্ষা প্রতিদ্বন্দিতা দমনে সমর্থ হইয়া থাকেন,

তাহা এই মাতার শিক্ষার ফলে। সন্তানকে শিখাইতে হইবে, কেবল পেলেই সুখ হয় না, নিবৃত্তিতে সুখ আছে। মার দায়িত্ব অতি গুরুতর, তাঁর আপনাকে ভাল করিতে হবে, নিজের জন্য ও অপরের জন্য, সন্তানদের জন্য। স্ত্রীজাতির কতকগুলি স্বাভাবিক গুণ আছে, নিবৃত্তি, লজ্জাশীলতা, আপনাকে সকলের পশ্চাতে লুকাইয়া রাখা, সন্তান কর্ম্মক্ষেত্রে মাতার এই সকল গুণ দেখিয়া আপনিই সেগুলি শিক্ষা করিবে। বাল্যকাল হইতে সন্তানের মনে ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া উচিত। আমাদের ধর্ম্মসম্প্রদায় যতই ভিন্ন হউক না কেন, এ বিষয়ে আমরা সকলে একমত। সংসারে এমন অবস্থা হয় যখন কেবল ঈশ্বরের দিকে চাওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। মাতা যদি সহজ ভাবে এ বিষয়ে শিক্ষা দেন, সন্তানের মনে এ জ্ঞান দৃঢ়মূল হইয়া যায়। মার কাছে কখনও কেন এরূপ জিজ্ঞাসা করে না, মা যা বলেন, অমনি গ্রহণ করে, পিতার কাছে প্রশ্ন করে, তাঁর সঙ্গে তর্ক করে। মা যদি বাল্যকাল হইতে মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দেন, যে একজন আছেন যিনি আমাদের ভাল করবেন, বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন, তাহা হইলে ভাল কাজ করিতে কখনও ভয় পাবে না। আমার মনে হয় মেয়েদের এই গুলিই প্রধান শিক্ষার বিষয়। যদি তাঁরা এ গুলি ছাড়া অন্য সব শেখেন, তাহা বৃথা, কিন্তু এগুলি শিক্ষা করিয়া আর অধিক কিছু না শেখেন, তাহাতে কোন দুঃখ নাই।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ সিলাই ও নানাবিধ সূচীশিল্পশিক্ষা সকল স্ত্রীলোকের পক্ষেই অত্যন্ত প্রয়োজন। অবস্থা অনুসারে অসহায় হইয়া পড়িলে মহিলাগণ সূচীকার্য্য দ্বারা কিছু উপার্জ্জন করিয়া আপনাদের অভাব মোচন করিতে পারেন। এই সকল উদ্দেশ্যে বর্ত্তমানে শ্রীমতী কুচবিহারের মহারাণীর আনুকূল্যে ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের অধীনে একটি মহিলাদিগের সূচীশিল্পশিক্ষাবিভাগ খোলা হইতেছে। আগামী ২৪ শে আগষ্ট শনিবার এই বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে। সপ্তাহে এক দিন করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে। যে সকল মহিলা এই সুযোগে সূচীশিল্প শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অবিলম্বে উক্ত *বিদ্যালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট* আপনাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবেন। এই বিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে মহিলাগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে। শিক্ষার্থিণীগণকে বর্ত্তমানে বেতন বা গাড়ীভাড়া বা শিক্ষার সরঞ্জামের জন্য কিছু দিতে হইবে না।

ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন। } শ্রীব্রজোগোপাল নিয়োগী।

৬৪। ২নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

কলিকাতা, ১৯শে আগষ্ট ১৯০৭। কার্য্যাধ্যক্ষ।

বৰ্ম্মদেশীয় দুইটী কুমারী।

(৪৪ পৃষ্ঠা)

বৰ্ম্মদেশীয় নর্ত্তকী।

(৪৫ পৃষ্ঠা)

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৩শ ভাগ] ভাদ্র ১৩১৪ ; সেপ্টেম্বর ১৯০৭। [২য় সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

পতি পুত্র কন্যা পরিবারস্থ অন্য আত্মীয় স্বজন যথাসময়ে ভোজন করিতে পান কি না এতদ্বিষয়ে গৃহ কর্ত্রীরবিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। পরিচারক বা পাচকের শৈথিল্য ও ত্রুটিতে বালক বালিকারা ক্ষুধার সময় খেতে পায় না, সময়ে অন্ন প্রস্তুত না পাইয়া না খাইয়াই স্কুলে চলিয়া যায়, যাঁহাদের বেলা ১০টার সময় কার্য্যক্ষেত্রে চলিয়া যাইতে হয়, সেই সময় ডাকাডাকি করিয়া তাঁহারা অন্ন প্রাপ্ত হন না, অনেক দিন কোন কোন পরিবারে এরূপও ঘটিয়া থাকে। এরূপ হইলে প্রধানতঃ গৃহিণীর ত্রুটি স্বীকার করিতে হইবে। তিনি দাস দাসী ও পাচক পাচিকাদিগকে উপযুক্ত রূপে শাসন করিলে কখনও এরূপ হইতে পারে না। যথাসময়ে সকলে যাহাতে খেতে পান প্রতিদিন গৃহকর্ত্রী এরূপ ব্যবস্থা করিবেন।

যাহাতে ব্যঞ্জনাদি উত্তমরূপে প্রস্তুত ও সুস্বাদু হয়, রন্ধনের দোষে, পাচক পাচিকাদের অমনোযোগে বিস্বাদ না হয়, ঘৃত মসলা ডাইল তরকারি ইত্যাদির জন্য অর্থ ব্যয় রন্ধনের দোষে পণ্ড হইয়া না যায়, গৃহিণী তদ্বিষয়ে বিশেষ তত্ত্বাবধান করিবেন। স্বামী ও পুত্র কন্যাদির তৃপ্তির জন্য দুই একটি ব্যঞ্জন স্বয়ং রন্ধন করিয়া দিতে পারিলে গৃহিণীর উত্তম সেবার কার্য্য হয়। আমরা বড় ঘরের গৃহিণী হইতে এতদপেক্ষা অধিক সেবা আশা করিতে পারি না।

অনেক সভ্য পরিবারে অত্যন্ত মাংসের ঘটা হয়, গৃহে হংস কুক্কুট ও ছাগল ভেড়া প্রতিপালিত হইয়া থাকে। আহারদানে সেই সকল নিরীহ পশু পক্ষীদিকে প্রতিপালন করিয়া পরে সেই প্রতিপালিত জীবগুলি কাটিয়া খাওয়া অতিশয় নীতিবিরুদ্ধ নিষ্ঠুর কার্য্য। মারিবার সময় সেই সকল আশ্রিত নির্দ্দোষ জীব যখন আর্ত্তনাদ করে তখনও কি মেয়েদের মন দয়ার্দ্র হয় না। বিধাতা মেয়েদের হৃদয়কে দয়া স্নেহাদি কোমল উপকরণে গঠন করিয়াছেন।

ভারতে ইংরাজরাজত্বে দেশোন্নতি ও নারীজাতির উন্নতি।

ন্যূনাধিক সাত শত বৎসর ব্যাপিয়া ভারতবর্ষে মোসলমান রাজত্ব ছিল, মোসলমান রাজত্বের অবসানে, ১৭৫৭ সালে বাঙ্গলার নবাব সিরাজউদ্দলার মৃত্যুর পর এদেশে ইংরাজরাজত্বের সূত্রপাত হয়, শতাধিক বৎসর হইবে না ভারতে ইংরাজরাজত্ব দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়াছে। এক্ষণ উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত পশ্চিমে বেলুচিস্থান হইতে পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য ইংরাজরাজের শাসনাধীন, এই সমগ্র ভূভাগে ইংরাজ রাজা একচ্ছত্র রাজা। এই ইংরাজ রাজত্বে সুবিশাল ভারত রাজ্যের সকল বিষয়ে সাধারণ ভাবে কত দূর উন্নতি হইয়াছে, বিশেষ ভাবে নারীজাতির উন্নতির পথ কতদূর মুক্ত হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য।

মোসলমান রাজত্বকালীন শাসনপ্রণালীর সঙ্গে ইংরাজ রাজত্বের শাসনপ্রণালী ও বিধি ব্যবহার তুলনা না করিলে, অল্প দিনের মধ্যে ইংরাজরাজত্বে ভারত কত দূর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে না। তজ্জন্য আমরা কত দূর উন্নতি না অবনতি ঘটিয়াছে তুলনা দ্বারা প্রদর্শন করিতেছি।

মোসলমান রাজত্বে স্বেচ্ছাচার শাসনপ্রণালী ছিল, মোসলমান সম্রাট্গণ কোন নিয়মবিধি আইন কানুনের অধীন ছিলেন না। তাঁহারা প্রজাশাসনে ও দণ্ড পুরস্কারাদি বিধানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিতেন, তাঁহাদের আজ্ঞার উপর কাহারও কোন কথা কহিবার সাধ্য ছিল না। তাঁহাদের একজন বিচারকের বিচারই চূড়ান্ত বিচার ছিল, তাঁহার উপর আর অন্য জনে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ হুমায়ুন বাদশা ভারতের সম্রাট্ ছিলেন, তাঁহার বিচার ও অপরাধীর প্রতি দণ্ডাজ্ঞার বৃত্তান্ত মহাপণ্ডিত রাজপারিষদ আবুলফজল কৃত পারস্য ভাষার রচিত সুবিখ্যাত আকবর-নামা গ্রন্থ হইতে এস্থলে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল :—"সম্রাট্ তাহাদিগকে (বিদ্রোহীদিগকে) ধরিয়া আনিবার জন্য সহস্র লোক নিযুক্ত করিলেন. অল্প সময়ের মধ্যে সেই সকল শমনকবলিত হতভাগ্য লোকদিগকে হস্ত পদ বন্ধন করিয়া সম্রাট্ সন্নিধানে আনা হইল। সেই দিন মঙ্গলবার ছিল। সম্রাট্ লোহিত বর্ণের পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করিয়া ক্রোধ ও প্রতাপের সহিত সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। অপরাধিগণ দলে দলে আনীত হইতে লাগিল সম্রাট্ প্রত্যেক দলের সম্বন্ধে তাহাদের ভাগ্যের অনুরূপ বিচারসঙ্গত আদেশ করিতে লাগিলেন, হস্ত বন্ধন করিয়া কতক লোককে পর্ব্বতাকার মাতঙ্গ যুথের পদতলে নিক্ষেপ করিয়া বিদলিত করা হইল ; কতকগুলির মস্তক যে বিনয়ের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল তাহাদের দেহকে মস্তকের ভার বহন হইতে মুক্ত করা হইয়াছিল ; একদল লোক যে, নিজেদের

হস্ত পদের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অসস্তাবে হস্ত ক্ষেপ করিয়াছিল তাহারা হস্ত পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল; কতকগুলি লোক আত্মদৃষ্টি (আত্মাভিমান) বশতঃ সম্রাটের আদেশকে কর্ণগোচর করে নাই তাহাদের চক্ষু ও কর্ণ স্থানভ্রষ্ট হইল; কতিপয় লোক যে অবাধ্যতার লিপিতে অঙ্গুলি চালনা করিয়াছিল তাহাদের হস্তমুষ্টি অঙ্গুলিশূন্য হইয়াছিল। এইরূপ আদেশ সম্পাদিত হইলে পর সায়ংকালীন নমাজের সময় উপস্থিত হয়। সরলহৃদয় এমাম (ধর্ম্মাচার্য্য) নমাজের প্রথম রকাতে কোরাণের সুরা ভুল পড়িয়াছিলেন। নমাজ সমাপ্ত হইলে পর প্রতিফলদানের জন্য সম্রাট্ আদেশ করিলেন যে, এই ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক ইঙ্গিত ক্রমে ফীল সুরা পড়িয়াছে, ইহাকে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করা হউক। ইহা অন্যায় আজ্ঞা হইয়াছিল, অশুভ ফল ঘটিল। মওলানা মোহম্মদ আলি নিবেদন করিয়াছিলেন যে, এই এমাম সরলহৃদয়, কোরাণের অর্থ অবগত নহে, ভুল করিয়াছে। কিন্তু যখন ক্রোধানল শিখা বিস্তার করিয়াছিল, তখন তিনি সম্রাটের প্রশংসনা বাণী ভিন্ন উত্তরে অন্য কথা শুনিতে পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে সম্রাট্ যখন এমামের সরলতা উপলব্ধি করিলেন, ক্রোধাগ্নির উদ্দীপনা শান্ত হইল, তখন অতিশয় আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করিয়া যাপন করিলেন।"

এই তো বাদশার অপরাধীর প্রতি দণ্ড বিধান ও বিচারপ্রণালী। মোসলমান ইতিবৃত্ত লেখকগণ বাদশাদিগকে "তলওনতবা" বলিয়াছেন। তলওনতবার অর্থ বিচিত্র ভিন্ন ক্রকুতিসম্পন্ন। তাঁহাদের প্রসন্নতা ও অপ্রসন্নতার স্থিরতা নাই। তাঁহারা একজন গুরুতর অপরাধীর প্রতি হঠাৎ প্রসন্ন হন, তাঁহাকে দণ্ড হইতে অব্যাহতি দান করেন, এমন কি পুরস্কার দান করিয়া থাকেন। আবার নিরপরাধীকে কখন কখন প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করিতে কুণ্ঠিত হন না। এই অবস্থাতেও মোসলমানদিগের রাজভক্তি কত! এইরূপ তলওনতবা বাদশাকে তাঁহারা "[illegible]" ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া থাকেন। প্রতি জোম্মা বারে (শুক্রবারে) তাঁহাদের ধর্ম্ম মন্দির মস্জেদে বাদশার উদ্দেশ্যে রাজভক্তিসূচক খোত্‌বা পড়া হইয়া থাকে।

ইংরাজ রাজের শাসন ও বিচারপ্রণালী স্বেচ্ছাচারমূলক নহে, নিয়মাধীন। সম্রাট বা রাজপ্রতিনিধি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া কিছুই করেন না। ফৌজদারী ও আদালতসম্বন্ধীয় বিচার বিভাগে বহু বিচারক—নানা শ্রেণীর অধস্তন ও উর্দ্ধতন আইনকানুনাভিজ্ঞ কৃতবিদ্য বিচারক নিযুক্ত। যোগ্যতানুসারে বিচারকদিগের পদোন্নতি হইয়া থাকে। বিচারক আইনের নির্দ্দিষ্ট বিধিকে অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছানুসারে দণ্ডদানাদি করিতে পারেন না। যথা আদালত অমান্য করার অপরাধে অপরাধীর ছয় মাস কারাবাস দণ্ড, সহস্র মুদ্রা অর্থ দণ্ড পর্য্যন্ত শাস্তি আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে, বিচারপতি ইহার অতিরিক্ত দণ্ড বিধান করিতে

অক্ষম। উচিত বোধ করিলে তিনি এতদা পক্ষা লঘু দণ্ড বিধান করিতে পারেন। নিম্নতম বিচারক বিচারে অন্যায় করিয়াছেন বোধ করিলে দণ্ডিত ব্যক্তি তাহা অমান্য করিয়া যথারীতি উর্দ্ধতন বিচারকের নিকটে সুবিচারের প্রার্থী হইতে পারেন। দ্বিতীয় বিচারকের বিচারের বিরুদ্ধেও আপীল আছে, তাহার পরও আপীল আছে। বিচারার্থী ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বা মোনসেফের বিচার-নিষ্পত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বা জজের নিকটে সুবিচারের প্রার্থী হইতে পারেন; তাঁহাদের বিচারও অমান্য করিয়া হাইকোর্টে আপীল পরে বিলাতে আপীল পর্য্যন্ত করিতে সক্ষম। জিলার বিচারক কাহারও প্রতি নির্ব্বাসনদণ্ড বা প্রাণ দণ্ডের আদেশ করিলে আবার হাইকোর্টের বিচারে সেই ব্যক্তি নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়া দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করে, এরূপও হয়। ইংরাজশাসনে কোন এক জনের বিচার চূড়ান্ত নহে। সাক্ষী প্রমাণাদির গোলযোগে বা বুদ্ধির ত্রুটিতেবিচারকের বিচারে ভ্রম প্রমাদ ঘটিতে পারে, ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনায় বা পক্ষপাতবশতঃ তিনি অন্যায় বিচার করিতে পারেন, তজ্জন্য আবার তাঁহার উপর বিচারের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। সূক্ষ্মদর্শী আইনজ্ঞ উকিল বারিষ্টারগণ বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষে নিযুক্ত হন, তাঁহারা বিচারকার্য্য বিচারকের সহায়তা করিয়া থাকেন। জুরি দ্বারা গুরুতর মোকদ্দমার বিচার হয়; অনেক উপযুক্ত লোক সম্মিলিত ভাবে বিচার কার্য্যের সাহায্য করেন। ইংরাজরাজকে রাজা বা রাজপ্রতিনিধির অবাধ্য হওয়া বা আজ্ঞা অমান্য করার অপরাধে কেহ হস্তি-পদতলে নিক্ষিপ্ত হয় না, তদ্রূপ অপরাধীর মস্তক ছিন্ন এবং হস্ত পদ ও কর্ণ নাসিকাদি ছিন্ন হয় না, বা নমাজ পড়িতে কোরাণের অধ্যায়বিশেষ পাঠে ভুল করাতে এমামকে (ধর্ম্মাচার্য্যকে) হস্তীর পদতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণ হারাইতে হয় না। ইংরাজ রাজা সচরাচর স্বয়ং বিচার করেন না, তাঁহার নিয়োজিত বিচারকগণ বিচার করিয়া থাকেন।

মোসলমান রাজত্বকালে ভারতের সর্ব্বত্র অশান্তি ও অরাজকতা ছিল, সমরানল সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকিত। মোসলমান সম্রাটগণ রাজধানী দিল্লী বা আগরা নগরে বৎসরের মধ্যে অল্প দিনই স্থিতি করিতেন, রাজ্যের নানা স্থানে বিপ্লব ও অত্যাচার ঘটিত, অত্যাচারীদিগকে শাসন ও দমন করিবার জন্য রাজধানী ছাড়িয়া তাঁহারা সসৈন্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাত্রা করিতেন। সম্রাট্ হোমায়ুন, তৎপুত্র আকবর ও তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গিরের রাজত্বকাল হইতে ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য সকল একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। তওয়ারিখ আক্‌বরী ও তওয়ারিখ জাহাঙ্গিরী নামক আক্‌বর ও জাহাঙ্গির বাদশার রাজত্বের ইতিবৃত্ত এ বিষয়ের পূর্ণ সাক্ষ্য দান করে। জাহাঙ্গিরের বাদশা নিজের পুত্র ও আত্মীয়দিগকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া এক একটি হিন্দুরাজ্য আক্রমণ ও জয় করিবার জন্য সসৈন্যে পাঠাইতেন,

নিজেও যুদ্ধযাত্রা করিতেন। মোসলমান সেনাগণ প্রলয়ের ঝড়ের ন্যায় হিন্দুরাজা সকলকে আক্রমণ করিয়া উচ্ছেদ সাধন করিত,ক্ষুদ্র হিন্দু রাজাদিগের কি সাধ্য যে, সম্রাটের প্রবল পরাক্রান্ত বাহিনীকে বাধা দিয়া রাজ্য রক্ষা করেন। অনেকে আত্ম-সমর্পণ করিয়া আত্ম-রক্ষা করিয়াছেন, বা সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণ দান করিয়াছেন। বিজয়ী মোসলমান সেনাগণ রাজ্যের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে, তাহাদের তীক্ষ্ণ করবালের আঘাতে সহস্র সহস্র লোকের শোণিতে দেশ প্লাবিত হইয়াছে; হিন্দু দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি সকল তাহাদের দৌরাত্ম্যে বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজ-মহিষী রাজকন্যাগণ এবং অন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের হিন্দুরমণীগণ সতীত্বের বিলোপ হইবে ভয়ে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে জীবনাহুতি দান করিয়াছেন। এইরূপ পরাজিত হিন্দু-রাজ্যের সহস্র সহস্র রমণী অগ্নিকুণ্ডকে আশ্রয় করিয়া পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন। বিজেতা সেনাপতি বা সম্রাটের অন্য কোন আত্মীয় সেই রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিয়াছেন। সম্রাট্ আওরঙ্গ জেব আলমগির ইত্যাদির রাজত্বকালে এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সচরাচর ঘটিয়াছে। আমরা মোগল সম্রাট্ হোমায়ুন, আক্‌বর ও জাহাঙ্গির বাদশার রাজত্বের অরাজকতার কাহিনী যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলাম। ইহারা তিন জন পিতা পুত্র পৌত্র ছিলেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গির দাক্ষিণাত্যের এক হিন্দুরাজ্য জয় করিয়া বিজিত হিন্দুদিগকে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ দান করিবার উদ্দেশ্যে একটি প্রধান দেবালয়ের দ্বারদেশে গোবধ করিয়া দেবালয়টিকে গো শোণিতে প্লাবিত করিয়াছিলেন।

এ দেশের বর্ত্তমান হিন্দুগণ আর্য্য জাতির বংশধর, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরু-ষেরা আর্য্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন, বিজেতা মোসলমানগণ পরাজিত এই আর্য্য জাতিকে বিদ্বেষবশতঃ "হিন্দু" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে হিন্দু শব্দ পাওয়া যায় না। মহাপণ্ডিত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী হিন্দু শব্দের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি আর্য্য নামে পরিচয় দান করিতেন। প্রসিদ্ধ পারস্য অভিধান গেয়াসোল্লা-গাতে হিন্দু শব্দের এরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে, "হিন্দু শব্দ পারস্য দেশের প্রচলিত ভাষায় চোর, ডাকাত এবং গোলাম বুঝাইয়া থাকে।" অতএব হিন্দু শব্দ সম্মানসূচক নহে, অতিশয় অবজ্ঞা ও অপমানসূচক, অনেক হিন্দু তাহা সম্মানসূচক মনে করিয়া সেই নামে পরিচয় দান করিয়া আপনা-দিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন। ইহা মহাভ্রান্তি, তাঁহাদের পক্ষে আর্য্যনামে পরিচিত হওয়া শ্রেয়ঃ। হিন্দুস্থান অর্থে গোলাম বা চোর ডাকাতের দেশ। যাহা হউক সম্রাট্ আক্‌বর হিন্দুবিরোধী ছিলেন না। তিনি সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে সদ্ভাব ও সম্মিলন রক্ষা করিয়া চলিতে যত্নবান্ ছিলেন। উক্ত সম্রাট্ রাজ পুতনার অন্তর্গত জয়পুর ও যোদপুর রাজ্যের রাজ কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়া

সেই দুইরাজ পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতাসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। এই কুটুম্বিতাদি কারণে রাজপুতনায় অনেক গুলি হিন্দু রাজা বিলুপ্ত হয় নাই।

মোসলমান রাজাদের রাজত্ব কালে সুশাসনের অভাবে ভারতের সর্ব্বত্র চোর দস্যুর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। চুরি ডাকাতি লুণ্ঠন অত্যাচারের কখনও বিরাম ছিল না। দুষ্ট লোকদিগের হস্ত হইতে ধন সম্পত্তি জীবন রক্ষা করা দুষ্কর ব্যাপার ছিল। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমনের প্রশস্ত পথ প্রায় ছিল না, যানবাহনাদির সুবিধা ছিল না, গোযানে এবং বিহার ও পশ্চিমাঞ্চলে এক্কাযানে এবং বর্ষাকালে বঙ্গদেশে ক্ষুদ্র নৌকায় অতি কষ্টে লোকে স্থানান্তরে গমনাগমন করিত, অন্য উপায় ছিল না। সচরাচর লোকে পদব্রজে দুরতর দেশে গমনে বাধ্য হইত। অনেকে পথে দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিত। নানা ভয় বিভিষিকা ও অসুবিধাবশতঃ নিতান্ত বাধ্য না হইলে কেহ গৃহ ত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইত না। সেই সময়ে প্রায় সকলেই গৃহবাসী ছিলেন। এক্ষণ কলিকাতা হইতে বাষ্পীয় শকট আশ্রয় করিয়া ১৬। ১৭ ঘণ্টার মধ্যে সামান্য ব্যয়ে অতি সহজে নির্ব্বিঘ্নে একজন বালক বা বালিকা কাশীধামে চলিয়া যায়, এমন কি ৫। ৭ দিনের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরিয়া আসিতে পারে। সেই সময়ে পথের দুর্গমতাদি কারণে বহুকষ্টে এক মাসেও কেহ কাশীতে যাইতে পারিত না। অনেক তীর্থযাত্রিক পথে দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইত বা প্রাণ হারাইত। ঢাকা জিলার পূর্ব্বাংশে ন্যূনাধিক ত্রিশ মাইল দূরে পাঁচদোনা নামক পল্লী আমাদের জন্মস্থান। পাঁচদোনা হইতে ঢাকায় যাইবার পথ ৩০ মাইলের মধ্যে ৮। ১০ মাইল অন্তর তিনটি ডাকাতের থানা ছিল। এই তিনটি ডাকাতের থানা পার হইয়া ঢাকায় যাওয়া মহাভাগ্যের ফল ছিল। জলপথে যাইতে হইলে বুড়ীগঙ্গা নদীর নিম্নস্থার চরে বিপদের আশঙ্কা ছিল, সে স্থানে নৌকা আক্রমণ করিবার জন্য দস্যুগণ দলবদ্ধ হইত। গুরুতর প্রয়োজন ব্যতীত কেহ ঢাকা নগরে যাইবার জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইত না। কোন ব্যক্তি বাধ্য হইয়া যাত্রা করিলে পুনর্ব্বার গৃহে ফিরিয়া আসিবে কি না ভাবিয়া আত্মীয় কুটুম্বেরা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিদায় দান করিতেন। মোসলমান রাজত্ব কালে নির্ম্মিত আমাদের বাসগৃহ পুরাতন ইষ্টকালয়। উক্ত গৃহের এক প্রান্তে অন্ধকারাকীর্ণ একটি ক্ষুদ্র কুঠরী বিদ্যমান, এক্ষণ ভূমিকম্পে তাহা ভগ্নদশা প্রাপ্ত। কুঠরীর সঙ্কীর্ণ দ্বার প্রাচীরের মূলে, সরীসৃপের ন্যায় অধোমুখে গলিয়া সেই দ্বার দিয়া দিবাভাগেও দীপহস্তে প্রবেশ করিতে হইত। তাহার নাম চোর কুঠরী। চোর দস্যুর ভয়ে সেই অন্ধকারাকীর্ণ কুঠরীতে কাঁসা পিত্তলাদির বাসন পত্র রাখা যাইত। উহার অভ্যন্তর প্রাচীরের ভিতরে অলঙ্কার এবং টাকা পয়সাদি লুকাইয়া রাখি-

যার স্থান ছিল। বাহির হইতে সেই স্থান সহজে কেহ টের পাইত না। ইহা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হইবে তখন চোর ডাকাতের ভয় কেমন প্রবল ছিল। রাত্রি-কালে দস্যুভয়ে সকলে কম্পিত থাকিতেন। অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকিয়াও স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা করা দুষ্কর ব্যাপার ছিল। দুষ্ট লোক হইতে আত্মরক্ষার জন্য তরবারি বঁড়শাদি অস্ত্র শস্ত্র সকলের ঘরে রক্ষিত হইত। এইরূপ ভারতবর্ষের সকল স্থানে ঘোরতর দুঃখ ও অন্ধকারের অবস্থা ছিল। আমাদের দেশের দয়ারাম মায়ারামনামক দয়ামায়াশূন্য অতি নৃশংস দুরাচার দুই ভাই দস্যুদলপতি ছিল। তাহাদের অত্যাচারে দেশ উৎসন্ন হইতেছিল; তাহারা কিছুতেই শাসিত হইতেছিল না। ডাকাতের সরদারী করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের অনেক লোক বড়মানুষ হইয়াছিল।

সেই এক দিন ছিল, আর আজ এক দিন। সেই ঘন অন্ধকার আর নাই, সুদিন সুপ্রভাত। প্রিয় মাতৃভূমির দুঃখ দুর্দ্দিন নাই, দস্যু দুর্ব্বৃত্ত লোক সকল সুশাসিত, হিমাচল হইতে সুবিস্তীর্ণ ভারত রাজ্যে শান্তি বিরাজিত। কোন দুষ্ট দুর্ব্বৃত্ত মস্তক উত্তোলন করিলেই দণ্ডিত ও শাসিত হয়। অত্যাচারী রাজা জমি-দারগণ ব্রিটীশ সিংহের ভয়ে মেষের ন্যায় শান্ত। ভারতসাম্রাজ্যের সকল স্থান জালের ন্যায় রেলওয়ে ঘেরিয়া আছে, গ্রামে গ্রামে পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক তার প্রসারিত, দূরতর প্রদেশে অল্প সময়ের মধ্যে চিঠী পত্রাদি প্রেরণের কত সুবিধা! একটি পয়সা ব্যয় করিলে ভারতের সীমান্ত প্রদেশবাসী বন্ধুর নিকটে অল্প সময়ের মধ্যে সংবাদ প্রেরণ করা যায়। স্থানে স্থানে বিচারা-লয় ও পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত। বিচারকদের সংখ্যা করিয়া উঠা যায় না। কোন অত্যাচার ও বিপ্লব ঘটিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকারের উপায় হয়। ভারত সাম্রাজ্যে বহুকাল যুদ্ধ বিগ্রহ কিছুই নাই। ১৮৫৭ সালে ইংরাজ রাজাধীন হিন্দুস্থানী সমুদায় সিপাহী দুর্ম্মতিবশতঃ মিথ্যা হুজুকে পড়িয়া রাজবিদ্রোহী হইয়াছিল। তাহারা ভয়ঙ্কর সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল, সিপাহিগণ লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, আগ্রা, কাণপুর মিরট, আরা প্রভৃতি নগর অধিকার করিয়া মহা আস্ফালন করিতেছিল। বিঠোরের নানা সাহেব, ভোজপুরের রাজা কুমার সিংহ এবং দিল্লীর রাজ্যচ্যুত বাদশা বাহাদুরশা সিপাহীদিগের পুষ্টিপোষক হইয়া রাজ্য বিভাগ করিয়া লইতেছিলেন। নানা সাহেবের দৌরাত্ম্যে কাণপুর নগর নির্দ্দোষ ইংরাজ রমণী এবং বালক বালিকার রক্তে প্লাবিত হইয়াছিল। তখন কোথাও রেলওয়ে টেলিগ্রাফ বিস্তার হয় নাই, স্থানে স্থানে অস্ত্রসস্ত্রধারী সহস্র সহস্র বিদ্রোহী সিপাহীদিগের থানা, পথ দুর্গম, অধীনস্থ সমুদায় হিন্দুস্থানী সিপাহী শত্রু, দূর দেশ হইতে সৈন্য আনয়ন করিয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন করা ইংরাজ রাজের পক্ষে কঠিন ব্যাপার ছিল, তথাপি ব্রিটিস সিংহের দুর্জ্জয় প্রতাপে অচির কাল মধ্যে সমুদায় বিদ্রোহী নির্ম্মূল হইল। কোথায়

গেলেন অত্যাচারী নানা সাহেব, কোথায় বা ভোজপুরের রাজত্বলোলুপকুমার সিংহ, তোপের গোলায় তাহাদের প্রাসাদাদি চূর্ণ বিচূর্ণ হইল, চিহ্ন পর্য্যন্তও নাই। হতভাগ্য দিল্লীর বাদশা বাহাদুর শা নির্ব্বাসিত হইলেন। অপহৃত সমস্ত নগর ও প্রদেশ অচিরে ইংরাজাধিকৃত হইল। যাহারা বিদ্রোহিদের সহায়তা ও পোষকতা করিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহারা উদ্বন্ধন দণ্ডে প্রাণ হারাইয়াছে। অল্প দিনের মধ্যে সর্ব্বত্র শান্তি বিস্তার হইল।

ভারত সাম্রাজ্যের সামন্ত রাজগণ ইংরাজ রাজের ভয়ে পূর্ব্ববৎ যথেচ্ছাচারী হইয়া চলিতে পারেন না, তাঁহাদের রাজ্যশাসনে মহা ত্রুটি ঘটিলে, বিষম অশান্তি ও অত্যাচার হইলে তাঁহারা শাসিত হন, তাঁহাদের কেহ স্বেচ্ছাচারী হইয়া শাসন উপেক্ষা করিয়া চলিলে রাজ্যচ্যুত পর্য্যন্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার বংশের কোন উপযুক্ত আত্মীয় রাজ্যের অধিকারী হন। মোসলমান রাজারা যেমন আপনার সজাতি কোন আত্মীয় কুটুম্বকে রাজ্যচ্যুত হিন্দুরাজার পদে অভিষিক্ত করিতেন, ইংরাজ রাজা কোন বিশেষ ইংরাজকে রাজ্য দান করেন না। ইংরাজরাজ অপ্রাপ্তবয়স্ক পিতৃহীন হিন্দু রাজাদিগের পিতৃস্থানীয় হইয়া তাঁহাদিগকে বয়ঃপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত সযত্নে লালন পালন ও শিক্ষাদান এবং অভিভাবকরূপে তাঁহাদের রাজ্যশাসন সংরক্ষণ করেন, মহিশূর, ত্রিবাঙ্কুর, বরোদা এবং কুচবিহারের মহারাজ যখন উপযুক্ত অভিভাবকবিহীন নাবালক ছিলেন তখন ইংরাজ রাজ তাঁহাদের প্রকৃত অভিভাবক হইয়া সকল বিষয় তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভারতের সমস্ত রাজকুমারের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ইংরাজগবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে স্বতন্ত্র কলেজ নির্দ্দিষ্ট আছে।

ইংরাজ রাজ পুরুষদিগের মধ্যে অনেকের শাসন কার্য্যে ব্যক্তিগত ভাবে যে মহাত্রুটি হইতেছে না, অনেকে যে অত্যাচার করেন না ইহা আমরা স্বীকার করি না। সাধারণতঃ দেখিতে হইবে তাঁহাদের রাজ্যশাসনে যে ভারতের কত অসাধারণ উন্নতি হইয়াছে প্রজাপুঞ্জের সুখ সমৃদ্ধি কত বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোসলমান শাসনের সঙ্গে তুলনা করিলে রাত্রি দিবার ন্যায় প্রভেদ। কোন্ সবল হৃদয় ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করিতে পারে। "ইংরাজ শালারা আমাদের দেশকে উৎসন্ন করিল।" ইহা অর্ব্বাচীন লোকের কথা। মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গলেচ্ছায় এ দেশের মঙ্গলের জন্য ইংরাজশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ধর্ম্মবিশ্বাসী লোকমাত্র ইহা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমরা মোসলমান রাজাদিগের বিদ্বেষী নহি, তাঁহাদের শাসনপ্রণালীর নিন্দা করার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করা যায় নাই। তবে পূর্ব্বতন শাসন যুগ আর বর্ত্তমান শাসনযুগে যে কত প্রভেদ বর্ত্তমান শাসনযুগে যে কত উন্নতি বর্ত্তমান বিপ্লবে এবং ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে ভীষণ উত্তেজনার সময় কিছু বলা আবশ্যক হইয়াছে, তজ্জন্যই বলিতে হইল, ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত জামালপুরে একদল গুণ্ডা

মোসলমান হিন্দুদিগের প্রতি এবং হিন্দু নারীজাতির প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, তাহারা ইংরাজগভর্ণমেণ্টের কুচক্রে পড়িয়া এরূপ ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে, এপ্রকার কথা রটনা করা কিরূপ অর্ব্বাচীনের কার্য্য। গবর্ণমেণ্ট এরূপ নীচ ও কাপুরুষের কার্য্য করিতে পারেন, হিন্দুরমণীর প্রতি অত্যাচার করিতে কুমন্ত্রণা দান করেন, যাহারা বলিতে পারে তাহারা যে কিরূপ ধাতুর লোক বুঝিয়া উঠা যায় না। যদি তাহাই হইত তবে গবর্ণমেণ্ট অপরাধী-দিগকে গুরুতর শাস্তি দান করিয়া অচিরে শান্তি স্থাপন করিলেন কেন? দণ্ড-বিধানের জন্য Special Court পর্য্যন্ত স্থাপন করা হইয়াছিল। অবশিষ্ট আগামীতে আলোচ্য।

একটী বিহারী বড়লোকের মেয়ে।

এক সময়ে আমাদের ভক্তিভাজন আচার্য্য বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ নববিধান গ্রহণ না করিতে পারে, কিন্তু চীন ও জাপানে ইহার সমাদর হওয়া অসম্ভব হইবে না। আমাদিগের বঙ্গীয় সমাজের মধ্যে যে উচ্চ ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি লাভ হওয়া সম্ভব হইতেছে না, সে উচ্চ ধর্ম্ম অকর্ষিত। হিন্দু মহিলার ভিতর স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে দেখিলে যে আমাদিগকে অবনত মস্তক হইতে হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। কয়েক মাস হইতে বিহারের কোন ধনাঢ্য পরিবারের এক সধবা কন্যা আমাদিগের অতি নিকটে বাস করিতেছেন। এই ধনাঢ্য পরিবারের বার্ষিক আয় কয়েক লক্ষ টাকা। এই পরিবারও এতদঞ্চলে রাজপরিবার বলিয়া বিখ্যাত। এক জন উচ্চ বেতনভোগী ইংরাজ কর্ম্মচারী এই প্রকাণ্ড ষ্টেটের ম্যানেজার। এদেশে সেই পরিবার ও কন্যার নামোল্লেখ আপত্তি-জনক হওয়া সম্ভব মনে করিয়া পরিচয় দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না। ইঁহার গুণের পরিচয়ই আমাদিগের আলোচ্য। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সময়ে আমাদিগের মহিলাদলে একটা বিলাস-শূন্যতা ও বৈরাগ্যের ভাব আসিয়াছিল। আহার পরিচ্ছদের আড়ম্বর ত্যাগ করা ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাদিগের লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইঁহাদের মুখচ্ছবিতে বৈরাগ্যের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছিল। হায়! এখন সে প্রবাহ মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। আজ যে বিহারী ধনী পরিবারের কন্যার কাহিনী অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে, তাঁহার উচ্চ বৈরাগ্য কি আমাদের পরিবারের শিক্ষণীয় বিষয় নহে? প্রভূত ধনরাশি অসংখ্য দাস দাসী দ্বারা পরিবেষ্টিতা হইয়া যে একটী সধবা নব যুবতী বৈরাগিণীর ন্যায় বাস করেন ইহা কি একটা স্বর্গীয় দৃশ্য নহে? আমাদের পরিবারের মেয়েরা এক দিন তাঁহার নিভৃত প্রকোষ্ঠে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে গিয়াছিলেন। বড় লোকের মেয়ে স্বর্ণালঙ্কার ছাড়িয়া সামান্য পরিধেয় পরিধান করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিয়াছিলেন যে, "বেশভূষা করিয়া কি হইবে, এ সমুদায় কি

সঙ্গে যাইবে ?" জীবের প্রতিও তাঁহার অদ্ভুত দয়া। তিনি যখন যেখানে থাকেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক বিড়াল ও কুকুর নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে বাস করিতে থাকে। এই বিড়াল ও কুকুরদিগের সেবার জন্য আহার ও দাস দাসীর বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। এই পোষিত জন্তুগুলি তাঁহার বিলাসের বস্তু নহে। তিনি বলেন, যে সকল বিড়াল কুকুরকে অন্য লোকে রাখে না, তিনি তাহাদিগকে রাখিয়া থাকেন। পথের জীর্ণ শীর্ণ বিড়াল কুকুর আসিয়া তাঁহার পশুশালা পূর্ণ হইতে থাকে। একদিন তিনি আমাদের ছোট ছোট মেয়েদেরে আহ্বান করিয়া মিষ্টান্নাদি খাওইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ভিতরে যে গুপ্ত বৈরাগ্য বাস করিতেছে ভবিষ্যৎ তাহা প্রমাণ করিয়া দিবে। তাই বলিতেছি, আমাদিগের কর্ষিত ও মার্জ্জিত দলে ও আমাদের শিক্ষিতা মহিলাদিগের মধ্যে যে উচ্চ বৈরাগ্য স্থান পাইল না একটী হিন্দু পরিবারের অল্প শিক্ষিতা ও ধনশালিনী কন্যার ভিতরে সেই বৈরাগ্য স্থান লাভ করিয়াছে। হায়! আমাদের হঠকারিতাপ্রিয়া যুবতী মহিলাগণ আবার বিলাত যাইবার জন্য ব্যস্ত। ভারতের বৈরাগ্যপ্রধান ভূমিতে যাঁহাদের ভিতর বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা চলিতেছে, আর সেই পাশ্চাত্য বিলাসিতাপূর্ণ সাগর পারের মহিলাদিগের সংস্পর্শে আসিলে যে তাঁহাদের কি দশা উপস্থিত হইতে পারে। কোথায় আমাদিগের একটা বৈরাগী বৈরাগিণীর দল প্রস্তুত হইবে, না একটা বিলাসী বিলাসিনীর দল প্রস্তুত হইতেছে।

G. P. M.

আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

বর্ম্মদেশ—রেঙ্গুণ নগর।

বিগত ২৭শে ফাল্গুন ফিযু হইতে রেঙ্গুণ নগরে যাত্রা করা যায়। রেঙ্গুণে যাইয়া দেবী পুষ্পমালার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিব পূর্ব্বে এরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু পীনমানাতে অবস্থান কালে আমরা রেঙ্গুণপ্রবাসী ব্রাহ্ম যুবা প্রীতিভাজন ডাক্তার শ্রীমান্ প্রসন্নকুমার মজুমদারের আগ্রহপূর্ণ ক্রমে দুই খানা পত্র তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার আবাসে স্থিতি করিবার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তাঁহার অনুরোধবশতঃ পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করা যায়। ফিযু নগর হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সেই দিবস সায়ংকালে আমাদিগকে প্রতীক্ষা করিবার জন্য তারযোগে তাঁহাকে জ্ঞাপন করা হয়। প্রিয় বিনয় ফিযু ষ্টেশনে বেলা ১০টার গাড়ীতে আমাদিগকে উঠাইয়া দিয়া বিদায় হইয়া চলিয়া যান।

বর্ম্মদেশের পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী নগর রেঙ্গুণ হইতে প্রাচীন রাজধানী মেণ্ডালয় নগর অতিক্রম করিয়া তাহারও বহু দূরে পূর্ব্ব সীমান্তর্গত স্থান পর্য্যন্ত রেলওয়ে বিস্তার হইয়াছে। এক্ষণ এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত যাত্রিকদিগের গমনাগমনে কোন অসুবিধা ও কষ্ট নাই। পূর্ব্বে বর্ম্মদেশে স্থলপথে গমনাগমন অসাধ্য

ব্যাপার ছিল। পথ দুর্গম, বহু স্থান অরণ্যাকীর্ণ এবং সর্ব্বত্র দস্যু-ভয় ছিল। সে দেশের দস্যুগণ বক্ষঃস্থলে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া পথিকদিগকে মারিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া যাইত, গ্রাম নগর লুণ্ঠন করিত। এক্ষণ ইংরাজশাসনে ও রেলওয়ে বিস্তার হওয়াতে দস্যুভয় প্রশমিত হইয়াছে। তথাপি তাহাদের দৌরাত্ম্য একেবারে নিঃশেষিত হয় নাই। পীনমানাতে অবস্থান কালে এরূপ জনরব শুনিতে পাওয়া গেল যে, একদল বন্দুকধারী দস্যু পীনমানা নগর আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিবার জন্য আসিতেছে, তৎ শ্রবণে আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। এদিকে গবর্ণমেণ্টের আদেশে এক দল পুলিশ সৈন্য নগররক্ষা ও দস্যুদিগকে গেরেপ্তার করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হয়। দস্যুদল ভয় পাইয়া আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহারা নগরের অদূরে আসিয়াছিল, তথা হইতে পলায়ন করে। পূর্ব্বে রেঙ্গুণ[illegible]তে যাত্রিকগণ জলপথে মেণ্ডালয় ইত্যাদি স্থানে গমন করিত, ঐরাবতী নদীর স্রোত অতিক্রম করিয়া নৌকারোহণে যাইতে মাসাবধি কাল ব্যয় হইত। সে পথও নিরাপদ ছিল না, স্থানে স্থানে দস্যু তস্করের ভয় ছিল। এক্ষণ দ্রুতগতি বাষ্পীয়পোত যাত্রিকদিগকে রেঙ্গুণ হইতে সত্বর নিরাপদে মেণ্ডালয়ে পঁহুছাইয়া থাকে।

ফিমু নগর হইতে রেঙ্গুণে গমন কালে প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনে পর্ব্বতাকার পুঞ্জীভূত সারি সারি ধান্যের বস্তা নয়নগোচর হইয়াছিল। সেই সকল ধান্য রেঙ্গুণে প্রেরিত হইবে, তথায় কলে চাউল প্রস্তুত হইবে। ষ্টেশন মাষ্টার মালগাড়ী যোগাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। রেঙ্গুণে ইংরাজ ও জর্ম্মণ প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় কোম্পানীর বড় বড় ৯টা চাউলের কল আছে। এক একটা কলে প্রতিদিন তিন হাজার বস্তা ধানের চাউল প্রস্তুত হয়। এক এক বস্তায় দুই মণ ত্রিশ সের ধান থাকে। চিনেম্যান ও বর্ম্মদেশীয় লোকদিগেরও কয়েকটি ছোট ছোট কল আছে। কিন্তু বাঙ্গালীর একটীও নাই, বাঙ্গালীর কেবল সগর্ব্ব বক্তৃতা ও নিন্দা কটূক্তি আছে। এক একটা Rice Millএ হাজার হাজার দেশীয় শ্রমজীবী লোক কাজ করিয়া দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। ডাক্তার প্রসন্নকুমার তিনটা Rice Mill এর ডাক্তার, এক এক শত টাকা করিয়া তিনটি কলে তিন শত টাকা মাসিক বেতন প্রাপ্ত হন। বিগত দুর্ভিক্ষের সময় রেঙ্গুণের চাউল আমাদের দেশকে রক্ষা করিয়াছে, নচেৎ অন্নাভাবে বহু লোকের মৃত্যু ঘটিত। যখন ঢাকার জিলায় ভীষণ বন্যায় শস্য সমূলে নষ্ট হওয়াতে ১০।১২ টাকাতেও এক মণ চাউল পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ গবর্ণমেণ্ট বর্ম্মা হইতে যাট হাজার মণ চাউল নারায়ণগঞ্জে পাঠাইয়া অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যে তাহা বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিলেন, ক্রমে বর্ম্মদেশে হইতে আরও হাজার ২ মণ চাউল আনাইলেন, তাহাতে দেশ রক্ষা পাইল। আমরা জানি ঢাকার

জিলার অন্তর্গত পাঁচদোনার রিলিফ কার্য্যে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট অতিশয় সদয়ব্যবহার করিয়া ছিলেন। স্বয়ং তথায় যাইয়া সমুদায় অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া এবং সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া মুক্তহস্তে সাহায্য দান করিয়াছেন।

বিদেশে বর্ম্মদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ মণ চাউলের রপ্তানি হয়। বিদেশী বণিকগণ জাহাজ বোঝাই করিয়া মূল্যবান সেগুন কাঠও তথা হইতে নানা দেশে প্রেরণ করিত, এক্ষণ সেগুন বন এক প্রকার নিঃশেষিত হইয়াছে। সেদেশে পর্য্যাপ্ত ইক্ষু জন্মে, তথা হইতে নানা স্থানে গুড়ের রপ্তানি হয়, তালের গুড়ও সেদেশে পাওয়া যায়, কিন্তু খর্জ্জুর তরু তথায় বিরল। খেজুর গাছ থাকিলেও তাহা হইতে রস উৎপাদন করিয়া গুড় প্রস্তুত করার প্রণালী সেদেশের লোকেরা জানে না। কেরসিন তৈল ও মেটে তৈলের খনি এবং কয়লার খনি সেদেশে আছে। ভূগর্ভে অন্য নানা প্রকার মূল্যবান্ সামগ্রীর খনি আবিষ্কৃত হইতেছে। বর্ম্মদেশের সমুদায় ভূসম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের খাস অধিকারে। তথায় বঙ্গদেশের ন্যায় জমীদার তালুকদার নাই।

বর্ম্মদেশীয় নরনারীদিগের প্রিয় খাদ্য নপ্পি কিরূপ বস্তু ইতিপূর্ব্বে আমরা তাহার বর্ণনা করিয়াছি। রেঙ্গুণ নগরের নাতি দূরস্থ একটি ষ্টেশনে বর্ম্মদেশীয় একটি সম্ভ্রান্ত পুরুষ আমরা যে কম্পাটমেণ্টে ছিলাম কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্রসহ সেখানে প্রবেশ করিয়া আমাদের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। দুর্গন্ধের জন্য আমাদের নাসিকা রন্ধ্র চাপিয়া রাখা আবশ্যক হইয়াছিল। আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, তিনি নপ্পি সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উক্ত ভদ্রলোক একটি পাত্রের আচ্ছাদন উদ্ঘাটন করিলেন। তন্মধ্যে দৃষ্ট হইল যে, কয়েকটি আস্ত সিঙ্গী মাছ পোড়া রহিয়াছে। শুষ্ক সিঙ্গী মাছ গুলিকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সযত্নে রাখা হইয়াছে, এরূপ বোধ হইল। তখন ভদ্রলোকটি তাহার ভিতর হইতে একটি সিঙ্গী মাছ উঠাইয়া তাহার ল্যাজ হইতে মুড় পর্য্যন্ত সমস্ত সাদরে চিবিয়া খাইলেন; জলস্পর্শ করিলেন না, পরে একটি আস্ত তাম্বূল তাম্বূলাধার হইতে বাহির করিলেন। তাহার সঙ্গে চূণ গুবাক সংযুক্ত করিয়া চিবাইয়া খাইলেন। বোধ হইল তিনি বিকাল বেলার জল খাওয়ার কার্য্য সিঙ্গী মাছ দ্বারা সম্পাদন করিলেন। রেঙ্গুণ পর্য্যন্ত তিনি আমাদের সহযাত্রী ছিলেন।

রেঙ্গুণ নগরের প্রান্তস্থিত [illegible]নডাঙ্গ ষ্টেশনে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমাদিগকে অবতরণ করিতে হইল। ডাক্তর প্রসন্ন কুমার মজুমদার প্লাটফরমে আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে তাঁহার আবাসে চলিয়া যাই। তিনি ষ্টেশনের অদূরে একজন সে দেশীয় ভদ্রলোকের দারুময় দ্বিতল গৃহ ভাড়া করিয়া বাস করিতেছেন। গৃহটি সেদেশীয় লোকের পল্লীর মধ্যেস্থলে বড় রাস্তার পার্শ্বে, অদূরেই বৃহৎ ফুঙ্গি চাঁও, সেই আশ্রমে শত শত ফুঙ্গি বাস করেন। প্রসন্ন

কুমার কিয়দ্দিন পূর্ব্বে উক্ত গৃহে বাস করিয়াছিলেন,গৃহের প্রাচীরে ও কবাটে রং দেওয়া হইতে ছিল, তজ্জন্য তিনি সপরিবারে অন্যত্র স্থিতি করিতে ছিলেন। আমরা তাঁহার সেই ভাড়াটিয়া বাড়ীতেই যাইয়া অবস্থিতি করি। সায়ংকালে রেঙ্গুন সেক্রেটিয়ট আফিসের অন্যতর ক্লার্ক ব্রাহ্ম যুবা বালী উত্তরপাড়ানিবাসী বাবু নগেন্দ্রনাথ সেন,আসিয়া বলিলেন,"আমার গৃহে যাইয়া ভোজন করিতে হইবে।" তাঁহার আবাস প্রায় এক মাইল দূরে, ইহা শুনিয়া আমরা বলিয়াছিলাম, আজ বড় শ্রান্ত ক্লান্ত, অত দূরে যাইতে অক্ষম। তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমি খাদ্য সামগ্রী এক্ষণই এখানে আনয়ন করিতেছি।" ইহা বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ডাইল তরকারি রুটি ইত্যাদিসহ স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। আমরা এই রূপ উৎকৃষ্ট রুটি বহুদিন খাইতে পাই নাই, খাইয়া পরম পরিতৃপ্ত হওয়া গিয়াছিল। পর দিন প্রত্যূষে প্রসন্নকুমার সপরিবারে উপস্থিত হন। বধূমাতা নব পরিণীতা, তিনি আসিয়াই গৃহের অগোছাল দ্রব্যজাত গোছাইলেন, ১২টার মধ্যে কুটন কুটিয়া রন্ধনাদি করিলেন, এবং আমাদিগকে ভোজন করাইলেন; প্রসন্ন কুমার পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী, বধূ মাতারও পিত্রালয় পূর্ব্ববঙ্গে। তাঁহাদের সঙ্গে পৌর্ব্বাহ্নিক উপাসনা হইল। অপরাহ্ণে নিজের দুইটি শিশু সন্তানসহ উক্ত নগেন্দ্র বাবুর পত্নী উপস্থিত হন। পূর্ব্বদিন রাত্রিতে তিনি খাওয়ার সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া তৃপ্ত হন নাই, আজ প্রসন্ন কুমারের গৃহে স্বহস্তে কুটন কুটিয়া রন্ধন পরিবেশন করিয়া আমাদিগকে ভোজন করাইবার জন্য আসিয়াছেন। বধূমাতাটীর বিনয় নম্রতা ও আগ্রহ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া গিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্বে কখনও আলাপ পরিচয় ছিল না, তিনি প্রথম সাক্ষাতেই কন্যার ন্যায় ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই দিনেই তাঁহার সেবা কার্য্যের পরিসমাপ্তি হয় নাই। পরের রবিবার মধ্যাহ্নে তিনি নিজগৃহে ভোজন করিতে আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছিলেন। টাঙ্গুতে আমরা যাইয়া যে পরিবারে কয়েক দিন বাস করিয়াছিলাম, সে পরিবারের বধূমাতাটীকে গৃহ কর্ম্ম ও সেবাকার্য্যে দিবা রাত্রি অবিশ্রান্ত ব্যস্ত দেখা গিয়াছে। শৈশব প্রকৃতি প্রাপ্ত জরাজীর্ণ শ্বশুর দেবকে তিনি মায়ের মত সেবা করেন দেখিয়া আহ্লাদ হইয়াছে। তথা হইতে যাত্রা করিবার সময় রেঙ্গুণ হইতে ভাল জিনিষ ক্রয় করিয়া লইয়া যাইবার জন্য তিনি সাদরে কয়েকটী টাকা আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

রেঙ্গুণ একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান। এই নগরে নানা দেশের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। নগরের রাস্তা সকল পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত এবং সরল, এস্থানে আঁকা বাঁকা গলি বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক রাস্তার নির্দ্দিষ্ট নম্বর আছে, নম্বর দ্বারা পথের পরিচ হয়। কলিকাতায় যেমন রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড ইত্যাদি গলি ও রাজ-

পথের নির্দ্দিষ্ট নাম আছে, রেঙ্গুণে সেরূপ নয়। রেঙ্গুণে ১লা নম্বরের রোড, দ্বিতীয় নম্বরের রোড ইত্যাদি নম্বর দ্বারা পথ নির্দ্দিষ্ট। এখানে কাঠের বাড়ীই অধিক, সুদৃশ্য বড় বড় বাড়ী অনেক আছে। বর্ম্মের রাজধানী রেঙ্গুণ নগর, ছোটলাট সাহেব রেঙ্গুণে বাস করেন। ইলেকট্রিক্‌ট্রাম ষ্টিম ট্রাম দুই প্রকারের ট্রাম গাড়ী চালিত হইতেছে। শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, ষ্টীম ট্রাম শীঘ্রই রহিত হইবে। ইলেক্ট্রিক্ ট্রাম বাহুল্য রূপে চালিত হইবে। অধিকাংশ বিদেশী লোক নগরের মধ্যস্থলে বাস করে। লোক সংখ্যার আধিক্যবশতঃ রেঙ্গুণের আয়তন ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে।

পাজনডাঙ্গ পল্লীতে সে দেশীয় লোকের বাস অধিক। আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি যে, বর্ম্মদেশীয় রমণীগণ অসঙ্কুচিতভাবে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিয়া থাকে, সকল অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথোপকথন করে। কিন্তু প্রসন্ন কুমারের প্রতিবেশী একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাগণের রীতি সেরূপ নয়। সেই পরিবারে চারিটী ভগিনী বাস করেন, সকলেই যুবতী। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হয় নাই, বিবাহ করিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। মধ্যমার বিবাহ হইয়াছে। তিনি স্বামী সেবাতে অতিশয় নিষ্ঠাবতী। জ্যেষ্ঠা অপর দুইটী ভগিনীকে সৎপাত্র পাইলে বিবাহ দিবেন এরূপ চেষ্টায় আছেন। সকল ভগিনীই গৃহে বসিয়া শিল্প কর্ম্মাদি করেন, ঘরের বাহির বড় হন না। হিন্দুরমণীদিগের ন্যায় তাঁহাদের অনেকটা সলজ্জভাব। অপর পুরুষ ঘরে আসিলে তখন কোন আত্মীয় পুরুষ উপস্থিত না থাকিলে তাঁহারা তাহার সঙ্গে অধিক কথা কহেন না। সত্বর তাঁহাকে বিদায় দেন।

বয়ঃস্থা হওয়ার পূর্ব্বে বর্ম্মদেশীয় বালিকাদিগের কর্ণভেদ হয়, তদুপলক্ষে, বন্ধুভোজন ও বাদ্যাদি হইয়া থাকে। যতদিন কর্ণভেদ না হয় বালিকা বালকের ন্যায় কেশ কর্ত্তন করিয়া থাকে, এবং ইচ্ছা মত ক্রীড়া কৌতুক করিয়া বেড়ায়। কর্ণভেদ হয় নাই এরূপ দুইটী কন্যার চিত্র প্রদর্শিত হইল। ইহাদের কর্ণভেদ অতিশয় কষ্ট দায়ক, ক্রমশঃ ছিদ্র এরূপ বড় করা হয় যে, তাহার ভিতরে সহজে অঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ করান যাইতে পারে। কর্ণভেদ হইলে উহাদের অন্যরূপ বেশ ভূষা হয়, তখন আর তাহারা কেশ কর্ত্তন করে না, দীর্ঘ কেশধারণ করিয়া মস্তকের মধ্যভাগে কবরী বন্ধন করে। অনেকে নব প্রস্ফুটিত কুসুম ও নব পল্লব দ্বারা কেহ কেহ কৃত্রিম কুসুমযোগে কবরীর শোভাবর্দ্ধন করে, আবশ্যক মতে কেশবিন্যাস করিবার জন্য অনেকে চিরুণী মস্তকের কেশগুচ্ছে রাখিয়া থাকে। সে দেশের অরণ্যে এক প্রকার কাঠ জন্মিয়া থাকে, তাহা জলসংযোগে শিলে ঘর্ষণ করিলে পিষিত শ্বেত চন্দনের ন্যায় দেখায়। বালক বালিকা যুবতী সকলেই সৌন্দর্য্য প্রকাশের জন্য কপোলদেশে তাহা বিলেপন করিয়া থাকে। সেই বস্তুকে তালেখা বলে। তথাকার মেয়েরা তালেখার বিশেষ আদর করিয়া থাকে। বাল্য কালেই পুরুষেরা অঙ্গ

প্রত্যঙ্গে চিরজীবনের জন্য উল্কীর ছাপ গ্রহণ করে। তাহাতে কয়েক দিন বিষম যাতনা ভোগ করিতে হয়।

বর্ম্মদেশীয় লোকদিগের নৃত্যগীত অতিশয় অদ্ভুত ও হাস্যোদ্দীপক। নৃত্য দর্শন ও গীত শ্রবণ কিছু কিছু হইয়াছে। নাট্যাভিনয়ে নর্ত্তক ও নর্ত্তকী বিকৃত অঙ্গভঙ্গিতে লম্ফ ঝম্প করিয়া নাচিয়া থাকে,তাহাদের নাচ দেখিলে হাসি পায়। নাচের পোষাক অতিশয় আমোদজনক। একটী নর্ত্তকী বালিকার চিত্র প্রদর্শিত হইল। পাঠিকা, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিবেন। অনেক অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার প্রোসেশনে শবের সঙ্গে নর্ত্তক করতাল বাদ্যের তালে তালে আনন্দে লম্ফ ঝম্প করিয়া নাচিতে নাচিতে শ্মশানক্ষেত্র পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। গায়কগণ অতিশয় চেঁচাইয়া গান করে, স্বরের কোনরূপ মাধুর্য্য অনুভূত হয় না। তাহারা নদীবক্ষে নৌকা চালাইয়া তার-স্বরে গান করিয়া আমোদ করিয়া থাকে।

পজনডাঙ্গ পল্লীতে চেটীদের একটি বৃহৎ দেবালয় আছে। সেই দেবমন্দি-রের ঠাকুর মণিময় আভরণে ভূষিত,ঠাকুর দর্শন হয় নাই, বাহির হইতে দেবালয়-মাত্র দৃষ্ট হইয়াছে। শ্রুত হইল প্রতি-বৎসর উক্ত দেবালয়সংক্রান্ত বৃহৎ উৎসব হয়। সেই উৎসবোপলক্ষে লক্ষ দেড় লক্ষ লোকের ভোজ হইয়া থাকে। কতকগুলি কূপ খনন করিয়া ডাইল ডালনা ইত্যাদি ব্যঞ্জন দ্বারা সে সকল পূর্ণ করা হয়। দড়ী বাঁধিয়া বাল্‌তি ফেলিয়া সেই সকল কূপ হইতে ব্যঞ্জনাদি উত্তোলন করা হইয়া থাকে, পরে ভোক্তাদিগকে পরিবেশন করা হয়। সেখানে মাদ্রাজীদের একটি বৃহৎকালী বাড়ী আছে। সেই কালী-বাড়ীতে সর্ব্বদা নহবত বাজিয়া থাকে।

প্রসন্নকুমারের বাড়ীর একদিকে বড় রাস্তা,অপরপার্শ্বে পেগুনদী। নদীতীরে ইত-স্তত: সারি সারি Ricemill। নদীতে মাল বোঝাই নৌকা ও জাহাজের গমনাগমনের অভাব নাই। গৃহে বসিয়াই আমরা নদীর শোভা দর্শন করিতাম। নিশাকালে বাষ্পীয় পোত ও তরণীশ্রেণীর দীপমালায় নদীবক্ষ সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বর্ম্মদেশীয় লোকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রোসেশনের ঘটা এবং তদুপলক্ষে যে নৃত্য বাদ্যাদি হয়,লিখিয়াছি। রেঙ্গুণে যাইয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অনেক বড় বড় প্রোসেশন দৃষ্ট হইয়াছে। প্রসন্নকুমার ভাড়া দিয়া যাহার বাড়ীতে বাস করি-তেছেন,তাঁহার উপার্জ্জনশীল উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয়। শ্রুত হইল তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বৃহৎ প্রোসেশনের আমোদে ১৪শত টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ক্রমশঃ।

আমেরিকাযাত্রিকের পত্র।

আরব সমুদ্র।

(৪ঠা আগষ্ট,১৯০৭, রবিবার।)

আজ চারি দিন হইল মাটীর মুখ আর দেখি নাই, খালি জল আর জল, ঢেউ, ফেণা, আর মেঘ আর আকাশ। মাটী যে কত সুন্দর, সমুদ্র যে কতই প্রকাণ্ড বাড়ীতে বসে ভেবে কিছুতেই ঠিক উপ-

লব্ধি হয় না। এ কথা তো অনেকদিন জানিতাম, বিলেত যেতে এত দিন লাগে, আরও শুনিতাম বিলেত তো এখন খুব শীগ্‌গিরই যাওয়া যায়, কিন্তু এই যে রাত দিন জাহাজ চলেছে আর চলেছে, আর ডেকে বসে বসে খালি দেখছি ঢেউ-এর পর ঢেউ আকাশের সীমা পর্য্যন্ত কেবল শাদা ফেণা মাথায় করে ছুটেছে, অথচ এই জলরাশির শেষ নেই, একটু খানি মাটীর দেখা নেই, এতে খালি মনে হয় সমুদ্দুরটা কি প্রকাণ্ড ব্যাপার, কবে এর সীমায় পৌঁছবো, কবে একটু মাটী দেখ্‌তে পাব। মাটীকে বোধ হয় কোন দিন এত প্রিয় মনে করি নি, এখন যেমন মনে হচ্চে। জন্ম থেকে মাটীর সঙ্গে সম্বন্ধ, তাই মনে হয় মাটীর সঙ্গে যেন একটা নাড়ীর টান আছে, তাই একটু খানি মাটী দেখ্‌বার জন্যে মনটা এত চায়। সে যাউক, জাহাজে আছি, মন্দ নয়। গেল বেস্পতিবার ১লা আগষ্ট বেলা ৩টেয় জাহাজে উঠেছি। কলম্ব জেটী থেকে আমার সংযাত্রী সেই বর্ম্মিজ ছেলেটী, একটী সাহেব,—তাঁর সঙ্গেও এক ট্রেণেই কলকাতা থেকে এসেছিলাম, ও আমি একখানি নৌকো করে সব জিনিষ পত্তোর নিয়ে জাহাজে এলাম। জাহাজে Cook এর লোকও উপস্থিত ছিল। জাহাজে এসে Steward কে বলে ক্যাবিন খুজে নিয়ে জিনিষ পত্তোর Cabinএ গুছিয়ে দিলাম। সব জিনিষই ক্যাবিনে সঙ্গে নিলাম। নৌকো ও কুলী ভাড়া এখানে ভয়ানক নিলো, প্রায় ৩৲ টাকা। Cabinটী আমাদের মন্দ নয়, সেই বরমিজ ছেলেটী ও আমি দুজনে এক Cabin এ থাকি। দুটী ছোট Spring এর খাট একটীর ওপর একটী যেমন ট্রেণে ওপরে বেডিং আর নিচের বেঞ্চি। খাট গুলিতে বেশ নূতন বিছানা চাদর বালিস দেওয়া। তা ছাড়া ছোট Cabin টীর ভেতরে একটী Chest of drawers একটী আয়না, wash hand stand, জলের কল, ইলেকট্রিক লাইট, ছোট একখানি বেঞ্চি, আলনা, ছোট একখানি টেবিল, সাবান তোয়ালে, কাঁচের গ্লাস কাঁচের কুঁজো, Life belts সব একেবারে Fit করা, অথচ Cabin টী হয়তো মোটে ৮ ফিট্ বা ৬ ফিট্ হ'বে। এমন সুন্দর করে গোছানো, দেখ্‌লে আহ্লাদ হয়। Cabinটী আমাদের একেবারে জলের ধারে নয় এই একটা দুঃখু। তাহ'লে বেশ সমুদ্দুরের হাওয়া বেশ খাওয়া যেত। Post holes না থাকায় ক্যাবেনটী বড় গরম হয়, তবে Cabinএর সঙ্গে সম্বন্ধ আমাদের খুবই কম, সমস্ত দিন ও রাত্তিরের অধিকাংশ সময়ই আমরা ডেকে থাকি, সেখানে খুব হাওয়া। মোট কথা, এখানে এসে ৩০৲ টাকা বেশী দিয়ে যে Cabinটী পেয়েছি এই একটা বড় ভাল হ'য়েছে, তা নইলে বড়ই অসুবিধে হ'ত। আমার জন্যে ক'লকাতায় Cooksএরা যে Berth Engage ক'রে দিয়েছিল, তা open sturageএ Colamboতে ৩০৲ টাকা দিয়ে অনেক কষ্টে ঘটে, হঠাৎ ভাগ্যক্রমে

কেবিনটা পেয়েছি। Open steerage মানে খোলা জায়গা নয়, তবে একটা প্রকাণ্ড হল মতন, খুব নীচে, সেই holl এতে সারি সারি গায়ে গায়ে, উপরোপরি প্রায় ১০০ খানিক কি ১৫০ births আছে, দেওয়ালে গোটা কয়েক hook লাগানো আছে, আর কিছু নেই। আর তা ছাড়া open eteerage এ অধিকাংশই নানান দেশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড rough, heavy, অপরিষ্কার, ছোট লোকের আড্ডা। তাদের ইংরিজি এমন অদ্ভুৎ যে কার সাধ্য বোঝে। যা হ'ক, এইতো গেল ক্যাবিনএর কথা। তার পর খাওয়া দাওয়ার কথাও বলি, সমস্তদিনকার কাজের কথাও বলি। খুব ভোর বেলা উঠে Dressing gown পরে খালি পায়ে ডেকে আসি, তখন ডেক্ ধোয়া হয়। ডেকের উপরে ভোর বেলায় যা ভাল লাগে কি ব'লবো? সুন্দর বাতাস, আর জলের শোভার কথা তো অবর্ণনীয়। সেখানে দাঁড়িয়ে সমুদ্দুরের সঙ্গে চেঁচিয়ে গান গাই, কি স্তোত্র বলি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভগবান্‌কে স্মরণ ক'রে স্নান ক'রতে যাই। স্নানের বন্দোবস্ত মন্দ নয়, তবে অনেক সময় বাথরুম খালি পাওয়া যায় না। স্নান ইত্যাদি শেষ ক'রে ক্যাবিনএ গিয়ে পোষাক পরে ডেকে আসি। সেখানে ডেক চেয়ারে ব'সে ব'সে সমুদ্দুর দেখি, পড়ি, কি কারু সঙ্গে আলাপ পরিচয় করি। দু চার জন অষ্ট্রেলিয়ান ইংরেজের সঙ্গে বেশ আলাপ হ'য়েছে, তাঁরা খুব যত্ন করে কথা বলেন, এবং সঙ্গে বেলা ডেকের ওপরে ছেলে মেয়ের "কানামাছি" ইত্যাদি নানান রকমের যে সব English games খেলা করে তা বুঝিয়ে দেন। তা ছাড়া সঙ্গের সেই Burmessটী ও Mr. Hamerseley, সেই ইংরেজ বন্ধুটী তো আছেনই। বেলা ৮টার সময় break fustএর ঘণ্টা হয়। Dining roomটী জাহাজের নিচের দিকে ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান দেওয়া। টেবিল গুলি, চেয়ার গুলি সব মেজের সঙ্গে আঁটা, তবে Chairs গুলি ঘোরে। খেতে যে কি মাথামুণ্ড দেয় তাতো জানি না, চা রুটী এইতো চেনার ভেতর, তা ছাড়া মাংস, মাছ, পুডিং ভেজিটেবিল ইত্যাদি তো আছে, কিন্তু কি যে রাঁধে তা তো বুঝি না, রান্নার নামও জানি না, যা দেয় তাই খাই। যে ওটমিল পরিজ আগে খেতে গেলে বমি আস্‌তো, যোগাদা যা খাওয়াতে না পেরে হারমেনে গিয়ে ছিলেন, তাতো খুবই খাই, তার চেয়েও যে কত অধম কত কি খাই জানি না। ভাল লাগা না লাগা, খেতে পারা না পারা যে, কতটা মনের ওপর নির্ভর করে দেখে অবাক্ হয়েছি। খেতে হয়তো একটু কষ্ট হয়, কষ্টও না, একটু অসুবিধে হয় মাত্তোর, কিন্তু এই খাবার যদি বাড়ীতে কেউ দিত হয়তো বমি হ'য়ে যেত; অথচো জাহাজের এই রোলিং আর এই খাওয়া, কিন্তু খালি এই মনে ক'রে জাহাজে উঠেছিলাম যে, বমি হবে না, খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে কষ্ট মনে করবো না, তাই বোধ হয় বমিও হয়নি, খাচ্ছিও তো

মন্দ নয়। যাহ'ক ৮টার সময় ব্রেকফাষ্ট খেয়ে আবার ডেকে আসি, সেখানে এসে আবার পড়াশুনো বেলা ১টা পর্য্যন্ত, ১টার সময় ডিনাব, ডিনাবের পর আবার ডেক ৫টা পর্য্যন্ত, ৫টার পর আবার ডেক, ৮টার সন্ধ্যা, তার পর আবার ডেক, তার পর অনেক রাত্তিরে গিয়ে ক্যাবিনে, শোয়া। মোটামুটী এইতো ডেইলী রুটিং। সন্ধে বেলা আবার ডেকের ধারে রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ ধ'রে সমুদ্দুর দেখি, আপনাদের সবাই-কার কথা এক এক ক'রে মনে করি, কত কথাই মনে হয়, যে জন্যে আপনাদের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে, সম্মুখে আপনাদের আশাপূর্ণ হ'বার ছবি রেখে চ'লেছি, সে কথা ভাবি। শেষে একে একে সব আলো যখন অন্ধকারে ডুবে যায়, অন্ধকার এসে যখন চারি দিক একা-কার করে দেয়, তখন সকল অন্ধকার তাঁর গাম্ভীর্য্যের স্পর্শ এনে দেয়, একাকী তাঁরই আশ্রয় গ্রহণে নিরাপদ হই, শান্ত হই, ধীর ও স্থিরদৃষ্টি হই।

(ক্রমশঃ)

জাপানের বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

২। তাহারা বক্তৃতায় কালক্ষেপ করে না। তাহারা প্রত্যেক বিষয় জীবন-গত কার্য্যে পরিণত করে।

৩। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি :—ভালরূপে প্রত্যেক বিষয়টি আয়ত্ত করিতে জানে, এবং স্মৃতি-শক্তি অতি প্রবল।

৪। উচ্চাভিলাষী, উন্নতিশীল, সমা-লোচন অভিজ্ঞ, এবং কোন বিষয়ে অন্য জাতি অপেক্ষা পশ্চাৎপদ হইবে না এই দৃঢ় সঙ্কল্প। বংশানুগত প্রথা বলিয়া প্রাচীন প্রথাতে অনুরক্ত হইয়া ভাবী উন্নতিতে বিমুখ নহে। বরং উন্নতির জন্য চিরাগত প্রথা বর্জ্জন করিতে সদা মুক্ত ভাবাপন্ন। ভারতবাসীর ন্যায় দেশাচারের দোহাই দিয়া কোন মন্দ প্রথা সমর্থন করে না।

৫। তাহারা অনুকরণ প্রিয়। কিন্তু অন্ধ ভাবে কাহারও কিছু গ্রহণ করে না। যেখানে যাহা কিছু ভাল তাহাই গ্রহণ করে। হিন্দুর মত দেশাচারের দোহাই দিয়া উন্নতি বিমুখ হয় না। যাহা গ্রহণ করে তাহার স্বজাতীয়ত্বের ভাবে মিশাইয়া নেয়। অথচ দেশের যাহা উৎকৃষ্ট তাহাতে খুব দৃঢ়নিষ্ঠ, তাহার এক চুলও এদিক্ ওদিক্ করে না।

৬। সদা উৎসাহপূর্ণ।

৭। সৌন্দর্য্যপ্রিয়।

৮। সদা প্রফুল্ল চিত্ত।

৯। অকৃত্রিম সৌজন্যতা :—খুব নীচু হইয়া প্রণাম করে।

১০। মুক্তহৃদয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের আধ্যা-ত্মিক দিকটার প্রতি তেমন দৃষ্টি নাই। সংসারাসক্তিই প্রবল। কনফুসিয়াশের ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে ঔদাসীন্য জন্মিয়াছে, কেবল নীতির ধর্ম্ম প্রবল হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবও তাহাদের জীবনে নৈতিক উন্নতির অনেক সহায়। বর্ত্তমান সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাবে

জাপান রমণীদের মধ্যে সতী ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। জাপরমণীদের সতীধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক শিথিলতা আছে।

জাপেরা বাণিজ্য এবং কলাবিদ্যার এত উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, ভারত কখনও তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে কুসংস্কার, অন্ধতা, অজ্ঞানতাসত্বেও ভারতের ধর্ম্ম অনেক শ্রেষ্ঠ। জাপান এবং ভারতমধ্যে আদান প্রদান হইলে উভয় জাতির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে। জাপানের জ্ঞান সভ্যতাদি যাবতীয় বাহ্যিক উন্নতি আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত মিশাইয়া নিব। ধর্ম্মের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া অর্থাৎ ঈশার সঙ্গে প্রাণের মহাযোগ যত বৃদ্ধি হইবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে জাপের বাহ্যিক উন্নতি ঈশ্বরের বাহিরের বিকাশরূপে গ্রহণ করিয়া আমরা অন্তর বাহ্যে উন্নত হইব। ঈশার জীবনে যেমন ঈশ্বর এবং মনুষ্য সহ একত্ব জন্মিয়াছে আমাদের জীবনেও তেমনি ঈশ্বর এবং মনুষ্যসহ একতা জন্মিবে।

জাপরমণীদের স্বদেশবাৎসল্য এত যে তাহারা সন্তানদিগকে স্তন্য দুগ্ধসহ স্বদেশের জন্য প্রাণত্যাগের লালসা জন্মাইয়া দেন। জাপের উন্নতি মূলে জাপরমণী। গত রুষিয়া সহ যুদ্ধে জাপরমণীদের স্বদেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।

আকস্মিক ঘটনা ও সামান্য রোগাদির গৃহচিকিৎসা।

(একজন বহুদর্শী চিকিৎসক হইতে প্রাপ্ত।)

সকল গৃহেই এরূপ দৈবিক বা আকস্মিক ঘটনা ও রোগাদি উপস্থিত হইয়া থাকে যাহার প্রতীকার বা উপশমের জন্য তৎক্ষণাৎ কোন উপায় অবলম্বন না করিলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। তাহাতে কেবল রোগীর কষ্ট বৃদ্ধি হয় এমত নহে, সময়ে সময়ে রোগ দুরারোগ্য হইয়া পড়ে, এবং কখন বা চিকিৎসক উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সর্পে দংশন করিলে গৃহের ছাদ বা তাদৃশ কোন উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইলে, জলমগ্ন হইলে, অগ্নিতে দগ্ধ হইলে, বিষপান করিলে, স্থানবিশেষে কোন কঠিন আঘাত প্রাপ্ত হইলে এবং মূর্চ্ছা, আক্ষেপ ও বিসূচিকাদি রোগে এরূপ ঘটিয়া থাকে। এইজন্য সকল গৃহিণীরই এ সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। কোন্ কোন্ বিশেষ ঘটনা বা রোগ উপস্থিত হইলে কিরূপ সহজ ও সামান্য চিকিৎসা দ্বারা তাহা আরোগ্য করা যাইতে পারে কিম্বা চিকিৎসককে সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহার আগমন পর্য্যন্ত কি কি উপায় অবলম্বন করিলে রোগী বা আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির অবস্থা বিকৃত হইবে না, মহিলার পাঠিকাগণের বিদিতার্থে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমে আমরা শরীরের উপরিস্থ আঘাত হেতু যে সমুদায় অবস্থা উৎপন্ন হইতে পারে তদ্বিষয়ে এবং পরে নানাবিধ রোগাদিসম্বন্ধে আলোচনা করিব। আঘাত সচরাচর দুই প্রকারের হইয়া থাকে।

১। নিষ্পেষিত বা থেঁতলান আঘাত। (Bruise)

২। ক্ষত। (Wound.)

থেঁতলান আঘাতে চর্ম্ম ছিন্ন হয় না। ক্ষতেতে চর্ম্ম এবং কখন কখন বা তন্নিম্নস্থ মাংশপেশী ও শিরা ধমনী ইত্যাদিও ছিন্ন যায়।

শরীরের কোন স্থান সামান্যরূপে বা স্বল্প স্থান ব্যাপিয়া থেঁতলাইয়া গেলে তাহাতে বিশেষ কষ্ট হয় না, কিন্তু যদি কঠিন ও বিস্তৃতরূপে থেঁতলাইয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ কোন উপায় অবলম্বন না করিলে ঐ স্থান ফুলিয়া উঠে ও তাহাতে বেদনা হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও হইতে পারে। অপিচ অধিকরূপে প্রদাহ * উৎপন্ন হইয়া থেঁতলান আঘাত ক্ষতে পরিণত হইতে পারে। এইরূপ অবস্থা নিবারণ করিবার জন্য প্রথম হইতেই থেঁতলান স্থানে শীতল জল ব্যবহার করা উচিত। আঘাত লাগিবার পর যত শীঘ্র সম্ভব ১০। ১৫ মিনিট কাল আহত স্থানের উপরে শীতল জলের ধারা দিবে, পরে উহাতে শীতল জলের পটী দিয়া যত ক্ষণ বেদনা বা দপদপানি থাকে অনবরত ভিজাইয়া রাখিবে। পটী অধিক মোটা করিয়া দিবে না, সচরাচর দুই পুরুর অধিক মোটা কাপড় দেওয়া উচিত নহে। এই রূপ করিলে প্রদাহ উৎপন্ন হইবে না, কিম্বা হইলেও ইহাতে তাহার আশু উপশম হইবে। যদি প্রদাহ নিবারণ হইবার পরেও আঘাত প্রাপ্ত স্থানে টিপিলে বেদনা অনুভব হয় তবে বেদনাযুক্ত স্থানে গরম জলের সেক দিবে।

* স্ফীত, রক্তবর্ণ এবং বেদনাযুক্ত হইয়া দপ্ দপ্ করাকে প্রদাহ বলে।

ক্ষত সচরাচর তিন প্রকারের হইয়া থাকে।

১। কর্ত্তিত অর্থাৎ কাটা।

২। ছিন্ন অর্থাৎ ছেঁড়া।

৩। বিদ্ধ অর্থাৎ বেঁধা বা খোঁচা দেওয়া।

কর্ত্তিত ক্ষত ছুরি, তরবারি, বঁটি ইত্যাদি তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট অস্ত্রের দ্বারা হইয়া থাকে।

বিদ্ধ ক্ষত ছোরা, গুপ্তি, কাঁচির অগ্র ভাগ ইত্যাদি কোন সূক্ষ্ম অগ্রভাগবিশিষ্ট ও ধারাল অস্ত্রের দ্বারা হইয়া থাকে।

ছিন্ন ক্ষত সামান্য ধারবিশিষ্ট উভয় প্রকার অস্ত্রের দ্বারা বা বাঁশের ও কাঠের খোচা, পেরেক ইত্যাদি দ্বারা হইতে পারে।

ক্রমশঃ।

মহিলাদিগের রচনা।

দজ্জাল।

যখন মহিলার শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহোদয় মোসলমান শাস্ত্রসংক্রান্ত অনেক পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন ও করিতেছেন তখন "কেয়ামত" "দজ্জাল" বা "পোলসেরাত" সম্বন্ধে মহিলায় কিছু লেখা অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক বোধ হইবে না। আমারত মনে হয়, "মহিলা" যেন আমাদেরই কাগজ।

এস্থলে বলা আবশ্যক, মোসলমানের ন্যায় খ্রীষ্টানগণও মহাপ্রলয় (কেয়ামত)

এবং মহাবিচারের দিনে বিশ্বাস করে। কথিত আছে যে, মহাপ্রলয়ের কিছুকাল (ধরাতলে হজরত ঈসার পুনরাগমনের) পূর্ব্বে এক বিধর্ম্মী পৃথিবীতে আসিয়া অনেক লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস নষ্ট করিবে, তাহার নাম 'দজ্জাল'। দজ্জালমাত্র চল্লিশ দিন রাজত্ব করিবে; এই চল্লিশ দিনের মধ্যেই সে অসংখ্য লোকের উপর প্রভুত্ব করিবে, নিজেকে ঈসা পয়গম্বর (যীশুখ্রীষ্ট) বলিয়া পরিচয় দিবে, সময় সময় ঈশ্বরত্বেরও দাবী করিবে! * দজ্জালের সঙ্গে একটা অগ্নিকুণ্ড (নরক) একটা মনোরম উদ্যান (স্বর্গ) এবং বাহনস্বরূপ একটা গর্দ্দভ থাকিবে। *এই কয়টা জিনিষ লইয়াই দজ্জাল দিগ্বিজয়ে বাহির হইবে! এবং দিগ্বিজয়ে সে অনেকটা কৃতকার্য্য হইবে। কারণ সে অপ্রতিহত ক্ষমতাশালী ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে, এবং তাহার সহিত অর্দ্ধ খানি রুটী (অর্থাৎ অন্ন) থাকিবে, আর পৃথিবীর যাবতীয় জলাশয় তাহার অধীন হইবে। যে ব্যক্তি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইবে, যাহার হাতে সমুদায় অন্ন জল থাকিবে, স্বর্গ ও নরক যাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান, সে যীশুখ্রীষ্টত্বের দাবী না'ই করিবে কেন? তাহার কথায় মূর্খ ক্ষুধাতুর তৃষ্ণাকাতর লোকেরা আপন পৈতৃক ধর্ম্মবিশ্বাসে জলাঞ্জলি নাই দিবে কেন? পেটের দায় বড় দায়!

যে ব্যক্তি দজ্জালের কথামতে কুপথে যাইবে, তাহাকে সে স্বীয় স্বর্গে স্থান দিবে, আর যে তাহার কথা অমান্য করিবে, তাহাকে ধরিয়া সে নরকে ফেলিবে! স্বর্গের লোভে ও নরকের ভয়ে অনেক লোক দজ্জালের দলভুক্ত হইবে! হায় ক্ষুদ্র স্বার্থ!

কিন্তু দজ্জাল যাহাকে স্বর্গে রাখিবে, সে প্রকৃত পক্ষে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে, এবং যে তাহার নরকে যাইবে সে স্বর্গসুখ উপভোগ করিবে!

পাঠিকা ভগিনি! ঐ দজ্জালের বর্ণনা হইতে আপনি আর কোন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উপদেশ লাভ করিতে পারেন না কি? প্রকৃত দজ্জাল ত পরে আসিবে, কিন্তু এখনই আমরা কি এ জীবনে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে দজ্জালের কুহকে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হই না?

ক্ষণিক সুখের (দজ্জালের স্বর্গের) লোভে লোকে কি প্রেয় পথে অগ্রসর হইয়া শেষে নিজেকে অভিশপ্ত দেখে না? আর যে প্রেয়ের প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া শ্রেয়ঃ পথ অবলম্বন করে সে ক্ষণিক কষ্ট (দজ্জালের নরক) ভোগ করে বটে, কিন্তু সে পরিণামে অনন্ত শান্তিলাভ করে।

মানুষের মনে প্রধানতঃ দুইটি ভাব দেখা যায়, একটি ইঙ্গিতে সুপথ, অপরটি

---

* "ইসা পয়গম্বর আমি খোদার রছুল।
আমার কলেমা সবে করহ কবুল॥"

অন্যত্র

"হয় ঠাই যাবে সেই চড়ে এক গাধা।
যারে তারে কবে আমি তোমাদের খোদা"
"কেরামত নামা।"

* "বড় এক আতশখানা সঙ্গে হবে তার।
দোজখ বলিয়া নাম রাখিবে তাহার॥
আর এক বাগান তার সঙ্গে সঙ্গে চলে।
রাখিবে তাহার নাম বেহেস্তখানা বলে॥"

কুপথ প্রদর্শন করে। আমরা প্রথমোক্ত ভাবকে দেবভাব এবং শেষোক্তকে অসুর ভাব বলিব। দেবভাবের কার্য্য সাত্ত্বিক, আর অসুর ভাবের কার্য্য তামসিক। শাস্ত্রকারদের মতে মানব ফেরেশ্‌তা (ইব্লিল বা দেবদূত) ও পশুর মধ্যবর্ত্তী জীববিশেষ! যে ব্যক্তি পশুভাব জয় করিয়া আপন আত্মাকে উন্নত করিতে পারেন, তিনি নরদেবতা; এমন কি তাঁহাকে ফেরেশ্‌তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যায়। আর যে পশুভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে অবনতির দিকে অগ্রসর হয়, সে মনুষ্য নামের অযোগ্য নরপশু।

দজ্জাল অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ইত্যাদি, অর্থাৎ পতনের পাপপথ কুসুম আস্তৃত এবং সুগম। সুতরাং অবোধ লোকেরা পাপানলে পতঙ্গপ্রায় প্রাণ উৎসর্গ করে। আর ধর্ম্মের বা উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ, অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে হয়, পদে পদে মানবের পদস্খলন হয়। উন্নতির পথে কত বিঘ্ন, কত বাধা। ও পথে পদবিক্ষেপ করিবামাত্র ভুজঙ্গের শত ফণা গর্জ্জন করিয়া উঠে। অবনতি স্রোতে একবার গা ভাসাইয়া দিলে আর কিছু করিতে হয় না, অনায়াসে গড়াইয়া নরককূপে পড়া যায়!

একটি অতি দীর্ঘ সেতুর নাম "পোলসেরাত"। "পোলসেরাত" সেতুটি চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম (সঙ্কীর্ণ) এবং অসির অপেক্ষা তীক্ষ্ণ * তাও আবার সোজা নহে—তিন স্থলে বাঁকা! সে পোল সেরাত নরকের উপর স্থাপিত হইবে।

মহাবিচারের শেষে সকলে ঐ সেতু অতিক্রম করিয়া স্বর্গাভিমুখে যাইবে। স্বর্গের পথ এমনই কঠিন!—অমাবস্যার রজনীর ন্যায় ঘোর অন্ধকারে মানবকে ঐ সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ সেতু অতিক্রম করিতে হইবে! পুণ্যবান লোকেরা ত অনায়াসে পার হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু পাপীদের পাপের পরিমাণ অনুসারে বার বার পদস্খলন হওয়ায় তাহারা নরকে পতিত হইবে!

আমরা ঐ দুরূহ সেতুর আর একটি অর্থ বাহির করিতে চেষ্টা করিলে দোষ কি? মনে করুন, ঐ পোলসেরাত একটি পরীক্ষা বিশেষ; ঐ পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয়, সে সিদ্ধি লাভ করে; যে ফেল (faeil) হয়, তাহার মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রহিয়া যায়। এই সংসার কি? একটা বিরাট পরীক্ষাক্ষেত্র নহে কি? মানবজীবন পোলসেরাতের পথেই চলিতেছে না কি? কেহ আস্তে, কেহ এক তৃতীয়াংশ পথে (পোল সেরাতের প্রথম মোড়ে,) কেহ অর্দ্ধপথে (অথবা সেতুর দ্বিতীয় মোড়ে), কেহ আর কিছু দূরে (সেতুর তৃতীয় মোড় পর্য্যন্ত) অগ্রসর হইয়া ফেল হয়,—অধিকাংশ লোকেই

---

* "চুল হইতে সরু যে তলওয়ার হৈতে ধার,
অন্ধকার রাত্রি হৈতে সেথা অন্ধকার ॥
পোনের হাজার সাল জান সেই রাহা।
তিন বেঁক হবে তাহে এলাহির চাহা ॥"

"পোনের হাজার সাল সেই রাহা," অর্থাৎ সেতুটি এত দীর্ঘ যে পদব্রজে চলিয়া উহা অতিক্রম করিতে ১৫০০০ বৎসর সময় লাগিবে!

ফেল হয়। ক্বচিৎ দুই দশ জন ভাগ্যবান্ লোক সফলকাম হয়। কবি বড় নৈরাশ্যে গাহিয়াছেন,—

"মিছে কেন কর বিষয় ভাবনা—
কতই দেখিছ, এছার সংসারে
কারুই পূরে না মনোবাসনা।"

এই ভারতের ত্রিশ কোটী নরনারীর মধ্যে কয় জন লোক প্রতিদিন দুই বেলা পূর্ণোদর আহার প্রাপ্ত হয়? কয় জন লোকের জন্য জীবিকার পথ সুগম? কয় জনে পোলসেরাতের উপর বসিয়া অশ্রুপাত না করে? কয় জন জীবনের এক একটি দিনকে এক বৎসর তুল্য দীর্ঘ মনে না করে? কয় জনে জীবনের পথটা কণ্টকময় মনে না করে? তাই কবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন,—

"জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে"! * * * *

তাইত। একবার এ ভ্রমে পতিত হইলে আর সহজে নিষ্কৃতি নাই।

তাই বলিয়া পোল সেরাত যে একেবারে দুর্গম, তাহাও নহে। অনেকে ধর্ম্মজীবনে সিদ্ধিলাভ করেন; অনেকে আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেন। যিনিই কোন বিশেষ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাকেই কঠোর পরীক্ষা পোলসেরাত অতিক্রম করিতে হইয়াছে। বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

আর এক কথা বলিয়া এখন উপসংহার করি। দজ্জাল ১ যীশুখ্রীষ্টত্বের দাবী করিবে, (অর্থাৎ দজ্জাল খ্রীষ্টান?) তাহার সঙ্গে ২ অর্দ্ধেক রুটী থাকিবে *; যে রুটী থাকিবে যে দেশে সে যাইবে, সেই দেশের ৩ জলের কর্ত্তা হইবে †; (অর্থাৎ তাহার হাতে দেশের অন্ন জল থাকিবে!) ৪ পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য্য তাহার করায়ত্ত হইবে; ৫ এবং তাহার ইচ্ছায় শুষ্ক তরু মঞ্জুরিত হইবে, ইত্যাদি কথার অবশ্যই কোন গূঢ় অর্থ আছে। মোটা মুটিত এই দেখা যায়,—১ খ্রীষ্টান দজ্জাল ২ অন্ন ৩ জল ও ৪ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর এবং সে ৫ বিজ্ঞান বলে অঘটন ঘটাইতে (অর্থাৎ শুষ্ক বৃক্ষে ফল ফলাইতে) সমর্থ!!

ঐ দজ্জাল ও পোলসেরাতে প্রচুর নৈতিক ও দার্শনিক শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত। ধন্য সেই ধর্ম্মগুরু (হজরত মহম্মদ), যিনি এত কথা জানিতেন! যিনি এমন সুক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী ছিলেন! ধন্য তিনি! অমর তিনি!!

অবশ্য আমার সাধ্য কি যে আমি দজ্জাল বা পোলসেরাতের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে বা তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারি! আমি কোন্ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট! তবে বাঙ্গালা "কেয়ামত নামা" পাঠকালে যাহা মনে উদয় হইল, এস্থলে তাই বলিলাম। আবশ্যক বোধে উক্ত পুস্তকের কোন কোন অংশ পাদটীকায় উদ্ধৃত করা গেল।

যাহার চক্ষু আছে, সে দেখুক; যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক, আর যাহার মন আছে সে চিন্তা করুক। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি দজ্জালকে একরূপ বুঝিলাম, আর কেহ হয়ত অন্যরূপ বুঝিবেন। কেহ হয় ত হাসিবেন। যিনি হাসিতে চাহেন, তাঁহার প্রতি আমার এই বিনীত অনুরোধ যে, হাসিবার পূর্ব্বে তিনি যেন একটু গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন। অদ্য এই পর্য্যন্ত।

সোলমান কন্যা
মতীচুর রচয়িত্রী।

* "সঙ্গে তার হবে আর এক আধা রুটী।
যাহাকে চাহিবে সেই রুটী দিবে বাঁটি॥"

† "আর তার তাবে হবে দেশে যত পানি।
চাহিলে না দিবে পানি বিনে পেরেশানি॥"
অর্থাৎ বিশ্বাসীদিগকে জ্বালাতন না করিয়া দজ্জাল জলদান করিবে না।

খেদ।

ওকি শুনি অকস্মাৎ
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত

মনোরমা প্রিয় সখী ছেড়ে গেল মোরে,
কোথা গেলি প্রিয়তমা
কোথা গেলি মনোরমা

আয় বোন্ প্রাণ ভরে দেখিব লো তোরে।
ধরিয়ে বিকার জ্বরে
মনোরমা নিল হ'রে

ছাড়াইয়ে আত্মীয়াদি প্রতিবেশী সব,
জ্বালাইয়ে পরিজন
জ্বালাইয়ে প্রিয়জন

কোথা গেলি প্রিয় সখি ছাড়িয়ে বিভব।
পরিজন আদি স্বামী
সবারি সোহাগী তুমি

কত আদরের ধন তুমি যে সবার।
হরিষে বিষাদ ঢালি
কেন তুই চলে গেলি

আয়লো প্রাণের বোন আয়লো আবার।
এত প্রেম ভালবাসা
এত সাধ এত আশা

সবে কি ফেলিয়ে তোরে চলে গেছে ভাই?
এত দয়া এত মায়া কিছুই কি নাই?
না, না, না, প্রাণের সই
স্বর্গের বালিকা তুই

কেমনে পাপেতে ডুবি রহিবি ভূতলে,
তব উপযুক্ত স্থানে
বসি রত্ন সিংহাসনে

মাতাবি দেবের বর্গ স্বরগ মণ্ডলে।
পুণ্যময় স্বর্গধামে
মণিরত্ন সিংহাসনে

বসিয়ে বিরাজ তুমি পুণ্যময়ী মেয়ে,
স্বরগের দেবী দেবে
তোমা পানে চেয়ে রবে

জুড়াবে নয়ন তারা তোমা পানে চেয়ে।
আমরাও তব তরে
তাকাব আকাশ পরে

মাঝে মাঝে দেখা দিও বাল্য সখী বলে,
এই তো প্রার্থনা মম ব্রহ্ম পদতলে।

সংবাদ।

শ্রীশ্রীমতী কুচবিহারের মহারাণীর আনুকূল্যে বিগত ২৪শে আগষ্ট শনিবার হইতে ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের অন্তর্গত সিলাই শিক্ষার একটি বিশেষ শ্রেণী খোলা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত সেই শ্রেণীতে ৩০ জন ছাত্রী ভর্ত্তি হইয়াছেন। মহারাণী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ক্লাস খুলিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয় সংক্রান্ত শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে কেহ প্রতিশনিবার অপরাহ্ণে ব্যবহার্য্য সিলাই কার্য্য শিক্ষা দিয়া থাকেন। ছাত্রীদিগের যাওয়া আসার গাড়ীভাড়া এবং সিলাই সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয় মহারাণী যোগাইতেছেন। ভদ্রঘরের গরিব মেয়েরা সিলাইয়ের কার্য্যে কিছু উপার্জ্জন করিয়া নিজেদের অভাব মোচন করিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে এইরূপ সিলাই শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কিয়দ্দিন হইতে রজনীর শেষ ভাগে আকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে বহু দূরে একটি অনুজ্জ্বল ধূমকেতু প্রকাশ পাইতেছে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এরূপ নির্ণয় করিয়াছেন যে, তাহার পুচ্ছ ২০ লক্ষ মাইল ব্যাপী। উক্ত পুচ্ছ তিন ভাগে বিভক্ত লক্ষিত হইয়াছে। নভোমণ্ডলে বিধাতার বিচিত্র ক্রিয়া ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহার অনন্ত মহিমা, আমরা এক কণিকাও উপলব্ধি করিতে পারি না।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

বিনয়, ভাবে ও কাজে। *

বিনয় বলিতে আমরা কি বুঝি? আমাদের নিজের কোন কাজ কোর্‌তে হ'লে মনে হয়, বিনয় জিনিষটা কি? এ প্রশ্ন সকলেরই মনে উদয় হয়। এ প্রশ্ন যাহার অন্তরে উদয় না হয় সে কখনও বিনয়ী নহে। সকল সময়ে সকলের মনে বিনয়ের ভাব থাকা সম্ভবপর নহে, কিন্তু এক সময়ে না এক সময়ে মানুষের মনে, এ প্রশ্নের উদয় হইবেই হইবে। এই প্রশ্ন মনে উদয় হইলে, মনে হয় ইহার উত্তর আমরা কিছু দিতে পারি কি না? কাহারও কোন কথা না শুনে কিংবা বই না দেখে, আমরা ইহার কোন উত্তর দিতে পারি কিনা? আমরা যদি নিজের জীবনের বিষয় নিজে চিন্তা করি তবে আমাদের কি মনে হয়? ভাব ও কাজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভাব ও কাজ এক নহে। একটা ভাব মনে এল, কিন্তু সে ভাবটা ভিতরে থাক্‌লো কি না? অর্থাৎ যে ভাবটা মনে এসে ছিলো সে ভাবটার দ্বারায় কোন উপকার হোল কি না, কোন কাজে লাগে কি না? যদি বুঝি, যে ভাবটা মনে এসেছিল সেটা ভিতরে আছে, তবেই বুঝিতে পারি সেটা কাজে দাঁড়াইয়াছে। আমরা যদি শহর ছাড়িয়া অন্যত্র কোথায়ও যাই, পাহাড় পর্ব্বতের নীচে দাঁড়াইয়া আমাদের এরূপ প্রশ্ন মনে আস্‌তে পারে যে, এটা কত বড়, ইহার কত সৌন্দর্য্য। কিংবা সমুদ্রের নিকট যাইয়া অনেকক্ষণ সমুদ্রের প্রতি তাকাইয়া থাকিলে সহসা বিনয়ের ভাব আসিতে পারে। বাহিরের জিনিষের দিকে তাকাইয়া যদি তাহার শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিতে পারি তবেই তাহাতে বিনয় বলিতে পারি। সমুদ্র পাহাড় ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করিলে মানুষের মনে সহসা বিনয়ের ভাব আসা সম্ভব। আকাশের নীচে বসিয়া খানিকক্ষণ যদি তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নিজের লঘুত্ব অনুভব করিতে পারি তবেই তাহাকে বিনয় বলা যাইতে পারে। এভাব সকলের মনে আসে না, কাহারও কাহারও মনে সময়ে সময়ে আসে। একজন বড় লোকের বিষয় পড়িলে কিম্বা তাঁহার জীবনী পাঠ করিলে সহসা বিনয়ের ভাব আসিতে পারে। সমস্ত মানবজাতি, কিম্বা মহাপুরুষদিগের মধ্যে যদি নিজের জীবনটী ছাড়িয়া দিই তবে মনে বিনয়ের ভাব আইসে। আবার যদি প্রকৃতিতে নিজের অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিই, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মনটা যদি একবার ডুবাইয়া দেই, তাহার মধ্যে যদি অনন্ত ঈশ্বরের ভাবনা আইসে, তাঁহার সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ দেখা হয়, তখন মানুষের মনে বিনয়ের ভাব আসিবেই আসিবে। আবার যদি নিজের জীবনের বিষয় নিজে আলোচনা করি তাহা হইলে নিজের ক্ষুদ্রতা, দুর্ব্বলতা ভাবিলে বিনয়ের ভাব আসে। ইহার সঙ্গে অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া

---

* ১৭ই নবেম্বর ভাই প্রমথলাল সেন যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন তন্মূলক।

যায়, এমন বড় বড় মহাপুরুষেরা কিরূপ ছিলেন তাহা যদি আলোচনা করি তবে তাঁহাদের ভিতরকার, ধর্ম্মের ভাব, দয়ার ভাব ইত্যাদি প্রকারের ভাব দেখিয়া নিজের হীনতা প্রকাশ পায়। সকল ব্যক্তিই, নিজেদের অপেক্ষা যাঁহারা বড়, তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া নিজকে ছোট মনে করেন। যাঁহারা খুব বড় লোক তাঁহারও তাঁহাদের অপেক্ষা উন্নত ব্যক্তির সহিত তুলনা করিয়া নিজকে হীন মনে করেন, সেই হীনতা দ্বারা নিজের বিনয় প্রকাশ পায়। যাঁহারা মহাপুরুষ বলিয়া জন সমাজে পরিচিত তাঁহারা সকলেই বলিতেন "আমরা কিসের বড়, আমাপেক্ষা অমুক লোক বড়, অমুকের জীবন কত উন্নত।" এইরূপে বড় বড় মহাপুরুষেরাও নিজকে কত হীন মনে করেন যাঁহারা খুব বড় কবি তাঁহারা বলেন, আমরা কিসের কবি, আমরা খুব সামান্য, আমাদের অপেক্ষা কত বড় বড় কবি রহিয়াছেন, তাঁহাদের তুলনায় আমরা তো কিছুই নই। প্যাটি নামক একজন খুব বড় কবি, তিনিও বলেছেন—আমি তো বড় কবি নই, আমাপেক্ষা কত বড় কবি আছেন। তাঁহাদের তুলনায় তো আমি কিছুই নই। যাঁহারা বড় যোদ্ধা তাঁহারাও এইরূপে নিজকে ক্ষুদ্র বলিয়া পরিচয় দেন। যীশুখ্রীষ্টকে মনে করুন, তিনি বলিতেন—আমি যা করি তা তো আমি করি না, আমার ভিতরে ঈশ্বর থাকিয়া আমা দ্বারা তাঁহার কাজ করাইয়া লন। তিনি শক্তি না দিলে তো আমি কিছুই করিতে পারি না। আমার নিজের কোনই শক্তি নাই। যীশুখ্রীষ্টের পর সেণ্ট-পল একজন কত বড় লোক ছিলেন, তাহা বোধ হয় কাহারও অজ্ঞাত নয়। সেই সেণ্টপল নিজকে দাস মনে করিতেন। তাহার পর মার্টিন লুথার বলিয়াছিলেন যে, আমি যে মৃত্যুকে ভয় করি না তাহা নহে। আমি মৃত্যুকে ভয় করি, কিন্তু সেণ্টপলের বিষয় ভাবিলে আমার মৃত্যু ভয় কোথায় চলিয়া যায়, মৃত্যুভয় আর থাকে না। তাহার পর মহম্মদের জীবন দেখিলেও মনে হয় যে তিনি অপরাপর মহাপুরুষদিগের তুলনায় নিজকে ছোট মনে করিতেন। এই সমস্ত মহাত্মারা বলিতেন যে, আমি নিজ হইতে কিছুই পাই নাই। আমি যাহা কিছু করি না কেন, সমস্তই অন্য হইতে পাইয়াছি, নিজের শক্তিতে কিছুই করি না। সমস্ত লোকদের নিকট আমাদের কত শিখিবার আছে। কোনও লোককে আমাদের ক্ষুদ্র মনে করা উচিত নয়, কারণ কাহার মনে কি ভাব আছে তাহা কে বলিতে পারে? যাঁহারা মহাত্মা, তাঁহারা অনন্ত ঈশ্বর বলিতে এই বুঝিতেন যে আমার সমস্তই ঈশ্বরপ্রদত্ত। আমার যাহা কিছু সমস্তই অনন্ত ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতেছে। সেই জন্য সেণ্টপল বলিতেন যে, তোমার যে সমস্ত গুণ সমস্তই ঈশ্বর হইতে পাইয়াছ, তাঁহার কৃপা না হইলে তোমার কিছু করিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং তোমার অহঙ্কার করিবার কি আছে? তুমি নিজকে গর্ব্বিত মনে কর কিসে? তোমার গর্ব্বের কিছুই নাই। বড় বড় মহাপুরুষদের মধ্যে বিনয়ের ভাব খুব অধিক পরিমাণে দেখা যায়, কিন্তু গায়ক ও যোদ্ধাদের মধ্যে এভাব বড় একটা দেখা

যায় না, তবে কেহই যে বিনয়ী নহে তাহা নহে, খুব অল্পই বিনয়ী আছেন। বাইবেলে লেখা আছে ডেভিড খুব ভাল লোক ছিলেন। তাঁহার অনেক গুণ ছিল, কিন্তু আবার এদিকে ভয়ানক ভয়ানক দোষও ছিল, অনেক লোকে তাঁহাকে দেখিয়া মনে করিত যে, লোকে ইহাকে সাধু বলে কিসে? অনেক দোষ থাকিলে কি হয় তাঁহার মধ্যে অনেক সদ্‌গুণ ছিল। ক্যারলাইল বলেছেন যে, আমরা মানুষের দোষ দেখি ইহা বড়ই অন্যায়। আমরা কি সাধু যে, আমরা মানুষের দোষ গুণ বিচার করি? যা'র মধ্যে নিন্দা করিবার দোষ অধিক পরিমাণে আছে, সে তত ঈশ্বরের নিকট অপরাধী। আমাদের কাহার মধ্যে অন্যায় নাই? আমরা সকলেই কি সব সময়ে ন্যায্য মত কাজ করিতে পারি? আমাদের সকলেরই দুর্ব্বলতা আছে, সুতরাং কাহারও নিন্দা করা উচিত নহে।

ডেভিড্ রাজার জীবনের ইতিহাস যেরূপ শিক্ষাপ্রদ এরূপ অতি অল্পই আছে। তিনি বলেছেন মানুষ যখন অন্যায় বুঝিতে পারিয়া অনুতাপ করে, সেটা বাস্তবিকই দেবভাবের লক্ষণ। মানুষ যত কাজ করে তাহার অধিকাংশ দেবভাবে পূর্ণ। ডেভিডের দোষ দুর্ব্বলতা থাকিলেও বিনয় ও সত্যে আস্থা ছিল। তাঁহার অন্তরে সত্যের জ্যোতি ছিল। অগষ্টিন প্রথমে তত সুবিধার ছিলেন না। তাঁহার মা তাঁহাকে কত শিক্ষা দিতেন, কত প্রকারে তাঁহাকে বুঝাইতেন, পরে তিনি কিরূপ ভাল লোক হইয়াছিলেন। সেণ্টফ্রান্স অবর‍্যাসিটস্ খুব বিনয়ী ছিলেন, আর তাঁহার মধ্যে খুব ক্ষমার ভাব ছিল। তিনি বলিতেন, 'তোমাকে যদি কেহ এক গালে চড় মারে তুমি আর এক গাল পাতিয়া দিবে'। তাঁহার এই উপদেশ শুনিয়া একজন লোক তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল, "তুমি যে বললে এক গালে মারিলে আর এক গাল পাতিয়া দিবে, কিন্তু তুমি কি নিজের সম্বন্ধে ইহা করিতে পার? তোমাকে মারিলে কি তুমি ঐরূপ আর এক গাল পাতিয়া দিতে পার?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমি আমার নিজের সম্বন্ধে ইহা করিতে পারি কি না জানি না, কিন্তু যাহাতে এইরূপ করিতে পারি তাহার খুব চেষ্টা করিব।" তিনি এরূপ বিনয়ের ভাবে এই কথাগুলি বলিলেন যে, সে আর কিছু বলিতে পারিল না। হাঁ পারি, কিম্বা হাঁ করিব, একথা তিনি বলিলেন না, তিনি বলিলেন, চেষ্টা করিব। ইহাতেই বোঝা যায় তাঁহার কিরূপ বিনয় ছিল। তাঁহার বিনয়ে কপটতা ছিল না। অনেকে বাহিরে এমন ভাব প্রকাশ করে সে যেন কত বিনয়ী, কিন্তু তাহার অন্তরে বাস্তবিক সেরূপ বিনয়ের ভাব নাই। ওরূপ কপট বিনয় থাকা অপেক্ষা বিনয় না থাকাও বরং ভাল, কিন্তু কপট হওয়া উচিত নহে। বিনয়ে কপটতা থাকিলে বড়ই খারাপ। বিনয়ের মধ্যে সত্য থাকা চাই, বিনয়ে কোনরূপ অসত্য থাকিবে না, সেই বিনয় যথার্থ। এইগুলি বিনয়ের লক্ষণ।

এখন বলিব যে, বিনয়ী কাজে ও ভাবে প্রকাশ করিতে হইবে। যে কাজ করিবে তাহাতে বিনয় থাকা চাই, এরূপ কাজ করিবে তাহাতে যেন বিনয়

থাকে। যিনি খুব ভাল গায়ক তিনি শুধু গান গাহিয়া লোককে মুগ্ধ না করিয়া নিজের বিনয়ের দ্বারা লোককে আকৃষ্ট করিবেন। তাঁহার মধ্যে যদি বিনয় না থাকে, যদি তিনি অহঙ্কারী হয়েন তবে লোকে তাঁহাতে আকৃষ্ট হইবে না। তিনি বিনয়ী হইলে সকলেরই ভালবাসা পাইবেন। যোদ্ধা কিংবা অন্যান্য বড় বড় লোকদেরও ঠিক সেইরূপ। তাঁহারা যে মহৎ মহৎ কাজ করিবেন তাহার মধ্যে বিনয় থাকা চাই। যিনি কাজ করেন তাঁহার মধ্যে যদি বিনয় থাকে, তবে তিনি আরও কাজ করিবেন। কিছুতেই তাঁহার ক্লান্তি হইবে না। তিনি কিছুতে বিরক্ত হইবেন না। একটা কাজ ভাল করিয়া করিতে পারিলে আরোও কাজ করিবার জন্য উৎসাহ হইবে, আর যাঁহার মধ্যে বিনয় নাই তিনি একটা কাজ করিয়া আর কাজ করিতে চাহেন না, সহজেই বিরক্ত হইয়া পড়েন। সমস্ত কাজেই তাহার বিরক্তি। মনে যখন যে ভাব আসিবে তখনই তাহা কার্য্যে পরিণত করিবে। একটা ভাব হয়তো মনে এসেছে সেটা তখনই যদি কার্য্যে পরিণত করা না হয় তবে খানিক পরেই হয়তো সে ভাবটা চলিয়া যায়, আর সেকাজ করা হয় না, সুতরাং যখন যে ভাব মনে আসিবে তখনই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে। যে ভাবটা আসে তাহা জীবনে প্রকাশ না করিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। একজনের মনে একটা কবিতার ভাব এলো, সে যদি তখনি সেটা না লিখিল, তবে পরে আর হয়তো তাহার সে কবিত্বের ভাব থাকিবে না, সুতরাং যাহা আসিয়াছিল তাহা নষ্ট হইয়া গেল! সেই জন্য যে ভাব যখন আসিবে তাহা তখনই কার্য্যে পরিণত করিবে। যদি না কর তবে সমস্তই পণ্ড হইবে। যাঁর যে কাজ তিনি সেই কাজেই বিনয় প্রকাশ করিবেন। ইহাতে কোনরূপ বাহ্যাড়ম্বর নাই। এক এক সময়ে কাহারও কাহারও বেশ বিনয়ের ভাব দেখা যায়, অন্য এক সময়ে তাহার এমন একটা ভাব দেখা যায় যাহাতে মনে হয় যে তাহার মধ্যে বিনয়ের ভাব আদবেই নাই। এমন একটা স্রোতে পড়িয়াছে তাহার সে সমস্ত ভাব হয়তো একেবারেই চলিয়া গিয়াছে। এরূপ ভাব দেখিলে মনে হইবে যে তাহার যাহা কিছু আসিয়াছিল সে সমস্ত মিথ্যা, কিছুই নহে। কাজ করে এটা ভাবিতে হ'বে যে "আমি বেশী কি কোরেছি, আমাকে ইহা অপেক্ষা আরও করিতে হইবে।" এইরূপ ভাব আসিলেই বিনয় প্রকাশ পায়। নেপোলিয়ন দেশ জয় ক'রে বলেছিলেন আমি এই সব দেশ জয় করে কি হয়েছি কিছুই তো হই নাই, যেমন ছিলাম সেইরূপই আছি। আরো দেশ জয় করিতে হইবে, আরো দেশ জয় করিব। বাস্তবিক দেখা যায় এইরূপ বড় বড় কাজ করে যদি খুব উৎসাহ হয়, আরো অধিক করিবার স্পৃহা যদি হয় তাহা হইলে জীবন আরো গভীর ও প্রশস্ত হয়। নেপোলিয়ন যে এত বড় লোক ছিলেন, তবুও তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তিনি সমস্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। জেনারেল বরণ খুব ভাল লোক ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস এত বেশী ছিল যে,

তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার বিশ্বাস অতি চমৎকার ছিল। তিনি বলিতেন নেপোলিয়ন খুব দুরদর্শী ছিলেন এবং যাহা করিতেন অধিকাংশ যশের আশায়। আমি ওসব বুঝি না, আমি যশের আশায় কিছু করি না। কাজ করিয়া যাও, ফলাফল চিন্তা করিয়া কার্য্য করিলে বড় কাজ করিতে পারিবে না। এক জন খুব বড় রাজা ছিলেন, তিনি সমস্ত ইউরোপে রাজত্ব করিতেন, খুব খাটিতেন (প্রজাদের জন্য) তিনি নিজের দেশটা খুব ভাল ভাবে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রজারা খুব সুখে থাকিত। তবুও তিনি মৃত্যু সময়ে বলিয়াছিলেন, আমি আমার প্রজাদের জন্য কিছুই করিতে পারি নাই। আমার করিবার অনেক বাকী। আশ্চর্য্য এত করিয়াও তৃপ্ত হন নাই। কতদূর বিনয় তাঁহার মধ্যে ছিল।

এইরূপ বিনয় আমাদেরও থাকা চাই। সমস্ত কাজের মধ্যে যেন বিনয় থাকে। আমাদের বিনয় যেন কপট না হয়। আমরা যথার্থ বিনয়ী হইব। আমরা এজন্য ঈশ্বরের কাছে বলভিক্ষা করিব। তিনি আমাদিগকে বিনয়ী করিবেন।

মূল্যপ্রাপ্তি।

৮ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ,	ভবানীপুর	১৲

৯ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ,	ভবানীপুর	১৲

১০ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ,	ভবানীপুর	১৲

১১শ বৎসর।

শ্রীমতী রাণী শ্যামাসুন্দরী ও উমাসুন্দরী,	ডুবলহাটী	১৲
„ অমলাসুন্দরী চন্দ,	ময়মনসিংহ	১৲

১২শ বৎসর।

শ্রীমতী হেমলতা দাস,	ঝাঁটরা	২৲
„ পরিমল দেবী,	মুঙ্গের	২৲
„ রাণী শ্যামাসুন্দরী ও উমাসুন্দরী,	ডুবলহাটী	২৲
„ কুসুমকুমারী পাল,	ঢাকা	১৲
„ অমলাসুন্দরী চন্দ,	ময়মনসিংহ	১৲
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ দত্ত,	শিলচর	২৲
„ বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন,	বালেশ্বর	২৲
„ হরলাল শাহা,	কলিকাতা	২৲

১৩শ বৎসর।

শ্রীমতী পরিমল দেবী,	মুঙ্গের	২৲
„ সৌদামিনী চক্রবর্ত্তী,	নওয়াখালী	২৲
„ পুষ্পমালা দেবী,	রেঙ্গুণ	২৲
শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন,	বালেশ্বর	২৲
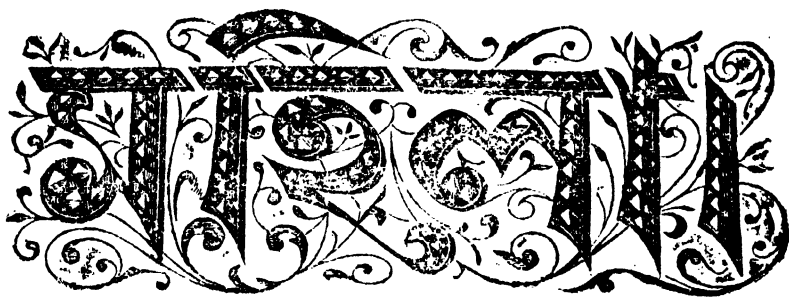
মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৩শ ভাগ] আশ্বিন ১৩১৪ ; অক্টোবর ১৯০৭। [৩য় সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

যে পরিবারে দয়া ধর্ম্ম নাই, কেবল বিলাস আমোদ ও স্বার্থ সুখের জন্য সকলের ব্যস্ততা, ধর্ম্মার্থ ও দীনদুঃখীদের দুঃখমোচনের জন্য একটী পয়সাও ব্যয় হয় না, ধিক্ সেই পরিবার। দয়ার কার্য্যে গৃহিণী সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, ইহা প্রার্থনীয়। তাঁহার অর্থাভাব হইলে প্রাত্যহিক রন্ধনের চাউল হইতে দুইবেলা দুই একমুষ্টি চাউল একটি ভাণ্ডে রাখিয়া দিবেন, বাজার খরচের জন্য টাকা ভাঙ্গাইয়া আনিলে একটী বা দুইটী পয়সা তুলিয়া রাখিবেন, মাসান্তে তাহা ধর্ম্মপ্রচারার্থ বা দীনদরিদ্রদের সেবার জন্য দাতব্যবিভাগে অর্পণ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিবেন।

গৃহের দ্বারে সময়ে সময়ে দুঃখী কাঙ্গাল, জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, অন্ধ, আতুর, উপস্থিত হইয়া সকাতরে নিজেদের দুঃখ দুরবস্থা জানাইয়া থাকে। তাহাদের প্রতি উপেক্ষা করিলে নির্দ্দয়ের কার্য্য হয়। চাউল পয়সা ও পুরাতন বস্ত্রাদিদানে যথাশক্তি তাহাদের দুঃখদূর ও অভাব মোচনে যত্ন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেক কর্ম্মক্ষম সুস্থ সবল লোক ভিক্ষাৰ্থীর বেশে ভিক্ষা করিতে আইসে, তাহাদিগকে দান করিলে তাহাদের আলস্যে প্রশ্রয় দান করা হয়। এই রূপ ভিক্ষার্থীকে দান করা পুণ্য নয়, পাপ ; ভিক্ষাব্যবসায়ে উৎসাহ দেওয়া হয়।

বালক বালিকাদিগের দ্বারা অন্ধ আতুর খঞ্জ প্রভৃতি দয়ার পাত্রদিগকে চাউল, পয়সা ও জীর্ণ বস্ত্রাদি দান করিলে তাহাদের দয়ার বৃত্তি উত্তেজিত হয়, দান ধর্ম্ম তাহাদের অভ্যস্ত কার্য্য হইতে পারে। বালক বালিকাদের কল্যাণের জন্য এরূপ করা কর্ত্তব্য। যে গৃহিণী যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন সেই ধর্ম্মের উন্নতি ও প্রচারের জন্য তাঁহার যথাশক্তি দান করা বিধেয়। পতি এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে ধার্ম্মিকা পত্নী তাঁহাকে প্রবৃত্তি দান না করিয়া থাকিতে পারেন না।

ভারতে ইংরাজরাজত্বে দেশোন্নতি ও নারীজাতির উন্নতি।

২য়।

মোসলমান রাজত্বকালে ভারতের এক একটি বিশেষ বিশেষ প্রদেশকে সুবা বলা হইত। যেমন সুবা বাঙ্গলা ও সুবা বিহার ইত্যাদি। এক এক সুবার জন্য এক এক জন শাসনকর্ত্তা সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। তিনি "সুবাদার" (প্রদেশরক্ষক) বা "নবাব" (রাজ-প্রতিনিধি) আখ্যা লাভ করিতেন। কোন সম্ভ্রান্ত মোসলমানই সুবাদার বা নবাব নিযুক্ত হইতেন। অনেক স্থলে নবাবী পদ প্রাপ্তি যোগ্যতানুসারে নয়, বংশানুক্রমে হইয়াছে। সম্রাট্ আকবরের সময়ে বাঙ্গলার রাজধানী গৌর নগর ছিল, গৌরের নবাব মোনেম খাঁর সময়ে মহামারীতে উক্ত নগর ধ্বংস হইলে নবাব মোরশেদকুলি খাঁ কর্ত্তৃক মোরশেদাবাদে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গস্থ জাহাঙ্গির নগরে (বর্ত্তমান নাম ঢাকা) মোরশেদাবাদের নবাবের অধীনে একজন নবাব কর্ত্তৃত্ব করিতেন। জাহাঙ্গির নগরের শেষ নবাব নসরতজঙ্গ ছিলেন। তাঁহার আধিপত্যকালে অত্যল্পসংখ্যক ইংরাজ সেনা যাইয়া জাহাঙ্গির নগরের দুর্গ অধিকার করে। নসরতজঙ্গ তাহাদিগকে কোনরূপ বাধা দেন নাই। সুবার এক একটি ক্ষুদ্র বিভাগে নবাবের অধীনে এক এক জন ফৌজদারী বিচারক ও ব্যবস্থাপক কাজী নিযুক্ত থাকিতেন। নবদ্বীপ ও সপ্তগ্রাম ইত্যাদি স্থানে কাজী ছিলেন। এই সকল উচ্চপদ মোসলমান জাতির এক চেটিয়া ছিল। নবাব ও কাজীর অধীনে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্য সম্পাদনার্থ, দেওয়ান, মোন্‌শী এবং দারোগা ইত্যাদি বিভিন্ন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহাদের ঊর্দ্ধতন মাসিক বেতন সচরাচর দুই শত বা এক শত টাকা ছিল। অনেকের বেতন ছাড়া উপরি উপার্জ্জন হইত। এ সকল নিম্ন কর্ম্মচারীর পদে হিন্দু মোসলমান উভয় জাতির অন্তর্গত লোক নিযুক্ত হইত। কর্ম্মচারী অধিকসংখ্যক ছিল না, এক প্রকার মুষ্টিমেয় ছিল। সম্রাটের মন্ত্রীর পদে ও সৈন্যসংক্রান্ত প্রধান পদে সচরাচর সম্ভ্রান্ত মোসলমানই নিযুক্ত হইতেন। তবে সম্রাট্ আকবর বড় উদারপ্রকৃতি অপক্ষপাতী ছিলেন। তিনি রাজা মানসিংহ ও বীরবর প্রভৃতি সুযোগ্য হিন্দুদিগকেও সেই সকল উচ্চপদে বরণ করিয়াছেন। সম্রাট্ আকবরকে ঠিক এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী বলা যায় না, তিনি জ্যোতির উপাসক ছিলেন, এক নূতন ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন।

ভারতে ইংরাজরাজত্বে সম্রাটের অধীনে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যশাসনের জন্য বিলাত হইতে এক জন প্রধান শাসনকর্ত্তা ও রাজপ্রতিনিধি নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নিযুক্ত হইয়া আইসেন। সুবিশাল ভারত সাম্রাজ্য নানা বিভাগে বিভক্ত। রাজপ্রতিনিধির অল্লাধিক কর্ত্তৃত্বাধীনে এক এক বিভাগে গভর্ণর, লেপ্টনেণ্ট

গভর্ণর, চীফকমিশনর, কমিশনর, জজ, মাজিষ্ট্রেট, কলেকটর, ডিপুটী ও সব ডিঃ মাজিষ্ট্রেট, সবার্ডিনে জজ মোন্সেফ ইত্যাদি চিহ্নিত ও অচিহ্নিত নানাশ্রেণীর বিচারক নিযুক্ত। রাজ্যের এক একটি ক্ষুদ্র বিভাগকে জেলা বলে, অনেক জেলা তিন চারিভাগে বিভক্ত, তাহাকে সবডিভিশন (উপবিভাগ) বলিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন বহু মোনসেফী চৌকী আছে। এক এক জিলাতে জজ, মাজিষ্ট্রেট, কলেক্টর, ডিপুটী ও সবডিপুটী কলেক্টর সবার্ডিনে জজ ও মোন্সেফ ইত্যাদি বহুসংখ্যক বিচারক নিযুক্ত। তদ্ভিন্ন শান্তিরক্ষার জন্য স্থানে স্থানে পুলিশ ষ্টেশন বিদ্যমান। এক এক সবডিভিশনে এবং এক এক মুন্সেফী চৌকীতে দুই তিন জন বা তদধিক বিচারক নিযুক্ত। যোগ্যতানুসারে জাতিনির্ব্বিশেষে সচরাচর দেশীয় লোকেরাও জজ মাজিষ্ট্রেট কখন কখন কমিশনর ইত্যাদি বিচারকের উচ্চপদে বরিত হইয়া থাকেন। এক এক জন প্রধান শাসনকর্ত্তা গভর্ণর বা লেপ্টেণ্ট গভর্ণরের অধীনে বহু সঙ্খ্যক কমিশনার, এক এক জন কমিশনারের জন্য এক একটি বিভাগ নির্দ্দিষ্ট। প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্গত ৫। ৭টি জেলা। রাজ্যশাসনের জন্য যত দূর সুশৃঙ্খলা, দেশোন্নতির জন্য যতদূর সম্ভব সুব্যবস্থা হইতে পারে তাহার ত্রুটি হইতেছে না। নিয়ম প্রণালীতে দোষ নাই, তবে ব্যক্তিগত মহাত্রুটি সময়ে সময়ে হইয়া থাকে। শত সহস্র দেশীয় কর্ম্মচারী ৫।৭ শত টাকা বা তদধিক মাহিয়ানা প্রাপ্ত হন; বৃদ্ধ বয়সে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিবার জন্য পেন্‌শন পাইয়া থাকেন। কোন্নগরের পরলোকগত শিবচন্দ্র দেব মহাশয় ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। শুনিয়াছি সাত শত টাকা তাঁহার মাহিয়ানা ছিল, তিনি কর্ম্মত্যাগের পর ত্রিশ বৎসর জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, গৃহে ব'সয়া প্রতি মাসে নিয়মিতরূপে ৩৫০৲ টাকা রাজকোষ হইতে পাইয়াছিলেন। এমন সুবিধা কোথায়? সকল বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর পরিণত বয়সে এরূপ পেনশন নির্দ্দিষ্ট।

মোসলমান রাজত্বকালে এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক সঞ্চারিত হয় নাই। তখন রেলগাড়ী জাহাজ ইত্যাদি কিছুই ছিল না, সুতরাং দেশ দেশান্তরে পণ্যজাত প্রেরণের কোন সুবিধা ছিল না। তাহার উপর আবার চোর ডাকাতের ভয় ছিল। তখন এ দেশে ব্যবসায় বাণিজ্যের পথ এক প্রকার অবরুদ্ধ ছিল। এক এক স্থানের লোক সেই সেই স্থানে ধান্য গোধূমাদি শস্য যাহা উৎপন্ন হইত, তাহা দ্বারা সামান্য ভাবে জীবন ধারণ করিত। অনাবৃষ্টি বা জলপ্লাবনে শস্য নষ্ট হইলে অনাহারে বহুলোকের মৃত্যু ঘটিত। দূরদেশ হইতে সহসা শস্যাদি আনয়ন করিয়া লোকের জীবনরক্ষা করার সুযোগ হইয়া উঠিত না। দুর্ভিক্ষ সচরাচর ঘটিত। তবে তখন টেলিগ্রাফ ছিল না, ডাকে চিঠী পাঠাইবার বন্দোবস্ত ছিল না, সংবাদপত্র

ছিল না, অন্যস্থানের লোকে দুর্ভিক্ষাদি বিপদের সংবাদও পাইত না। আমরা বাল্যকালে বৃদ্ধ লোকদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, এক সময়ে আমাদের দেশে (পূর্ব্ববঙ্গে) "আট কেঠে আকাল" হইয়াছিল। এক টাকার আট কাঠা ধান বিক্রয় হইতেছিল, আট সেরে এক কাঠা. অর্থাৎ এক টাকায় ৬৪ সের ধান বিক্রয় হইতেছিল, তাহাতে দেশে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছিল, অন্নাভাবে লোক মরিতেছিল। তখন বহু স্ত্রী পুরুষ এক মুষ্টি অন্নের জন্য আত্মবিক্রয় করিয়াছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ও জ্ঞাতি কুটুম্বগণ অন্নদান করিয়া বিনামূল্যে অনেক দাস দাসী লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণ তাহাদের বংশধর পুরুষেরা "সিক্‌দার" বা "সিংহ" আখ্যায় আখ্যাত হইয়া বিদ্যমান। আট কেঠে আকালে এক সময় লোক মারা গিয়াছিল, এক্ষণ এক কাঠাতেও আকাল নয়।

এক্ষণ সর্ব্বত্র রেল গাড়ী ও জাহাজ ইত্যাদির গতিবিধি হওয়াতে দেশীয় লোকেরও বিস্তৃত বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছে, বাহুল্যরূপে দেশ দেশান্তরে নানা বিধ পণ্য দ্রব্য প্রেরণ এবং দেশান্তর হইতে পণ্যজাত স্বদেশে আনয়নপূর্ব্বক ক্রয় বিক্রয় করিয়া ধনবান্ হইতেছে। ইংরাজ বণিক্‌দিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায়ে এ দেশের অনেক লোক সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই সত্য সপ্রমাণ করিতেছে। তবে ইংরাজবণিক্‌দিগের মত তাহাদের প্রচুর মূল ধন নাই, তাদৃশ উদ্যম উৎসাহ নাই। এদেশের বুনিয়াদি পরিবারের ভদ্রলোকেরা অলস ও অকর্ম্মণ্য, তাঁহারা গৃহে বসিয়া আলস্যে কাল যাপন করেন, তাহাতেই অর্থাভাবে কষ্ট পান। ইহা কাহার দোষ? ইংরাজেরা অর্থ শোষণ করিয়া এ দেশকে নিতান্ত দরিদ্র করিয়াছে। আমরা এ কথায় সায় দিতে পারিতেছি না। ইংরাজেরা যত্ন পরিশ্রম ও বুদ্ধিবলে এ দেশে ধনোপার্জ্জন করিয়া ধনবান্ হইতেছেন সত্য, আবার তাঁহারা কি এতদ্দেশীয় লোকের প্রচুর ধনাগমের উপায় হন নাই? বিচারবিভাগে ও শিক্ষাবিভাগে চিকিৎসা বিভাগে এবং অন্যান্য বিভাগে অসংখ্য এদেশীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত, তাঁহাদের এক এক জনের মাসিক উপার্জ্জন কি সামান্য? ওকালতী বারিষ্টারী করিয়া এক এক জনে ধনকুবের হইয়াছেন, ইহা কি ইংরাজরাজত্বের ফল নয়? এ দেশে সহস্র সহস্র রেলওয়ে ষ্টেশন বিদ্যমান, এক একটি বড় বড় ষ্টেশনে শত শত শ্রমজীবী ও ভদ্রলোকের জীবনোপায়ের সংস্থান হইয়াছে। এরূপ লক্ষ লক্ষ লোক সুখে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইতেছে। চাবাগিচায় লক্ষ লক্ষ উপায়হীন গরীব কুলি কাজ করিয়া সপরিবারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। সূতার কল পাটের কল কাগজের কল ইত্যাদিতে হাজার হাজার শ্রমজীবী দশটাকা উপার্জ্জন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। শুত হওয়া গিয়াছে ঘুসরীর একটি সূতার কলে ছয় হাজার শ্রমজীবী কাজ করে,এক এক জনে প্রতিমাসে ১৫।১৬ টাকা বা তদধিক

উপার্জ্জন করিয়া থাকে। কল কারখানাতে ও চা-বাগিচায় রেলওয়ে ও জাহাজ ইত্যাদিতে ডাক্তারী ও কেরাণীগিরী কাজ করিয়া দেশীয় হাজার হাজার ভদ্রলোক জীবিকানির্ব্বাহ কি করিতেছে না? ইংরাজদিগের দ্বারা এইরূপ উপার্জ্জনের পথ মুক্ত না হইলে আজ কাল ইঁহাদের কি গতি হইত। ইংরাজ সওদাগরদিগের হাউসে মুচ্ছুদ্দিগিরী করিয়া শত সহস্র লোক ১০৲ উপার্জ্জন করিতেছে। জমীদার ও তালুকদারদিগের জমীদারী ও তালুকদারীর আয় পূর্ব্বাপেক্ষা ১০। ১৫ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বঙ্গ দেশের কৃষকগণ বিলাত হইতে প্রতি বৎসর পাটের মূল্যস্বরূপ গড়ে ১২ কোটি টাকা পাইয়া থাকে। পূর্ব্বাপেক্ষা এদেশ কি গরিব হইয়া পড়িয়াছে? না ধনী হইয়াছে? পূর্ব্বে বঙ্গদেশে কয় জন লোক ধনী ছিল? এক্ষণ লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তিশালী এক কলিকাতাতে কি সহস্র সহস্র লোক বিদ্যমান নয়? অনেকের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। তবে পূর্ব্বে যেমন সামান্য আয় ছিল, তদ্রূপ সামান্য ব্যয়ে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। ১০৲ টাকাতে এক একটি ভদ্র পরিবারের মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন হইত না। জিনিষ পত্র অতিশয় সুলভ ছিল। এক্ষণ যেমন সাধারণতঃ গৃহস্থের উপার্জ্জন অধিক, খাদ্য দ্রব্যাদি মহার্ঘ্য। বিলাতী বিলাসিতায় অধিকতর অর্থ শোষণ করিতেছে। ইংরাজ ব্যবসায়ী বণিক্‌দিগের ন্যায় দেশীয় ভদ্রলোকেরা উৎসাহী হইয়া সম্মিলিতভাবে চা-বাগিচা ও চাউলের কল, সূতার কল ইত্যাদি স্থাপন করুন তাহা হইলে তাঁহাদের হাহাকার মিটিয়া যায়। বসিয়া বসিয়া কেবল দ্বেষ হিংসা ও নিন্দা কটূক্তি করিলে মিটিবে না। এ সকল কার্য্য করিতে কে বাধা দেয়? যে সকল নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের পূর্ব্বে অন্ন বস্ত্রের নিতান্ত কষ্ট ছিল, ইংরাজরাজত্বে নানা বিষয়ে এক্ষণ সুবিধা হওয়াতে ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া, ময়দার কল তৈলের কল ইত্যাদি কল স্থাপন করিয়া তাহারা ধনী বড় মানুষ হইতেছে, তাহারা আর কাহারও চাকুরী করিতে চাহে না, অপমান বোধ করে। বাঙ্গলা দেশে এক্ষণ ভদ্রলোকের চাকর চাকরাণী পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে। প্যায়াদা, বরকন্দাজ কনেষ্টবলের সঙ্খ্যা এত অধিক হইয়াছে যে, ভৃত্য শ্রেণীর লোকদিগকে প্রায়ই সেই সকল পদে নিযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা সেই সকল কাজে দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। তাহা হইলে আমাদের দেশ পূর্ব্বাপেক্ষা গরিব হইয়া পড়িয়াছে, কেমন করিয়া বলা যায়? পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সাধারণতঃ কৃষক শ্রেণীর লোকের পরিধেয় কৌপীন, ভোজ্যপাত্র ও পানপাত্র মাটীর সানক ও বদনা, বাসগৃহ ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর ছিল, এক্ষণ দেখ, বহু কৃষক ধুতি চাদর ও জুতা ব্যবহার করে, তাহাদের স্ত্রীলোকেরা ভাল ভাল শাড়ী ও সোণারূপার অলঙ্কার পরে, এবং তাহারা বড় বড় টিনের ঘরে বাস করিয়া থাকে। ইংরাজদিগের দৌরাত্ম্যে পূর্ব্বাপেক্ষা ইহা কি দুঃখ দারিদ্র্যের প্রমাণ?

এক্ষণ ভারতের এক প্রান্তে দৈব দুর্ব্বিপাকে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইলে অবিলম্বে-অল্প ক্ষণের মধ্যে টেলিগ্রাফ ও সংবাদ পত্রাদি যোগে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সংবাদ পঁহুছে। তৎক্ষণাৎ রেলওয়ে ও ষ্টীমারাদি যোগে শস্যাদি পাঠাইয়া এবং অর্থ প্রেরণ করিয়া তাহা প্রশমনের উপায় করা হয়। গভর্ণমেণ্ট কি জানিয়া শুনিয়া এ বিষয়ে উদাসীন থাকেন? রাজকোষের দ্বার অবরুদ্ধ রাখেন? স্বয়ং গভর্ণর জেনরেল ও লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণর পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া লোকের জীবনরক্ষার উপায় বিধান করিয়া থাকেন। গত বৎসর পূর্ব্ববঙ্গে অতিবৃষ্টি ও জলপ্লাবনে শস্য সমূলে বিনষ্ট হইলে বিশেষ বিশেষ স্থানে এক মণ চাউল ১০।১২ টাকা মূল্যেও পাওয়া দুষ্কর হইয়াছিল। গরিব লোকদের অন্নাভাবে মারা যাইবার উপক্রম হয়। তৎক্ষণাৎ গভর্ণমেণ্ট রেঙ্গুণ হইতে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল আনাইয়া অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে—মণকরা পাঁচটাকা সাড়ে পাঁচটাকা মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন, বহু দেশীয় দয়াবান্ লোক মুক্ত-হস্তে অর্থ সাহায্য করেন, তাহাতে দেশের গরিব লোকের জীবন রক্ষা হয়। তবে ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থানে বিশেষ বিশেষ রাজপুরুষের উপেক্ষা ও ভুল ভ্রান্তিবশতঃ অন্নাভাবে লোক মারা গিয়াছে, এবং দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত লোকের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত অর্থলোলুপ নিষ্ঠুর দেশীয় কর্ম্মচারীরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অন্নাভাবগ্রস্ত মুমূর্ষু লোকদিগকে অন্নদানে বঞ্চিত করিয়া মারিয়াছে, এবং নিজেরা বড় মানুষ হইয়াছে, তাহার কি করা যায়? কেবল রাজা ও রাজপুরুষদিগের ছিদ্রান্বেষণ পূর্ব্বক তাঁহাদের কুৎসা নিন্দা রটনা করিয়া লোকের মনে তাঁহাদের প্রতি মন্দভাব জন্মাইয়া দিলে কি ফল হইবে? ভাবিয়া দেখিতে হইবে, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ২০ কোটি লোকের বাস ছিল, এক্ষণ ২০ কোটিস্থলে ৩০ কোটি হইয়াছে। লোকবৃদ্ধির সঙ্গে শস্যোৎপত্তির বৃদ্ধি না হইলে সমস্ত লোকের আহার কোথা হইতে আসিবে? কৃষিকার্য্যের উন্নতি কি সেরূপ হইয়াছে? ইংরাজ বণিকেরা এদেশ হইতে চাউল খরিদ করিয়া বিলাতে লইয়া গিয়া শূকরকে খাওয়ায়। তজ্জন্য চাউল দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, একথা বলিয়া আক্ষেপ না করিয়া যাহাতে ইংরাজ বণিকগণ আড়তদার হইতেও কৃষকগণ হইতে চাউল খরিদ করিতে না পারে, দেশীয় লোকেরা খরিদ করিতে পায়, তাহার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। দেশীয় আড়তদারেরা দেশীয় লোকের নিকটে শস্য বিক্রয় না করিয়া সাহেবদিগের নিকটে বিক্রয় করিবে কেন? চাষারা চাষবাসের উন্নতিকল্পে উপেক্ষা করিয়া অলস হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে এত লোকের আহার কোথা হইতে আসিবে?

মোসলমান রাজত্বকালে প্রজার কোনরূপ স্বাধীনতা ছিল না। রাজা ও রাজপুরুষদিগের কার্য্যের বিরুদ্ধে কেহ সভা সমিতি করিয়া আন্দোলন ও নিন্দা কটুক্তি করিতে পারিত না। তাহা

করিলে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইত। তখন লোকে বক্তৃতা করিত না, বক্তৃতা করিতে জানিত না। মোসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কাহারও কোন কথা কহিবার সাধ্য ছিল না। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী স্বাধীন ভাবে নিজের মত প্রচার করিতে যাইয়া অনেক সময় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে, অনেক প্রচারক রাজাজ্ঞায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বা কারারুদ্ধ হইয়াছেন। সেই সময়ে মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র ছিল না। বক্তৃতা করা ও সংবাদপত্র সম্পাদন ইত্যাদি সভ্য ইংরাজদিগের নিকট হইতে এ দেশের ধার করা, ইংরাজের নিকটে তজ্জন্য এদেশ ঋণী। সেকালে যাঁহারা মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না, সেই ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম-মন্দির ও স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ প্রাচীন কীর্ত্তি-কলাপ বিজয়ী মোসলমান রাজা কর্ত্তৃক ধ্বংস হইত। এক্ষণ হিন্দু মোসলমান বৌদ্ধ ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের বিলুপ্তপ্রায় কীর্ত্তি ও জীর্ণ পুরাতন প্রসিদ্ধ মন্দির সকল রাজকোষের অর্থসাহায্যে সযত্নে নবীভূত করিয়া রক্ষা করা হইতেছে। এই সকল স্মৃতিচিহ্ন ও কীর্ত্তিকলাপ রক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ডকুর্জ্জন মুক্তহস্তে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন; এদেশের জনহিতৈষী মহাজনদিগের সম্মান ও গৌরব রক্ষার উদ্দেশ্যে তৎকর্ত্তৃক স্থানে স্থানে নূতন স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইয়াছে।

আজকাল দুগ্ধপোষ্য বালকও রাজ-নৈতিক বক্তৃতা করিতে শিখিয়াছে, রাজপ্রতিনিধি ও রাজপুরুষদিগকে গালি দিয়া থাকে, মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত লোকদিগের কার্য্যের সমালোচনা করিয়া তাঁহাদের কাহাকে স্বর্গে তোলে বা কাহাকে নরকে পাঠাইয়া দেয়। অস্বাভাবিক আর কি হইতে পারে? পরনিন্দা ও পরদোষ-ঘোষণার জন্য যেন অধিকাংশ সংবাদপত্রের জন্ম। খ্রীষ্টধর্ম্ম বা হিন্দুধর্ম্ম কিংবা মোসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সকলের প্রকাশ্যে সমালোচনা করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, ইংরাজরাজের অনুগ্রহে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া অনেকে স্বভাব দোষে স্বেচ্ছাচারী হইয়া সীমালংঘন করিয়া চলিয়াছেন, অচিরে সেই স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। একান্ত আতি-শয্যের জন্য বলিবার ও লিখিবার স্বাধীনতা হয়তো বিলুপ্ত হইবে।

মোসলমান রাজত্বকালে রাজকীয় অর্থসাহায্যে প্রজাসাধারণের বিদ্যাশি-ক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কোথাও যে কোন বিদ্যালয় ছিল, আমরা জানি না। বিশেষ ২ প্রধান নগরে দুই একটী মাদ্রাসা (প্রধান পাঠশালা) বৃহৎ বৃহৎ গণ্ডগ্রামে মক্তব (সামান্য পাঠশালা) ছিল, তাহাতে মৌলবী ও মোন্‌শীগণ আরব্য ও পারস্য ভাষা শিক্ষা দান করিতেন। মুষ্টিমেয় হিন্দুছাত্র বিচারালয়াদিতে লেখা পড়ার কাজ চালাইয়া বিষয়কর্ম্ম করিতে পারেন এই প্রকার সামান্যরূপে পারস্যভাষায় চর্চ্চা করিতেন। তাঁহারা সচরাচর কয়েক খানা পারস্য কাব্য গ্রন্থ পড়িয়াই মক্তব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন।

শিক্ষাপ্রণালীর দোষে সামান্য রূপে শিক্ষা-লাভ করিতেই বহু বৎসর ব্যয় হইত। অনেক মোসলমান ছাত্র মাদ্রাসাতে আরব্য ভাষায় ধর্ম্মপুস্তকাদি পড়িতেন।

এক্ষণ ইংরাজরাজের পূর্ণ সাহায্যে বা আংশিক সাহায্যে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে শত সহস্র কলেজ, স্কুল ও পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত, লক্ষ লক্ষ ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। দর্শন বিজ্ঞান ভূগোল ইতিহাস সাহিত্য কলাবিদ্যা এবং চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষা করিতেছে, সুপণ্ডিত হইয়া নানারূপে পুরস্কৃত, উচ্চ উপাধি ও রাজকীয় উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতেছে। ভারতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বিলাতে যাইয়া উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিবার পথও প্রযুক্ত আছে। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া খ্যাতি লাভ করিতেছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রভাবে এ দেশের গভীর কুসংস্কার অন্ধকার বিলুপ্ত হইয়াছে। এ সকল প্রাপ্ত উপকারের জন্য প্রায় কাহারও মুখে কৃতজ্ঞতার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, অসন্তোষের কথাই সচরাচর শুনা যায়। অবশ্য ইংলণ্ডের ন্যায় প্রাচীন স্বাধীন রাজ্যের প্রজাবর্গের সম্বন্ধে রাজকীয় শিক্ষাব্যয়ের তুলনায় ভারতের ন্যায় নবাধিকৃত পরাজিত রাজ্যের শিক্ষা-ব্যয় সামান্য। স্বাধীন রাজ্যের সঙ্গে পরাধীন রাজ্যের সংসা সমকক্ষ হওয়া সহজ নহে। বিলাতের ধনী বড় মানুষেরা স্বদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। বিখ্যাত অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য তথাকার ধনী লোকদিগের অর্থসাহায্যে নির্ব্বাহ হইতেছে। সে দেশের সামান্য শ্রেণীর বালকেরাও অন্ততঃ সামান্যরূপে লেখ পড়া শিক্ষা করিতে বাধ্য, এ দেশে এ পর্য্যন্ত সেরূপ নিয়ম হয় নাই। এ দেশের সামান্য ব্যবসায়ী ও কৃষক শ্রেণীর লোকেরা আপন আপন বালকদিগকে পাঠশালাতে পাঠাইয়া শিক্ষা দান করিতে চাহে না। এক্ষণ বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধির এইরূপ সঙ্কল্প যে, প্রথম তিন বৎসর ছাত্রদিগকে সম্পূর্ণ রাজকীয় ব্যয়ে সাধারণ শিক্ষা প্রদান করিবেন।

এক্ষণ নারীজাতির উন্নতি ও শিক্ষা বিষয়ে কথা :—

পূর্ব্বে এদেশের নারীকুলের অতিশয় হীনাবস্থা ছিল, তাঁহাদের কোন প্রকার স্বাধীনতা ছিল না। তাঁহাদের জ্ঞানোন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ ছিল। বাদশা ও নবাবদিগের অন্তঃপুরে শত সহস্র মহিলা তাঁহাদের পত্নীরূপে বাস করিতেন। এদেশের হিন্দু রাজারাও বহু দার পরিগ্রহ করিতেন। এক্ষণও যে অনেকে বহু নারীর পাণিগ্রহণ করেন না, ইহা বলা যায় না। খ্রীষ্টীয় নীতি একাধিক দার পরিগ্রহের ব্যবস্থা দান করে না। এদেশে খ্রীষ্ট নীতির প্রভাবে ও খ্রীষ্টবাদী রাজার আধিপত্যে এবং সুশিক্ষা বিস্তারে এই সকল কুনীতির হ্রাস হইয়াছে।

সম্রাট্ আকবরের অন্তঃপুরে মহিলাগণ কি ভাবে স্থিতি করিতেন, আমরা আবুল ফজল কৃত প্রসিদ্ধ আইন আকবরী গ্রন্থ হইতে তাহার আভাস প্রদান করিতেছি।

সম্রাটের অন্তঃপুরের অভ্যন্তরভাগে চতুর্দ্দিকে বিশুদ্ধ চরিত্র স্ত্রীলোক পাহারার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, দ্বারের বাহিরে খোজা সকল প্রহরীর কার্য্য করিত, কিয়দ্দূর অন্তর রাজপুত সেনাগণ দণ্ডায়মান থাকিত। তাহার পর সচ্চরিত্র সাধারণ প্রহরী সকল স্থিতি করিত। বহির্ভাগের চতুর্দ্দিকে অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনাগণ দলে দলে শ্রেণীবদ্ধরূপে থাকিত।

কি জানি বা কোন অন্তঃপুরিকা কোন পুরুষকে অন্তঃপুর হইতে দেখিতে পান, বহির্দেশ হইতে বা কোন পুরুষ অন্তঃপুরিকাদিগের প্রতি লক্ষ্য করে, এই আশঙ্কায় বাদশা ও নবাব এবং আমির লোকদিগের অন্তঃপুরে দ্বিতল প্রাসাদ নির্ম্মিত হইত না। বহির্ভাগের প্রাচীর অত্যন্ত উচ্চ করা হইত, যেন প্রাচীরের বাহির হইতে কেহ অন্তঃপুর দেখিতে না পায়।

আমরা নেজাম হায়দরাবাদে যাইয়া শুনিলাম তথাকার নবাব বাহাদুরের ৪।৫ শত বেগম, চারি পাঁচটী প্রধানা বেগম (রাজ্ঞী)। সাধারণ বেগম দিগের উপর এক জন খোজা কর্তৃত্ব করে। তাঁহাদের কেহ অন্যায়াচরণ করিলে সে শাসন করিয়া থাকে, বেত্রাঘাত পর্য্যন্ত করে। এদেশের বহু হিন্দু রাজার অন্তঃপুরের ব্যবস্থা এইরূপ। তাঁহাদের বহু রাণী বা বহু পত্নী। এইরূপ অন্তঃপুর সকলে প্রায় সূর্য্যালোক প্রকাশ পায় না, বাস্তবিক ঈদৃশী অন্তঃপুরিকারা অসূর্য্যম্পশ্যা। সূর্য্যালোকের ন্যায় কোনরূপ জ্ঞানালোক এইরূপ অন্তঃপুরিকাদিগের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। ইংরাজাধিকৃত হওয়ার পর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকসঞ্চারে বঙ্গদেশে মহিলাদের যুগান্তর অবস্থা ঘটিয়াছে। তাঁহারা আর কুসংস্কারান্ধকারে আবদ্ধ নহে, বহু মহিলা নানা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছেন। পুরুষদিগের ন্যায় তাঁহাদের জন্য শিক্ষার দ্বার মুক্ত, তাঁহাদের উন্নতির জন্য ইংরাজরাজ মুক্ত হস্ত আছেন, নারীজাতির স্কুল কলেজের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন, বর্ত্তমান বৎসরেও দেড় লক্ষ টাকা অধিক স্ত্রীশিক্ষাতে ব্যয় করিবার জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অনেক মহিলা এদেশে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিবার জন্য—নারীসমাজে বিদ্যালোক বিকীর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে রাজকীয় অর্থসাহায্যে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে বিলাতে যাইতেছেন। তাঁহারা আর পূর্ব্ববৎ অন্তঃপুরকারাগারে আবদ্ধ নহেন, অবরোধমুক্ত পুরাঙ্গনাগণ স্বাধীন ভাবে রেলওয়ে ও ষ্টীমারে নির্ভীক হৃদয়ে যথাতথা বিচরণ করিয়া থাকেন। রাজশাসনের ভয়ে কোন দুষ্টলোক আর তাঁহাদিগকে সহসা অসম্মান ও অপমান করিতে সাহস পায় না। গত বৎসর মাঘ মাসে বেথুনকলেজ গৃহে মহিলাদের মহাসমিতি কি প্রমাণ করিতেছে? ভারতের নানা বিভাগের ৭।৮ শত শিক্ষিতা মহিলা, ১৪।১৫ জন মহামান্যা রাণী সম্মিলিত হইয়াছিলেন; বরদা রাজ্যের মহারাণী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরাজী বাঙ্গলা ও

হিন্দীইত্যাদি ভাষায় নারীজাতির উন্নতি-সাধনবিষয়ে মহিলাদিগের রচিত অনেক গুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা হইয়াছিল। এরূপ এদেশে কোন্ যুগে হইয়াছিল? এদেশের নারীজাতির স্বাধীনতা ও জ্ঞানোন্নতির দ্বার কে মুক্ত করিল? ইংরাজশাসনের প্রভাবে কি ইহা হয় নাই? এজন্য কি হৃদয়ে প্রচুর কৃতজ্ঞতা উদার ব্রীটিশ রাজাকে অর্পণ করা হইবে না?

পূর্ব্বে ঘোরতর কুসংস্কারবশতঃ এদেশে প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র হিন্দু রমণী স্বামীর চিতানলে দগ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন; জননী নিজগর্ভজাত শিশুসন্তানদিগকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন করিয়া বধ করিয়াছে; কুসংস্কারজনিত এই সকল লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড. জ্ঞানোন্নত ইংরাজরাজের শাসনে কি নিবারিত হয় নাই? এজন্য কি এদেশ কৃতজ্ঞ হইবে না?

আমরা ভারতে মোসলমান রাজত্ব কালে শাসনের অব্যবস্থাদিবিষয়ে যাহা লিখিলাম তাহা তদানীন্তন মোসলমান পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বিরচিত ইতিহাসাদি পুস্তক পাঠ করিয়াই লিখিত হইয়াছে, আমাদের মনঃকল্পিত নয়। ভরসা করি তাহা মোসলমান বন্ধুগণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না। সেই এক যুগ ছিল, এক্ষণ জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতার ও স্বাধীনতার যুগ। আজকাল এদেশে মোসলমান রাজত্ব থাকিলে, এদেশ পূর্ব্বাবস্থায় থাকিত বলিতে পারা যায় না। মোসলমান রাজাদের শাসনাধীন তুরস্ক পারস্ত ও কাবুল রাজ্যের এক্ষণ অনেক বিষয়ে উন্নতি হইয়া থাকিবে। তবে সকল স্থানে সুশাসন চলিতেছে এরূপ বলা যায় না। আমাদের একজন প্রচারক বন্ধু কিছুকাল হইল নববিধান প্রচার করিবার জন্য তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর বসোরাতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে তিনি আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন,"এস্থানে লোকের সম্পত্তি ও জীবন নিরাপদ নহে, আমি বাড়ী ভাড়া করিয়া স্বতন্ত্র থাকিতে সাহসী হই নাই। এখানে একজন বড় লোকের আশ্রয়ে নিরাপদে আছি।"তিনি সেই স্থানে এবং পারস্ত রাজ্যের অন্তর্গত বসায়ের নগরে প্রকাশ্যে বক্তৃতাদি করিতে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন নাই। উক্ত বন্ধু বসোরা হইতে বগদাদে চলিয়া গিয়াছিলেন। তত্রত্য লোকেরা তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করে নাই। অল্প দিনের মধ্যে তিনি সেই স্থানে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। বসোরা নগরে যে বড়লোকটি তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়া নিরাপদ করিয়াছিলেন, পরে শ্রুত হওয়া গিয়াছে, তথাকার লোকেরা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। সভ্য ইয়ুরোপ মহাদেশের অন্তর্গত রুসিয়াতে স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন প্রণালী, কে তাহার প্রশংসা করে? তজ্জন্য তথায় পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিতেছে। মহানগরী কলিকাতার পার্শ্বস্থিত সভ্য ফরাসীরাজ্যের অন্তর্গত চন্দননগরে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য বক্তৃতা করিবার কাহারও অধিকার নাই। সুবিজ্ঞ প্রবীণ লোকেরা বলেন, বিদেশে রাজ্যশাসনে ইংরাজ জাতি যেরূপ সুদক্ষ

এ প্রকার কোন সভ্য জাতি নহে। সুবিশাল ভারত সম্রাজ্যে হিন্দু মোসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ জৈন ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের নানা প্রকার প্রকৃতি ও রীতিনীতি বিশিষ্ট ত্রিশ কোটী লোকের বাস। প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ। সকলের স্বার্থরক্ষা ও মনোরঞ্জন করিয়া একজন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিদেশী রাজপ্রতিনিধির রাজ্য শাসন করা কত দূর কঠিন ব্যাপার, কত সংঘর্ষণে তাঁহাকে আসিতে হয়! তিনি আবার স্বাধীন নহেন। তাঁহার উপর অনেক কর্ত্তা আছেন। সকল কার্য্য নিজের ইচ্ছা মত করিতে পারেন না। ইহা অনেকে ভাবিয়া দেখেন না।

পিতৃস্থানীয় পরমোপকারী রাজা ও রাজপ্রতিনিধিদের প্রতি দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশের বহু প্রজার অতিশয় অপ্রেম, অভক্তি ও অকৃতজ্ঞতা এবং গুণগ্রহণে অন্ধতা ও দোষকীর্ত্তনে মত্ততা দর্শন করিয়, অপিচ অন্তঃপুরস্থ বহু মহিলা এবং ক্ষুদ্র বালক বালিকাদেয় মনের বিকৃতাবস্থা দেখিয়া আমরা এই ঘোরতর বিপ্লবের সময় ইংরাজ রাজা ও ইংরাজ জাতি দ্বারা এদেশের লোক যে কত দূর উন্নত ও উপকৃত, মনের আবেগে তাহা প্রদর্শন করিতে যত্নবান্ হইয়াছি। ইহা বলা বাহুল্য যে, ইংরাজ সম্রাট্ হউন বা তাঁহার প্রতিনিধি হউন কেহই আইনকে অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছানুসারে স্বাধীন ভাবে কিছু করিতে পারেন না। সম্রাট্ পার্লেমেণ্ট মহাসভার অধীন, তিনি অন্যায় কিছু করিলে পার্লেমেণ্ট তাঁহাকে শাসন করেন। রাজপ্রতিনিধি নিজের কাউন্সেলের মেম্বর দিগের ও ষ্টেটস্‌সেক্রেটারীর এবং পার্লেমেণ্টের অমতে রাজ্যশাসনসম্বন্ধীয় কোন গুরুতর কার্য্য করিতে অক্ষম। আমরা জানি ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি নিজের অধীনস্থ প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের পর্য্যন্ত অভিমত গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ শাসনের জন্য লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

আমরা ভারতের মোসলমান রাজাদের রাজ্যশাসন প্রণালীর বা মোসলমান জাতির নিন্দা করিবার জন্য এবং ইংরাজদিগের তোষামোদ করার নিমিত্ত এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, কেহ যেন এরূপ মনে না করেন। মনে করিলে অত্যন্ত ভুল করিবেন। মোসলমান রাজত্বের শাসন প্রণালী বিষয়ে যাহা লেখা হইয়াছে সাধারণ ভাবে লেখা হইয়াছে। ভারতের মোসলমান রাজাদিগের মধ্যে অনেক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন,সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সকলের রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা যে উৎকৃষ্ট ছিল না এরূপ নহে। তবে বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজরাজের রাজ্যশাসনের নিয়মপ্রণালী তদপেক্ষা যে উৎকৃষ্ট, ইংরাজশাসনে যে ভারত সাম্রাজ্যের নানা বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে, প্রজা সাধারণ যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুখস্বচ্ছন্দে আছে তাহা প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য। ইহার মধ্যে আমাদের কোন কুটীল অভিসন্ধি আছে কেহ যেন মনে এরূপ স্থানদান না করেন। রাজভক্তি আমাদের ধর্ম্মের মূল মত। রাজা বলিয়া আমরা সমুদায় মোসলমান রাজাকে ভক্তি করি, একেশ্বর-

বাদী মোসলমান জাতির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ; তাঁহাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রীতি ও আদরের অভাব নাই। মোসলমান রাজাদের রাজ্যশাসনসম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা মোসলমান পণ্ডিত কর্ত্তৃক বিরচিত ইতিবৃত্ত সুপ্রসিদ্ধ আকবর নামা ও তওয়ারিখ জাহাঙ্গীর গ্রন্থ অবলম্বনে ও নিজের অভিজ্ঞতানুসারে লিখিত হইয়াছে। আমাদের ভুল ভ্রান্তি হয় নাই, ইহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। কিন্তু মনে কোনরূপ মন্দভাব পোষণ করিয়া কল্পনাবলে লেখা হয় নাই, ইহা নিশ্চিত।

ভারতে দুর্ভিক্ষ হয়, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্টকে দোষী করা হইয়া থাকে, কিন্তু উহা নিবারণের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে কতদূর যত্ন চেষ্টা করিতেছেন তাহার উল্লেখ কি কেহ করেন? সে সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, এস্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে। বাঙ্গলা বিহার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, পঞ্জাব ও সিন্ধু এবং মান্দ্রাজ প্রদেশে অনাবৃষ্টির সময় জলসিঞ্চন করিয়া ক্ষেত্র সকলকে শস্যশালী করিবার উদ্দেশ্যে সুদূর প্রসারিত শত শত জলপ্রণালী ও শাখা প্রণালী গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খাত হইয়াছে। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু চেনাব শোণ মহানদী কৃষ্ণা গোদাবরী প্রভৃতি বড় নদীর জল, প্রণালী ও উপপ্রণালী যোগে Irrigationএর জন্য দেশ দেশান্তরে চালিত হইয়াছে। শত শত ইঞ্জিনিয়ার ও সব ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি এ-কার্য্যে নিযুক্ত। এই উপায়ে পঞ্জাব ও সিন্ধু-দেশের অনুর্ব্বর ভূমি—মরুভূমি সকল উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী হইয়াছে। পঞ্জাব হইতে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত চেনাব ও সিন্ধু নদের জল-প্রণালী যোগে সিক্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভীষণ অনুর্ব্বরক্ষেত্র সকল নয়নতৃপ্তিকর হরিৎকান্তি শস্য ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে কেনালের ভিতর দিয়া বাষ্পীয়পোত ও বাণিজ্যপোত সকল চালিত হইতেছে। কেমন আশ্চর্য্য ব্যাপার! পূর্ব্বে কখনও কি লোকে এদেশের এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইবে কল্পনা করিয়াছিল? ক্রমশঃ।

আমাদের অন্দরমহল।

"It is universally admitted that there is no better criterion of the refinement of a nation *than the condition of the fair* sex therein."—COLONEL TOD.

রাজস্থানের ইতিবৃত্তলেখক টড্ সাহেব বলিয়াছেন যে, কোন জাতির উন্নতি অবনতি নির্দ্দেশ করিতে গেলে তাহাদের রমণীগণের অবস্থা বিচার করিতে হয়। হার্বার্ট স্পেন্সরও প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন দেশের সভ্যতার পরীক্ষা করিতে যাইবার অগ্রে তথাকার অবলাগণ কিরূপ উন্নত তাহা দেখিতে হয়। বাস্তবিক এ কথা অনেক বার অনেক মহাপুরুষের মুখে শুনা গিয়াছে যে, স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে পুরুষগণের উত্থানপতন অবশ্যম্ভাবী। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশের লোক যেন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। বালক যুবকসমূহের শিক্ষা দানের জন্য ব্যস্ত হইলেও বালিকা বা যুবতীর

কি সে শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় সে দিকে আমরা আদৌ লক্ষ্য রাখি না। শুধু পুরুষগণ শিক্ষিত হইলে যে কোন জাতির উন্নতি হয় না, রমণী-দিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিলে সমস্ত পণ্ড হয়, ইহা কি আজও আমরা বুঝি না? প্রকৃতপক্ষে একথা আমরা অধুনা বুঝিয়াছি, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্যম উৎসাহ আমাদের নাই। কোন্ বিষয়ে আমাদের যথার্থ উদ্যম উৎসাহ আছে তাহাওত দেখি না। উন্নতি উন্নতি বলিয়া আমরা অনেক সময়ে চীৎকার করিলেও বাস্তবিক কি আমরা উন্নতি লাভ করিয়াছি? আমাদেরত মনে হয় যাহাকে প্রকৃত উন্নতি বলে তাহা হইতে আমরা এখনও অনেক দূরে। আমরা মনে করিতে পারি যে, ইংরাজা-ধীনে আমরা কত কি নূতন তত্ত্ব শিখি-য়াছি, বড় বড় বারিষ্টর, উকীল, জজ, ম্যাজিষ্টর হইয়াছি, কত রকম পোষাক পরিতেছি, কিরূপ ইংরাজী বুলি বলি-তেছি, কোচ্মান সহিস প্রভৃতি ভৃত্য-বর্গকে পাগড়ী তকমা পরিচ্ছদাদি দ্বারা শোভিত করিয়া ল্যাণ্ডভিক্টোরিয়া ফিটন আরোহণে গড়ের মাঠে হাওয়া খাইতেছি; রাজা, মহারাজা, নাইট, ছার, নচ্ছার প্রভৃতি কত রকম উপাধিভূষিত হইয়া লাট বেলাট দরবারে লপাট হইয়া পড়ি-তেছি, গৃহিণীকে এয়ারিং, নেক্‌লেস, লকেট প্রভৃতি কত অভিনব উপাধির গহনা দিতেছি; সেকালের কদর্য্য শাঁখা খাড়ু গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়াছি; কোম্পানির কাগজে লোহার সিন্ধুক বোঝাই করিয়াছি, ইহাতেও যদি সংসার আমাদিগকে সুসভ্য উন্নত না বলে তাহা হইলে নাচার। হায়! হায়! সভ্যতার উন্নতির কি এই সকল লক্ষণ? এইখানেই বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃত উদ্যম উৎসাহ এখনও আমাদের জন্মে নাই, আমরা যে অলস অপদার্থ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ছিলাম আজও তাহাই আছি, কেবল ঘুনধরা-কাঠের উপর বিলাতী বার্ণিস দ্বারা একটু চক্‌চকে হইয়াছি মাত্র, একটু ঘসিয়া রংটা উঠাও, দেখিবে যে অন্তঃসার-শূন্য ভারতবাসী অষ্টাদশ শতাব্দীতে যা ছিল, এখনও তাহাই আছে, কেবল গিল্টীর জোরে কিঞ্চিৎ চটক্ মাত্র প্রকাশ পাই-তেছে।

শাস্ত্রে বলে "বলং বলং ব্রহ্মবলং" অর্থাৎ যত কিছু শক্তির ব্যবহার আমরা জগতে দেখিতে পাই তন্মধ্যে ব্রহ্মবল অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীলতা, সত্যের প্রতি অচলা ভক্তি, প্রেম পুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা দ্বারা মানুষ যেবল লাভ করে তাহার নিকট অন্যান্য বল নগণ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অতএব যে জাতির মধ্যে যত খানি ব্রহ্মবল পরিলক্ষিত সেই জাতিকেই প্রকৃত উন্নত বলা যাইতে পারে, সেই জাতির তেজ-প্রভাবের নিকট অন্য সকলকে মস্তক অবনত করিতেই হইবে। আমাদের নরনারী যতটুকু ব্রহ্মবলে বলী আমরা ততটুকু উচ্চে উঠিয়াছি, নতুবা আমাদের সহস্র চাক্‌চিক্যসত্ত্বেও আমরা অসভ্য বর্ব্বরমধ্যে পরিগণিত। এই

কেবল লাভই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য, শিক্ষা দানে অর্থকরী বিদ্যা উপার্জ্জন নহে। দুঃখের বিষয় আমাদের পুরুষবাবু ও রমণীবাবুদের মধ্যে ধর্ম্মের প্রতি আস্থা, ন্যায়ের প্রতি সম্মান, সত্য প্রেম পুণ্যের প্রতি সমাদর কোথায়? কেবল ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য আমাদের নরনারী না করিতেছেন এমন কাজ নাই, অর্থ ও ভোগবিলাস ব্যতীত আর তৃতীয় কি বিষয় আছে যাহার দিকে তিলেকের জন্যও তাঁহারা মনঃসংযোগ করিয়া থাকেন। কত প্রকার মিথ্যা ব্যবহার দ্বারা আমরা ঘরে বাহিরে প্রতিনিয়ত কলুষিত হইয়া নরকের পথে ধাবমান হইতেছি, আমরা কি মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিয়া থাকি? কোন প্রকারে পরের টাকা ঘরে আনিলেই হইল, সদুপায়ের দিকে আমাদের আদৌ লক্ষ্য নাই, একমাত্র লক্ষ্য কেবল কোম্পানির আইন বাঁচাইয়া চলিতে পারা, ধর্ম্ম নষ্ট হয় হউক তাহাতে কিছুই আসে যায় না; কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারত কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহজগতেত আদৌ নাই, পরলোকে কি আছে কে দেখিয়া আসিয়াছে? আর পরলোক আছে কি না কে জানে বা কে বলিতে পারে? মৃত্যুর পর কি হইবে সে খোঁজে আবশ্যকই বা কি? এই রূপ ইহসর্ব্বস্ববাদী আমরা সবাই, বাহিরের পুরুষগণ, ভিতরের রমণীগণ কেহই এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহেন। আমাদেরত বিশ্বাস হয় না যে, কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত কোন স্থানের আধুনিক সভ্যতালোকে আলোকিত নর-নারী বাস্তবিক পরলোকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। অবশ্য ব্রাহ্মসমাজের মুষ্টিমেয় লোক দিনকতকের জন্য পরলোক পর-লোক বলিয়া ছুটাছুটী করিয়াছিলেন, সে দিন চলিয়া গিয়াছে। যখন ইঁহাদের পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ প্রকৃত বিশ্বাসীর ন্যায় জীবন প্রদর্শন করতঃ জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন ততদিন ছিল। আজকাল সাধারণ ভারতবাসী যেরূপ ইঁহারাও প্রায় তাই, যদি কোথাও সামান্যমাত্র উনিশ বিশ লক্ষিত হইয়া থাকে। বরং কোন কোন বিষয়ে ব্রাহ্ম বাবু ভায়ারা ও তাঁহাদের অবলাগণ এককাটি চড়াইয়া চলেন। জন কতক পুরাতন বৃদ্ধ ব্রাহ্ম চক্ষু বুজিলে তাঁহাদের শিষ্যেরা যে কোথায় গিয়া পঁহুছিবেন, তাহা ভগবানই জানেন। ইঁহা-দের অবর্ত্তমানে যে সাধন ভজনের নাম গন্ধ ব্রাহ্মসমাজে থাকিবে এরূপ আশা ত করা যায় না।

এখন জিজ্ঞাসা করি মিথ্যা ব্যবহার হইতে দূরে থাকিয়া সর্ব্বদা সত্যপথে চলি-বার জন্য উপদেশ আমাদের মধ্যে কয় জন পিতামাতা সন্তানগণকে দিয়া থাকেন? দুঃখীকে দয়া করিতে সর্ব্বজীবে প্রেম করিতে, ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা দ্বারা অবনত না হইতে কে পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগ্নীকে শিক্ষা দিতে যত্নবান্? কেবলই চারি দিকে শুনু এক কথা;—লেখাপড়া শিখিয়া খুব টাকা রোজগার কর, ভাল খাও, ভাল পর, স্ত্রীপুত্র লইয়া সুখে ঘর করো। বস্! তাহা হইলেই মানবজীবনের সার্থকতা সম্পা

মেণ্ডালয়ের একটি দারুময় গৃহ।
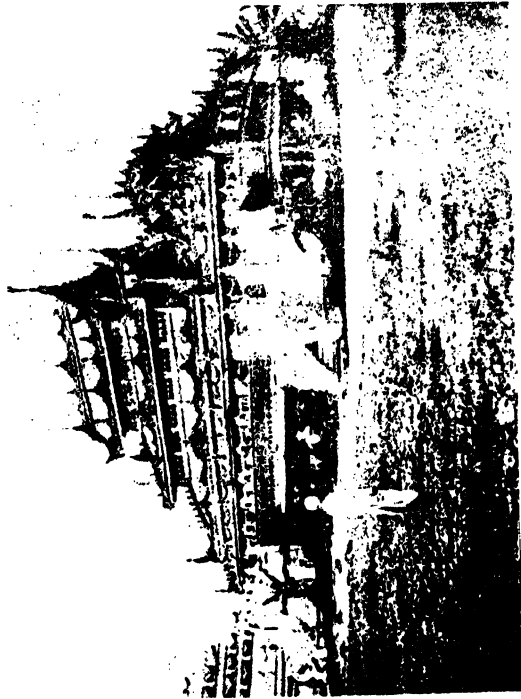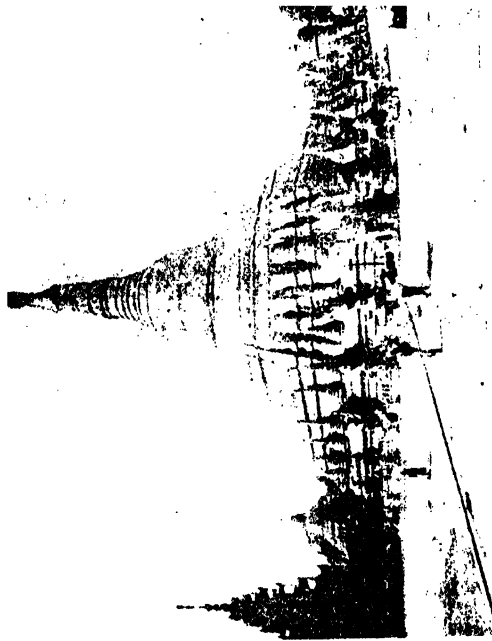
রেঙ্গুনের স্বর্ণমণ্ডিত পেগোডা।

দিত হইল যেন আমাদের মনুষ্যত্ব কেবল নিকৃষ্ট জীবগণের ন্যায় আহার বিহার ভোগবিলাসেই পর্য্যবসিত কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন "Life is something much more than eating, drinking, begetting children and accumulating money" অর্থাৎ পানাহার, সন্তানোৎপাদন ও অর্থ সংগ্রহ অপেক্ষা মানবজীবনের মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। ঐ মহত্তর উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় ;—ধর্ম্মোপার্জ্জন ও পুণ্য সঞ্চয়। সত্যের আলোকে প্রেমের পথে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হওয়াই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি ত কেবল ঐ কার্য্যের জন্য জীবনরক্ষার উপায় মাত্র। কিন্তু হায়! উপায়কে আমরা উদ্দেশ্যের আসনে যত্নপূর্ব্বক বসাইয়া নিশ্চিন্তমনে একপ্রকার পৈশাচিক আনন্দ অনুভব করতঃ বিকৃত মস্তিষ্কের ন্যায় আপনাকে সুখী মনে করিতেছি।

উল্লিখিত অবস্থায় আমাদের কি কর্ত্তব্য? বাস্তবিক যদি আমরা জগতের মধ্যে গণ্যমান্য হইতে বাসনা রাখি, এই "স্বদেশী" "স্বরাজ আন্দোলনে যদি কিছুমাত্র সরলতা থাকে, তাহা হইলে আমাদের উচিত যে, আমরা সকল কাজ ফেলিয়া আগে আমাদের মহিলাকুলকে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় মনে করি। কারণ আমাদের জননী ভগ্নীরা উঠিলে আমাদের ভবিষ্যদ্ বংশ আপনিই উঠিবে, তাঁহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিলে আমরা কখনই এক ধাপও উঠিতে পারিব না। আর যদি কেবল হুজুগের জন্য এই সব আন্দোলনের জন্ম হইয়া থাকে তবে কোন কথা নাই। প্রেম ব্যতীত কেবল পার্থিব স্বার্থের জন্য যেখানে যাগ সম্পাদিত হইয়াছে তাহাই তিন দিনে মিটিয়া গিয়াছে, আর সত্যের উপর প্রেমের উপর যাহার ভিত্তি, সহস্র বিঘ্ন বাধা সত্ত্বেও তাহা কিছুতেই নষ্ট হয় নাই। অতএব অন্দরমহল হইতে আমাদের উন্নতির পথ পরিষ্কার করা বিজ্ঞতার কাজ বিবেচনা করিয়া প্রথমে সেই অবজ্ঞাত স্থানে সকলের মনোযোগ আবশ্যক। বিধাতা আমাদের সহায় হউন।

C. Sen

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

৮ম।

রেঙ্গুণনগর।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

রেঙ্গুণ নগরের পশ্চিম প্রান্তস্থিত সুবর্ণমণ্ডিত সুবিশাল পেগোডা (বুদ্ধমন্দির) এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। উহা বহুদূর হইতে নয়নগোচর হয়। এক দিন অপরাহ্নে ডাক্তার প্রসন্নকুমারের সঙ্গে উক্ত পেগোডা দর্শন করিতে যাওয়া হইয়াছিল।

এই বিশাল পেগোডা বড় অধিক দিনের নহে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা ছিল না। উহা একটি উপশৈলের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ও মধ্যমাকার নানা কারুকার্য্য যুক্ত সুবর্ণরঞ্জিত, ছাদ ও স্তম্ভাবলীতে ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র অগণ্য শুভ্র কাঁচ ও পরকলা সংযুক্ত শত ২ রমণীয় মন্দির (পেগোডা)। প্রত্যেক মন্দিরের ভিতরে শ্বেত প্রস্তর বা পিত্তলাদি ধাতু নির্ম্মিত মণিমাণিক্য খচিত এক একটি বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত। ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধভক্ত এই সকল মন্দির নির্ম্মাণ ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শৈল মূলে দারুময় সুবর্ণমণ্ডিত একটি সুরম্য সমুচ্চ তোরণ, সেই তোরণ অতিক্রম করিয়া শৈলশিখরে সুবিশাল সুবর্ণমণ্ডিত পেগোডা পর্য্যন্ত ক্রমোন্নত পথে সোপান পরম্পরাযোগে আরোহণ করিবার সময় উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হেমরঞ্জিত দারুময় মন্দিরাদির বিচিত্র শোভা নয়নগোচর হয়। ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কুর্জ্জন মহোদয় মন্দির সকলের জীর্ণ সংস্কার করাইয়া সেই সমস্তের উন্নতি সাধন ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। বর্ম্মদেশে রেঙ্গুনের সুবর্ণমণ্ডিত সুবিশাল পেগোডা বাস্তবিক এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। যে রাজকুমার শাক্যসিংহ রাজসিংহাসন ও রাজ্যসম্পদ্ তুচ্ছ করিয়া অরণ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন, সংসার অনিত্য অসার জানিয়া নির্ব্বাণলাভের জন্য ঘোরতর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন; যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া দীন ভিক্ষু অনুগামী পরিব্রাজকদিগের সঙ্গে দীন বেশে দেশে দেশে নগরে নগরে নির্ব্বাণ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন; ধ্যান চিন্তা সমাধি আত্মসংযম যাঁহার উপদেশের বিষয় ছিল; যিনি গৃহে বাস না করিয়া নগরপ্রান্তে বেণুবনে বা আম্রকাননে শিষ্যমণ্ডলী সহ আনন্দে অবস্থিতি করিতেন, আজ দেখ তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য বৌদ্ধনামে পরিচিত তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে কত দূর বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। যিনি পুত্তলপূজার বিরোধী ছিলেন, তাঁহাকে পুতুল করিয়া রাজবেশদানে পূজা করিতেছে। কোথায় বুদ্ধচরিত্র, জীবন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা ও বৈরাগ্য, আর কোথায় বর্ত্তমান যুগের বৌদ্ধ ধর্ম্মের বাহ্যিক বিলাসাড়ম্বর, স্বর্গ মর্ত্ত্যের ন্যায় প্রভেদ। বর্ম্মদেশের এক এক স্থানে ফয়াচাঁও এত অধিক যে হঠাৎ দেখিলে সে সকল অগণ্য বলিয়া বোধ হয়। কোন দেশে এত অধিক ধর্ম্মমন্দির নয়নগোচর হয় না। বর্ম্মদেশীয় ভাষায় "ফয়া" ঈশ্বরকে বলে। "ফয়া চাঁও" ঈশ্বরের মন্দির। ফুঙ্গি চাঁও ফুঙ্গিদিগের বাসগৃহ। বিশেষ বিশেষ ফুঙ্গির আশ্রমগৃহ রাজপ্রাসাদের ন্যায় চিত্তাকর্ষক। সে দেশের সুনিপুণ ভাস্করগণ দারুময় মন্দিরে যেরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সকল করিয়া থাকে এরূপ কোথাও লক্ষিত হয় না। সে বিষয়ে তাহাদিগকে অদ্বিতীয় বলা যায়। আমরা মেণ্ডালয় নগরের একটি দারুময় গৃহের প্রতিকৃতি রেঙ্গুনের স্বর্ণ মণ্ডিত পেগোডার প্রতিকৃতির পার্শ্বে প্রদর্শন করিলাম। পাঠিকাগণ তৎপ্রতি লক্ষ্য করিবেন, সেই গৃহটি সুবর্ণ-মণ্ডিত বড় সুন্দর। রেঙ্গুণ নগরের বক্ষঃস্থলেও চিত্তাকর্ষক বৃহৎ পেগোডা বিদ্যমান। দূরে দূরে বিশেষ বিশেষ তীর্থে স্থাপিত হিন্দুদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমন্দির এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুতুল ও প্রতিমা বর্ম্মদেশের বুদ্ধমন্দির পেগোডা এবং বুদ্ধ মূর্ত্তি সকলের নিকটে

কিছুই নয়। হিন্দুতীর্থে দেবমন্দিরাদিদর্শন করিতে যাইয়া অর্থগৃধ্নু পাণ্ডাদিগের দ্বারা এবং ভিক্ষাব্যবসায়ী ভিক্ষুকদিগের দ্বারা যাত্রিকদিগকে অত্যন্ত ক্লিষ্ট ও উৎপীড়িত হইতে হয়। বর্ম্মদেশে সে সকল উৎপাত কিছুই নাই।

রেঙ্গুণ নগরের প্রান্তস্থিত পজনডাঙ্গ পল্লীতে বৌদ্ধধর্ম্মযাজক ফুঙ্গিদিগের বহুদূর স্থানব্যাপী বৃহৎ আশ্রম। সেই আশ্রমে সভাসমিতি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ব্যবহারের জন্য অনেকগুলি বড় বড় অতি সুন্দর দারুময় গৃহ বিদ্যমান। তথায় শতাধিক ফুঙ্গি বাস করেন। ফুঙ্গিদিগের বাসগৃহকেই ফুঙ্গিচাঁও বলে। বর্ম্মদেশের প্রতি নগরে ও বড় বড় পল্লীতে বহু ফুঙ্গিচাঁও লক্ষিত হয়। পজনডাঙ্গের ফুঙ্গি চাঁওএর অন্তর্গত একটি বৃহৎ গৃহের চতুর্দ্দিকের প্রাচীরে স্বর্গ নরকের ছবি অঙ্কিত পট সকল টাঙ্গান আছে। আমরা যখন তাহা দেখিতে গিয়াছিলাম তখন দুই জন ফুঙ্গিকে তথায় পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের একজন ছবি সকল প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার ভাব ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এস্থানে কয়েকটি চিত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে ;—

স্বর্গ ;—স্বর্গগমনার্থী এক রাজা ও এক রাণী মণিমুক্তাময় বসনভূষণে সুসজ্জিত হইয়া বিচিত্র রথারোহণে উন্নত স্বর্গলোকে যাত্রা করিয়াছেন, কিয়দ্দূর পথ অতিক্রম করিলে পর এক জন স্বর্গীয় দূত আসিয়া তাঁহাদিগকে বাধা দিয়া বলেন, "তোমরা আর অগ্রসর হইতে পারিবে না, তোমাদের স্বর্গলোকে গমনের অধিকার নাই।" তাঁহারা তাহাতে নিবৃত্ত হন। তাঁহাদের পশ্চাতে একজন দীনহীন লোক ছিন্ন বসন পরিধান করিয়া যাইতেছিলেন, স্বর্গীয় দূত অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দেন। সেই দীনাত্মা ব্যক্তি কিয়দ্দূর পথ চলিয়া সিংহ শার্দ্দূলাদি হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ অরণ্যে প্রবেশ করেন, সেই ভয়বিপৎসঙ্কুল অরণ্যদর্শনে সে ভীত না হইয়া নির্ভরশীল অন্তরে চলিয়া যান। পরে তিনি এক শৈলমূলে উপস্থিত হন। সেখানে এক শ্বেত মাতঙ্গ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শুঁড়ে জড়াইয়া পৃষ্ঠে ধারণপূর্ব্বক উচ্চতর পর্ব্বতোপরি লইয়া যায়। তথায় তিনি সাধুর পবিত্র বৈরাগ্য বস্ত্র প্রাপ্ত হন, সাধুর বেশে অপর শ্বেত হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গলোকে চলিয়া যান।

নরকযন্ত্রণা ;—এক ব্যক্তি ফুঙ্গিকে ও ফয়াকে (ঈশ্বরকে) অবজ্ঞা করিত, তাহাকে তরুশাখায় বাঁধিয়া অধোমুখে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে, কাকে তাহার চক্ষু উৎপাটন করিতেছে।

এক ব্যক্তি পিতামাতাকে অসম্মান করিত, তাহাকে উচ্চস্থান হইতে অধোমুখে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইতেছে।

একটী নিষ্ঠুরা নারী বঁটি দ্বারা জীবন্ত কৈ মাগুর সিঙ্গী মৎস্য কাটিয়াছিল, উহার দণ্ডস্বরূপ নরকের দূত তাহার গলদেশে বঁটি দা বসাইয়া তাহাকে কাটিতেছে।

এক মেছুনী কম ওজনে মাছ বিক্রয় করিয়াছিল। ভয়ঙ্কর নরকের দূত তাহার শরীরের মাংস কর্ত্তন করিতেছে।

একজন মৎস্য শিকারী খাওয়ার প্রলোভন দেখাইয়া বড়শী দ্বারা মাছ ধরিয়াছিল, নরকের দূত তাহার কণ্ঠে বড়শী বিদ্ধ করিয়া তরুশাখায় ঝুলাইয়া রাখিয়াছে ইত্যাদি।

অপর একটি বৃহৎ গৃহের ছাদে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার্থে বুদ্ধদেবের অরণ্যযাত্রার ছবি এবং অনেকগুলি বড় বড় বুদ্ধ মন্দিরের ছবি অঙ্কিত।

রেঙ্গুণের সুবৃহৎ স্বচ্ছ সলিল তড়াগ (Royal Lake) বিচিত্র দৃশ্য। উহা উক্ত স্বর্ণমণ্ডিত পেগোডার অদূরে তাহার পার্শ্বেই বহু দূর ব্যাপিয়া বিদ্যমান। তড়াগটি ভুজঙ্গগতির ন্যায় বক্র। তাহার কূলে মনোহর উদ্যানশ্রেণী। অপরাহ্নে তথায় ভ্রমণ করিতে গেলে বিশেষ আনন্দলাভ হয়। কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিলে সেই সুবিশাল মনোহর হ্রদের বক্ষে নৌকাবিহার করা যায়। সাহেব বিবীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া হ্রদের ইতস্ততঃ আমোদ করিয়া বেড়ান। সেই অপূর্ব্ব হ্রদ স্বাভাবিক না কৃত্রিম বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। কতক স্বাভাবিক ও কতক দূর মনুষ্যখাত এরূপ প্রতীতি হয়। যাহা হউক চিল্কা হ্রদ দর্শন করার পর এই প্রকার রমণীয় হ্রদ আর নয়নগোচর হয় নাই।

রেঙ্গুণ নগরের প্রান্তভাগে একটি Zoological Gargen হইতেছে। ৫৫ একর ভূমিতে দুই বৎসর ব্যাপিয়া তাহার কাজ চলিয়াছে, দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি পশু এ পর্য্যন্ত অল্পই সংগৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ বিক্রমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাইমোহন সেন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়া সপরিবারে তথায় বাস করিতেছেন। তিনি আমাদিগকে পাইয়া অতিশয় আদর যত্ন করিয়াছিলেন।

কটকে নবপ্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়।

কটক নগরনিবাসী শ্রীযুক্ত দেওয়ান জগন্নাথ রাওয়ের প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রেবা দেবী মহিলার পাঠিকাদের নিকটে অপরিচিত নহেন। তিনি উৎকল দেশীয়া কন্যা হইলেও স্বদেশে থাকিয়া নিজের যত্ন ও অধ্যবসায়বলে বাঙ্গলা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন। রেবা দেবী একজন সুলেখিকা, সুকবি। ক্রমশঃ মহিলাতে তাঁহার রচিত অনেকগুলি ভাবময় গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি উৎকল ভাষায় অনেক গদ্য ও পদ্য পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তৎকর্ত্তৃক দুই তিন খানা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপুস্তক বঙ্গ ভাষা হইতে উৎকলভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। তিনি উৎকল সাহিত্য নামক সাময়িক পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধলেখিকা। এক সময় উৎকল ভাষায় এক খানা পত্রিকাও তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। আমাদের এই কন্যার শরীর সুস্থ নয়, অর্থসম্বল নাই, এমত অবস্থায় কাহারও নিকটে কোন উৎসাহ না পাইয়া তিনি নানা বাধা বিঘ্নকে অগ্রাহ্য করিয়া অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন উৎকল কন্যাদের মধ্যে

বিদ্যালোক বিকীর্ণ করিবার জন্য অদম্য উৎসাহসহকারে বৎসরাধিককাল হইল একটি উচ্চশ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। সেই বিদ্যালয়ের সঙ্গে পুরুষের কোন সম্পর্ক নাই। তিনি নিজে তাহার তত্ত্বাবধান ও শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করেন, এবং অনেক উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। ইংরাজী বাঙ্গলা ও উৎকল ভাষায় গণিত সাহিত্যাদি শিক্ষাদানের সঙ্গে শিল্প ও সঙ্গীত বিদ্যা ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দান করা হয়। এই বিদ্যালয়ে স্ত্রীপ্রকৃতি অনুসারে শিক্ষা দান হইয়া থাকে। প্রধানতঃ নীতিশিক্ষা দান হয়, এতৎ সংক্রান্ত ছাত্রীনিবাসও স্থাপিত হইয়াছে। রেবা দেবী অভিভাবিকাস্বরূপা হইয়া নিজে ছাত্রীনিবাসে অবস্থিতি করেন। তিনি নিজের গাড়ী ও পাকাবাড়ী স্কুলের কার্য্যে ব্যবহার করিতেছেন। দিন ২ এই বালিকা বিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। ময়ূরভঞ্জের মহারাজ প্রভৃতি উক্ত বিদ্যালয় দর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট মাসিক ২৫৲ টাকা সাহায্যদানে উক্ত কন্যাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। রেবা দেবী স্কুলের কার্য্যে এরূপ জ্বলন্ত উৎসাহসহকারে ব্যাপৃত থাকেন যে, অনেক সময় তিনি নিজের আহারনিদ্রাদি ভুলিয়া যান। সংসারের গুরুভার ও সন্তানাদিসম্বন্ধে একটি নিঃসহায়া অপরিণতবয়স্কা মহিলা সর্ব্ববিধ পার্থিব সুখ ও বিলাসবাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বদেশের কল্যাণের জন্য ভগবানের প্রেরণায় কিরূপ অসম সাহসিক গুরুতর কার্য্য করিতে পারেন আমরা মা রেবাকে দৃষ্টান্তস্থলে উল্লেখ করিতে পারি। আমাদের আদরের ও স্নেহের কন্যা দীর্ঘজীবনী হইয়া ভগবানের ইঙ্গিতে স্বীয় জীবনের সৎকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক ধন্য হউন, ইহাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

আমেরিকাযাত্রিকের পত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

আমার কথাতো বল্লাম্, অন্যের কথাও একটু আদটু বলি। জাহাজে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পেসেঞ্জারদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্বন্ধ নেই, দেখাও হয় না। আমরা জাহাজের শেষের দিক্‌টায় থাকি, তৃতীয় শ্রেণীর পেসেঞ্জার অনেক,—ঠিক জানি না,—প্রায় ১০০ শো ১৫০ শো হবে। এদের ভেতর অষ্ট্রেলিয়ানই বেশী, ইটেলিয়ান, আইরিস এবং অন্যান্য দেশের লোকও বোধ হয় আছে। কারো কারো তো প্রকাণ্ড শরীর, লম্বা লম্বা দাড়ী, মোটা গলা, ভয়ানক দেখ্‌তে। ইণ্ডিয়ান আমি ও বার্ম্মিজ সেই ছেলেটী, Mr. Maung Teis,—আর কেউ আমাদেব দেশের নেই। যা'হক,জাহাজে সবাই বেশ আমোদেতে থাকে। দেশে সাহেবদের সঙ্গে ব্যবহার ক'রতে যেমন একটা সঙ্কোচ ছিল, এখানে তা কিছু নেই, তারাও আমাদের বেশ সম্মান ক'রে,—নেটিভ মনে করে না। ষ্টুওয়ার্ড ইত্যাদির তো

কথাই নেই,—সর্ব্বদা সার, সার ব'লে খুব সম্মানসূচক ভাষায় কথা বলে। থার্ড ক্লাসের ভেতর অনেক মেম ও ছেলে মেয়েও আছে। তারা সমস্ত দিন ডেকে খুব খেলা করে,—তাতে তাদেরও আমোদ হয়, আমাদেরও দেখে কত আমোদ হয়। বিকেল বেলা ডেকে প্রায় কুসি খেলা হয়। সন্ধে বেলা ছেলে, বুড়ো মেয়ে সবাই মিলে "Blind mans Chair" "Prist of the Parish" ইত্যাদি মজার মজার খেলা খেলে;—কেউ কেউ আমাকে আবার তাদের খেলা বুঝিয়ে দেয়,—আমাদের দেশে কি খেলা আছে জিজ্ঞেস করে,—মেয়েরা কি খেলা খেলে জিজ্ঞেস করে,—আমিও "কুমীর কুমীর" "কানামাছি ভোঁ" "কপাটী" ইত্যাদি যা দু একটা খেলার কথা জানি তা বলি, সেগুলি তারা জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে বুঝে নেয়। ছেলে বুড়ো মেয়ে সবাই মিলে এরা যেমন এক সঙ্গে আমোদ করে, খেলা করে, এমন আমাদের দেশে দেখা যায় না,—এটা একটা খুব নতুন জিনিষ। কাল সন্ধে বেলা কন্‌সার্ট হ'য়েছিল, জাহাজের ব্যাণ্ড মেনেরা পিয়ানো বেয়ালা ইত্যাদি নানান রকম বাজনা বাজিয়েছিল, গানও হ'য়েছিল, দুটী ছোট ছোট মেয়ে নেচেও ছিল। আজ সকালে রবিবার ব'লে সারভিস হ'য়েছিল। সারভিসে খুব বেশী লোক হয় নি, তবে মেয়েরা প্রায় সবাই গিয়েছিলেন। আজ সন্ধে বেলা আপনারা সবাই মন্দিরে যাবেন, আমিও ডেকে ব'সে সুবিশাল জল নিধির দিগন্তব্যাপী বিস্তারের ওপরে আকাশ যে অনন্ত মন্দির রচনা ক'রেছে সেখানে সেই এক পরম পিতাকে পূজা ক'রবো।

আকস্মিক ঘটনা ও সামান্য রোগাদির গৃহচিকিৎসা।

(একজন বহুদর্শী চিকিৎসক হইতে প্রাপ্ত।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।

ক্ষতের বিশেষত্ব এই যে, উহাতে রক্তস্রাব হয়, সুতরাং উহার সম্বন্ধে প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য রক্তস্রাব বন্ধ করা। ক্ষত সামান্য হইলে প্রথমতঃ শীতল জলের ধারা দিয়া উহা পরিষ্কার করিবে। সচরাচর শীতল জলের ধারাতেই রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যাইবে। যদি না হয় তবে একখণ্ড শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা ঐ স্থান টিপিয়া ধরিবে, কিম্বা ঐ বস্ত্র খণ্ডকে ডেলার মত করিয়া ক্ষতমুখে রাখিয়া আর এক খণ্ড বস্ত্রের দ্বারা উহা একটু দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া দিবে। দশ পনের মিনিট মধ্যে যদি ইহাতে রক্ত পাত বন্ধ না হয় তবে ঐ ডেলা উঠাইয়া লইয়া ক্ষতের উপরে এক খণ্ড ছিন্ন বস্ত্র রাখিয়া তদুপরি এক খণ্ড বরফ রাখিয়া দিবে। সাধারণতঃ ইহাতেই অধিকাংশ রক্তস্রাব বন্ধ হইবে। যেখানে ধারে ও দ্রুতবেগে রক্ত বহিতে থাকে, কিম্বা ফেণকি দিয়া রক্ত ছোটে, এবং পূর্ব্বোল্লিখিত কোন উপায়ে তাহা বন্ধ না হয় এমত স্থলে ক্ষত স্থানের কিঞ্চিৎ উপরে সুবিধানুরূপ বাঁধিবার স্থান থাকিলে (অর্থাৎ হস্ত পদ

ও অঙ্গুল্যাদিতে ক্ষত হইলে) এক খণ্ড বস্ত্রের দ্বারা একটু আঁটিয়া বাঁধিয়া দিবে, এবং অবিলম্বে চিকিৎসককে সংবাদ দিবে, কেন না এরূপ বাঁধা অধিক ক্ষণ থাকিলে অপকার হইবার সম্ভাবনা। এতদ্ভিন্ন এমন কতকগুলি দ্রব্য আছে যাহা ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়, যথা ;—কচুর ডগার রস, থেঁতলান বা চর্ব্বিত দূর্ব্বাঘাস, গাঁদাফুলের পাতার রস, থেঁতলান, চর্ব্বিত বা শিলেতে বাটা কচি পেয়ারা ও দাড়িম্বের পাতা, বট, অশ্বথ ও ডুমুর বৃক্ষের রস, মাকড়সার জাল, আকন্দের রস, হরিতকী চূর্ণ কিম্বা হরিতকী ভিজান জল, ফটকিরি চূর্ণ বা তন্মিশ্রিত শীতল জল, হিরাফল চূর্ণ, মাজুফল চূর্ণ ইত্যাদি। অনেক শিক্ষিতা গৃহিণীরা আজকাল সচরাচর গৃহে ব্যবহৃত নানাবিধ ইংরাজী ঔষধ জানেন, তাঁহাদের জন্য এরূপ দুই একটি রক্তস্রাব নিবারক ঔষধের নাম করা যাইতেছে। Tin Steel একটী অতিশয় ফলপ্রদ রক্ত নিবারক। ইহাকে সমান ভাগ শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে ধারা দিলে, কিম্বা বস্ত্রখণ্ড ইহাতে ভিজাইহা ক্ষতস্থানে রাখিয়া দিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। যদি জল মিশ্রিত টিং ষ্টীল দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়, তবে অমিশ্রিত টিং ষ্টীলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া দুই তিন পুরু করিয়া ক্ষতের উপরে রাখিয়া তাহা বাঁধিয়া দিবে।

ট্যানিক্ এসিড বা গ্যালিক এসিড এই দুইয়ের একটীর চূর্ণ ক্ষতস্থানে রাখিয়া তদুপরি কয়েক পুরু কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিলেও রক্তস্রাব বন্ধ হয়। ম্যাটিকো Matico বলিয়া এক প্রকার শুষ্ক পত্রের চূর্ণ ডিসপেন্‌সারীতে পাওয়া যায়, উহাও পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে ব্যবহার করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

ক্রমশঃ।

মহিলার রচনা।

কে বুঝায়ে বলে ?

কে বুঝায়ে বলে ?
এত সাধ এত আশা
এত স্নেহ ভালবাসা
সকলি ভাসিয়ে যায়
কাল-স্রোত-জলে,
এ বিশ্ব এমন কেন
কে বুঝায়ে বলে ?

(২)

কে বুঝায়ে বলে ?
সাধনার ধন যাহা
হারাইয়ে যায় তাহা
শত যতনেও আর
খোঁজ নাহি মেলে,
এ বিশ্ব এমন কেন
কে বুঝায়ে বলে ?

(৩)

কে বুঝায়ে বলে ?
'আমার' নিশ্চয় যাহা
সেও পর হয় আহা !
নিমেষে হৃদয়-ধন
কোথা যায় চ'লে,

এ বিশ্ব এমন কেন
কে বুঝায়ে বলে ?

(৪)

কে বুঝায়ে বলে ?
পলক পড়িলে চ'খে
তৃপ্ত নহি যারে দেখে
দিনান্তে দেখে না সে যে
দুটী আঁখি তুলে,
এ বিশ্ব এমন কেন
কে বুঝায়ে বলে ?

(৫)

কে বুঝায়ে বলে ?
যে গৃহে আনন্দ প্রীতি
জাগা'ত স্বর্গের স্মৃতি
সে গৃহ শ্মশানসম
দেখে বুক জ্বলে,
এ বিশ্ব এমন কেন
কে বুঝায়ে বলে ?

(৬)

কে বুঝায়ে বলে ?
পরম প্রীতির ঠাঁই
তা'ও হয় 'দূর ছাই'
(যেন) অমর অমৃত ভাণ্ড
পূরিত গরলে !
এ বিশ্ব এমন কেন
কে বুঝায়ে বলে ?

(৭)

কে বুঝায়ে বলে ?
মরা বাঁচা একি কথা
বুকে পেয়ে নানা ব্যথা
তবুও থাকিতে হয়
এ অবনী তলে !
এ বিশ্ব এমন কেন
কে বুঝায়ে বলে ?

(৮)

কে বুঝায়ে বলে ?
জ্ঞানী বা পণ্ডিত, মূর্খ
(হোক্ বুদ্ধি মোটা, সূক্ষ্ম.)
সকলে স্বার্থের বশে
এক ভাবে চলে,
পরের সুখের লাগি
কেহ নহে আত্মত্যাগী
আপন সুযোগ তরে
পরে পা'য় দলে !
এ বিশ্ব এমন কেন
কে বুঝায়ে বলে ?

(৯)

কে বুঝায়ে বলে ?
ভাঙিতে ভবের ভুল
পেতে যাঁর তত্ত্বমূল
জ্ঞানীরা অন্বেষে সদা
অন্তশ্চক্ষু খুলে,
সে তত্ত্ব অজ্ঞাত কেন
এত চেষ্টা ফলে ?
অপূর্ণ ও পূর্ণতায়
যে গঠিল বিশ্বকায়
তাহার চাক্ষুষ দ্রষ্টা
নাহি ভূমণ্ডলে,
এ বিশ্ব এমন কেন
কে বুঝায়ে বলে ?

(১০)

কে বুঝায়ে বলে ?
কেন এই অপূর্ণতা
কেন এই মোহব্যথা

না বুঝে বিস্ময়ে প'ড়ে
ডাকিতেছি রোলে,
এ বিশ্ব এমন কেন
(কেহ যদি জেনে থাক)
দাও মো'রে ব'লে ॥

বরাহনগর। একটী দুঃখিনী।

সংবাদ।

শারদীয় ছুটী উপলক্ষে বিগত ২৪শে আশ্বিন হইতে ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয় ও তৎসংক্রান্ত বালিকাবিদ্যালয়ের কার্য্য এক মাসের জন্য বন্ধ হইয়াছে। বালিকাদিগের সাপ্তাহিক নীতিবিদ্যালয় এবং বালকদিগের নীতিবিদ্যালয়ও একমাস বন্ধ থাকিবে। মহিলাবিদ্যালয়সংক্রান্ত কয়েকটী শিক্ষিতা মহিলা, প্রতিশনিবার প্রাতঃকালে বালিকাদিগকে নীতিশিক্ষা দান করেন, ২।৩ জন শিক্ষিত যুবক রবিবার দিন কতিপয় বালককে নীতি বিষয়ে উপদেশাদি দান করিয়া থাকেন। মহিলাবিদ্যালয়ের এক প্রকোষ্ঠে তাহার কার্য্য হয়।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি যে, গভর্ণমেণ্ট এ দেশের স্ত্রীশিক্ষার জন্য এ বৎসর অতিরিক্ত দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

পরম আহ্লাদের বিষয় যে, শ্রীযুক্ত কে, জি, গুপ্ত ইণ্ডিয়া কাউন্সেলের মেম্বর মনোনীত হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালীর এরূপ উচ্চপদ হয় নাই। তাঁহাকে উক্ত কার্য্যের অনুরোধে বৎসরের অধিকাংশ সময় ইংলণ্ডে বাস করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে শীত ঋতুতে দেশে থাকিতে পারিবেন। তিনি ভারতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ষ্টেটস সেক্রেটারীর কাউন্সেলের অন্যতর সদস্য হইয়াছেন। ভারতের গভর্ণর জেনারেল ষ্টেটস্ সেক্রেটরীর আজ্ঞাধীন্। কে, জি গুপ্ত যোগ্যতা সহকারে উড়িষ্যা বিভাগে কমিশনরের কার্য্য সম্পাদন করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে একসাইস কমিটীর মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই কার্য্যোপলক্ষে তিনি সমুদায় ভারতবর্ষ ভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অবস্থাবিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। সুযোগ্য লোক সেই উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদ্বারা দেশের বিশেষ কল্যাণ হইবে আশা করা যায়। ভগবানের হস্তে তিনি ব্যবহৃত হইয়া স্বদেশের কল্যাণ সাধন করেন, তজ্জন্য ভগবানের নিকটে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

ইতিমধ্যে এক দিন বীডনপার্কে স্বদেশী বক্তৃতার সময় স্বদেশী যুবকদল ও পুলিশে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। উভয় দলে মারপীট জখমী হইয়াছিল, শ্রুত হইল অনেক গুলি পাহারাওয়ালা গুরুতর রূপে আহত হইয়া হাসপাতালের আশ্রয় লইয়াছে। তাহার একদিন পরে কলেজস্কোয়ারে পুলিশ ও বাঙ্গালী যুবকদলে ভীষণ দাঙ্গার আয়োজন হইয়াছিল, কর্ত্তৃপক্ষের যত্নে হইতে পারে নাই। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের এরূপ আদেশ হইয়াছে যে, কলিকাতায় কোন পার্কে আর কেহ রাজনৈতিক আন্দোলন ইত্যাদির জন্য সভা-

সমিতি করিয়া বক্তৃতাদান করিতে পারিবে না। পূর্ব্ববঙ্গে ও পঞ্জাবে ইতিপূর্ব্বে গবর্ণ জেনারেলের আদেশে তদ্রূপ সভাসমিতি ও বক্তৃতা বন্ধ হইয়াছে। "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার সম্পাদক যে,রাজবিদ্রোহিতাসূচক লেখা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া বিচারাধীন ছিলেন, প্রমাণাভাবে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন, কিন্তু প্রিণ্টারের তিন মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। বক্তৃবর শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্রপাল উক্ত সম্পাদকের মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দান না করাতে আদালত অবমাননা করার অপরাধে ৬ মাসের জন্য কারাবাসী হইয়াছেন। যুগান্তর পত্রিকা সম্পাদক এক বৎসরের জন্য কারাবাসী হইয়া আছেন। বারিষ্টার বাবু অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতায় রাজবিদ্রোহিতার ভাবপ্রকাশ করাতে ধৃত হইয়া বিচারাধীনে আছেন। বরিশালে একজন মোসলমান স্বদেশী বক্তা, এবং গিরিডিতে একজন বাঙ্গালী বক্তা, কলিকাতার সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক রাজবিদ্রোহিতার পরিপোষক বলিয়া বিচারাধীন আছেন।

মূল কোরাণ শরিফের সটীক বঙ্গানুবাদের তৃতীয় সংস্করণ সংশোধিত আকারে উত্তম রূপে হইতেছে। আগামী মাঘ মাসের প্রথম ভাগে এই মহাগ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য যত্ন করা যাইতেছে। ইহার মূল্য বোর্ড বাইণ্ডিং ৪৲, উত্তম বাঁধা ৪৷৷৹ নির্দ্ধারিত হইবে। এই কার্য্যে সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয় হইতে চলিল। যিনি আগামী অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে নাম ধাম লিখিয়া অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহাকে ৪৲ স্থানে ৩৲ এবং ৪৷৷৹ স্থানে ৩৷৷৹ মূল্যে উক্ত পুস্তক দেওয়া যাইবে। তাঁহা হইতে ডাক মাশুল গৃহীত হইবে না। ভরসা করি গ্রাহক মহাশয়গণ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

প্রেরিত।

অনাথাশ্রম।

কঙ্কালাবশিষ্ট অসহায় জীর্ণ শীর্ণ অনাথ শিশুর মলিন মুখের দিকে তাকাইলে কোন্ প্রাণ না বিগলিত হয়? আমরা বিধাতার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় বুঝিয়া হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত গিরিডিনামক স্বাস্থ্যনিবাসে একটী অনাথাশ্রম সংস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়া অনাথদিগের জন্য আশ্রম নির্ম্মাণ, অনাথদিগের আহার পরিচ্ছদের ব্যবস্থা প্রভৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় সাধনে দানশীল দাতাদিগের সাহায্যই একমাত্র উপায়। আগামী অক্টোবর মাসের শেষভাগে আমাদিগের কার্য্যারম্ভের সঙ্কল্প। আশা করি উন্নতমনা দাতাগণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীদিগের নিকট স্ব স্ব দেয় প্রেরণ করিয়া এ কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

বিধান আশ্রম, মোরাদপুর পোঃ, পাটনা। } শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার, শ্রীগণেশ প্রসাদ।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

জোয়ার ভাটা *।

সমুদ্রের জল উঠিতেছে ও পড়িতেছে, যেন কি এক মহানন্দে নৃত্য করিতেছে। এক দিবা রাত্রিতে দুবার জোয়ার ও দুবার ভাটা হয়। কিন্তু প্রত্যহ একই সময়ে জোয়ার হয় না, আজ যদি দ্বিপ্রহরে হয় তবে কাল ১টার সময় জোয়ার হইবে। এক সপ্তাহ পরে, আজ যখন জোয়ার হইল, ঠিক সেই সময়ে ভাটা হইবে। দুই সপ্তাহ পরে আবার আজিকার জোয়ার ও ভাটার সঙ্গে সময় মিলিয়া যাইবে।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বেশী জোরে জোয়ার ভাটা হয়। কেন হয় তাহার ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হইবে।

কোন কোন বিশেষ স্থান হইতে দেখা যায় যে চন্দ্র মাধ্যাহ্ন রেখা meridian line পার হইয়া যাইবার কতকটা নির্দ্দিষ্ট সময় পরে জোয়ার আসে। শূন্য পথের যে অংশটি সূর্য্য মধ্যাহ্ন সময়ে অতিক্রম করে সেই অংশটিকে মাধ্যাহ্ন রেখা (meridian) বলা হয়।

চন্দ্রের সহিত জোয়ার ভাটা হওয়ার যে একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাহা বহু প্রাচীন কাল হইতেই লোকে অনুভব করিয়াছিল। পরে ভুবনবিখ্যাত নিউটন পণ্ডিত এই ঘটনাকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফল বলিয়া প্রমাণ করেন। কিন্তু এই বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। নিউটনও ইহার সম্যক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। সে ব্যাখ্যা পরে দিয়াছিলেন একজন ফরাসী পণ্ডিত। তাঁর নাম ল্যাপলাস্। নিউটনের কথাই আলোচনা করা যাউক।

নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম আবিষ্কার করেন তাহা এই যে, জগতের প্রত্যেক পরমাণু প্রত্যেক পরমাণুকে আকর্ষণ করিতেছে। যখন একটি ঢিল ছুঁড়িয়া দেওয়া হয়, পৃথিবীর আকর্ষণে সেটি পৃথিবীর উপরেই আসিয়া পড়ে। পৃথিবীর প্রত্যেক পরমাণু যেমন ঢিলটির প্রত্যেক পরমাণুকে আকর্ষণ করে, তেমনি ঐ ঢিলের প্রত্যেক পরমাণুও পৃথিবীর পরমাণুকে আকর্ষণ করে। ঢিলটী পৃথিবীর দিকে যায়, আবার পৃথিবীও ঢিলটীর দিকে যায়। অবশ্য যে বস্তুটি যত বড় এবং ভারি তাহার আকর্ষণ শক্তিও সেই পরিমাণে বেশী হইবে। সেই জন্য পৃথিবী ঢিলটী অপেক্ষা যে পরিমাণে বড়, তাহার ঢিলটীর দিকে গতিও সেই পরিমাণে কম। পৃথিবীর সঙ্গে তুলনায় ঢিলটী কিছুই নহে। সেইজন্য তাহার আকর্ষণ পৃথিবীর তুলনায় কিছুই নহে। এই মাধ্যাকর্ষণ

---

* বিগত ১৬ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে বক্তৃতাদান করিয়াছিলেন তন্মূলক।

শক্তির নিয়মে সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে, পৃথিবী সূর্য্যকে আকর্ষণ করিতেছে। আবার পৃথিবী এবং চন্দ্র পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে।

গননার সুবিধার জন্য নিউটন প্রত্যেক জড়পিণ্ডের মধ্যবিন্দুতে আকর্ষণের সমুদায় শক্তি ঘনীভূত বলিয়া ধরিয়াছেন। এই কারণে তাঁহার আবিষ্কৃত নিয়মকে বাঙ্গলায় মাধ্যাকর্ষণ বলে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যে কেবল মধ্যবিন্দু মধ্য বিন্দুকে আকর্ষণ করে তাহা নহে।

পৃথিবীর উপরে চন্দ্রের আকর্ষণ কিরূপ সেই কথা আলোচনা করা যাউক। পৃথিবীর উপরিস্থ অংশ কঠিন। কঠিনাংশের উপর চন্দ্রের আকর্ষণ কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সৃজন করিতে পারে না। কিন্তু এই কঠিনাংশ যদি সম্পূর্ণরূপে জলের দ্বারা আবৃত মনে করা যায় তবে এই জলাংশ কঠিনাংশ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে নড়িতে চড়িতে পারে।

পৃথিবীর যে কঠিনাংশ তাহার উপরে চন্দ্রের আকর্ষণ তাহা মধ্য বিন্দু প তে ঘনীভূত ধরা যাউক।

প—পৃথিবীর কেন্দ্র

চ—চন্দ্রের কেন্দ্র

গ প খ—একটি বৃত্ত যার কেন্দ্র চ ও ব্যাসার্দ্ধ চ প।

চন্দ্রের আকর্ষণে প স্থিত জল যত দূর নড়িবে ক স্থিত জল তদপেক্ষা বেশী দূর নড়িবে এবং খ স্থিত জল তদপেক্ষা কম দূর নড়িবে। এইজন্য এই কারণে ক ও খ স্থিত জল পুঞ্জীভূত হইবে, এবং সেখানে জোয়ার হইবে। সুতরাং গ ও খ স্থিত জলরাশি কম হইয়া যাইবে, এবং সেখানে ভাটা হইবে। এইরূপ হইলে জলাবৃত পৃথিবীর একটি ডিম্বাকৃতি আকার হইবে।

ইহা সকলেই জানেন যে পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে চন্দ্র ও পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিতেছে। চন্দ্র যদি স্থির থাকিত তবে পৃথিবীর আহ্নিক গতিতে প্রত্যেক ২৪ ঘণ্টায় দুবার জোয়ার দুবার ভাটা হইত। ঐ ডিম্বাকৃতি জলরাশি ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিয়া আসিত। কিন্তু চন্দ্র পূর্ব্বদিকে ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছে সেইজন্য কোন স্থানের মাধ্যাহ্ন রেখা meridian ঠিক চন্দ্রের সম্মুখীন হইতে ২৪ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট লাগে। কিন্তু চন্দ্র কোন স্থানের মাধ্যাহ্ন রেখা (meridian) ঠিক পার হইবার সময়েই জোয়ার হয় না, কতকটা নির্দ্দিষ্ট সময় পরে হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী দ্বীপ হইতে ইহা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। কেন এরূপ হয়, ইহার কারণ অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

জোয়ার ও ভাটার ভিতরে সূর্য্যের শক্তি ও কার্য্য করিতেছে। করিবারই কথা। পৃথিবী হইতে চন্দ্র যত দূরে সূর্য্য তদপেক্ষা ৩৯০ গুণ দূরে। কিন্তু চন্দ্রের যত ওজন সূর্য্যের ওজন তদপেক্ষা ২৭ লক্ষ গুণ বেশী। অঙ্ক কসিয়া দেখা যাইতে পারে যে

চন্দ্রের আকর্ষণ যদি ১১ আনা ধরা যায়, সূর্য্যের আকর্ষণ তবে ৫ আনা। পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সময় চন্দ্র ও সূর্য্য সমরেখায় থাকে, সেইজন্য উভয়ের আকর্ষণ মিলিয়া যে জোয়ার হয়, তাহা বেশী জোরে হয় বলিয়া তাহাকে "কোটালে জোয়ার" বলে। সপ্তমী অষ্টমীতে চন্দ্র ও সূর্য্য সমরেখায় থাকে না, সে সময় জোয়ার কম হয়। কোটালে জোয়ারের সময় চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণ মিলিয়া ১৬ আনা হয়, কিন্তু "মরা জোয়ারে" (neaptide) চন্দ্রের ১১ আনা আকর্ষণ হইতে সূর্য্যের ৫ আনা বাদ যায় সেই জন্য তাহার আকর্ষণ শক্তি মাত্র ৬ আনা হয়।

জোয়ার ভাঠা একটী তরঙ্গ বিশেষ। তরঙ্গে জল ঠিক এক স্থান হইতে অপর স্থানে যায় না। একটি পুষ্করিণীতে যদি একটি ঢিল ফেলা হয় তবে চারি দিকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ হয়। পানা প্রভৃতি ভাসমান লঘু দ্রব্যগুলি তরঙ্গে উঠে নামে নৃত্য করে, কিন্তু তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তীর পর্য্যন্ত আনীত হয় না। তরঙ্গ অগ্রসর হয় বটে, কিন্তু স্রোত অর্থাৎ জলের গতি হয় না। জোয়ার ভাটাও একটি তরঙ্গ স্রোত নহে। কিন্তু সমুদ্রের সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। সেখানে অসীম জলরাশির ভিতরে জোয়ারের উচ্ছ্বাস তরঙ্গেরই সঞ্চার করে, স্রোত করিতে পারে না, কিন্তু নদী নালাতে এই তরঙ্গের কারণেই স্রোতের সঞ্চার হয়। ইহাকেই "পদ্মার বান" ডাকা বলে।

পৃথিবীর উপরিভাগ যদিও কঠিন, কিন্তু ইহার অভ্যন্তর এখনও তরল অবস্থায় আছে। এখনও আগ্নেয় গিরির উচ্ছ্বাসে ভূমধ্য হইতে গলিত উষ্ণ প্রস্তররাশি বিনির্গত হয়। বহিঃস্থ কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরে এই তরল বস্তুর উপর সূর্য্যের ও চন্দ্রের আকর্ষণ কি কোন কাজ করিতে পারে? প্রকৃত পক্ষে অভ্যন্তরস্থ তরল অংশে জোয়ার ভাটা খেলিবার সুযোগ হয় না। কিন্তু ভূপঞ্জরের উপর এই তরল অংশ চন্দ্রের আকর্ষণে কোথাও কম কোথাও বেশী জোরে আঘাত করিতেছে। সম্ভবতঃ ভূমিকম্পের ইহা একটী অন্যতম কারণ।

জোয়ার ভাটার জন্য যে ডিম্বাকৃতি জলরাশি ভূপৃষ্ঠে ক্রমাগত ঘুরিতেছে তাহার ঘর্ষণে পৃথিবীর আহ্নিক গতিও ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, যখন সমুদায় পৃথিবী তরল অবস্থায় ছিল তখন সূর্য্যের আকর্ষণে সেই তরল পদার্থের উপর যে জোয়ার ভাটা হইত, তাহারই প্রভাবে পৃথিবী হইতে যে কতটা অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল তাহাই চন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। এখন চন্দ্রের আকর্ষণে যেমন পৃথিবীতে জোয়ার ভাটা হইতেছে, চন্দ্র যখন তরল অবস্থায় ছিল, পৃথিবীর আকর্ষণে অবশ্য তাহার উপরে বহু গুণ প্রবল ভাবে জোয়ার ভাটা হইত। সেই জোয়ার ভাটার ঘর্ষণে চন্দ্রের আহ্নিক গতি ক্রমশঃ কমিয়া কমিয়া আবর্ত্তন ও কক্ষ বেষ্টনের সময় এক হইয়া গিয়াছে। জুপিটার বা বৃহস্পতি গ্রহের যে চারিটি উপগ্রহ আছে তাহাদেরও এইরূপে চন্দ্রের ন্যায় অবস্থা লাভ হইয়াছে। এবং শুক্র (Venus) ও বুধ (Mercury)

গ্রহেরও দিন ও বৎসর সমান হইয়াছে। পৃথিবী অপেক্ষা বুধ ও শুক্র গ্রহদ্বয় সূর্য্যের অনেক নিকটে, সূর্য্যের আকর্ষণে তাহাদের বক্ষে প্রবল জোয়ার ভাটা হওয়াতেই তাহাদের এরূপ অবস্থা প্রাপ্তির কারণ। ক্রমে পৃথিবীর আহ্নিক গতিও মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে, এবং এমন দিন আসিবে যেদিন পৃথিবীও শুক্রাদির অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। তখন পৃথিবীও তাহাদের ন্যায় তৃণপত্রহীন জীব জন্তু হীন নিস্পন্দ দশা প্রাপ্ত হইবে।

মহিলার নিয়মাবলী।

মহিলা পত্রিকার ডাকমাশুলসহ বার্ষিক মূল্য ২৲ মাত্র। গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ মহিলার মূল্য ও অর্থসম্বন্ধীয় পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে এবং প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকটে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি উপযুক্ত হইলে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক প্রকাশিত হইবে। কাহারও প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া যাইবে না।

অনেকে মহিলা পত্রিকা বৎসরাধিক কাল গ্রহণ করিয়া মূল্য দান করেন না। বড় দুঃখের বিষয়। যাঁহারা মূল্যদানে অসমর্থ তাঁহারা যেন অবিলম্বে পত্রিকা ফেরত পাঠাইয়া দেন, অথবা আমাদিগকে তাহা পাঠাইতে নিষেধ লেখেন তাহা হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া প্রাপ্য মূল্য না পাইলে অনেক সময়ে আমরা সেই মূল্যের জন্য ভি, পিতে মহিলা পাঠাইয়া থাকি।

মূল্যপ্রাপ্তি।

১০ম বৎসর।

শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর,	কলিকাতা	২৲
শ্রীযুক্ত হরিনাথ নিয়োগী,	পিঙ্গনা	॥০
„ বৈকুণ্ঠনাথ দাস,	বালেশ্বর	১॥০
„ রায় উমাকান্ত দাস,	আগরতলা	২৲
„ রাধানাথ ঘোষ,	টাঙ্গাইল	১৲

১১শ বৎসর।

শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর,	কলিকাতা	২৲
„ সুহাসিনী ভিগুা,	অমৃতশহর	২৲
শ্রীযুক্ত হরিনাথ নিয়োগী,	পিঙ্গনা	২৲
„ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়,	নারায়ণগঞ্জ	২৲
„ রাজা মহিমরঞ্জন রায়,	কাকিনিয়া	২৲
„ বৈকুণ্ঠনাথ দাস,	বালেশ্বর	২৲
„ রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর,	আগরতলা	২৲

১২শ বৎসর।

শ্রীমতী সচীবালা রায়,	বানীবন	২৲
„ ক্ষীরোদা সুন্দরী দত্ত,	কুমিল্লা	২৲
„ সুধাংশুপ্রভা ঘোষ,	কাণপুর	২৲
„ এম্ এল্ গুপ্ত,	হোসেঙ্গাবাদ	২৲
„ নির্ম্মলাসুন্দরী সেন,	পূর্ণিয়া	২৲
„ ইন্দুমতী দাস,	ঢাকা	২৲
„ বিন্দুবাসিনী সেন,	চট্টগ্রাম	২৲
„ কিরণময়ী সেন,	ঢাকা	২৲
„ সুরবালা সেন,	মরিয়াণ	২৲
„ কুমুদিনী সেন,	কলিকাতা	২৲
„ দীনতারিণী দেবী,	ভাগলপুর	২৲
„ হৈমবতী চৌধুরী,	সেরপুর	২৲

শ্রীযুক্ত হরিনাথ নিয়োগী,	পিঙ্গনা	।৹
„ মধুসূদন রাও,	কটক	২৲
„ অমৃতলাল সরকার,	কলিকাতা	২৲
„ রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়,	পুরী	২৲
„ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ,	কটক	২৲
„ অবিনাশচন্দ্র রায়,	ফরুক্কাবাদ	২৲
„ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়,	নারায়ণগঞ্জ	২৲
„ রাজা মহিমরঞ্জন রায়,	কাকিনিয়া	২৲
„ প্রসন্নকুমার চৌধুরী,	বগুরা	২৲
„ জগচ্চন্দ্র রায়	মুন্সিগঞ্জ	২৲
„ মাধবচন্দ্র ঘটক	পাথরাইল	২৲
„ রায় উমাকান্ত দাস,	আগড়তলা	২৲
„ রামলাল	ভাগলপুর	১৲
„ নলিনীবন্ধু ভৌমিক,	ভাগলপুর	১।৶৹

১৩শ বৎসর।

শ্রীমতী নির্ম্মলা সুন্দরী সেন,	পূর্ণিয়া	২৲
„ দীনতারিণী দেবী	ভাগলপুর	২৲
„ হৈমবতী চৌধুরী,	সেরপুর	২৲
শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়,	নারায়ণগঞ্জ	২৲
„ দীননাথ সরকার,	ধুবড়ী	২৲
„ সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার,	পিণ্ডিদাদন খাঁ	২৲
„ মহিমচন্দ্র দে,	কুলুম্বী	১৲

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৩শ ভাগ] কার্ত্তিক ১৩১৪ ; নবেম্বর ১৯০৭। [৪র্থ সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

বিধাতা জননীর উপর শিশুগণের চরিত্রগঠনের ভার অর্পণ করিয়াছেন, এবিষয়ে জননীর গুরুতর দায়িত্ব। কোমল-প্রকৃতি শিশু মাতৃস্তন্য পানের সঙ্গেই তাঁহার চরিত্র ও ভাবভঙ্গি ইত্যাদি আয়ত্ত করে। মাকে খিট্‌খিটে রাগী দেখিলে তাহার স্বভাবও সেই রূপ হয়, মার কোমল ভাব প্রকাশ পাইলে সে কোমলপ্রকৃতি হইয়া-থাকে। স্তন্যপানের সময় শিশু মায়ের মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকে। মায়ের চক্ষু প্রেমার্দ্র মুখমণ্ডল প্রশান্ত ও প্রফুল্ল দেখিলে, তাহার মুখে মধুর হাসি প্রকাশ পায়, সে শান্ত ভাব ধারণ করে; সে তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি দর্শন করিলে ভয়ে কাঁদিয়া উঠে। মায়ের সরলতা ও সত্য-বাদিতায়, শিশু সরল ও সত্যবাদী হয়, তাঁহার কুটিলতা ও অসত্যাচরণে এবং নিষ্ঠুর ব্যবহারে, সে কুটিল, অসত্যাচারী নিষ্ঠুর হইয়া উঠে।

জননী শিশুর প্রথম প্রধান শিক্ষয়িত্রী। তিনি অনেক সময় বালক বালিকা দিগকে নীরবে কেবল নিজের চরিত্র দ্বারা শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। জননীর চরিত্রকে শিশু আদর্শ করিয়া চলে। তাহার পক্ষে উহাই বেদ বেদান্ত।

সুনীতিপরায়ণা সুমাতা সহজে আকার ইঙ্গিতে যেমন শিশুদিগকে নীতি শিক্ষা দিতে পারেন অন্যে শত চেষ্টাতেও সেরূপ শিক্ষাদান করিতে সক্ষম হয় না। প্রত্যেক পরিবার সেই পরিবারস্থ শিশুদিগের প্রথম শিক্ষার পাঠশালা, জননী তাহা-দিগের শিক্ষয়িত্রী। এখানে শিশুদিগকে পুস্তক প'ড়তে হয় না, বড় বড় উপদেশ শুনিতে হয় না। সুমাতার চরিত্রই পুস্তক ও উপদেশ, এখানে নিঃশব্দে শিক্ষাদান ও নিঃশব্দে শিক্ষা প্রাপ্তি হয়। এই বিদ্যালয়ে যে সকল বালক বালিকা ভাল শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাহারা মহাত্মা লোক হইয়া থাকে।

ভারতে ইংরাজরাজত্বে দেশোন্নতি ও নারীজাতির উন্নতি।

তৃতীয়।

বঙ্গদেশ এতকাল জড়প্রায় নিদ্রিত ও নির্জীব ছিল। আজ তাহার জাগ্রত জীবন্ত ভাব। যুবা বৃদ্ধ বালক ও স্ত্রীলোক "স্বদেশ স্বদেশ" বলিয়া মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা শুভলক্ষণ, জীবনের লক্ষণ। মহানামী জীবন্ত পুরুষ ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি বঙ্গ বিভাগরূপ একটি ঢিল ছুড়িয়াছিলেন, তাহাতেই এদেশের এরূপ সজীব ভাব হইয়াছে। উক্ত রাজপ্রতিনিধি নিন্দা কটূক্তিলাভের পরিবর্ত্তে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা পাইবার যোগ্য। তিনি এ কার্য্যটি না করিলে আজ বাঙ্গলা দেশ জাগিয়া উঠিত না, স্বদেশী কাপড়, স্বদেশী লবণ ও স্বদেশী চুরুট ইত্যাদি স্বদেশী দ্রব্যের এত কাটতি হইত না; স্বদেশী শিল্পজাতের উন্নতিসাধনে সকলে এত উৎসাহ ও মত্ততা প্রকাশ করিত না। প্রথমে "বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ হইল" বলিয়া মহা রোল উঠিয়াছিল, কিয়দ্দিনের মধ্যে সেই কোলাহলের নির্ব্বাণ হয়; অঙ্গচ্ছেদ স্বদেশীতে পরিণত হইয়া যায়। এক্ষণ স্বদেশী বস্ত্রাদির উন্নতিসাধন করিয়া স্বদেশের হিতসাধনে স্বদেশপ্রিয় সমস্ত বাঙ্গালী বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। অনেক ভদ্র যুবা স্বহস্তে তাঁত চালাইয়া বস্ত্র বয়ন করিতেছেন, নিজেরা বিলাতী বিলাস দ্রব্য ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন, গরিবাণা চালে চলিতেছেন। অনেকে চাকুরীর মায়াও ছাড়িয়া দিয়াছেন। স্বদেশের জন্য এরূপ ত্যাগস্বীকার সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে। বিলাতী বস্ত্রের অধিকতর কাটতি এবং তাহা সুলভ মূল্যে বিক্রয়ের জন্য এদেশের তাঁতীদের ব্যবসায় এক প্রকার বন্ধ হইয়াছিল, তাহাদের উদরে অন্ন জুটিতেছিল না, তাহারা অন্নাভাবে সপরিবারে হাহাকার করিতেছিল, আজ কাল আর তাহাদের সেরূপ দুঃখের অবস্থা নয়। দেশীয় তাঁতীদের ব্যবসায়ের কথঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে। ইহা জাগ্রত ভাব ও আন্দোলনের ফল। কিন্তু এক্ষণও বস্ত্রবয়নের উপযুক্ত সূত্র এদেশে প্রস্তুত হইতেছেনা, বিলাতী সূতায় স্বদেশী বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে বিশেষ ফল হইতেছে না। বোম্বাইয়ের একজন কাপড়ের কলওয়ালা বড় মানুষ হইল, একজন লোক বড় মানুষ হইলে স্বদেশের আর উন্নতি কি? বাহুল্যরূপে কাপড়ের কল চালাইয়া শস্তাদরে উৎকৃষ্ট কাপড় বিক্রয় করিতে না পারিলে বিলাতের তাঁতীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া উঠা দুষ্কর। দুর্মূল্যে অপকৃষ্ট কাপড় অনুরোধ উপরোধে গরিব লোকেরা কতদিন খরিদ করিতে পারিবে?

দেশী বস্ত্র, দেশী লবণ এবং দেশী চুরুট বিক্রয়ের আধিক্যে স্বদেশের উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইতে পারে না। স্বদেশবাসীদিগের জীবন ও চরিত্রের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবল এ সকল বাহিরের জিনিষে উৎসাহ উদ্যম বদ্ধ রাখিলে স্বদেশের বিশেষ মঙ্গল কি হইতে পারে? বিশেষতঃ এক মণ দুগ্ধে একবিন্দু

গোমূত্র প্রক্ষিপ্ত হইলে যেমন সমস্ত দুগ্ধ বিষাক্ত ও বিকৃত হয়, তদ্রূপ ক্রোধ বিদ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হইয়া কোন সৎকার্য্য করিলে সেইকার্য্যে ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ হয় না; উক্ত কার্য্যে শুভ ফল না হইয়া বরং অশুভ ফল হয়। বালক বালিকাদি ভবিষ্যদ্বংশীয় লোকেরা যদি স্বদেশীয় বস্ত্রাদির উন্নতির চেষ্টার সঙ্গে ইংরাজ রাজা, রাজপুরুষ এবং ইংরাজজাতির প্রতি নিন্দা কটুক্তি ও ক্রোধ বিদ্বেষ উপার্জ্জন করে তাহা হইলে স্বদেশের কল্যাণ কোথায়? স্বীকার করি ইংরাজদিগের বহু দোষ ও ত্রুটি আছে, গুণ কি তদপেক্ষা অধিক নয়? তুমি দোষের জন্য নিন্দা করিবে, গুণের জন্য তাঁহাদের প্রশংসা করিবে না কেন? ইংরাজ জাতি হইতে আমরা যে সকল মহোপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব না কেন? গুণকীর্ত্তন যদি করিতে না পার, করিও না; নিন্দাও করিও না, স্বদেশের কাজ করিয়া যাও। দ্বেষ হিংসা ও নিন্দা কটুক্তির জন্য যত গোলযোগ বাড়িয়াছে, ইহা কি কেহ বুঝিতে পারে না? একটী আখ্যায়িকা স্মরণ হইল;—একটী মোসলমান সাধ্বী নারীর নিকট এক ব্যক্তি মস্তকে পটি বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়া "শিরঃপীড়া হইয়াছে, বিধাতা আমাকে বড় কষ্টে ফেলিয়াছেন" বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার অবস্থা দেখিয়া ও কথা শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার বয়স কত?" সে বলিয়াছিল, "ত্রিশ বৎসর।" তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি এত দিন সুস্থ, না রুগ্ন ছিলে?" সে বলিয়াছিল, "এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আমার আর কখনও কোন রোগ হয় নাই, আমি সুস্থ ছিলাম, এবারই কেবল শিরঃপীড়ায় ক্লেশ পাইতেছি।" ইহা শুনিয়া সাধ্বী বলিলেন, "এত দিন তুমি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন মস্তকে কেন ধারণ কর নাই? যাই একটু অসুখ হইয়াছে নিন্দার চিহ্ন ধারণ করিয়া লোকদিগকে বলিয়া বেড়াইতেছ, তোমার এ কিরূপ স্বভাব?" এত কাল ইংরাজরাজের ও ইংরাজ জাতির নিকটে রাশি রাশি উপকার লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নাই, গুণ সকল আচ্ছাদিত রাখিয়া কেবল কল্পনা-বলে দোষের সৃষ্টি করিয়া বা তিলপ্রমাণ দোষকে তাল প্রমাণ বাড়াইয়া, নিন্দা করিয়া বেড়াইয়া কি কল্যাণ হইবে? অসত্য, অহঙ্কার, কৌশল চতুরতা কোন ব্যাপারে থাকিলে সমুদায় পণ্ড হইয়া যায়। ইহা মনে করিতে হইবে।

মানসিক উন্নতি, জীবনের কল্যাণ হয়, বালক বালিকারা এরূপ কি শিক্ষা পাইতেছে? তাহারা কি দৃষ্টান্ত লাভ করিতেছে? দেশী জিনিষের চিন্তার সঙ্গে তাহাদের মস্তিষ্কে যে ইরাজজাতির প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ প্রবেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে যে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাহাদের মস্তিষ্কে যে কেবল দেশী কাপড় ও দেশী লবণ ইত্যাদির চিন্তার সঙ্গে ইংরাজের প্রতি দ্বেষ হিংসা বিরাজ করিবে। এ দেশের যদি

কখনও মঙ্গল হয় জীবনের উন্নতিতে ধর্ম্মোন্নতিতে হইবে, ভক্তি কৃতজ্ঞতাতে হইবে, এই সকল দেব ভাবের বৃদ্ধিতে হইবে। ইহার বিপরীত ভাব—দৈত্যভাব; অবিনয়, অভক্তি, অকৃতজ্ঞতা। দেবভাবে জাতীর সমুত্থান হয়, দৈত্যভাবে কখনও হয় না। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে শ্রীচৈতন্য হরিনামের আন্দোলনে ও মত্ততায় এ দেশকে নবজীবন দান করিয়াছিলেন, তাঁহার নামকীর্ত্তনের মূল মন্ত্র ছিল, "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়া সদা হরিঃ।" নিজে তৃণের ন্যায় অতিশয় নীচ হইয়া তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া, স্বয়ং অমানী হইয়া অন্যকে মানদানপূর্ব্বক সর্ব্বদা হরিসঙ্কীর্ত্তন করিবে। গর্ব্বিত ভাবে কুৎসা নিন্দা রটনা করিয়া শ্রদ্ধেয় সম্মানিত লোকদিগকে সাধারণের নিকটে ঘৃণিত নিন্দিত ও অপদস্থ করিয়া, প্রকাশ্য স্থানে তাঁহাদের ছবি পর্য্যন্ত পুড়িয়া কি দেশের উদ্ধার হইবে? এ সকল বিলাতী বিকৃত ভাব, এ দেশের উচ্চ ভাব নয়। একদিকে ইংরাজরাজের বিপক্ষকে স্বর্গে তোলা, নিজেরা অশ্বস্থানীয় হইয়া তাহার গাড়ী পর্য্যন্ত টানিয়া মহা ঘটা করিয়া তাহার অভ্যর্থনা করা, আর এক দিকে ইংরাজের সপক্ষকে রসাতলে প্রেরণ করা—তাহার ছবি প্রস্তুত করিয়া গলায় জুতা ঝুলাইয়া হাজার২ লোকের সম্মুখে সেই ছবি পুড়িয়া ফেলা, এই দুই বিলাতের বিকৃত ভাব। অন্তরের এই সকল বিলাতী বিকৃত ভাব বর্জ্জন না করিয়া, কেবল বাহিরে ২।৪টা বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিলে এই পতিত দেশের কি উদ্ধার হইবে? এ দেশের ভাব, ভারতের আর্য্য জাতির ভাব—যোগভক্তি প্রেম কৃতজ্ঞতা, এই পুণ্যভূমি স্থিত আর্য্য পুরুষদিগের ভাব বিনয় বিশ্বাস বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিকতা, এ দেশের ভাব রাজভক্তি। তাহা ছাড়িলে এ দেশের কখনও উন্নতি হইবে না, বরং অবনতি ঘটিবে। মহর্ষি পরাশর যাজ্ঞবল্ক্য, ভক্তাবতংশ শ্রীচৈতন্য, মহামুনি গৌতম ও শ্রীনানক প্রভৃতি আর্য্য মহাপুরুষগণ এ সকল উচ্চ স্বর্গীয় ভাব উপদেশ ও চরিত্রের সুদৃষ্টান্ত দ্বারা বিকীর্ণ করিয়া ভারতে দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পুণ্যাত্মা পূজ্যপাদ আর্য্য মহাপুরুষদিগের পদচিহ্নের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। বিলাতী কুরীতির অনুকরণ করিলে এ দেশের কখনও উদ্ধার হইবে না। স্বদেশীর স্বদেশী ভাবে কার্য্য করা সমুচিত। অন্যথা "স্বদেশী স্বদেশী" বলিয়া চিৎকার করিয়া বেড়ান উপহাসের ব্যাপার।

মহামান্য প্রধান শাসনকর্ত্তা ও রাজপুরুষদিগকে "শুওর, গাধা, পাগল" ইত্যাদি শব্দে গালি না দিয়া, তাঁহাদের দোষ ত্রুটি হইলে ভদ্ররীতিতে সুপ্রণালী মতে প্রদর্শন করিলে শুভ ফল হয়। সকলেই জানেন ইংরাজ জাতি বাণিজ্য প্রধান জাতি। বাণিজ্য প্রভাবেই পৃথিবী মধ্যে তাঁহাদের অতুল ধন সম্পত্তি ও প্রভুত্ব। বাণিজ্যোপলক্ষেই ৮। ১০ হাজার ক্রোশ দূর হইতে সাত সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া তাঁহারা এদেশ অধিকার করিয়াছেন। এ দেশের আধিপত্যে তাঁহাদের বিশেষ স্বার্থ

আছে। তাঁহারা নিঃস্বার্থ দেবতা নহেন। নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করিয়া তাঁহারা এ দেশের যত টা উন্নতিসাধন করিতে পারেন তাহাতে প্রস্তুত। আমরা সামান্যাবস্থাপন্ন লোক। আমরা কি করি? আমরা কি নিঃস্বার্থভাব ও অপক্ষপাতিতার পরিচয় দিয়া থাকি? আফিসে কোন কাজ খালি হইলে তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের যদি পরস্পর সম্বন্ধ থাকে, সচরাচর কি ঘটিয়া থাকে? আফিসের বড় বাবু যে প্রদেশের লোক তিনি সেই দেশের আপনার লোককেই সেই কাজে ভর্ত্তি করিয়া লন। অপর প্রদেশের উপযুক্ত লোককে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করিয়া স্বার্থসাধন করেন। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

কাহারও দোষ প্রদর্শন অন্যায় বলা যায় না। কিন্তু দোষ এইরূপে প্রদর্শন করিতে হইবে যেন দোষী ব্যক্তি ভাল ভাবে গ্রহণ করিয়া তৎসংশোধনে যত্নবান্ হয়। নিন্দা কটূক্তি করিলে কোন পক্ষে শুভ ফল হয় না, যাহার নিন্দা করা যায় সে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়, এবং নিন্দুক ও অধোগতি লাভ করে। রাজা ও রাজপুরুষদিগের দোষ ত্রুটি হইলে তাহা প্রদর্শন আবশ্যক। সভ্য ও সুবিবেচক রাজা ও রাজপুরুষগণ তাহা জানিয়া অম্ন সংশোধনে প্রস্তুত। তজ্জন্য তাঁহারা প্রজা সাধারণকে বলিবার ও লিখিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন। অন্যথা সেই স্বাধীনতা প্রজাকে দান করিতেন না। রাজা ও রাজপ্রতিনিধি এবং রাজপুরুষদিগের শাসনকার্য্যে দোষ প্রদর্শন করিতে হইলে সুপ্রণালী মতে ভদ্র রীতিতে শান্ত ও বিনীত ভাবে বলিলে বা লিখিলে সুফল হয়। গর্ব্বিত ভাবে কতক গুলি পরুষ বাক্য বলিলে, গাল দিলে কে শ্রবণ করিতে প্রস্তুত? তাহাতে অনেক সময়ে হিতে বিপরীত হইয়া থাকে। বিলাতে সহস্র সহস্র ইংরাজ নরনারীর সম্মুখে ভক্ত কেশবচন্দ্র তাঁহাদের ভোজ্য পরিচ্ছদাদির বিষয়ে ব্যাঙ্গোক্তি করিয়াছিলন, এবং ভারতবর্ষে অনেক ইংরাজ দ্বারা যে সকল অত্যাচার হইয়াছিল সদ্ভাবে স্পষ্ট বাক্যে আবেদন বা অভিযোগের ভাবে বলিয়াছিলেন, সকলেই শান্তভাবে মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়াছিলেন, বন্ধুভাবে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভক্ত তাঁহাদিগকে প্রেমভরে হৃদয়ে ধারণ করিয়া যাহা বলিবার বলিয়াছিলেন, বয়টক করিয়া তাঁহাদিগকে দূর করিয়া দেন নাই। তিনি যেমন তাঁহাদের দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার শতগুণ গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। তুমি আমি যদি গুণদর্শনে অন্ধ হইয়া কেবল দোষ খুঁজিয়া নিন্দা করিয়া বেড়াই, তাহার বিষময় ফলভোগ করিতেই হইবে।

হাঁ, আচার্য্য কেশবচন্দ্র এক সময়ে এক ভাবে বলিয়াছিলেন, "তরবারি দ্বারা ভারত শাসন না করিয়া ক্রাইষ্টের spirit এ শাসন করিলে মঙ্গল হইবে।" ক্রাইষ্টের শিষ্য ইংরাজগণ ঠিক ক্রাইষ্টের স্বর্গীয় ভাবে চালিত হইয়া ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন ইহা আমরা বলিতেছি না।

আচার্য্যের উচ্চ উচ্চ উপদেশ তাঁহার সাক্ষাৎ অনুগামী নববিধানবাদী ব্রাহ্মগণও কতটুকু পালন করিয়া চলেন। ক্রাইষ্ট যেমন "শত্রু দক্ষিণ গণ্ডে চড় মারিলে বাম গণ্ডও ফিরাইয়া দিবে, অত্যাচারের প্রতিরোধ করিবে না।" এরূপ উপদেশ দিয়াছেন। আবার তিনি এক দিকে তীব্র ভাবেরও একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। জেরুজিলামের মন্দিরে কতকগুলি লোক দোকান পশার খুলিয়া বসিয়াছিল, তাহা দেখিয়া তিনি "তোরা আমার পিতার গৃহকে সংসার করিয়া তুলিয়াছিস" বলিয়া গালে চড় মারিয়া তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, এবং পণ্যজাত বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া ছিলেন। ক্রাইষ্ট কপট ফিরুসীদিগকে কৃষ্ণ সর্পের বংশধর বলিয়া তীব্র তিরস্কার করিয়াছিলেন। ক্রাইষ্টের এক প্রকার রাজত্ব ছিল, ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব অন্য প্রকার। অত্যাচারী শত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা ও প্রজাপুঞ্জ রক্ষা করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিতে অবস্থা ভেদে তরবারি ধারণ রাজার কর্ত্তব্য হইয়া থাকে।

স্বাধীনতার একটা সীমা আছে, সীমা লঙ্ঘন করিয়া চলিলে উহা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়। দুই চারি জন লোকের দোষে জাতীয় সহস্র সহস্র নির্দ্দোষ লোক দোষী ও নিন্দাভাজন হইয়া থাকে। কতক গুলি লোকের ব্যবহারে সাধারণ বাঙ্গালী জাতি এক্ষণ অশিষ্ট ও অকৃতজ্ঞ বলিয়া ইংরাজ জাতি ও ইংরাজ রাজপুরুষ দিগের নিতান্ত অপ্রিয় ও অবিশ্বাসভাজন এবং ঘৃণাস্পদ হইয়াছে, এরূপ কখনও হয় নাই। ইহাতে কি এদেশের মঙ্গল হইবে? মনে করিতে হইবে যে, ইংরাজ রাজপুরুষ দিগের অনুগ্রহের উপর আমাদের সৌভাগ্য নির্ভর করে, তাঁহাদের অনুগ্রহের অভাবে দুর্ভাগ্য। আমরা একান্ত অধীন প্রজা, আমাদের কোন আধিপত্য ও ক্ষমতা নাই। সকল ক্ষমতা ও আধিপত্য রাজ্যাধিপতির হস্তে। "ইংরাজের রক্তে গঙ্গার জল লাল করিয়া দাও। আমরা বন্দুক ধারণ করিব।" বীর বক্তার এসকল কথা কেবল হাস্যজনক। বন্দুকের পাশ পাইলেত বন্দুক ছুটান হইবে। আমরা বাঙ্গালী তালপাতার সিপাহী, বন্দুকের শব্দেই আমাদের অনেকের [illegible] হয়। রাজবিদ্রোহিতাপরাধে অপরাধী হইয়া কয়েক জন বাঙ্গালী কারাদণ্ড ভোগ করিলে কোন গৌরব নাই, বরং বাঙ্গালীর পক্ষে দুরপনেয় কলঙ্ক। ইংরাজ দিগকে চটাইয়া লাভের মধ্যে এই হইল যে, যে সকল উচ্চ অধিকার আশু আমাদের পাইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা শত বৎসর পশ্চাতে পড়িল। যাহারা মনে করেন নিজেরা রাজা হইয়া ভারত শাসন করিবেন, তাঁহাদের সেই যোগ্যতা ও ক্ষমতা কোথায়? আজ যদি বাঙ্গালীদের লেখা ও বক্তৃতার ধমকে ভয় পাইয়া তাঁহারা নিজেদের সমুদয় কাজ গুটাইয়া এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান, যে পুলিশের কেবল নিন্দা করা হয় সেই পুলিশ ও থানা ইত্যাদি না থাকে, দেখা যায় রাজ্যে কি বিষম ব্যাপার ঘটে? এক জন পুলিশ প্রহরীকে শাসন

করিবার যাঁহাদের ক্ষমতা নাই, তাঁহারা স্বয়ং রাজ্য শাসন করিবেন, ইহা কেবল স্পর্দ্ধা মাত্র। সহস্র বৎসরাবধি পরাধীন ও পরপদদলিত যে জাতি সেই জাতি দুই এক দিনেই জাপ জাতির ন্যায় স্বাধীন ও উন্নত জাতি হইবে, ইহা দুরাশা মাত্র। একার্য্য বক্তৃতার জোরে হইবার নয়। প্রাপ্ত স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিতে না পারায় বক্তা ও সম্পাদক দিগের রসনা ও লেখনীর স্বাধীনতাটুকু গেল। তাহা পূর্ব্বে উদ্ধার করা হউক, পরে রাজ্য শাসন হইবে। একান্ত আতিশয্যের ফল এইরূপ। "অতি দর্পে হতা লঙ্কা।" এদেশের একজন উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত লোক ইয়ুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বলিয়াছেন, ভারত সাম্রাজ্যের শাসনের সুনিয়ম ও প্রজাবর্গের স্বাধীনতা, সেই সকল রাজ্য অপেক্ষা কোনরূপে নিকৃষ্ট নহে, বরং কোন কোন অবস্থায় উৎকৃষ্ট। আমেরিকার যুক্ত রাজ্য ও ফরাসিস রাজ্য Republic সেই দুই রাজ্যের শাসন প্রণালীর সঙ্গেও তুলনা করিয়া তিনি এই কথা বলিয়াছেন।

সাম্রাজ্যের শীর্ষ স্থানীয় প্রজাপুঞ্জের পিতৃস্বরূপ মহামান্য রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো অনুগ্রহপূর্ব্বক বিগত কংগ্রেস সংক্রান্ত প্রদর্শনী মহামেলার দ্বার উদ্ঘাটন করেন, তখন তিনি সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন, "তোমরা স্বদেশের শিল্প ও পণ্যজাতের যথাবিধি উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত থাক, তাহাতে আমাদের সহানুভূতি থাকিবে, আমরা সহায়তা করিব। কিন্তু আমাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিছু করিও না। তাহাতে কল্যাণ হইবে না।" তাঁহার সেই সদুপদেশ সম্পূর্ণ অনাদৃত হইল। তাহার পরেই প্রদর্শনী মেলাতে ও সমিতিতে বিলাতী বর্জ্জনের ভয়ঙ্কর গোলযোগ ঘটিয়াছিল। উক্ত মহা সমিতির মাননীয় বৃদ্ধ অভিজ্ঞ সভাপতি নিজের বক্তৃতায় এরূপ উল্লেখ করিয়াছিলেন, "আমি যতদূর জানি ইংরাজ রাজ উপযুক্ত বোধ করিলে আমাদের প্রাপ্য সকল অধিকার দান করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু রীতিমত আবেদন করিতে হইবে, আন্দোলন শান্তভাবে করা চাই, বিবাদ বিসম্বাদ ও জোর জবরদস্তিতে কিছু হইবে না। কার্য্যতঃ তাঁহার সেই উপদেশও ব্যর্থ হইয়াছে। ইংরাজ রাজা সুবিস্তীর্ণ ভারত সাম্রাজ্যের একছত্র রাজা বলিয়া সমস্ত ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজে ইংরাজী ভাষা প্রচলিত, ভারতের সমুদায় প্রদেশ ও নগর রেলওয়ে দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত, রাজনৈতিক আন্দোলনে রাজা সমুদয় প্রজাকে স্বাধীনতা দান করিয়াছেন, তাহাতেই ভারতের নানা বিভাগ হইতে কংগ্রেস মহাসমিতি উপলক্ষে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক সকল বৎসরান্তে এক স্থানে সম্মিলিত হইয়া ইংরাজী ভাষায় রাজনীতি সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে পরস্পর সমালোচনা করিয়া থাকেন, পরস্পর বন্ধুতা ও একতাসূত্রে বদ্ধ হন। ইহা ভারতে উদার ব্রীটিশশাসন ও একাধিপত্যের ফল। তাহা না হইলে কি এরূপ মহাসমিতি কখনও হইতে পারিত? খরস্রোত

দুস্তর তটিনী, উত্তাল তরঙ্গাকুল দুল্লঙ্ঘ্য সমুদ্র, অভ্রভেদী দুরারোহ শৈলশিখর, ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তু সমাকুল ভীষণ অরণ্যানী, বালুকাকীর্ণ সুদূর প্রসারিত মরুক্ষেত্র সকল ইংরাজেরা অদ্ভুত বিজ্ঞানবলে ও বুদ্ধি কৌশলে তড়িদ্গতি বাষ্পীয় শকট ও বাষ্পীয়পোত এবং সুদৃঢ় সেতু ইত্যাদি যোগে সুগম করিয়াছেন,তজ্জন্যই এই মহা ব্যাপার ভারতে হইতেছে। এইরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার হইতে পারিবে এই প্রকার ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মহাযোগ স্থাপিত হইবে, পূর্ব্বে এদেশের কয় জন লোক কল্পনা করিতে পারিয়াছিল ? দুঃখের বিষয় স্বদেশী গোলযোগে এবার সেই কংগ্রেসও হইতে পারিতেছে না।

যিনি যাহাই বলুন অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থায় পশ্চাৎপদ অনুন্নত পূর্ব্ববঙ্গের নানা বিষয়ে উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। লোকে দশ বৎসরের মধ্যে দেখিবে, সেই প্রদেশের কত শ্রী সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি বিধাতার শুভ দৃষ্টিই বলিতে হইবে। দুই বৎসরের অধিক হইয়া গিয়াছে যে, ঢাকা নগরে রাজধানী হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে বিচ্ছেদের কোন লক্ষণতো লক্ষিত হইতেছে না, পূর্ব্বে যেরূপ উভয় প্রদেশবাসী লোকের মধ্যে সম্মিলিতভাব ছিল, এক্ষণও তাহাই আছে। কি জন্য তবে এরূপ মারামারি হুলুস্থুল ব্যাপার ?

ভীষণ আন্দোলনের স্রোতে পড়িয়া ইংরাজরাজের অধীন দেশীয় অনেক কর্ম্মচারী মানসিক দুর্ব্বলতাবশতঃ আত্ম সম্বরণ করিতে পারেন নাই। যাঁহারা বহুকাল হইতে ইংরাজ রাজকোষের অর্থসাহায্যে সুখে স্বচ্ছন্দে সপরিবারে প্রতিপালিত হইতেছেন, প্রমোশন ও পেন্সনের জন্য রাজানুগ্রহের প্রার্থী আছেন, তাঁহাদের অনেককে রাজবিদ্রোহের ব্যাপারে পূর্ণ রসিক দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল চাকুরী যাইবার ভয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলিতে ও লিখিতে পারিতেছেন না। এরূপ অকৃতজ্ঞতা বড় লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। পিতৃতুল্য ইংরাজ রাজের প্রসাদে লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া মানুষ হইয়া—চিরজীবন তাঁহার অধীনে চাকুরী করিয়া প্রতিপালিত হইয়া উপকার প্রাপ্তির এই কি কৃতজ্ঞতা দান? নববিধানধর্ম্মের অন্যতর মূল মত রাজভক্তি। অনেক নববিধানবাদী লাটসাহেবের নিন্দা করিয়া বেড়ান, রাজভক্তির পরিবর্ত্তে রাজবিদ্বেষ অন্তরে পোষণ করেন, এবং রাজবিরোধী দলের সঙ্গে সহানুভূতি করিয়া চলেন, বড় দুঃখের বিষয়। পূর্ব্ববঙ্গে লাটসাহেবকে অপমান করা, জিলার কর্ত্তা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম অমান্য ও অগ্রাহ্য করা ইত্যাদি অনেক ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, প্রতিফলও ঘটিয়াছে।

আমরা স্বদেশের ভাবী দুঃখ ও দুর্দ্দশা ভাবিয়া অতিশয় ব্যথিত অন্তরে স্বদেশী ভ্রাতা ভগিনীদিগের চরণে কতকগুলি কথা নিবেদন করিলাম, ভরসা করি তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই গুরুতর বিষয়ে

বিশেষ মনোযোগ বিধান করিবেন। স্বীকার করি, তাঁহারা স্বদেশহিতৈষণায় প্রণোদিত হইয়া সমস্ত কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু কার্য্যের প্রণালী ও ভাবের দোষে এবং বুঝিবার ত্রুটিতে স্বদেশের ইষ্ট না হইয়া বরং অনিষ্ট হইতেছে। তাঁহারা দয়া করিয়া বংশধর বালক বালিকাদিগের সুনীতি ও সুশিক্ষার প্রতি, অপিচ নারী জাতির সুকোমল প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। অন্যথা স্বদেশের কল্যাণ বহু শত বৎসর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে। স্বদেশী ভ্রাতৃগণ, স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া আপনাদের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক এই নিবেদন করা গেল। স্বদেশের পরম হিতৈষী-স্বর্গগত ভক্ত কেশবচন্দ্র, টাউনহলে এক সময়ে রাজভক্তিবিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশের অনুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। রাজবিরুদ্ধ আন্দোলনে মত্ত অবিশ্বাসী দলের অন্তরে তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাসের কথাগুলি স্থান পাইবে না, আমরা জানি, কিন্তু তাহা পড়িয়া বিশ্বাসীদিগের উপকার হইবে, এই বিশ্বাস।

"আইনকে গ্রহণ করিব, বিচারকের—মাজিষ্ট্রেকের প্রভুত্বকে মান্য করিব। যাহাতে সুশাসন প্রণালী ও সুব্যবস্থা রক্ষা হয় আমি তাহার চেষ্টা করিব। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না রাজভক্তি ব্যক্তিগত ভাবে পরিণত হয় তত ক্ষণ আমার অন্তঃকরণ তৃপ্ত হইতেছে না। আমরা প্রাচীন হিন্দু জাতির বংশধরগণ, আমাদের পক্ষে সত্যই এইরূপ হওয়া স্বাভাবিক। বহু শতাব্দ হইতে হিন্দুজাতি রাজার প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি দিয়া আসিতেছেন। হিন্দুর নিকট রাজভক্তির অর্থ ব্যক্তিগত ভাবে রাজাকে ভালবাসা ও শাসনবিভাগের কর্ত্তার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা। হিন্দু সন্তান নিজের রাজাকে প্রগাঢ় আনুগত্যের সহিত ভাল বাসেন। হিন্দুর নিকটে রাজাকে বিশ্বাস করার অর্থ রাজভক্তি বা রাজাকে ভালবাসা। হিন্দু গৃহস্থ পিতাকে গৃহ কর্ত্তৃরূপে ভক্তি করেন, এবং ভালবাসার সহিত তাঁহার আজ্ঞা পালন করেন, সেই প্রকার রাজাকে রাজ্যের পিতৃরূপে ভাল বাসেন ও আনন্দের সহিত তাঁহার আজ্ঞা পালন করেন। রাজা যে প্রজাসাধারণের পিতৃস্বরূপ, ইহা প্রধানতঃ হিন্দুভাব। হিন্দুশাস্ত্র তাহার সাক্ষ্য দিতেছে, এবং দেশীয় প্রজা সকলের উচ্ছ্বসিত রাজভক্তি তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। হিন্দু মতই যথার্থ মত। ইহা স্বভাবের অত্যন্ত উপযোগী। ভ্রান্তমতবাদীরা ইহা অস্বীকার করুক, হৃদয়বিহীন কল্পনার সেবকগণ ইহার বিরুদ্ধে বলুক তাহাতে কি? আমি তেজের সহিত বলিতেছি, মনুষ্যের অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ রাজাকে সাধারণের পিতৃরূপে দর্শন করে। তিনি মনুষ্যশ্রেষ্ঠ না হইতে পারেন, তাঁহার শাসনপ্রণালী দোষ-শূন্য না হইতে পারে, তথাপি সাধারণ লোক তাঁহাকে ভক্তি করে। যেমন সন্তান তাহার পিতার দোষ দুর্ব্বলতা বিচার না করিয়া তাঁহাকে ভক্তি করে। রাজ্যের আইন-সঙ্গত অভিভাবকের উপর যে

প্রগাঢ় ভক্তি, তাহা অন্তঃকরণ হইতে দূর করিবার কোন কারণই যথেষ্ট নহে। শান্ত স্বাভাবিক অন্তঃকরণ কখনও রাজনৈতিক কল্পনায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। রাজভক্তি ব্যক্তি-বিহীন ভাব ত্যাগ করে। ইহা একটি ব্যক্তি চায়, সেই ব্যক্তি রাজা কিংবা রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি, যাঁহা হইতে নিয়ম ও রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা হয়। এ বিষয়ে আমার রাজবিশ্বস্ততার যথার্থ অর্থ কেবল আইন ও পার্লেমেণ্টকে মান্য করা নয়, কিন্তু ইংলণ্ডের রাজ্ঞী ও ভারতের সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার উপর ব্যক্তিগত অনুরাগ। কেবল সাংসারিক ভাবে রাজভক্তিতে মন এত সরস হয় না। কিন্তু ইহা গভীর ধর্ম্মভাবের ফল। রাজভক্তির অর্থ, বিধাতাকে বিশ্বাস করা। এই বিশ্বাসই রাজভক্তির মধ্যে এত পবিত্রতা ও গভীরতা আনয়ন করিয়াছে, এবং প্রত্যেক লোকের অন্তরে ও সমাজের মধ্যে এই পবিত্র বৃত্তি স্থাপিত করিয়াছে। তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, ইতিহাসের মধ্যে ঈশ্বর বিদ্যমান? সমস্ত জাতির উন্নতির মধ্যে কি ভগবানের বিশেষ বিধান দেখিতে পাও না? নিশ্চয়ই ভারতে ইংরাজ-শাসনকাল ইতিহাসের একটি সামান্য অধ্যায় নয়। কিন্তু ইহা একটি ধর্ম্মসমাজের ইতিহাস। আমাদের এই সুবিস্তীর্ণ দেশের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উন্নতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে ও ইংরাজের পিতার ন্যায় শাসনে সম্পন্ন হইতেছে। যে পুস্তকে এ কথা লিখিত হয় সত্যই ইহা একটি পবিত্র পুস্তক। ইহাতে আমরা পরিষ্কার দেখিতেছি যে, ভগবানই ইংলণ্ডের দ্বারা ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন।

* * *

হে শিক্ষিত দেশীয়গণ, তোমরা তোমাদের স্বর্গের নিয়োজিত রাজাকে ভক্তি করিতে বাধ্য। তুমি যদি ভক্তি না কর তাহার অর্থ ভয়ানক অকৃতজ্ঞ হওয়া ও ভগবানে অবিশ্বাস করা। যখন তোমাদের দেশ অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে অন্তঃসারশূন্যতায় আচ্ছন্ন ছিল তখন ইংরাজশাসন ঈশ্বরের দূত হইয়া তোমাদের উদ্ধারার্থ আসিয়াছিল, এবং সেই অবস্থা হইতে তোমাদিগকে বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত করিয়াছে। সেই ইংরাজ-শাসনকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য। এই কাজ মানুষের নয়, কিন্তু ঈশ্বরের। ইংরাজ জাতি দ্বারা তিনিই ইহা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার মনোনীত যন্ত্র জানিয়া তোমরা রাজাকে ও সমস্ত শাসনকর্ত্তাদিগকে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত মান্য কর। আমরা যতই অধিক রাজভক্ত হইব তত আমরা আমাদের শাসনকর্ত্তাদের সাহায্যে নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইব। ইহাও ভগবানের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় যে, ভারতবর্ষ তাহার বর্ত্তমান পতিত অবস্থায় ইংলণ্ডের পদতলে বসিয়া বহুদিন পাশ্চাত্য শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিবে। অপর দিকে দেখ, ইংলণ্ড পক্বকেশ ভারতের পদতলে বসিয়া এদেশের প্রাচীন সাহিত্য শিক্ষা করিতেছেন, এবং বৈদিক

ও বৌদ্ধ সাহিত্যের ভিতর হইতে অপ্রকাশিত অমূল্যরত্ন সকল সংগ্রহ করিবার জন্য সমস্ত ইয়ুরোপ ভারতের প্রাচীন বস্তুগুলির দিকে মনোযোগ দিয়াছেন। এই রূপে আমরা ইংলণ্ডের নিকটে বর্ত্তমান বিজ্ঞান শিক্ষা করিতেছি, অপরদিকে ইংলণ্ড ভারতের নিকটে অপর জ্ঞান শিক্ষা করিতেছেন। মহাশয়গণ, ভারতবর্ষ ইংরাজ জাতির আগমনে বিচ্ছিন্ন ভ্রাতাদের মিলন দেখিতে পাই। অর্থাৎ এই দুই জাতি আর্য্য জাতির দুইটি ভিন্ন পরিবার হইতে উদ্ভূত। সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের বিধানে, স্বর্গের সুনিয়মে কতকগুলি মহদুদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য এই ভারতে সেই দুই জাতি মিলিত হইয়াছে। ইংলণ্ড ও ভারত রাজনৈতিক ও সামাজিক নীতিবিষয়ে পরস্পর আদান প্রদান করিয়া যথার্থ উন্নতি ও অক্ষয় গৌরব লাভ করে ভগবানের ইচ্ছা। আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি, রাজকীয় সভাতে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে ও তাঁহার প্রতিনিধিকে এ দেশের রাজা মহারাজগণ মিলিতভাবে সম্মান প্রদান করিয়াছেন। আমরা তখন আরও অধিক আনন্দিত হইব, যখন দেখিব ভারতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা ও জনসাধারণ এবং ইংরাজজাতি একটি বৃহৎ মিলিত দলে সকল রাজার রাজা, সকল প্রভুর প্রভুর সিংহাসনের সম্মুখে মিলিত হইবে। ইংলণ্ড তাহার পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান যথাসাধ্য দান করিয়া আমাদিগকে সেই পূর্ণতার নিকটবর্ত্তী হইতে সাহায্য করুক। ভারতে ইহাই তাহার (স্বর্গের প্রেরিত) কার্য্য। সে যেন এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে। ইংলণ্ড তাহার পরিশ্রম ও শিল্প এবং তাহার কার্য্যকারী বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক দর্শন আমাদিগকে প্রদান করুক যাহা এ দেশের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যে দেশ কুসংস্কার দ্বারা ভয়ানক রূপে আচ্ছন্ন।" ইত্যাদি।

স্বর্গগত ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার শেষ জীবনে বিরচিত "আশীষ" নামক পুস্তকে ইংরাজশাসনবিষয়ে তাঁহার এই রূপ অভিমত ব্যক্ত।

"ইংরাজ শাসন—ইংরাজদিগের ভারত অধিকারকে পরম আশীর্ব্বাদ মনে করি। তাঁহারা এদেশে বহুকাল রাজত্ব করুন, ইহা কামনা করি। হে রাজাধিরাজ হে প্রজাপতি, তোমাকে অভিবাদনপূর্ব্বক স্বীকার করি যে, তুমি আমাদের ভাবী উন্নতির উদ্দেশ্যে আমাদিগকে পরাক্রান্ত ব্রীটিশ সাম্রাজ্যের অধীন করিলে। এই বীর্য্যশালী সর্ব্বত্র জয়ী জাতির নিকটে এত জ্ঞান, সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ শিখিলাম যাহা পূর্ব্বে কখনও জানি নাই। ইহা স্বীকার করিতে পারি না যে, ইহাদের শাসনপ্রণালী যথোচিত পরিমাণে নিঃস্বার্থ কি দোষশূন্য, এবং ইহাও স্বীকারকরি না যে রাজনীতি, লোকহিতৈষণা, ন্যায়, যাথার্থ্য ও সাম্যবিষয়ে শাসনকর্ত্তাদিগের মহা ত্রুটি সময়ে সময়ে লক্ষিত হয় না। এ সকল ত্রুটির ফলভোগে আমরা পুনঃ পুনঃ আহত ও অবসন্ন হই। কিন্তু ইহা

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি যে, এই ইংরাজ জাতির সঙ্গে মিলনে আমাদের ধর্ম্মের আদর্শ উচ্চ হইল, নীতি চরিত্র উচ্চ হইল, সভ্যতা সদাশয়বৃদ্ধি হইল, সামাজিক উন্নতি, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতিবিষয়ক উন্নতি আরম্ভ হইল; পূর্ব্ব পশ্চিমের এরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হইল যাহাতে ভবিষ্যতে কত দিন পরে জানি না, সমুদায় মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক একতা সম্পন্ন হইবে। আমরা যদি এই ইংরাজ জাতির সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলি, যদি তীব্র কুটীল দৃষ্টিতে ক্রমাগত তাঁহাদের দোষানুসন্ধান না করি, তাঁহারা যদি আমাদের সঙ্গে সম্মিলনবিষয়ে উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করেন, যদি তাঁহারা ন্যায়পর সাত্ত্বিক ভাবে আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেন, তবেইত এই মহাবিধান সার্থক হয়। সম্রাট্ ও তাঁহার মহিষীকে ও তাঁহার মন্ত্রীদিগকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা কর, এদেশনিবাসী নানা রাজকীয় কর্ম্মচারী ইংরাজদিগকে ধর্ম্মবুদ্ধি ও লোকসহানুভূতি দাও। এই সাম্রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি দান কর।”

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু অধিবাসী অপেক্ষা মোসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অনেক অধিক। ঢাকার নবাব সাহেব এবং পূর্ব্ববঙ্গের প্রবল মোসলমান দল পূর্ব্ববঙ্গ শাসনের নূতন ব্যবস্থাতে অভিনন্দন করিয়া ষ্টেটস্ সেক্রেটারীর নিকটে এরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন যে, যে প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছে পূর্ব্ববঙ্গের পক্ষে তাহা অতিশয় কল্যাণজনক, ইহা যেন স্থায়ী থাকে। ৭ই অক্টোবর পূর্ব্ববঙ্গে রাজধানীস্থাপনের দিন, সেদিন হিন্দুদিগের যেমন দুঃখপ্রকাশের প্রোসেসনে বাহির হইয়া থাকে, পূর্ব্ববঙ্গের নগরে নগরে আনন্দপ্রকাশের জন্য রাজপথে মোসলমান দলের প্রোসেশন হয়। মোসলমানেরা নিশান উড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে “আল্লাহো আক্‌বর” ধ্বনি করিয়া ময়দানে যাইয়া আনন্দসূচক বক্তৃতাদি করেন।

দেশের উন্নতি ও লোক বৃদ্ধির জন্য পঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণরের কার্য্য বৃদ্ধি হওয়াতে লর্ড কুর্জ্জনের আধিপত্যকালে উক্ত প্রদেশশাসনের জন্য অতিরিক্ত এক জন চীফকমিশনার নিযুক্ত হন। রাউলপিণ্ডি হইতে সীমান্ত প্রদেশ পেশওয়ার পর্য্যন্ত উক্ত চীফকমিশনরের শাসনাধীন হইয়া যায়। “অঙ্গচ্ছেদ হইল” বলিয়া পঞ্জাবী লোকেরা কোন গোলযোগ করেন নাই; পঞ্জাবে কোন বাদ প্রতিবাদ ঘটে নাই। বঙ্গের লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণরের কার্য্যবাহুল্য জন্য এবং অনুন্নত পূর্ব্ববঙ্গের উন্নতিবিধান জন্য পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশ এক জন স্বতন্ত্র লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন হইয়াছে। এবিষয়ে লর্ড কুর্জ্জনের কুটীল অভিসন্ধি ছিল মনে না করিলেই হয়। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গভর্ণর জেনারলের রাজ্যশাসন কালেই স্থির হইয়া গিয়াছিল, ঢাকা ময়মনসিংহ চট্টগ্রাম কুমিল্লা প্রভৃতি কয়েকটি জিলা আসাম চিফকমিশনারের শাসনাধীন থাকিবে। লর্ড কুর্জ্জনের আধিপত্যকালে তৎকর্ত্তৃক তাহা কার্য্যে পরিণত হইতেছিল, তাহাতে প্রজাবৃন্দের নিতান্ত অসন্তোষদর্শনে তিনি পূর্ব্ববঙ্গকে আসাম চীফকমিশনরের অধীন

না করিয়া উভয় প্রদেশকে একজন লেপ্টনেণ্ট গভর্ণরের শাসনাধীন করিতে যত্নবান্ হন, প্রজাদের কোনরূপ অসুবিধা না হয়, এবং পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষ উন্নতি হয় তাহার ব্যবস্থা করেন। তাহাতেও বক্তারা স্থানে স্থানে যাইয়া সভাসমিতি করিয়া প্রতিবাদ ও নানা কটূক্তি নিন্দা করিতে থাকেন। ইহা দেখিয়া তিনি দুঃখ ও বিরক্তির সহিত বলিয়াছিলেন তোমাদের এরূপ একতা ভঙ্গ করিতে হইবে। এই কথাকে ছল করিয়া বক্তারা এবং পত্রিকা সম্পাদকগণ আরও হুলুস্থূল ব্যাপার করিয়া তোলেন।

আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গ সীমান্ত প্রদেশ, এই দুই পরস্পর সংযুক্ত সীমান্ত প্রদেশ একজন গভর্ণরের শাসনাধীন থাকে, প্রধান সেনাপতির একান্ত অনুরোধ ছিল। যেহেতু সীমান্ত প্রদেশে সহসা শত্রুর আক্রমণ ও যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিয়া থাকে। এই পরস্পর সম্মিলিত দুই প্রদেশে দুই জন শাসনকর্ত্তার অধীনে থাকিলে, দুঃ গভর্ণরের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সৈন্য চালনা ও সমরসংক্রান্ত সকল কার্য্যের ব্যবস্থা করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। ইহাও পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামকে একজন শাসনকর্ত্তার অধীন করার অন্যতর কারণ। কিন্তু একই সুপ্রিম গভর্ণমেণ্টের অধীনে পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গ যেরূপ ছিল এক্ষণও তদ্রূপ রহিয়াছে। এত হাহাকার করিবার কোন কারণ নাই। দুই বৎসরের অধিক হইয়া গেল, অঙ্গচ্ছেদ ও বিচ্ছেদের কোন লক্ষণও লক্ষিত হইতেছে না। পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গনিবাসীদিগের মধ্যে পরস্পর যেরূপ সম্মিলন ঘনিষ্ঠতা অভিন্নতা ছিল এক্ষণও তদ্রূপ বিদ্যমান, সমুদয় অক্ষুণ্ণ আছে মূলে কোন বিচ্ছেদ ঘটে নাই, তবে কেন ইংরাজজাতি ও ইংরাজ শাসনকর্ত্তাদের সঙ্গে এত বিবাদ কলহ, দেশে ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত করা হইল?

কথায় বলে "হুজুগে বাঙ্গালী।" বাঙ্গালী কোন হুজুগ পাইলেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া মত্ত হইয়া উঠেন। সম্মতি আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সময়ে, কুচবিহার বিবাহের সময়ে এবং বর্ত্তমান ব্যাপারে তাহা বিশেষ প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহাদের এই সকল ব্যাপারে অন্তঃসারশূন্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কুচবিহার বিবাহোপলক্ষে কতকগুলি লোক ভক্ত কেশবচন্দ্রকে মিছামিছি কত লাঞ্ছনা না করিয়াছিলেন। ভক্তকে নির্য্যাতন করিবার জন্য সেই সময় বাঙ্গলা দেশ জাগিয়া উঠিয়াছিল। বিলাতী কাপড়ে প্রস্তুত সামিয়ানার নীচে বসিব না, বিলাতী চেয়ার ব্যবহার করিব না, এবার বিলাতী দ্রব্যপারত্যাগে এত দূর জিদ। ভাল, বিলাতী জিনিষ ট্রাম ট্রেণ জাহাজ মুদ্রাযন্ত্র বিলাতে মুদ্রিত বিলাতী গ্রন্থকারদিগের কর্ত্তৃক বিরচিত গ্রন্থ এবং বিলাতী ঔষধ অস্ত্র শস্ত্রাদি কোন principle এ ব্যবহার করা হয়? ইংরাজী ভাষাতো খাস বিলাতী? এবিষয়ের সামঞ্জস্য কোথায়? বালকগণ যে, পিতা মাতা শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনের অশাসিত ও অবাধ্য হইল, তাহাদের লেখা পড়ার বিশেষ ক্ষতি হইল, অনেক পিতা

মাতা যে, হাহাকার করিয়া অশ্রুপাত করিতেছেন, তজ্জন্য কে দায়ী? নেতারা কি নহেন? রাজভক্তি স্বদেশী ভাব, রাজার প্রতি বিদ্বেষ, রাজাজ্ঞা অমান্য করা, রাজ-নিয়োজিত লোকদিগকে অগ্রাহ্য করা এ সকল বিলাতী বা বিদেশী ভাব, স্বদেশী হইয়া রাজভক্তির বিরোধী বলাতী ভাবে চালিত হওয়ার অর্থ কি? স্বদেশী কি কেবল কাপড় ও চুরুটে এবং লবণে বদ্ধ থাকিবে?

অবশেষে দুই একটী কথার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে! রাজভক্তিবিষয়ে স্বর্গগত আচার্য্য কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের যে সকল মহাবাক্য উপরে উদ্ধৃত করা হইল, তাহাতে রাজার প্রতি তাঁহার কেমন গভীর ভক্তি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে! কিন্তু তিনি অন্ধ ভক্তির পক্ষপাতী ছিলেন না। রাজা যদি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন, বা অবিচার ও অত্যাচার করেন, তাহা নিবারণের জন্য প্রজা তাহার প্রতিবাদ করিবে, কিন্তু আপনাকে অধীন প্রজা জানিয়া শিষ্ট শান্তভাবে ভদ্র রীতিতে পিতৃভক্ত পুত্র যেমন বিনীত ভাবে পিতার দোষ ত্রুটি প্রদর্শন করে সেই ভাবে প্রতিবাদ করিতে হইবে। তবে শুভফল হইবে। শাস্ত্রীয় উক্তি এই যে "সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে পরাজয় কর।" অসাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে—ক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে পরাজয় করিতে গেলে অসাধুতা ক্রোধাদি বৃদ্ধি পায়।

দেখ ক্রাইষ্ট সক্রেটিস প্রভৃতি জগৎ-পূজ্য মহাত্মারা কেমন রাজানুগত ও রাজভক্ত ছিলেন। ক্রাইষ্ট বলিয়াছেন, "মহারাজ সীজরের যাহা প্রাপ্য, তাহা তাঁহাকে দাও, ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও।" তিনি নিরপরাধী হইয়াও রাজ-প্রতিনিধি পাইলটের আজ্ঞায় ঘোরতর অপরাধীর দণ্ড শিরোধার্য্য করিলেন, ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করিলেন। সক্রেটিস শিষ্যদিগের পরামর্শানুসারে অন্য রাজার রাজ্যে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া রাজাজ্ঞায় বিষপানে প্রাণদানে সম্মত হইলেন। দেবাত্মা মহাপুরুষদিগের রাজার প্রতি কেমন বাধ্যতা ও ভক্তি! আর একটী কথা বলা যাইতেছে। হিন্দু শাস্ত্র বলেন, "অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা লঘুচেতসাং উদার-চরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।" অর্থাৎ ইনি বন্ধু ইনি পর ক্ষুদ্র চেতা লোকদিগের এইরূপ গণনা. কিন্তু উদার চরিত্র লোকের সমস্ত জগৎ আত্মীয়। ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলের এক মহা বাক্যঃ—"প্রীতি দীর্ঘকাল সহ্য-করে, এবং দয়ালু, প্রীতি পরদ্বেষ করে না, প্রীতি আত্মশ্লাঘা করে না, এবং স্ফীত হয় না, উহা অনুচিত ব্যবহার করে না, সহজে ক্রুদ্ধ হয় না, অনিষ্ট চিন্তা করে না, স্বার্থান্বেষণ করে না; অধর্ম্মে আনন্দিত হয় না, কিন্তু সত্যেতেই আনন্দিত হয়, তাবৎ বহন করে, তাবৎ বিশ্বাস করে, তাবৎ আশা করে "এবং তাবৎ সহ্য কর।"

উচ্চৈঃস্বরে "বন্দে মাতরং" উচ্চারণ করিয়া লাঠীচালনায় কিরূপ মাতৃভক্তি

স্বদেশানুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি প্রকাশ পায় বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। এই লাঠী-চালনার ফল এই হইল যে, সমুদায় প্রকাশ্য স্থানে সভা সমিতি ও বক্তৃতা করা বন্ধ হইয়া গেল। সম্প্রতি যেরূপ আইন পাশ হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের কোন গৃহে বিশ জন লোকের অধিক একত্র হইয়া আলোচনাদি করার পথও বন্ধ হইয়া-গিয়াছে। স্বাধীনতা আর কোথায় রহিল? গভর্ণর জেনরেল মহোদয়ের বাথরগঞ্জের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য। ইংরাজগভর্ণমেণ্টের বিরোধী কতিপয় দেশীয় পত্রিকা সম্পাদক বহুকাল হইতে চেষ্টা যত্ন করিয়া ইংরাজ-শাসন ও ইংরাজজাতির বিরুদ্ধে নানা কথা লিখিয়া ছোট ছোট বালকগুলিকে পর্য্যন্ত অস্বাভাবিক Politics করিয়া তুলিয়াছেন। যেমন আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের উপর আক্রমণ অনেক কাল লেখা লিখি ও যত্ন চেষ্টায় হইয়াছে ইহাও সেইরূপ।

যাঁহাদের দ্বারা এদেশের নানা বিষয়ের সংস্কার ও উন্নতি হইয়াছে, যাঁহাদের নিকটে এদেশ অশেষ ঋণে ঋণী। সেই পরমোপকারী ইংরাজেরা আমাদের শত্রু, আমরা তাঁহাদের সঙ্গে যোগ রাখিব না, বয়কট করিয়া তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিব, কেবল সঙ্কীর্ণ বঙ্গদেশে ও ক্ষুদ্র বাঙ্গালী জাতির মধ্যে বদ্ধ থাকিব, ইহা কি প্রেম, উদারতা ও স্বদেশী ভাব! কিছু দিন হইতে কলিকাতা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, এস্থানে কোথাও সভা সমিতি বক্তৃতাদি করিবার হুকুম নাই। শ্রুত হইল বিলা-তের ভাল ভাল প্রধান প্রধান লোক এই আন্দোলনের ব্যাপারে বাঙ্গলী জাতির প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। ইংরাজ রাজপুরুষদের নিকটে ব্রাহ্মগণ বিশ্বাসভাজন ছিলেন, এবার তাঁহারাও সেই বিশ্বাসটুকু হারাইয়াছেন। কুচবিহার বিবাহের ঝড়ে যেমন বড় বড় ব্রাহ্মের পতন হইয়াছিল, এবার রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝড়েও সেই দশা ঘটিয়াছে। অবিশ্বাসী অপরিণাম-দর্শী লোকেরা রাজবিদ্বেষ ও রাজবিদ্রোহিতার উদ্দীপক যে সকল লেখা সংবাদ পত্রে প্রকাশ করেন, ব্রাহ্ম যুবকদিগের তো কথা নাই, অনেক বড় বড় ব্রাহ্ম প্রত্যহ তাহা গভীর ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠের ন্যায় মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন। ইহা বড় দুঃখের বিষয়।

লোকে বলে আমরা স্বদেশীর বিরোধী, ইহা মিথ্যা কথা। বরং আমরা স্বদেশীর বিশেষ পক্ষপাতী, কিন্তু স্বদেশের অনিষ্ট-জনক বিকৃত স্বদেশীর বিরোধী।

একটী উৎকলকন্যার কার্য্যোদ্যম।

অনেক বঙ্গ মহিলাই ভাল লেখা পড়া শিখিয়াছেন, কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছেন, অনেক প্রকার যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি প্রায়ই বিশেষ কাজে আসিতেছে না। তাঁহারা তাহাদ্বারা না দেশের কল্যাণ, না নিজের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। তাঁহাদের নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহে, পার্থিব সুখপ্রিয়তায় ও বিজাতীয় আলস্যে সমুদায়

সম্মুখে চাপা পড়িয়া যাইতেছে। আমরা গত বারে "কটকে নব প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়" শীর্ষক প্রবন্ধে একটী উৎকল কন্যার অসাধারণ উৎসাহ ও কার্য্যোদ্যমের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তিনি বাহিরে কাহারও নিকটে কোনরূপ উৎসাহ না পাইয়া বরং নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন পাইয়া, স্বদেশীয় কন্যাদিগের মধ্যে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিবার জন্য কেমন প্রাণ মন সমর্পণপূর্ব্বক কার্য্য করিতেছেন, ইহা সামান্য উচ্চ দৃষ্টান্ত নয়। কন্যা প্রতিদিন উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য ও তত্ত্বাবধানের কার্য্য করেন, ছাত্রী-নিবাসে স্থিতি করিয়া ছাত্রীদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। ভালরূপে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া স্বয়ং ছাত্রীদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দান করিবেন উদ্দেশ্যে, প্রত্যহ তিন ঘণ্টাকাল ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা করেন। দুই ঘণ্টা নিজ-গর্ভজাত বালক বালিকার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। তাহারা প্রায় এক মাইল দূরে স্বতন্ত্র আলয়ে স্থিতি করে। কন্যাকে সেখানে যাইতে হয়। তাঁহার শরীর সুস্থ ও সবল নয়, অথচ তিনি এতগুলি কার্য্য প্রতিদিন উৎসাহসহকারে সম্পাদন করেন। তাহা ছাড়া সময়ে সময়ে গদ্য পদ্য প্রবন্ধাদি লেখেন। বাঙ্গলা দেশের অনেক বিদূষী কন্যা কেবল আলস্যে বসিয়া ও গল্প করিয়া জীবন যাপন করেন, তাঁহারা দেহ-সজ্জা ও কাপড় চোপড় লইয়া দিবা রাত্রি ব্যস্ত থাকেন। "আমার অবকাশ নাই, সময় হইয়া উঠে না।" তাঁহাদের মুখে এই কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। অথচ অনেকেই রন্ধন পরিবেশন গৃহকর্ম্মাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রায় কিছুই করেন না। তাঁহাদের যেন জগতের জন্য কিছুই করিবার নাই। কর্ত্তব্য বিমুখ দায়িত্ববিহীন জীবন বড় দুঃখকর।

আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত—বর্ম্মদেশ।

৯ম।

রেঙ্গুণ নগর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রেঙ্গুণে বিষয় কর্ম্মাদি উপলক্ষে শত শত বাঙ্গালী বাবু বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে ধনে মানে সর্ব্বাপেক্ষা বড় লোক পি, সি, সেন (পূর্ণচন্দ্র সেন)। ইঁহার জন্ম স্থান চট্টগ্রাম। পি, সি, সেন বহুকাল হইতে রেঙ্গুণে বাস করিতেছেন, ইনি এক জন খ্যাতিমান্ বারিষ্টার ছিলেন, এক্ষণ অন্যতর উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। সম্প্রতি সেন সাহেব নগরের প্রান্তে সুন্দর বাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেস্থানে সপরিবারে বাস করিতেছেন। স্বর্গগত আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠা কন্যা তাঁহার পুত্র বধূ। স্নেহের কন্যা স্বামিসহ শ্বশুরালয়ে থাকেন। ২৯শে ফাল্গুন বুধবার অপরাহ্ণে ডাক্তার মজুমদারের সমভিব্যাহারে তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া হইয়াছিল। সেন সাহেব ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। রেঙ্গুণব্রাহ্মসমাজের জন্য একটি মন্দিরনির্ম্মাণের প্রস্তাব করিয়া সেন

ব্রহ্ম দেশীয় রমণী।

সাহেবের সহানুভূতি প্রার্থনা করা গিয়াছিল, সহানুভূতি পাওয়া যায় নাই। ১লা চৈত্র শুক্রবার মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রণানুসারে সেই গৃহে পুনর্ব্বার যাইতে হইয়াছিল। গৃহের ছাদের উপর উপাসনার জন্য একটি সুন্দর ঘর আছে, সেই উপাসনালয়ে উপাসনা করা গিয়াছিল। আচার্য্যের কন্যা ও তাঁহার এক ননদ তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। সঙ্গীতের কার্য্য আচার্য্যকন্যা দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছিল। শ্রুত হইল প্রতিদিন একা তিনি সেই গৃহে উপাসনা করেন। রবিবার দিন পারিবারিক সম্মিলিত উপাসনা হয়। আমরা উপাসনা ও ভোজনান্তে ডাক্তার মজুমদারের আবাসে প্রত্যাগমন করি। ৩০শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রেঙ্গুণের ব্রাহ্ম সমাজগৃহে "নির্ব্বাণ ও সংসার" বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। ৩রা চৈত্র রবিবার অপরাহ্নে রেঙ্গুনস্থ বেঙ্গল ক্লাব গৃহে ধর্ম্মের ক্রমোন্নতিবিষয়ে বক্তৃতা এবং সায়ংকালে সমাজগৃহে সামাজিক উপাসনা হইয়াছিল। বক্তৃতায় সেন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন, এরূপ নির্দ্ধারিত ছিল; কিন্তু তিনি উপস্থিত হন নাই, আসিবেন না যে কোন সংবাদও পাঠান নাই। নির্দ্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করা গিয়াছিল।

বাবু হৃদয়নাথ রাহা রেঙ্গুণব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন, তাঁহার উৎসাহ উদ্যম ও সমাজের উন্নতিসাধনে আগ্রহ ও ব্যস্ততা দেখিয়া আমরা অতিশয় প্রীত হইয়া ছিলাম। তিনি স্বয়ং বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া বক্তৃতা শুনিবার জন্য অনেক বাঙ্গালী বাবুকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমরা কলিকাতায় প্রত্যাগমন করার কিয়দ্দিন পরেই সংবাদ প্রাপ্ত হই যে, তিনি প্লেগাক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে তাঁহার একটি বালিকা ও একটি শিশু পুত্র উক্ত মহামারীতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। তাঁহার শোকার্ত্তা অপরিণতবয়স্কা নিরাশ্রয়া পত্নী এই আকস্মিক দুর্ঘটনার পর রেঙ্গুণ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া আসিয়াছেন। যশোহরের জেলায় হৃদয়নাথের জন্ম স্থান, তাঁহার পত্নীর নানা বিষয়ে উন্নতিসাধনে বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল, স্বামী স্ত্রী উভয়ে প্রগাঢ় প্রণয়ে বদ্ধ ছিলেন। বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায়ের মর্ম্ম কে বুঝিতে পারে? মঙ্গলময় পরলোক গত আত্মাকে আপনার শান্তি ক্রোড়ে রক্ষা করুন। অনাথার শোকার্ত্ত হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করুন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নানা প্রকার যত্ন চেষ্টা করিয়াও প্লেগরাক্ষসের আক্রমণ হইতে বর্ম্মদেশকে বিশেষতঃ রেঙ্গুণ নগরকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। প্লেগ পরীক্ষার জন্য জাহাজের সাধারণ আরোহীদিগকে রেঙ্গুণে যে, কত নাকালই না হইতে হয়। প্লেগ নিবারণের সকল উপায় পণ্ড হইয়াছে।

বিগত ৪ঠা চৈত্র সোমবার অপরাহ্ণ

২টার সময় টেরভানামক অর্ণবপোতা-রোহণে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিব, পুষ্পমালা দেবী আমাদের যাত্রার আয়োজন করিয়া দিবেন এরূপ স্থির ছিল। পূর্ব্ব দিন রবিবার বারষ্ট্রীট তাঁহার গৃহে যাইয়া স্থিতি করা যায়। তিনি জাহাজে আমাদের চারি দিন ভোজনের ও জল খাওয়ার সমস্ত খাদ্য দ্রব্য যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া আমাদের সঙ্গে দিয়াছিলেন। শ্রীমতী পুষ্পমালা প্রসিদ্ধ অ্যাডভোকেট শিবায়ের সহধর্ম্মিণী। তিনি মহিলার পাঠিকাদিগের নিকটে অপরিচিত নহেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত সকল কিছু দিন পূর্ব্বে পাঠিকাগণ মহিলাতে পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। জাহাজে কি প্রকারে আমাদের স্থিতি ও আহারাদি হইয়াছিল, পরে বিবৃত হইবে। আমরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাহাজ ঘাটে চলিয়া যাই। পূর্ব্ব দিনই হৃদয়নাথ এক খানা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট খরিদ করিয়া আনিয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তার প্রসন্নকুমার মজুমদার এবং আমাদের দেশস্থ একটি আত্মীয় যুবা জাহাজ ঘাট পর্য্যন্ত পঁহুছাইয়া দিয়া আইলেন।

নারীপ্রধান বর্ম্মদেশস্থ নারীসম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা কহিয়া বর্ম্মদেশের ভ্রমণবৃত্তান্তের উপসংহার করা যাইতেছে। সাধারণতঃ এদেশের লোকের সংস্কার যে, বর্ম্মরমণীগণ নিতান্ত চরিত্রহীনা, তাহাদের চলা ফিরার বিজাতীয় স্বাধীনতা দেখিয়া ভিন্ন দেশীয় লোকের এরূপ সংস্কার হওয়া আশ্চর্য্য নহে। আমাদের দেশের যুবতীগণ পুরুষ মণ্ডলীতে এরূপ স্বাধীন ভাবে চলিলে কত যে, চরিত্রের স্খলন ও কত বিপদ হইত! কিন্তু সেদেশে সেরূপ বড় ঘটে না। কোন বিদেশী পুরুষ বর্ম্মদেশীয় যুবতীর সঙ্গে ঠাট্টা আমোদে প্রবৃত্ত হইলে রমণী সচরাচর তীব্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে গাল দিয়া বলে, "সাগর ভাসানে, দেশে তোর মরবার স্থান ছিল না, তুই আমাদের দেশে মরতে এসেছিস।" গাল খাইয়া তাহার মুখ চুণ হইয়া যায়। তবে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাহাদের বিবাহবন্ধন বড় শিথিল, বিবাহের গুরুত্ব বোধ নাই। বিবাহোপলক্ষে কোনরূপ ঘটা হয় না; যত ঘটা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে। আমাদের দেশের বড় ঘরের বর চারি ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া মহা বাদ্যোদ্যম লোকজন সমারোহ সহকারে কন্যার পিত্রালয়ে বিবাহ করিতে যান, সেদেশে বড় পরিবারের শব সুসজ্জিত চৌঘুড়ীতে বা আট ঘোড়ার গাড়ীতে স্থাপন করিয়া বন্ধুবান্ধবগণ নানা প্রকার বাদ্য ও নৃত্য সহকারে মহাঘটা করিয়া শ্মশান ক্ষেত্রে গোর দিবার জন্য লইয়া যায়। সেদেশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রসেশন আর আমাদের দেশের বরযাত্রা তুল্য। আমাদের দেশে বিবাহ সভায় মহা আনন্দ ও লোকের সমারোহ হয়, শ্মশানক্ষেত্রে কয়েক জন শ্মশানবন্ধুমাত্র, বিষণ্ণ বদনে গমন করিয়া থাকেন, সেদেশের বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বর কন্যার বিবাহসভা, হয় না বলা যায়। এক প্রকার গান্ধর্ব্ব বিবাহ হয় শ্মশানক্ষেত্রে শব সমাহিত করার সময়, ধর্ম্মযাজক ফুঙ্গিগণ, শত শত

সুসজ্জিত বন্ধু বান্ধব স্ত্রী পুরুষ উপস্থিত হইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান, মন্ত্রপাঠ ও প্রার্থনাদি করেন। সেখানে নানা প্রকার দানাদি হয়। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে বর্ম্মা রমণীগণ অতিশয় চুরুট সেবন করেন। হস্তে চুরুট বিবৃত যে রমণীর ছবি প্রকাশিত হইল, সেইরূপ চুরুট মুলী বাঁশের ন্যায় মোটা, প্রায় এক ফুট লম্বা হয়।

বিগত ভাদ্র মাসের মহিলায় একটি ছবি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে বর্ম্মদেশীয় "নর্ত্তকী" বলিয়া লেখা গিয়াছে, উহা ভুল হইয়াছে। উহা রাজবেশে অভিনয়কারী একটী অভিনেতা বালক। আশ্বিন মাসের মহিলাতে মেণ্ডালয় নগরের একটি দারুময় গৃহের ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। উহা তথাকার ফুঙ্গি চাঁওয়ের ছবি। ভিক্ষান্নভোজী ফুঙ্গি সন্ন্যাসী সেই রাজপ্রাসাদতুল্য গৃহে বাস করেন।

সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকৃতি।

(বালক বালিকাদের জন্য।)

কলিকাতাস্থ নববিধান মণ্ডলীর কতিপয় কৃতবিদ্য যুবক প্রকৃতির ভিতর দিয়া বালক বালিকাদিগকে সুনীতি ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সহজ সহজ জ্ঞান শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে "প্রকৃতি" প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা ইহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। প্রকৃতি উৎকৃষ্ট রূপে উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। প্রবন্ধ সকলও বালক বালিকাদের বিশেষ উপযোগী সুপাঠ্য। প্রণাম, আমন্ত্রণ, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, এক প্রকারের মক্ষিকা, নাকেখৎ, আমাদের দেশের কথা, চুহাদ্দুপা জানয়ারের স্কুল, চারিটি পরি, সংবাদ, ধাঁদা এই কয়েকটি বিষয় প্রকৃতির প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রণাম, আমন্ত্রণ, নাকেখৎ, চারিটি পরি পদ্যে লিখিত। পদ্যগুলি বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে। প্রকৃতিতে ছয়টি হাফ টোন ছবি সংযুক্ত। প্রথম ছবি তুষারমণ্ডিত হিমালয়—২৯০০২ উচ্চ গৌরী শৃঙ্গ। প্রকৃতির জন্য বহু যত্ন ও অর্থব্যয় হইতেছে। ইহার মূল্য সামান্য, ডাক মাশুলসহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ মাত্র। প্রকৃতির ২য় সংখ্যাও প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে কয়েকটী সুন্দর ছবি আছে, তন্মধ্যে প্রকৃতি দেবীর ছবিটি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। এই দ্বিতীয় সংখ্যাতে একটী মহিলার গদ্য ও পদ্য দুইটী প্রবন্ধ আছে। সম্পাদক ও তাঁহার সহকর্ত্তারিগণ ভরসা করি এরূপ যত্ন করিবেন যেন বালক বালিকারা প্রকৃতি পড়িয়া প্রাকৃতিক জ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃতিপতি পরমেশ্বরের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। তাঁহারা যেন বাহ্য প্রকৃতির বিষয় বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দান করিতে যাইয়া ঈশ্বরের মহিমা ও করুণা এবং তাঁহার জ্ঞান কৌশল বুঝাইয়া দেন। প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতিপতিকে ব্যক্ত না করিলে শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে না। আজ কালের শিক্ষার ন্যায় নিরীশ্বর শিক্ষা হইবে। ভরসা করি আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে।

মহিলার পাঠিকাদিগের প্রতি আমা-

দের এই অনুরোধ যে, তাঁহারা যেন নিজ নিজ বালক বালিকার জন্য এই সুলভ মূল্যের সুন্দর পত্রিকা এক এক খানা গ্রহণ করেন। ৵১০ পাঠাইলে নমুনাস্বরূপ এক খানা প্রকৃতি পাইতে পারিবেন। প্রকৃতি কার্য্যালয়ের ঠিকানা, ৮২নং হ্যারিসন রোড।

আমেরিকাযাত্রিকের পত্র।

৭ই আগষ্ট।

পরশু রাত্রি থেকে খুব ঝড় বইচে। বাতাসের শব্দে আর সমুদ্রের মহা গর্জ্জনে কাণে কথা শোনা যায় না। মাঝে মাঝে বড় বড় ঢেউ এসে ডেক্ ধুয়ে দিয়ে যাচ্চে, অথচ জল থেকে ডেক্ প্রায় দোতালা উচ্চ। কিন্তু এতে কোনও ভয় নেই, বরং খুব মজা। ডেকে দাঁড়িয়ে জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে দোল খেতে এবং মাঝে মাঝে আছাড় খেতে বড় আমোদ; আর সমুদ্রের যে গম্ভীর ভয়ঙ্কর দৃশ্য তার সঙ্গে একটা সৌন্দর্য্যও মেশানো আছে, তা দেখতে দেখতে নিজেকে ভুলে যেতে হয়। বড় বড় ঢেউ গুলি ঠিক যেন এক একটা পাহাড়, আর তার ওপরকার শাদা দুধের মত ফেণা গুলি যেন হিমালয়ের মাথায় বরফের মুকুট, এই রকম "রজত বিমল অরুণ কিরণে ঝলমল" মুকুট পরা কত লক্ষ কোটী পাহাড় সমস্ত সমুদ্দুরের বুক জুড়ে একবার উঠ্‌ছে আর অমনি ভেঙ্গে পড়ছে; একি কম ব্যাপার! বড় অদ্ভুত, মহা সৌন্দর্য্য পূর্ণ দৃশ্য। ঢেউগুলি যখন খুব উচ্চ হ'য়ে উঠে ভেঙ্গে প'ড়তে আরম্ভ করে তখন বড় শোভা হয়। ঢেউএর ঠিক চূড়োর ওপরকার জলটা প্রথমে ঘন নীল থেকে ফিকে সবুজে পরিণত হয়, আর তখুনি সাদা পশমের মত ফেণা হ'যে গড়িয়ে পড়ে এবং খানিকটা বাতাসের আগে উড়ে যায়। আর এর ওপরে যখন সূর্য্যকিরণ পড়ে, নানান রংএর আভা ফুটিয়ে তোলে, তখন যে শোভা হয় তা কি মুখে বলা যায়? তাতো মনে বোঝা যায় মাত্তোর, কিন্তু তাতেও কি সে শোভার গভীরে সম্পূর্ণ পৌঁছুনো যায়? এই শোভার গভীরে এই শোভার আধার হ'য়ে যে বস্তু আছে, যার ওপরে এই শোভা আলোকের রশ্মির মত দীপ্ত হ'য়ে সেই বস্তুকে প্রকাশ ক'রতে চায়, সে বস্তুতে মানুষ কতদূর আর ডুবতে পারে? সে বস্তুকে যে মানুষ "যত জানে তত জানে না।"

ভালকথা, সেদিন অসংখ্য ফ্লাইংফিশ (উড্ডডীয়মান মৎস্য) দলে দলে উড়তে দেখেছি। সে আবার আর এক মজার দৃশ্য। একটী মাছ ডেকে উড়ে পড়েছিল, একটী মেম তক্ষুনি সেটা ধ'রে ফেললেন।

এতদিন পরে আজ জমি দেখতে পেলাম। খানিক আগে একজন চেঁচিয়ে উঠ্‌লো "Land" অমনি দলে দলে সব জাহাজের বাঁ দিকে ছুটে গিয়ে দেখি আফ্রিকার উপকূল। সমুদ্র থেকে পাহাড় সোজা ভাবে উঠেছে। আমরা দূরবীণ দিয়ে দেখলাম্ তাতে খালি বালি আর পাথর,

আর কিছু নেই। গরম হাওয়া বৈচে, দেখতে দেখতে খুব গরম হ'য়ে উঠলো। আমরা আফ্রিকার উপকূল থেকে ৩ মাইল দূর দিয়ে যা'চ্চ।

৯ই আগষ্ট।

কাল রাত্তিরে আমরা বেবলমেণ্ড পার হয়ে এসেছি, এখন রেডসীতে চ'লেছি। আজ খুব গরম বোধ হ'চ্চে, এবং মরুভূমির শুক্‌নো হাওয়া গরম, আরও গরম ক'রে তুলেছে। আজ কিন্তু বড় সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাচ্চি। আমাদের জাহাজের পাশ দিয়ে কত জাহাজ দেশের দিকে চ'লে গেল, আমি আমার দূরবীণ দিয়ে দেখছিলাম, ভারি সুন্দর দেখতে। সব চেয়ে সুন্দর লাইট হাউস্ গুলি। সমুদ্রের মাঝখান থেকে একটা একটা মাঝে মাঝে পাহাড় উঠেছে, তার ওপরে monument এর মতন লাল রং করা লাইট হাউস গুলি দাঁড়িয়ে আছে, লাইট হাউসের পাশেই, হাউসকিপারের ছোট বাড়ী, বড় সুন্দর দেখতে, কিন্তু যে লোকটী ওখানে থাকে তার অবস্থা পৃথিবীর সাধারণ লোকের অবস্থা হ'তে কত তফাৎ; সে কেমন ক'রে তার দিন কাটায়? গ্রেসডারলিং কেমন ক'রে তাঁরা দিন কাটাতেন? বড়ই সুন্দর, কিন্তু নির্জ্জনতায় একটা ক্ষীণ দুঃখের রেখা মেশানো এই Light houseএর দৃশ্য।

আমি বেশ আছি। প্রণাম করি।

স্নেহের বিনয়—

আকস্মিক ঘটনা ও সামান্য রোগাদির গৃহচিকিৎসা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এখানে বুঝিয়া রাখা আবশ্যক যে, কোন ঔষধীয় দ্রব্যাদি প্রয়োগ করিয়া রক্ত বন্ধ করা অপেক্ষা জল, বরফ, শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা চাপ ইত্যাদি উপায়ই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। তাহাতে পরবর্ত্তী চিকিৎসার পক্ষে সুবিধা হয়। রক্ত বন্ধ করিবার জন্য ক্ষত স্থানে ঔষধাদি লাগালো পরে, ক্ষতারোগ্যকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময়ে উহা পরিষ্কার করিয়া ফেলা আবশ্যক হয়, অনেক সময় তাহা করিতে গিয়া পুনর্ব্বার রক্তপাত হয়, এবং না করিলেও ক্ষত আরোগ্য হইতে বিলম্ব হয়।

সামান্য ক্ষতেতে উহাকে পরিষ্কার করিয়া অর্থাৎ মৃত্তিকা, বালি, কোন দ্রব্যাদির ক্ষুদ্র কণিকা বা ছুঁচো উহাতে থাকিতে না পারে এইরূপ করিয়া কেবল মাত্র শীতল জলের পটী দিয়া রাখিলে উহা আরোগ্য হইয়া যায়।

অধিক রূপে ক্ষত হইলে ৬০ ফোঁটা কার্ব্বলিক এসিড ১০ ছটাক বা ২০ আউন্স (একটী বড় কাল বোতলে যতটা ধরে) গরম জলের সহিত উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা ক্ষত স্থান পরিষ্কার করিয়া ক্ষত স্থানে তাহারই পটী দিবে, এই পটীর উপরে নারিকেল বা তিল তৈলের আর একটী পটী দিবে। তৈলের সঙ্গে কিঞ্চিৎ (৬০ ফোঁটা কাঃ এসিড এক ছটাক তৈল এই পরিমাণে)

কার্ব্বলিক এসিড মিশ্রিত করিয়া লইলে ভাল হয়। এই তৈলের পটীর উপরে একখণ্ড কচি কলাপাতা রাখিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিবে। এইরূপে প্রতিদিন একবার করিয়া পটী দিলে ক্ষত শীঘ্রই শুখাইয়া যাইবে।

ক্রমশঃ।

মহিলাদিগের রচনা।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

(বাঁকিপুর হইতে প্রাপ্ত।)

শ্রীআচার্য্যের প্রার্থনা হইতে পদ্যে পরিবর্ত্তিত।

ওহে স্নেহময় পিতঃ অধমতারণ,
বঙ্গে শুভদিন আজি "ভ্রাতৃসম্বর্দ্ধন।"
ভগ্নীদল ভ্রাতৃগণে করে সমাদর,
ভ্রাতৃ-প্রেমে মগ্ন আজি ভগিনী-অন্তর,
ব্রাহ্ম মোরা আসিয়াছি প্রেমের খাতিরে,
প্রেমময় বলি তোমা ডাকি নত শিরে,
তবে কেন ভ্রাতৃ-প্রেম বল দিন দিন,
অন্তরে মোদের যেন হইতেছে ক্ষীণ ?
ভ্রাতৃ-প্রেম যদি প্রভো, হ্রাস হ'য়ে যায়,
তা হ'লেত ভালবাসা হয় না তোমায়,
পিতা, মাতা ব'লে যারা ডাকিছে তোমায়
বিচ্ছেদ, অপ্রেম তায় নাহি স্থান পায়,
দেখ আজ পিতঃ, তুমি বঙ্গের আলয়ে
ভাই ভগ্নী মিলে আজ পবিত্র প্রণয়ে,
হিন্দুর সমাজে আজ করি নমস্কার,
এ পবিত্র প্রেম-চিত্র প্রতিষ্ঠা যাহার,
বুঝেছিল বঙ্গদেশ ভ্রাতার গৌরব,
বুঝেছিল শাস্ত্রকার ইহার সৌরভ,
ভগিনী বসিয়া করেন ভ্রাতার আদর—
এ দৃশ্য এ বঙ্গধামে কেমন সুন্দর।
দীন দুঃখী ভগ্নী দল আজি বঙ্গ দেশে,
ভাইয়ের ললাটে ফোঁটা দেয় হেসে হেসে,
পবিত্র স্বর্গীয় এই ভগিনী-প্রণয়,
ভাই ব'লে ডেকে কিবা হয় সুখোদয়,
বিধানবিশ্বাসী মোরা ওহে দয়াময়,
কর প্রতিষ্ঠিত এই পবিত্র প্রণয়।
ভগিনী চিন্ময় নাথ,—ভাই কিবা ধন,
ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিক্ ভগ্নীজন।
স্বর্গীয় এই "ভাই ফোঁটা" বঙ্গের আলয়ে
ধন্য আজ ভগ্নীদল ভাইফোঁটা দিয়ে,
একের ফোঁটায় হয় সবার আদর
স্বর্গে শঙ্খধ্বনি আজ "ভ্রাতৃ সমাদর"
বল কবে বল নাথ, সেই দিন হবে
ভাই এসে ভগ্নীরূপে তা'রে ফোটা দেবে
বল কবে সেই দৃশ্য হবে বিশ্বময়
ভগিনীরে দিবে ফোঁটা ভাই সমুদয়।

কে শিখাল তোরে—

কে শিখাল তোরে নন, কে শিখাল তোরে
সুধামাখা রব, অমিয় যাহাতে ঝরে,
সুধা মাখা মাখা বুলি,
সুধা মাখা হাতে তালি,
সুধা মাখা হাসাহাসি, সুধা মাখা সব,
কে শিখাল তো'রে নন, সুধা মাখা রব॥
যখনি তোমার মুখে,
অমৃত নির্ঝর ছোটে,
হাসির লহরী উঠে, অমৃতে গড়িয়া,
দেখিয়া সবার প্রাণ, যায় রে গলিয়া॥
কে দেয় তোমারে নন, এ সব শিখাইয়া।

এত গুন কার আছে,
এত তোকে কে শিখাহে,
যা শিখে তুই রে নন, ভুলাস সকলে,
যা দেখে তোরে রে নন, সবে তোলে কোলে
যে নাকি শিখায় তোরে,
আমিত জানি না তাঁরে,
চিনি না তাঁহারে আমি দেখিনি কখন,
আমারে দেখাতে হবে, তোর তাঁরে নন,
যে তোর আত্মার নয়,
সেই কি রে দয়াময়,
নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার, সবে ডাকে যারে,
এ সব সকলি কি রে সে শিখাল তোরে ॥

পূর্ণিয়ানিবাসী
ননের মাতা।

নারীজীবন।

ভগ্নীগণ, আমরা অনেক সময় আমাদের নিজদের জন্য আক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারি না, আমরা জন্মাবচ্ছিন্ন পরাধীন, আমাদের কোন রকমে স্বাধীনতা নাই, কাহারও আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া আমরা বাঁচিতে পারি না। শিশুকালে পিতা মাতার তাহার পর পতির, বৃদ্ধকালে পুত্র কন্যার অধীন হয়ে জীবন কাটাতে হয়। চিরকালই পরাধীনা, অন্যের সেবা করিয়া জীবন শেষ করিবার জন্যই আমাদিগের জন্ম। বিধাতা আমাদিগকে এমনি দুর্ব্বল নিরাশ্রয় করিয়াছেন যে, চিরকাল আমাদিগকে অন্যের আশ্রয়ে থেকে অন্যের উপর নির্ভর, অন্যের কাজ করে অন্যকে ভয় করে, অন্যের মন রেখে জীবন পাত করিতে হইবে। আমাদের ধন সম্পত্তি বল, রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান যাহা বল, কিছু আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না, বরং এসব থাকিলে অনেকের চক্ষুর শূল হইব, এবং প্রলোভনের কারণ হইব। তাহার জন্যে অন্যের আশ্রয় ব্যতীত আমরা বাঁচিতে পারি না। লতা যেমন তরুকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না, তেমনি আমরা কোন আশ্রয় না লইয়া থাকিতে পারি না; কিন্তু তরু যেমন আপনার বলে সর্ব্বদা লতাকে রক্ষা করে, এবং আপনার বক্ষদানে পালন করে, সেরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ আশ্রয় আমাদের কয় জনের ভাগ্যে যোটে। এদেশের পিতা মাতা পতি ও ভাই আপনাদিগের ক্ষমতা অনেক সময় অপব্যবহার করেন, এবং আমাদের প্রকৃতিকে নষ্ট করিয়া থাকেন, এদেশের নারীর প্রতি এত অনাদর যে কন্যা জন্মাইলে অনেক পিতা মাতা আনন্দিত না হইয়া দুঃখিত হন। এ সংসারে আমাদের মতন অভাগিনী আর কেহ নাই। এদেশের কত লোকে নারী জাতিকে সকল কার্য্যের কণ্টক মনে করিয়া তাহাদের মুখ দর্শন করেন না। তাঁহারা মনে করেন, নারীজাতি থাকাতেই সংসার এত নিন্দনীয় ও প্রলোভনময় হইয়াছে।

এতদিনের পর আমাদের দুঃখের নিশা অবসান হইয়াছে, সুখের দিন আরম্ভ হইয়াছে, জগজ্জননীর প্রাণ আমাদিগের জন্য কাঁদিয়াছে, তিনি আমাদিগের জন্য নববিধান পাঠাইয়াছেন, বিধানাশ্রিত লোকদিগের

মন ফিরিয়াছে। এ বিধানের পুরুষগণ নারীদিগকে আদর ও সম্মান করিতে শিখিয়াছেন, এবং যাহাতে আমাদের প্রকৃত চরিত্র গঠিত হয়, তাহার জন্য তাঁহারা কত ব্যস্ত, যাহাতে আমরা বিদ্যা এবং ধর্ম্মে উন্নত হইয়া বিশ্বজননীকে চিনিতে পারি এবং পূজা করিতে পারি, তাহার জন্য কতই যত্ন করিতেছেন, পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব আমাদের উন্নতির জন্য যে সকল বীজ পুতিয়া গেছেন, তাহা কে নষ্ট করিতে পারে? কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দ্বারা এবং আমাদের অভিভাবক দিগের দ্বারা সেই বীজ গুলিতে ভাল করে জল সিঞ্চিত হইতেছে না। হে করুণাময়ী জননি, তুমি আমাদের উদ্ধারের জন্য যে উপায় উদ্ভব করিয়াছ, তাহাতে যেন আমরা সকলে প্রাণপণে যোগ দিতে পারি, মা! আমরা তোমার প্রদর্শিত পথে চলিলে, এবং তোমাকে ভাল করে চিনিলে, ভাল বাসিতে পারিলে আমাদের সকল দুঃখ ঘুচিবে, কোন্ স্থানে স্বাধীন কোন্ স্থানে পরাধীন হতে হয়, তাহা বুঝিতে পারিব, পিতা মাতা পতি পুত্র কন্যা ও সমস্ত আত্মীয়বর্গের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় জানিতে পারিব, এবং বিদ্যা ও ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া তোমার চরণে চিরসুখী হইয়া বাস করিব

সংবাদ।

মৃত পত্নীর ভগিনীকে বিবাহ করা ইংলণ্ডের আইনে নিষিদ্ধ ছিল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আন্দোলনের পর এবার শ্যালীকে বিবাহ করার আইন পাশ হইয়াছে। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ক্রমে ১৩বার এই আইনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। প্রধান ধর্ম্মযাজক বিশপের দল এক্ষণও বিরোধী। তাঁহারা এরূপ বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিবেন না। রেজেষ্টরী আফিসে পাত্র পাত্রী যাইয়া বিবাহ রেজেষ্টরী করিয়া লইবে, হয়তো এইরূপে কাজ চলিবে। মৃত পত্নীর ভগিনীকে বিবাহ করা ইংলণ্ডে এরূপ দোষের ব্যাপার, এদিকে মামাত পিস্তত ভাই ভগিনী ইত্যাদি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে অবাধে বিবাহ চলিতেছে, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। হিন্দু সমাজে শ্যালীকে বিবাহ করা দোষের মধ্যেই গণ্য নয়। ব্রাহ্মসমাজেও তাহা প্রচলিত হইয়াছে। আবার হিন্দুসমাজে সগোত্র দূর সম্পর্কিত জ্ঞাতির মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ হইতে পারে না। বহু বিবাহকারী মোসলমান পুরুষদিগের সম্বন্ধে স্ত্রীর জীবদ্দশায় শ্যালীকে বিবাহ করার বিধি নাই; কিন্তু হিন্দুসমাজে তাহা হইতে পারে। বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত।

গত আষাঢ় মাসে মহিলার দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। বহু গ্রাহক ও গ্রাহিকার নিকট হইতে উক্ত বৎসরের মূল্য এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে স্ব স্ব দেয় মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করিবেন। এজন্য আমরা পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

"সাহিত্য ও ইতিহাস * ।"

খ্রীষ্ট জগতে আমরা অনেক মার্টারের নাম শুনি। মার্টার তাহাকে বলে, যে ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য নিহিত। বাঙ্গালায় ইহার ঠিক প্রতিশব্দ নাই। খৃষ্টীয় ইতিহাসে মার্টার থাকা গৌরবের বিষয় না অগৌরবের বিষয়? এক দিকে গৌরবের বিষয়, কিন্তু মার্টার হতে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই হনন করবার লোক চাই, যেমন কতকগুলি লোক প্রাণ দিয়েছেন তেমনি কতকগুলি লোক তাঁদের প্রাণ নিয়েছেন। আমাদের এ দেশ দয়া প্রধান, কোমলতাপ্রধান, ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য প্রাণদণ্ড নাই। যদিও এক প্রহ্লাদের গল্প জানা যায়, প্রহ্লাদকে ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য উৎপীড়ন করা হয়েছে তিনি কি না নারায়ণের উপাসনা করিতেন, যে নারায়ণ তাঁর পিতার শত্রু, সেই জন্য তাঁর পিতা উৎপীড়ন করিতেন। তবুও সেই বিশ্বাসের মধ্যেও এমন অর্থ আছে, যাতে উদ্ধার হ'য়ে গেল। এ দেশের লোকের মন কোমলতার দিকে যায়, কঠোরতা সহ্য করে না। অনেকে বলেন, এ দেশে যখন, বৌদ্ধধর্ম্ম আসে, বৌদ্ধদের উপর তখন উৎপীড়ন হইত, হিন্দুরাজারা তাঁদের উপর অত্যাচার করিতেন। কারণ বৌদ্ধদের নির্ম্মিত সঙ্ঘারাম বিহার, বিশেষতঃ নালন্দার বিহার সব কোথায় গেল। কিছুদিন পরে তাঁদের আর কোন চিহ্নই নাই। যদিও এই কথায় মনে হয় হিন্দুরা অত্যাচার করিতেন, তবুও নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না, ঐতিহাসিক ভাবে কিছু বলা যায় না। বৌদ্ধদের মধ্যে মার্টারদের নাম শোনা যায়। ভারতবর্ষে কিন্তু হত করার রীতি নাই। খৃষ্টীয় ইতিহাস মার্টারের ইতিহাস। মার্টারদের বিষয় লইয়া একখানা বড় বই আছে। তাহার মধ্যে দেখা যায়, স্ত্রীলোক বালক পুরুষ কত রকম অত্যাচার-যন্ত্রণা ধর্ম্মের নামে সহ্য ক'রতেন। ইহাঁদের কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে হয় ঠিক কি রকম ভাবে ইহারা প্রাণ দেন, তখন তাঁদের মনের অবস্থা কিরূপ ছিল! আজকাল সে রকম দেখা যায় না। মার্টারদের বিষয় ভাবিলে দেখি যে, খ্রীষ্ট ভাব তাঁদের জীবনকে অধিকার করেছিল, যাতে তাঁরা অনায়াসে প্রাণ দিতেন। একজন লোক যে আপনার ধর্ম্মমতের জন্য প্রাণ দিলেন, তাতে বলা যায় না সেই ধর্ম্ম সত্য, তাদের দলের মধ্যে যে ভুল ছিল না, অপর দলের মধ্যে যে সত্য ছিল না তাও বলা যায় না। যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রথমে রোমে গেল তখন রোমান্‌স সব পৌত্তলিক সম্রাট্‌কে দেবতা ব'লে গ্রহণ করিত, পূজা করিত। সম্রাটকে স্বীকার না করলে তার দরুণ প্রাণ

---

* ১৯০৩ সনের ১২ই জানুয়ারি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তন্মূলক।

যাইত। তারপর যখন ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টেন্ট দুই দল হল, তখনও পরস্পর পরস্পরের প্রাণ নাশ করিত। কিন্তু ধর্ম্মভাব ও সত্য গ্রহণীয় বিষয়, তাহা রোমাণক্যাথলিকদের মধ্যেও আছে, প্রোটেষ্টেন্টদের মধ্যেও আছে। এই দুই দল ক্রমাগত পরস্পরের মাথা কেটেছেন, এবং অম্লান বদনে প্রাণও দিয়াছেন। ধর্ম্মমতের জন্য একজন প্রাণ দিলেই যে তা সত্য হল, তা নয়। ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়া যে আদর্শ চরিত্রের লক্ষণ, তাহাও দেখিবার বিষয়। তাঁরা কি উত্তেজনাশূন্য শান্ত, নীচপ্রবৃত্তি শূন্য হ'য়ে প্রাণ দিতেন, তাহা প্রমাণ করা যায় না। তাঁরা যে পূর্ণ সাধু চরিত্র হয়েছিলেন, তাও মনে হয় না, অন্ততঃ খুব একটা শত্রুতার ভাব ছিল। রোলেন টেলার বলে একজন মার্টারের নাম শোনা যায়, তিনি রোমাণ ক্যাথলিক ছিলেন। মেরী যখন রাণী হলেন, তিনি প্রোটেষ্টেন্ট ছিলেন, তিনি তাঁর প্রাণ দিলেন। দুজনে তর্ক আরম্ভ হল। ইনি ওঁর নিন্দা করিতে লাগিলেন, গালাগালি দিতে লাগিলেন, উনিও সেই প্রকার গাল দিতে লাগিলেন। দুজনে, দুজনকে নিজের মত সত্য বলছেন, বিবাদ করছেন, অবশেষে টেলারের প্রাণ গেল। ঈশার মত তা নয়, ঈশার মধ্যে আদর্শ চরিত্র দেখিতে পাই। সকলেই যে ঈশার মত হ'য়ে জীবন দিয়াছিলেন তা নয়। তবে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়া এত গৌরবের বিষয় কেন। কি বিশেষত্ব আছে যাতে সকলে মুগ্ধ হয়। খ্রীষ্টধর্ম্ম যে স্থাপিত হয়েছে, তার প্রধান একটি কারণ এত লোক প্রাণ দিয়াছে বলে, এত লোকের রক্তে ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাঁদের প্রতি এত ভক্তি শ্রদ্ধাদি কেন? প্রাণ দেওয়ার জন্য নয়, কিন্তু একটী বিশেষ লক্ষ্য স্থির রেখে, কোন দিকে বিচলিত না হয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়া, একটী লক্ষ্যের দিকে তাঁরা মন প্রাণ সব ঢেলে দিয়েছেন, একটী বিষয় যাহা তাঁরা বিশ্বাস করেছেন, সব তুচ্ছ করে তাহা পেতে ব্যস্ত হওয়া। অন্যে উৎপীড়িত করুক আর না করুক একই বিশেষ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া, তাহাই গৌরবের বিষয়। মানুষের মনে যদি একটী বিশেষ লক্ষ্য থাকে তাহা হইলে আর কিছু ভাবনা থাকে না। একটী লক্ষ্য স্থির রেখে সমস্ত পরীক্ষা ও প্রলোভনের মধ্যে দিয়ে স্থির ভাবে সেই দিকে অগ্রসর হওয়া গৌরব না অগৌরব, তাহা দেখার বিষয়। বর্ত্তমান সময় বিচারের, এখন বিচারের প্রাধান্য এসেছে। ধর্ম্ম বিশ্বাসের মধ্যে যদি কুসংস্কার থাকে, লোকে এখন বিচার করে তাকে তাড়াচ্ছে, এখন কেবল এই কথা উঠেছে সব [illegible] বিচারের অধীন করিতে হইবে। কোন কুসংস্কার দাঁড়াতে পারে না। ইহার পূর্ব্বে যেমন সকলে নিজের নিজের ধর্ম্মকে ভগবানের ধর্ম্ম বলে প্রচার করিতেন অন্যের মতকে শয়তানের মত বলিতেন, এবং অন্যকে শয়তানের পথ হতে সর্ব্বনাশের পথ হোতে বাঁচাইবার জন্য তাঁর প্রাণনাশ করিতেন, এবং তারাও বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। যারা প্রাণ নিচ্ছেন তাঁরা ভাবিতেন যে, এলোককে

আরও অন্য লোককে সর্ব্বনাশের পথ হতে বাঁচালাম। যেমন প্লেগ হলে বাড়ী পুড়িয়ে দেয়, সেই রকম। কিন্তু এখনকার বিজ্ঞান বলছেন, তা হতে পারে না দেখ তার মধ্যে সত্য আছে কি না। যত ধর্ম্ম মত ও বিশ্বাস আছে, সমস্ত বিচারের আলোকে ধরিতে হইবে, এটা খুব ভাল জিনিষ। কিন্তু ইহার একটী অপকারিতা দেখিতে পাইতেছি যে, মানুষের মন এক লক্ষ্যের দিকে স্থির নয়। তখন যেমন লোকে এক লক্ষ্যের দিকে মন রেখে প্রাণ দিতে প্রাণ নিতে প্রস্তুত ছিল এখন আর সেভাব নাই। একটীকে বিশ্বাস করে তাকে সুন্দর শ্রেষ্ঠ বলে, তার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত! কিন্তু এখন কি নিজের মত সত্যকে বলিব, সব সত্য ইহা হইতে বাহির কর। বর্ত্তমান যুগের লোকের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে, সাধারণ অসাধারণ সকলকেই এই দোষ স্পর্শ করিয়াছে, এ রকম অবস্থা যে থাকবে তা নয়। ক্রমে এহতে উচ্চ অবস্থায় সকলে দাঁড়াবে ভবিষ্যতে আর কোনও উজ্জ্বল ভাব গ্রহণ করিবে। কিন্তু এখনকার অবস্থা বিক্ষিপ্ত, লোকের মন এক লক্ষ্যের দিকে স্থির নয়। এক লক্ষ্যে স্থিররেখে সাধন করিলে যে উপকার হয় তাহা এখন নাই। একটী লক্ষ্য স্থির করে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াতেই বেশী গৌরব না বিক্ষিপ্ত হয়ে নানা রকম জিনিষ বিচার করাতেই বেশী গৌরব? একটী বিশেষ লক্ষ্য জীবনের সামনে রাখা খুব উচ্চ মহৎ। কোনটী জীবনের পক্ষে ঠিক লক্ষ্য তাহা স্থির করা বড় কঠিন। কিন্তু জীবনের সামনে যদি একটী লক্ষ্য না রহিল তবে তাহা বৃথা মনে হয়। সেদিন আমি সেই লিখিত বিষয় পড়িতে পড়িতে যে স্বার্থত্যাগের কথা হইয়াছিল, তখন গীতার কথাও বলিয়াছিলাম। গীতার মধ্যে যোগের গভীর কথা আছে। আপনাদের কাছে গীতার প্রথমটা খানিক পড়ছি আপনারা ইহা পড়ে বিচার করুন। মানুষের প্রত্যেক কাজই কত লোকের উপর পড়িবে, তার ঠিক নাই, কারণে মানুষ পরস্পর জড়িত। মহাপুরুষদের ধর্ম্মে কত বিচ্ছেদ হয়েছে, তাই বলে কি ধর্ম্ম প্রচারে বিরত হয়েন। তিনি কেবল কর্ত্তব্য ভাবছেন, অন্যকে হত করবেন, কি নিজেরা হত হবেন, সেকথা ভাবছেন না। রস্কিনবলেন বীরদের একটী সম্মান আছে, ব্যবসায়ীর সম্মান নাই ব্যবসায়ীরা খেতে দিচ্ছে, যোগাচ্ছে, কিন্তু তাদের সম্মান নাই বীরদের সম্মান এই জন্য যে, তারা আপনাদের প্রাণ দিতে প্রস্তুত। অন্যের প্রাণ গ্রহণ করে সেজন্য সম্মান নয়, কিন্তু প্রাণ দেয় বলে। এই ভাব আমরা ইহাতে দেখি যে, অপরকেও কষ্ট দেওয়া যায়, এই জন্য যে কর্ত্তব্য করিব না তা নয়। কিন্তু যাঁরা মার্টার হন বা করেন তাঁদের ভাব যে, মানুকে অনন্ত নরক হতে বাঁচাবার জন্য, শয়তানের হাত হতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণনাশ করেন, আমরা অবশ্য এই মতের অনুমোদন করি না। তাঁরা যে এই কাজ করিতেন, একটী উজ্জ্বল বিশ্বাস থেকে। তাঁরা নরঘাতক ছিলেন না, কিন্তু একটা ভুল ছিল। একটী স্থির লক্ষ্য সাধন করিতে হইবে। সেই লক্ষ্য চিনিবার বিষয়ে অনেক কথা আছে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

১১শ বৎসর।

শ্রীমতী রায়চৌধুরী,	কাশীপুর	২৲

১২শ বৎসর।

শ্রীমতী রায়চৌধুরী,	কাশীপুর	
„ কুমুদিনী রায়,	ঢাকা	২৲
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন,	পাঁচদোনা	২৲
শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী,	কুচবিহার	২৲
„ কুন্দমালা দেবী,	কলিকাতা	২৲
„ মনোরমা দেবী,	ঢাকা	

১৩শ বৎসর।

শ্রীমতী কুমুদিনী রায়,	ঢাকা	
শ্রীমতী এস্ সি মুখোপাধ্যায়,	পাবনা	
শ্রীযুক্ত সুমেরচাঁদ সাহার,	কলিকাতা	২৲

মহিলার নিয়মাবলী।

মহিলা পত্রিকার ডাকমাশুলসহ বার্ষিক মূল্য ২৲ মাত্র। গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ মহিলার মূল্য ও অর্থসম্বন্ধীয় পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে এবং প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকটে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি উপযুক্ত হইলে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক প্রকাশিত হইবে। কাহারও প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া যাইবে না।

অনেকে মহিলা পত্রিকা বৎসরাধিক কাল গ্রহণ করিয়া মূল্য দান করেন না। বড় দুঃখের বিষয়। যাঁহারা মূল্যদানে অসমর্থ তাঁহারা যেন অবিলম্বে পত্রিকা ফেরত পাঠাইয়া দেন, অথবা আমাদিগকে তাহা পাঠাইতে নিষেধ লেখেন তাহা হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া প্রাপ্য মূল্য না পাইলে অনেক সময়ে আমরা সেই মূল্যের জন্য ভি, পিতে মহিলা পাঠাইয়া থাকি।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১০ম ভাগ] অগ্রহায়ণ ১৩১৪ ; ডিসেম্বর ১৯০৭। [৫ম সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি যে, প্রতিদিন প্রাতঃকালে মাতৃদেবী পূজা আহ্নিক করিতেন, পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না, সায়ংকালে নামজপে প্রবৃত্ত হইতেন, অপরাহ্নে আত্মীয় মহিলাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থপাঠ শ্রবণ করিতেন, দুই চারি দিন পরেই বিশেষ বিশেষ ব্রতানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইতেন। ইহা দেখিয়া আমাদের মনে পূজার্চ্চনাদিতে শ্রদ্ধা হয়, দেব দেবীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মে, ধর্ম্মকথা শুনিতে আগ্রহ হয়। কোন্‌টা কুসংস্কার ও অসত্য তখন আমরা তাহা বুঝিতাম না। সাধারণতঃ মাতৃদৃষ্টান্তে আমাদের অন্তরে ধর্ম্ম ভাবের সঞ্চার হয়। মাতৃচরিত্রের দৃষ্টান্ত শিশুদিগের মনে কিরূপ কার্য্য করে, ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

নব্য শ্রেণীর জননীগণ পূজা আহ্নিকাদির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সন্তানদিগকে ধর্ম্ম ও সুনীতির দিকে আকর্ষণ করেন এরূপ দৃষ্টান্ত বড় বিরল। তাঁহারা শিবপূজা ও তুলসীতরুর পূজা ইত্যাদিকে অসত্য বলিয়া তৎসংস্রব পরিত্যাগ করেন করুন, যাহা সত্য বলিয়া জানেন সেই দেবতার পূজা কেন প্রত্যহ নিষ্ঠা পূর্ব্বক করিবেন না? বালক বালিকারা তাঁহাদের নিকটে ধর্ম্মাচরণের উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখিয়া বাল্যকাল হইতে তাহাদের ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি না জন্মিলে তাহাদের মন যে কঠিন হইয়া যায়। তাহারা কেবল পান ভোজন আমোদ প্রমোদেই সময় যাপন করিবে, ক্রমে নাস্তিক হইবে, ধর্ম্মের প্রতি উপহাস বিদ্রূপ করিবে, ইহা বলা বাহুল্য, ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

মাতৃগণ নিজ নিজ জীবনের গুরুতর দায়িত্ব মনে রাখিবেন, তাঁহারা যথেচ্ছরূপে জীবন যাপন করিয়া নিজেদের অকল্যাণ এবং সন্তান সন্ততিদের অকল্যাণ সাধন করিতে পারেন না।

মেয়েদের রূপের মায়া।

(পদ্মাবতী, সরলা ও নির্ম্মলা।)

পদ্মাবতী। দিদিমণি, বড় দুঃখেই বল্‌ছি, রাগ কর না। দিদি, কল্লে কি? এমন বরকে বিয়ে কল্লে? বরের রং কাল, লম্বা মোটা,সোটা নিজে দেখে শুনে এমন বর পছন্দ হল? তুমি যে দিদিমণি,সোণার পাত খানি, যেমন রং তেমনি মুখ চোখ আর গঠন পেটন।

নির্ম্মলা। (হাস্যের সহিত) পদ্মাবতি, তুই যে,একজন কবি হয়ে উঠ্‌লি। আমার পরম ভাগ্য যে, আমি এমন সৎপাত্র লাভ করিয়াছি। তিনি সচ্চরিত্র বিদ্বান্ ধার্ম্মিক মিষ্টভাষী সুগায়ক কর্ম্মনিষ্ঠ সবলকায় এবং সুস্থ। এত গুণ যার তার গায়ের বর্ণে কি এসে যায়? তুই তো বলিস "কাল জগৎ আলো।

পদ্মাবতী। সেতো আমি কৃষ্ণের কথায় বলি,তিনি যে, দেবতা আমার ইষ্ট দেবতা।

নির্ম্মলা। ওলো কথায় বলে "যার ইষ্টি তার মিষ্টি" তিনিও আমার দেবতা। আমি তাঁর গুণই দেখি, বাহিরের রূপ কি দেখি?

পদ্মাবতী। তোমার সঙ্গে কি আমি কথায় পারিব, তুমি চারিটী পাস করা মেয়ে, তবে কিনা বলাই বাবুর রং আর একটু ফর্সা হলে আমার মনে লাগিত।

নির্ম্মলা। তবে তো তিনি সুন্দর না হয়ে ভালই হয়েছে।

পদ্মাবতী। দিদিমণি, ঠাট্টা তামাসা নিয়েই আছেন। বলাই বাবুকে যখন তোমার এত ভাল লেগেছে তখন আমারও ভাল লাগিল। মা বাবারও ভাল লাগিবে। আমি আজ থেকে বলাই বাবুকে বলিব কাল নয় যেন কাল মাণিক।

নির্ম্মলা। তাহলে আমি হাততালি দিয়ে খুব হাসিব। পদ্মাবতী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

সরলা। পদ্মকে তো সহজে বুঝাইয়া দিলে আমায় একটু বুঝাইয়া দাও দেখি। রূপ কি কিছু নয়? তবে লোকে এত রূপের প্রশংসা করে কেন, এত মোহিত হয় কেন?

নির্ম্মলা। রূপের কি নিন্দা করিতে পারি? ভগবান্ নিজে সুন্দর, তাঁরই সৌন্দর্য্য নানা প্রকার রূপ হয়ে বিকশিত হয়েছে।

সরলা। তবে রূপের প্রতি তোমার এত বীতরাগ কেন?

নির্ম্মলা। না সই,রূপের প্রতি আমার বীতরাগ নাই, কিন্তু রূপের মায়ার প্রতি আমার বিষদৃষ্টি। সৌন্দর্য্য নানা প্রকার— মানসিক সৌন্দর্য্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, কবিত্বের সৌন্দর্য্য এবং আত্মিক সৌন্দর্য্য। মানুষের সম্বন্ধে আত্মিক সৌন্দর্য্যই শ্রেষ্ঠ,এই সৌন্দর্য্যকে অতিক্রম করিয়া বহিঃসৌন্দর্য্যে মোহিত হওয়ার নাম রূপের মায়া। এই রূপের মায়াকে কোন রূপে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। এই কুহকিনী এ সংসারকে নরক তুল্য করিয়াছে। সুখের সংসারকে দুঃখের আলয় করেছে। রূপের মায়াতে রাবণ সবংশে নিধন হইল। হেলেনের রূপ ট্রয় রাজার বংশ, গ্রীস এবং ট্রয়ের অসংখ্য যোদ্ধার মরণ ও তাহাদের বিধবা

ও পুত্র কন্যাদিগের সর্ব্বনাশের কারণ হইল। রূপের মায়া মানব সমাজের যে কত অনিষ্ট করিয়াছে ইতিহাস, কবিতা এবং আখ্যায়িকা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আচ্ছা সই, বল দেখি রূপ আমরা কি কেবল চক্ষু দিয়াই দেখি?

সরলা। চক্ষু দিয়া দেখি বটে, কিন্তু তাহা মনে থাকে, তুমিই তো সে দিন আমায় বুঝাইয়া দিয়াছিলে মনই সকল প্রকার জ্ঞানের মূল।

নির্ম্মলা। বেশ বলেছ। "আঁখি কত শত হেরে সকলেই কি মনে ধরে; মন যারে ধরে মনে সে হয় মনোরঞ্জন।" ইংরাজিতে একটী দার্শনিক মত আছে "The subjective gives colour to the objective," মনের রং বহির্বিষয়ে পড়ে। দেখ কাল কুৎসিত ছেলে মায়ের চক্ষে কত সুন্দর, স্বামীর চক্ষে স্ত্রী কত সুন্দর, স্ত্রীর চক্ষে স্বামী কত সুন্দর! আর সেই তুমি যদি আমার চক্ষে আমার বরকে দেখ তবে একেবারে মোহিত হয়ে যাবে। তোমার বর তো দেখিতে তত ভাল নয়, কিন্তু তুমি কেমন সোণার চক্ষে দেখেছ, তিনিও তোমায় সোণার চক্ষে দেখেছেন।

সরলা। তা ভাই ঠিক বলেছ, কিন্তু বলিতে কি আমার প্রথম প্রথম একটু রূপের লালসা ছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রেমে এবং গুণে আমায় এমন বশ করেছেন যে, তাঁর মতন আমি আর কাহাকেও ভাল দেখি না।

নির্ম্মলা। তাই তো ঠিক, তোমার মনের রং তার গায়ে লেগেছে, তাই মনের অবস্থার উপর সমস্তই নির্ভর করে, একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক ভিন্ন ভাবে দেখে। মনে কর, একজন রূপসী যুবতীকে তিন জন লোকে দেখিল, তার মধ্যে যিনি রূপের কাঙ্গাল, বিলাসপরায়ণ যাহার কাছে নারী পুরুষের বিলাস ও ক্রীড়ার বিষয় বই আর কিছুই নহে, সে সেই যুবতীকে দেখিয়া মনে মনে নরকে ডুবিল। যিনি নীতি-পরায়ণ ভদ্রলোক তিনি সেই যুবতীকে দেখিয়া আপনার চক্ষুকে তৃপ্ত করিলেন, এবং তাঁহাকে আপনার কন্যা বা ভগ্নী ভাবে দেখিলেন; আর তৃতীয় ব্যক্তি যিনি শুদ্ধমনা তত্ত্বদর্শী ঈশ্বরপরায়ণ তিনি সেই যুবতীর সৌন্দর্য্যে ব্রহ্মজ্যোতি দেখিলেন, এবং তাঁহার মধ্যে বিশ্বজননীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মনে মনে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিলেন। দেখ বিষয়টি এক, কিন্তু প্রকৃতিভেদে ভিন্ন প্রকারে প্রদর্শ হইল। আমাদের মনের প্রকৃতি এবং ব্যবহার হইতে ভাবযোগ হয়, সেই ভাবযোগই আমাদের স্বর্গে বা নরকে লয়ে যায়।

সরলা। ভাব যোগ কাহাকে বলে? আমার সঙ্গে কথা বলিবার সময় বড় বড় কথা বলিলে হবে কেন? আমার বিদ্যা বুদ্ধিত আর তোমার অগোচর নাই।

নির্ম্মলা। ভাবযোগ ইংরাজীতে বলে (Law of Association) আমরা যে বস্তু দেখি আমাদের মনের সঙ্গে সে বস্তু যেন একটি সূত্রে গাঁথা হয়ে যায়। সে বস্তু দেখিলে পরে সেই ভাব আপনা আপনি মনে এসে পড়ে, সহজে নিবারণ করা যায়

না। রামপ্রসাদ তাঁহার একটি গানে বলে-ছেন—মনে করি ঘর ছেড়ে যাই, থাকব না আর এপাপ দেশে, বিষম চক্রে ঘুরিয়ে মারে চিন্তারাম চাপরাশী এসে। ভাব যোগকে চিন্তারাম চাপরাশী বলিলে হয়। আদালত হইতে চাপরাশী যেমন ওয়া-রেণ্ট নিয়ে এসে ধরে নিয়া যায়, এই চিন্তারাম চাপরাশী ঠিক তাহাই করে। হয়ত বেশ ভাল কাজ বা ভাল চিন্তায় একজন লোক নিযুক্ত আছে কিন্তু পূর্ব্বের কোন একটা মন্দ ভাব বা চিন্তার কথা স্মরণ হইল, অমনি মনের ভিতর সেই সম্বন্ধে যে নরক আছে, চিন্তারাম চাপরাশী ধরে নিয়ে তাঁকে তাইতে ফেলিল। মন্দ কাজ বা চিন্তা করিয়া ছাড়িয়া দিলেই যে সহজে নিস্তার পাওয়া যায় তা নয়। ভাব-যোগের যন্ত্রণায় যে কত কাল ভুগিতে হয় তা কে বলিতে পারে ?

এই জন্য ভাল চিন্তা ভাল কাজ ভাল পুস্তক পাঠ এবং সাধু সঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গে সর্ব্বদা মনকে রাখিতে অভ্যাস করিতে হয়। উচ্চ জীবনলাভের এই প্রধান উপায়, কিন্তু চেষ্টা কি সহজে করা যায় ? কত অনুতাপ করিতে হয়, কত কান্না কাঁদিতে হয়, কত ব্যাকুল প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকট করিতে হয় ; তবে মন স্থির হয়। ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত কেবল মানুষের চেষ্টায় কিছু হয় না, মানুষের চেষ্টা এবং ব্রহ্মের কৃপা এই দুইয়ের যোগ চাই। অনেকে একটু লেখা পড়া শিখে মনে করে যে, তাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধিবলে এবং চেষ্টা করিলে ভাল হইতে পারিবে। ঈশ্বরের কৃপার আর প্রয়োজন কি ? কিন্তু তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত।

সরলা। তোমার কথা শুনিয়া বড় ভয় হচ্চে। এখন চিন্তারাম চাপরাশীর হাত হইতে উদ্ধার হইবার উপায় কি ?

নির্ম্মলা। "উপায় ওপায়" "ভয় করিলে ভয়" ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, ক্রমে সমস্ত বাধা বিঘ্ন চলে যাবে। তোমাকে আর কি বেশী ক'রে রূপের মায়ার দোষ বুঝাতে হবে ! তোমার নিজের বাড়ীতে দেখ না, তোমার দাদা রূপের মোহে পড়ে কি বিপদে পড়ে-ছেন। একটা নীচমনা সুন্দরী মেয়েকে বিবাহ ক'রে, এবং তার বশীভূত হ'য়ে আপনি যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাচ্চেন, এবং সমস্ত পারিবারিক জীবন বিষাক্ত করে-ছেন। এখন তিনি তাঁর ভুল বুঝেছেন, এখন আর কি হবে ? না বুঝে যে খেয়েছে কচু, তেঁতুল কোথা পাবে ? এখন কি আর তিনি বড় বৌকে ঠিক করিতে পারেন ? অল্প বয়সে চেষ্টা করিলে কিছু হইতে পারিত। কিন্তু তিনি তার যৌবন ও রূপের মোহে অন্ধ হয়ে ছিলেন।

সরলা। আজ একটি মনের কথা তোমাকে বলি, আমি তোমাকে সই করে ও তোমাকে ভাল বাসিতে শিখে এবং তোমার সঙ্গ ও ভালবাসা পেয়ে আমার যে কত উপকার হয়েছে বলিতে পারি না। তোমার কাছে বসিলে, তোমার কথা শুনিলে কত জ্ঞান হয়, ভাল হবার কত ইচ্ছা এবং চেষ্টা হয়, আমি ঈশ্বরকে

কত নমস্কার করি, এবং তোমার কত মঙ্গল ইচ্ছা করি। লোকে বলে পাস করা মেয়ে বিবি হয়, কেবল নিজের বেশ ভূষা এবং বিলাস সুখ নিয়ে থাকে, আর একটু আধটু পড়া শুনা করে, আর কিছুই করে না, কাহারও মুখপানে চায় না কেবল আপনার স্বামীকে চেনে। কিন্তু ভাই, তোমার দেখে আমার ও সকল কথায় বিশ্বাস হয় না। তুমি যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তেমনি কর্ম্মিষ্ঠ, তোমার তেমনি পড়া শুনায় মন, লোকের কিসে ভাল হয়, বিশেষতঃ মেয়েদের কিসে ভাল হয় তার জন্ত তোমার কত চেষ্টা কত কষ্ট। সকলের সঙ্গে হেঁসে কথা কও, মিষ্ট ব্যবহার কর, কখনও তোমাকেতো চুপক'রে বসে থাক্‌তে দেখি না। যখন আসি তখন দেখি কিছু না কিছু করিতেছ। তোমার মতন আর জন কত পাস করা মেয়ে হ'লে কত যে দেশের উপকার হয় তা কে বল্‌তে পারে! আচ্ছা ভাই লোকে বলে "হর পূজে বর পায়" কিন্তু তোমার বর কাকে পূজে এমন ক'নে পেয়েছেন। তাঁর উপর আমার হিংসা হয়, যদি আমি তাঁর মতন হতুম, তবে তোমাকে একেবারে আমার ক'রে নিতুম।

নির্ম্মলা। বা, বা, আমারও আজ একটা ভ্রম চলে গেল, আমি তোমাকে গো বেচারা বলে জানিতাম। তোমার মুখে কথা ফুটে না, এখন দেখ্‌ছি তুমি যে এক জন মহা বক্তা, কোন্ দিন টাউনহলে গিয়ে বক্তৃতা ক'রে ব'সবে।

সরলা। তুমিই তো আমাকে বক্তা ক'রলে তুমি তো সে দিনে বলেছিলে, "খুলিলে হৃদয়দ্বার না লাগে কপাট"। এখন আমার মনে যে ভাব হয়েছে যদি তোমার মতন বিদ্বান হতাম, তবে কত সাজিয়ে গুছিয়ে বলিতে পারিতাম। বেলা যাচ্ছে এখন যাই। আমি তোমার কাছে যত বার পারি আসিব। আমাকে গাধা পিটে ঘোড়া ক'রে দিতে হবে।

নির্ম্মলা। আচ্ছা ভাই তবে এখন এস। কিন্তু আজ থেকে আমি তোমাকে কবিরত্ন মহাশয় বলিব।

R. M. Bose.

খদিজাদেবী।

খদিজাদেবী এস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মোহম্মদের প্রথমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম খবিলক ছিল। খদিজা অসময়ে বিধবা হইয়াছিলেন। মক্কা নগর তাঁহার বাসস্থান ছিল। তাঁহার বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল,ব্যবসায় বাণিজ্যে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়াছিলেন। নানা দেশের নরপতি ও সম্ভ্রান্ত লোক সকল তাঁহার পাণিগ্রহণের একান্ত অভিলাষী হইয়াছিলেন, কিন্তু কাহাকেও তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্ত অন্তরে স্থান দান করেন নাই, স্বামীর পরলোক প্রাপ্ত হইতে পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরোপসনায় ও ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠে সময় ক্ষেপণ করিতেন। বাণিজ্য কার্য্যসম্পাদনার্থে দেবী খদিজার এক জন সুদক্ষ বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল। এদিকে

মহাপুরুষ মোহম্মদের অভিভাবক ও পিতৃব্য আবুতালেব অতিশয় দৈন্যদশাপন্ন হইয়াছিলেন। উক্ত মহাপুরুষ যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার পিতৃস্বসা আবুতালেবের ভগিনী আত্কাদেবী আবুতালেবের নিকটে ভ্রাতুষ্পুত্র মহাপুরুষ মোহম্মদের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাহাতে আবুতালেব বলেন, প্রিয়তম মোহম্মদ বয়ঃপ্রাপ্ত, উপযুক্ত পাত্রীর সঙ্গে সে পরিণয় সূত্রে সম্বন্ধ হয় ইহা প্রার্থনীয়। কিন্তু আমি নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণ বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করা আমার পক্ষে অসাধ্য। মোহম্মদের বিবাহবিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত নহি। কিন্তু কি করিব দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কার্য্য নির্ব্বাহ করাসম্বন্ধে আমার অবস্থা অনুকূল নহে। আত্কা বললেন, তজ্জন্য ভাবিতে হইবে না, ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া তাহার উপায় বিধান করিবেন। আমি শুনিয়াছি পরমৈশ্বর্য্যশালিনী খদিজা খাতুনের বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর প্রয়োজন। আমি তাঁহার নিকটে যাইয়া মোহম্মদের জন্য সেই কার্য্যের প্রার্থনা করিব। মোহম্মদের সততা যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। খদিজা মোহম্মদকে সুদক্ষ ও সুযোগ্য লোক বলিয়া বিশেষ জ্ঞাত। আশা করি, খদিজা আমার আবেদন অগ্রাহ্য করিবেন না, যেহেতু তিনি অতিশয় গুণগ্রাহিণী মহিলা। মোহম্মদ উক্ত পদে নিযুক্ত হইলে উচ্চ বেতন প্রাপ্ত হইবে, অর্থকষ্ট আর থাকিবে না। তাহার উদ্বাহ-সমুচিত ব্যয়নির্ব্বাহে অর্থ স্বচ্ছল হইবে।

আবুতালেব ভগিনীর এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন। তখনি দেবী আত্কা, খদিজা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নিজের প্রার্থনা জানাইবার জন্য সমুদ্যত হন। এদিকে খদিজা এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলেন, যে, মোহম্মদ প্রত্যাদিষ্ট ও নব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইবে না, তাঁহা প্রচারিত নবধর্ম্মের দীপ্তিতে ভূমণ্ডল প্রদীপ্ত হইবে, এবং তিনি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন, তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী হইবেন। এই প্রকার স্বপ্ন দেখিয়া খদিজার আনন্দের পরিসীমা থাকে না। এই স্বপ্ন কার্য্যতঃ সত্য হইবে তাঁহার এরূপ বিশ্বাস হয়। তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, তাঁহার কৃপা প্রকাশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অতুল ধন সম্পত্তির জন্য আরবের লোকে খদিজাদেবীকে রাণী বলিয়া সম্বোধন করিত। রূপ লাবণ্যে ও সদ্গুণ সৌন্দর্য্যে আরব দেশে কোন সীমন্তিনী খদিজাদেবীর উপমার যোগ্য ছিল না।

ইতিমধ্যে আত্কা হজরতের বাণিজ্য-যাত্রাবিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য খদিজার গৃহে উপনীত হন। খদিজা তাঁহার শুভাগমনকে আপনার সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করেন। পরম শ্রদ্ধা ও সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া উচ্চাসনে বসান, এবং নানা সুরস ভোজ্যসামগ্রী দ্বারা তাঁহার সৎকার করেন। যেহেতু আত্কা মহামান্য আব্দোল্মোত্তালেবের দুহিতা, আবুতালেবের সহোদরা, প্রসিদ্ধ কোরেশকুলের গৌরবান্বিত মহিলা; তিনি বিশেষ আদর সম্মান পাইবার উপযুক্ত। আত্কা

এক এক বার চেষ্টা করিতেছিলেন যে, খদিজার নিকটে মনের ভাব ব্যক্ত করেন, কিন্তু হজরতের বেতনসম্বন্ধে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে লজ্জা তাঁহার কণ্ঠ অবরোধ করিতেছিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ মৌন ভাবে থাকিলে খদিজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বরণ্যে, আপনার কি আজ্ঞা, এ গৃহে পদার্পণের উদ্দেশ্য কি? আপন অভিসন্ধি-জ্ঞাপন করুন, এবং আমার সেবা গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।" তখন আত্কা বলিলেন, "রাজ্ঞীর কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে যে, আমার ভ্রাতা আব্দোল্লার এক পুত্র আছে, তাহার নাম মোহম্মদ, আমার জনক আব্দোল্মোত্তালেব জীবদ্দশায় তাহার লালনপালনে ব্রতী ছিলেন। পরলোক গমনকালে তিনি সেই মোহম্মদসম্বন্ধে কতকগুলি বিধি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এক্ষণ আমাদের স্নেহাস্পদ মোহম্মদের যৌবনকাল, একটী রূপগুণশালিনী বরাঙ্গনার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়, ইহা এই সময়ে একান্ত বাঞ্ছনীয়, কিন্তু মোহম্মদের বর্ত্তমান অভিভাবক আমার ভ্রাতা আবুতালেব নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। একার্য্য সম্পাদন করেন এরূপ তাঁহার অর্থসম্বল নাই। শ্রুত আছি, রাণী বাণিজ্যার্থ বণিগদল নিযুক্ত করিয়া শামদেশে পাঠাইবেন, যদি মোহম্মদকে সেই বাণিজ্যসম্বন্ধীয় কোন কার্য্যে মনোনীত করেন, তবে হাশেমকুল রাজ্ঞীর অনুগ্রহে বাধ্য থাকিবে।" এই কথাশ্রবণে স্বপ্নবৃত্তান্ত অবিলম্বে সফল হইবে ভাবিয়া খাদ্জার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, আশাসমীরণে তাঁহার চিত্তমুকুল প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল অনুরাগানলে হৃদয়দীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, চিররোগী যেন রোগপ্রতীকারের মহৌষধ লাভ করিল। তিনি প্রফুল্লমনে সহাস্যাননে বলিলেন, "আর্য্যে, আমি মোহম্মদের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়াছি তাঁহার সচ্চরিত্রতা ও ধার্ম্মিকতা, নীতি ও নিষ্ঠা সমুদায় জ্ঞাত আছি, তিনি যে মহৎ কুলোদ্ভব তাহা আর কাহার অবিদিত আছে? কোন বিষয়ে কাহারও সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, তাঁহার কোন রূপ সেবা করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইব কিন্তু পণ্যজাতসংরক্ষণ বাণিজ্যকার্য্য সম্পাদন গুরুতর ব্যাপার। আপনি মোহম্মদকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসুন আমি তাঁহার ভাব চরিত্র আকার প্রকার লক্ষ্য করিয়া দেখি, তিনি এই কঠিন কার্য্যসাধনে উপযুক্ত কি না।" আত্কা এই কথা শুনিয়া হজরতকে আনয়ন করিবার জন্য গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

এ দিকে দেবী খদিজা, প্রিয়তমের দর্শনানুরাগে প্রাসাদসুস জ্জিত করিলেন, নিজে স্নাত প্রক্ষালিত হইলেন, অন্তর বাহির আন্তরিক ও বাহ্য সজ্জায় সাজাইলেন, উচ্চাসনে বসিয়া হজরতের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সিংহাসনের সম্মুখভাগে সূক্ষ্ম যবনিকা স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি তওরাত গ্রন্থ উদ্ঘাটন করিয়া তাহাতে বিবৃত ভাবী পেগাম্বরের বর্ণনা অধ্যয়নে রত ছিলেন, এবং আশাজনিত আনন্দাশ্রুরূপ উজ্জ্বল মুক্তাবিন্দু নয়নরূপ শুক্তিকোষ হইতে বর্ষণ করিতেছিলেন।

রূপযৌবনশালিনী কিঙ্করীদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, "যখন মোহম্মদ উপনীত হইবেন তোমরা বিবিধ বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া সভাস্থল সমুজ্জল করিবে, এবং উচ্চ আসনে তাঁহাকে বসাইবে।" কিয়ৎ-ক্ষণানন্তর হজরত স্বীয় পিতৃস্বসা আত্‌কার সঙ্গে পদার্পণ করিলেন। খদিজা অভ্যর্থনার কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না, উভয়কে সসম্ভ্রমে গৌরবের বসাই লেন। তিনি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে যেরূপ বর্ণনা পাঠ করিতেছিলেন, হজরতের প্রতি গূঢ় দৃষ্টি করিয়া তাঁহার আকৃতির সঙ্গে একে একে মিলাইলেন, কথিত আছে উহা ঠিক মিলিয়া গেল। * । তাহাতে খদিজার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। পুনঃ পুনঃ তিনি সতৃষ্ণ স্থির নয়নে হজরতের মুখচন্দ্র তাঁহার ভ্রূ ও নেত্রযুগল এবং কেশগুচ্ছের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে-ছিলেন। স্বপ্ন যে সফল হইবে তৎসম্বন্ধে তাঁহার আর অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তখন হইতে তিনি প্রাণসিংহাসনে হজরত মোহম্মদকে বসাইলেন, তাঁহার নয়নে সেই মনোহর সুন্দর ছবি অঙ্কিত হইয়া রহিল। অবিলম্বে তিনি হজরতের বেতন নির্দ্ধারণ করিলেন। আত্‌কা হজরতকে প্রফুল্লচিত্তে গৃহে লইয়া গিয়া বাণিজ্য-যাত্রিকের উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরাইলেন, এবং পরে খদিজার আলয়ে পাঠাইয়া দিলেন। হজরত বেতনভোগী ভৃত্য হই-লেন বলিয়া আত্‌কা ক্ষুন্ন, খদিজা তাঁহার দর্শনলাভে ও সম্মিলনসুখের আশায় প্রফুল্ল; একজনের মনোভঙ্গ অন্য জনের মনের আরাম।

খদিজার মিসরানামক এক ক্রীতদাস ছিল, ধনসম্পত্তি পণ্যজাত তাহার নিকটেই গচ্ছিত থাকিত। খদিজা তাহার হস্তে এক মূল্যবান্ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন, এবং একটি উষ্ট্র সুসজ্জিত করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত রাখিলেন ও বলিলেন, "যখন মক্কা হইতে বহির্গত হইবে তখন মোহম্মদের হস্তে উষ্ট্রের রজ্জু অর্পণ করিবে। লোকালয় ছাড়িয়া দূরে চলিয়া গেলে এই পরিচ্ছদ তাঁহাকে পরিতে দিবে। আদান প্রদান ক্রয় বিক্রয়াদিতে তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিবে না। যথা-সাধ্য তাঁহাকে সুখস্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে রাখিবে, এবং সত্বর মঙ্গলমতে আমার নিকটে পঁহুছাইবে, তাহা হইলে আমি মাননীয় কোরেশদিগের ও হাসেম পরি-বারের নিকটে লজ্জিত হইব না। আমার আজ্ঞানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিলে আমি তোমাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিব, এবং তোমার বাসনানুরূপ ধন দান করিয়া তোমাকে ভাগ্যবান্ করিয়া তুলিব।" ক্রমশঃ

* মোসলমানেরা বলেন যে, ইহুদি-দিগের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ তওরাতে ও খ্রীষ্টবাদীদিগের শাস্ত্র বাইবেলে ভবিষ্যতে অমুক অমুক রূপগুণযুক্ত আহমদনামক এক মহা তেজস্বী পেগাম্বর হইবেন, এরূপ লেখা ছিল। হজরতের প্রেরিতত্বের প্রকাশ হইলে পর ইহুদ ও খ্রীষ্টীয় পণ্ডিতগণ ঈর্ষ্যাবশতঃ আপন আপন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সেই কথা বিলোপ করিয়াছে।

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

১০ম।

রেঙ্গুণ হইতে কলিকাতায় যাত্রা।

আমরা বিগত ৪ঠা চৈত্র অপরাহ্ণে টৈরন্ডানামক অর্ণবপোতারোহণে রেঙ্গুণ হইতে কলিকাতায় যাত্রা করি। সেই দিন বর্ম্মদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ হয়। বিদায় গ্রহণোপলক্ষে সে দেশের কি কি বিশেষত্ব তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ বুদ্ধমন্দির পেগোডা। নগরে ও উপনগরে যেরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধর্ম্ম মন্দির বিদ্যমান অন্য কোন দেশে তদ্রূপ আছে কি না সন্দেহ। সে দেশের ছোট ছোট নগরগুলি পর্য্যন্ত বড় বড় পেগোডা-শ্রেণীতে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। রেঙ্গুণের স্বর্ণমণ্ডিত পেগোড়ার তুলনা নাই। দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধমূর্ত্তি, সে দেশের স্থানে ২ যে প্রকার বৃহদাকার বুদ্ধমূর্ত্তি-নয়নগোচর হয় তদ্রূপ অন্য কোথাও বৃহৎ দেবমূর্ত্তি সচরাচর দেখিথেতে পাওয়া যায় না। ইহা ধর্ম্মদেশের বিশেষত্ব। তৃতীয়তঃ পীত বর্ণের ত্রিবসন পরিহিত ভিক্ষান্ন-ভোজী একাহারী মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজক ফুঙ্গিগণ। অপিচ দারুময় দ্বিতল ত্রিতল ফুঙ্গি চাঁও (ফুঙ্গিদিগের বাস গৃহ) সে দেশের রাজপ্রাসাদ সদৃশ। বৌদ্ধ গৃহস্থগণ ফুঙ্গিচাঁও ও পেগোডানির্ম্মাণে মুক্তহস্ত, অনেক ধর্ম্মোৎসাহী সম্পন্ন বৌদ্ধ লক্ষ লক্ষ টাকা তদ্বিষয়ে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নয়। প্রত্যহ প্রত্যুষে বৌদ্ধ নারীগণ ফুঙ্গিদিগকে ভিক্ষাদানের জন্য ভক্তি নিষ্ঠা সহকারে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেন। এরূপ অকাতরে ধর্ম্মার্থদান এবং নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধুসেবা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। চতুর্থতঃ বৌদ্ধ বালকদিগের ধর্ম্মদীক্ষা ও ব্রতগ্রহণ ব্যাপার, এ প্রকার অন্য দেশে কোন সম্প্রদায় দেখা যায় না। পঞ্চমতঃ তথাকার বৌদ্ধ নরনারী-দিগের প্রতিবৎসর তগুলা ও তজিলা নামক উৎসবে কয়েক দিন ব্যাপিয়া মত্ততা, ব্রতানুষ্ঠানতা ও বৈরাগ্যসাধন; অন্য কোন দেশের কোন সম্প্রদায়ের স্ত্রী পুরুষ এইরূপ দলবদ্ধভাবে উৎসব সম্পাদন করেন শুনিতে পাওয়া যায় না। ষষ্ঠতঃ, কোন পরিবারে কাহারও মৃত্যু হইলে নৃত্য বাদ্যাদিসহ আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক প্রতিবেশী স্ত্রী পুরুষ সুসজ্জিত হইয়া মৃত দেহকে বিবাহের বরের সাজের ন্যায় সাজাইয়া মহাঘটা করিয়া শ্মশানক্ষেত্র (গোরস্থানে) লইয়া যাওয়া, তথায় ফুঙ্গি-দিগের সভা ও মন্ত্রপাঠ এবং নানা প্রকার দানাদি হওয়া; এদিকে, তদ্বিপরীত বিনা ঘটা ও আড়ম্বরে এক প্রকার গোপনে উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদিত হওয়া, অন্য দেশের পক্ষে ইহা নূতন ব্যাপার। সপ্তমতঃ স্ত্রী স্বাধীনতা, স্ত্রীলোকের শ্রমশীলতা ও কার্য্যতৎপরতা সাধারণতঃ পুরুষদিগের আলস্য ও অকর্ম্মণ্যতা, স্ত্রী উপার্জ্জন করিয়া স্বামীকে প্রতিপালন করা, বিবাহের পর স্বামী আসিয়া স্ত্রীর পিত্রালয়ে স্ত্রীর নিকটে বাস করা এবং মধ্যে মধ্যে প্রণয়ি-ণীর উপানৎ প্রহার উপহার প্রাপ্ত হওয়া। কন্যা পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারিণী হওয়া

ইহা কি বিশেষত্ব নহে? অষ্টমতঃ পচা দুর্গন্ধ চূণ মৎস্যে নাপ্পি প্রস্তুত হয়, যাহার দুর্গন্ধ আঘ্রাণে আমাদের অন্নপ্রাসনের অন্ন পর্য্যন্ত পেট হইতে বাহির হইয়া পড়ে, ব্যঞ্জনাদিতে সেই নাপ্পির যোগ না হইলে বর্ম্মদেশীয় নরনারীদের অন্ন ভোজন দুষ্কর হওয়া; প্রিয় খাদ্যরূপে প্রত্যহ নাপ্পিভোজন বিশেষ বিশেষত্ব। নবমতঃ মুখ ব্যাদান করিয়া যুবতীগণ মুলীবাঁশের ন্যায় মোটা, এক ফুট দেড় ফুট লম্বা অদ্ভুত চুরুটের ধূম পান করেন। ইহাকে কে বিশেষত্ব বলিয়া স্বীকার করিবে না? ১০মতঃ গালাতে জড়িত বাখারি বা কাঠের থালা বাটী গ্লাস কৌটা ইত্যাদি বিচিত্র পাত্র এবং বর্ম্মরমণীদিগের রচিত মনোহর কাপড়ের ফুল ইত্যাদি. শিল্প দ্রব্য ও স্ত্রী পুরুষের ব্যবহার্য্য উপানৎ আতপত্র ও পরিচ্ছদাদির বিশেষত্ব ও বিচিত্রতা বিদ্যমান। আমাদের একটী স্নেহের কন্যা বিবাহ হওয়ার অব্যবহিত পরেই স্বামিসহ বর্ম্মদেশে গিয়াছিলেন, তিনি রেঙ্গুণে পঁহুছিয়াই তথাকার রয়েল লেক (বিশাল তড়াগ) এবং তৎকূলস্থিত সুশোভন উদ্যান দর্শন করিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বীয় পিতৃদেবকে প্রথম পত্রেই এরূপ লিখিয়াছিলেন, "বাবা, এ বড় সুন্দর স্থান তুমি এ স্থানে আসিয়া বাস কর।" এ স্থানে আসিয়া একবার তুমি স্বচক্ষে দেখিয়া যাও. তাহা নয়, এখানে আসিয়া স্থিতি কর।" তখনও তিনি রেঙ্গুণের প্রধান পেগোডা দেখেন নাই, তাহা দেখিলে নাজানি আনন্দে কত বিহ্বল হইয়া পড়িতেন।

বর্ম্মদেশ ও কলিকাতার ভিতরে যতগুলি অর্ণবপোত পরিচালিত হয় তন্মধ্যে টেরভা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। সেই দিন টেরভা জাহাজে বর্ম্মদেশের বিলাতী ডাক কলিকাতায় রওয়ানা করা হইয়াছিল। এই জাহাজে নানা বিষয়ে সুবিধা বলিয়া সাহেব ও বাঙ্গালী বহু যাত্রিক আরোহণ করিয়াছিল। জাহাজ ছাড়িবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে ডাক্তার প্রসন্নকুমার আমাদের কোন অসুবিধা হইল কি না তাহার অনুসন্ধান লইবার জন্য নদীতটে যাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যাঁহাদের টিকিট নাই, তাঁহাদের জাহাজে আরোহণ করিবার হুকুম নাই, তজ্জন্য তিনি কূলে দাঁড়াইয়া আমাদিগের অনুসন্ধান লইয়াছিলেন। আমাদের কোন পরিচিত লোক সেই জাহাজে ছিল না, আমরা যে কেবিনে ছিলাম সেখানে জাহাজের ডাক্তার চট্টগ্রাম নিবাসী বৌদ্ধ যুবা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চৌধুরী স্থিতি করিতেছিলেন, আলাপ পরিচয় হইলে তিনি আমাদের প্রতি অতিশয় আত্মীয়তা প্রকাশ করেন, যত্ন ও আদরের ত্রুটি করেন না, আমাদের কাজ কর্ম্ম করিবার জন্য নিজের ভৃত্যকে আদেশ করেন। তিনি অবিবাহিত যুবা আমাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের লোক জানিয়া ব্রাহ্মসমাজে কোন সৎপাত্রীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে আমরা বলিয়াছিলাম, বৌদ্ধ থাকিলে ব্রাহ্মসমাজে বিবাহ হওয়া সম্ভবনহে, ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে হইতে পারে।

আমরা কলিকাতা হইতে বর্ম্মদেশে যাইবার সময় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মালদহ-নামক জাহাজে গিয়াছিলাম। আমাদের সহযাত্রী শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ বন্ধু ডাক্তার নকুড়-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা এবং জামাতা পীনমানার য়্যাডভোকেট শ্রীমান্ বসন্তকুমার হালদার ছিলেন। কন্যার যত্নে আমরা জাহাজে কোনরূপ অভাব ও অসুবিধা বোধ করিতে পাই নাই। দুই বার করিয়া প্রচুর জলখাওয়ার সামগ্রী এবং মধ্যাহ্নে গরম গরম অন্ন ব্যঞ্জন এবং রাত্রিতে গরম লুচি তরকারি ইত্যাদি আমাদিগকে পরিবেশন করা হইত। আমরা জাতীয় ভাবে আহারাদি করিয়া প্রায় চারিদিন জাহাজে যাপন করিয়াছিলাম। ফল মিষ্টান্নাদি জলখাওয়ার সামগ্রী প্রচুর ছিল। অনিচ্ছা সত্বেও কন্যার অনুরোধ উপরোধে খাইতে হইত। এবার আমরা আহারাদিতে স্বাধীন। আমাদিগকে অনুরোধ উপরোধ করেন, এমন কেহ ছিল না, কাহারও ব্যবস্থামতে চলিতে হয় নাই। আমরা টেরভাতে আরোহণ করিয়াই স্থির করিলাম যে, মধ্যাহ্নে কেবল ভাতেভাত ভোজন, রাত্রিতে একমাত্র ঝোল ভাতের ব্যবস্থা হইবে। রেঙ্গুন হইতে দেবী পুষ্পমালা নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য বাস্কেটে পুরিয়া আমাদের সঙ্গে দিয়াছিলেন। চাউল তরকারি ঘৃত তৈল লবণ মসলা যাহা২ প্রয়োজন জাহাজের পাচককে দেওয়া যাইবে, সে আমাদের ব্যবস্থামত আলুভাতে ও ঝোল ভাত প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিবে, তাহাকে কিছু বক্‌শিস দেওয়া যাইবে, এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম। আমরা বাস্কেট খুলিয়া দেখি, নানা প্রকার তরকারি চাউল, লবণ তৈল ঘৃত মসলাদি অপিচ জলখাবার ফল মূল মিষ্টান্নাদি সামগ্রীতে তাহা পূর্ণ। পুষ্পমালা নিজের গাভীর দুগ্ধে সযত্নে সন্দেশ পান্তুয়া প্রস্তুত করিয়া নিজের বাগানের ফল তরকারি আনাইয়া সঙ্গে দিয়া মাতৃস্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ও অনুরোধমতে গৃহস্বামী স্বয়ং বাজারে যাইয়া অনেক প্রকার ফল মূল ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। ইহাতে নিঃসহায় বৃদ্ধ পরিব্রাজকের জন্য মঙ্গলময় বিধাতারই কৃপা বুঝিতে পারিলাম। বাস্কেটে পুটলিতে বাঁধা কিছু মুড়ি পাওয়া গেল। বর্ম্মদেশের কোন স্থানে মুড়ি বিক্রয় হয় না। রেঙ্গুণের উক্ত মাতা জানিতে পারিয়াছিলেন, আমরা মুড়ি ভাল বাসি, কলিকাতায় প্রত্যহ অপরাহ্নে আমাদের জলখাওয়ার জন্য মুড়ি ব্যবস্থা। রেঙ্গুণে নিম্ন শ্রেণীর একজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোক আছে, সে মুড়ি ভাজিতে জানে, কন্যাটী ফরমাইস দিয়া তাহা দ্বারা কিছু মুড়ি ভাজাইয়া আনিয়া আমাদের সঙ্গে দিয়াছিলেন। কত আদর ও যত্ন! বিকালে জল খাওয়ার জন্য অর্দ্ধ পয়সার মুড়ি বহুকাল হইতে বরাদ্দ ছিল, বিধাতা তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন। সম্প্রতি রোগ বিশেষের জন্য ডাক্তার বাবু তাহা খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। মুড়ির প্রতি আসক্তি জন্মিয়াছে ভাবিয়া আমরা একবার এক বৎসর মুড়ি খাওয়া বন্ধ রাখিয়াছিলাম,

এবার বুঝি দীর্ঘ দীর্ঘকালের জন্য বা চির-জীবনের জন্য মুড়ি খাওয়া বন্ধ করিতে হইল। বিধাতা এইরূপে মুড়ি সম্বন্ধে বৈরাগ্যা-বলম্বনে বাধ্য করিয়াছেন, অপর দিকে আমাদের পরম বন্ধু ডাক্তার বাবু মুড়ির পরিবর্ত্তে পেস্তা বাদাম বেদানা ন্যাসপাতি ইত্যাদি কাবোলী ফল জল খাওয়ায় ব্যবহৃত করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। অর্দ্ধ পয়সার মুড়ির বরাদ্দ ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে কাবোলী ফল ভক্ষণ করিয়া কি অর্দ্ধ আনারও অধিক ব্যয় করা যায়? সেইরূপ ফল ভক্ষণ সচ-রাচর হয় না, কখন কখন ঘটে। আমাদে এক জন বন্ধু দীর্ঘকাল ব্যাপী কঠিন রোগে শয্যাগত ছিলেন, মুখরুচির জন্য তিনি বেদানা কিশমিশ আঙ্গুরাদি ভক্ষণ করিতেন, আর বলিতেন, "মা, তোমার কি দয়া, তুমি রোগ পাঠাইয়া আমাকে এ সকল বড় মানুষের জলখাবার খাওয়া-ইতেছ, আমি গরিব মানুষ, ২।৪ বৎসরের মধ্যেও এইরূপ উপাদেয় সামগ্রী খাইতে পাইতাম না, তোমার দয়াকে বলিহারি যাই!" তিনি আঙ্গুর ও বেদানা ইত্যাদি খাওয়ার বিষয়ে কৃতজ্ঞতাসূচক সুন্দর সুন্দর গানও রচনা করিয়া গাহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় পেস্তা বেদানা খাইয়া আমা-দের সেরূপ আনন্দ হয় না, তবে বিধাতার বিধি বলিয়া শিরোধার্য্য করিতে হইয়াছে।

যে কয়দিন জাহাজে থাকা হইয়াছে এক বেলা ভাতেভাত ও এক বেলা ঝোল ভাত তৃপ্তিপূর্ব্বক খাওয়া গিয়াছে, উৎকৃষ্ট ঘৃত ও নানা প্রকার আচার চাটনি সঙ্গে ছিল, আহারে কোনরূপ কষ্ট হয় নাই। জলখাওয়ার সামগ্রী পর্য্যাপ্ত ছিল, কিছু কলিকাতায়ও আনা গিয়াছিল।

বেগগামী টেরভা ইংরাজ বাঙ্গালি সিন্ধী পঞ্জাবী প্রভৃতি প্রায় সহস্র যাত্রিক বক্ষে ধারণপূর্ব্বক তরঙ্গায়িত সাগরবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া যাত্রা করিয়াছিল। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিকদিগের সুখ সুবিধার জন্য আশ্চর্য্য সুব্যবস্থা। তাহা আর কি বলিব? কিছু দিন হইল মহিলাতে আমেরিকাযাত্রিকেরপত্রে এবিষয় বিস্তারিত বিবৃত হইয়াছে, অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। একস্থানে একত্র হাজার লোক, কোন গোলযোগ ও হৈ চৈ নাই। আমরা একটি বাড়ীতে দশজন লোক কোন কাজে ২৪ ঘণ্টার জন্য সম্মিলিত হইলে কত কোলাহল হয়। ইংরাজদিগের নিকট শিষ্টতা ও নিয়ম ব্যবস্থা আমাদের শিখিবার কত আছে।

উপরে নীল চন্দ্রাতপের ন্যায় অনন্ত আকাশ, নিম্নে তরঙ্গাকুল দিগন্তব্যাপী নীল জলধি, কি বিচিত্র দৃশ্য! নীল গগন ও অকূল জলধি দূরে পরস্পর মিলিত হইয়া সকল গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্যের আকর সেই ভূমা অনন্ত মহেশ্বরকে প্রকাশ করে। কিন্তু যাত্রিকদিগের মধ্যে কয় জন ছিল যে, তাহা দেখিয়া বিচিত্র বিশ্বকর্ম্মার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছে? কতক লোককে দেখা গিয়াছে যে, তাস পাশা-ক্রীড়াতে মত্ত, কতক লোক বসিয়া কেবল হাস্য গল্প করিতেছে, কেহ কেহ মদ্য পান করিতেছে। ইতস্ততঃ এইরূপই লক্ষিত

হইয়াছে। আমাদের কেবিনে এক জন সিন্ধু দেশীয় যাত্রিক ছিলেন, তিনি নিজের একটি বন্ধুকে আনিয়া তাহার সঙ্গে বসিয়া পুনঃ পুনঃ সুরা পান করিতেছিলেন, পরে ডাক্তার চৌধুরী নিষেধ করাতে অন্যত্র যাইয়া পান করিতে লাগিলেন, এবং তিনি ডেকের কোন কোন আরোহীর সঙ্গে জুয়া খেলিতেন জুয়া খেলায় অনেক গুলি টাকা হারাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ভগবানকে স্মরণ মনন করার সুবিধা, কোন সময়ে জাহাজের কোন স্থানে প্রায় হইয়া উঠিত না। প্রত্যুষে ডেকের উপরে যাইয়া সংক্ষেপে উপাসনা করা যাইত, এবং নীল নীরধির গর্ভ হইতে সুবর্ণকান্তিবিভাবসুর গগনপ্রান্তে সমুদিত হওয়ার বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করা যাইত।

৬ই চৈত্র বুধবার অপরাহ্ণে একটি বিপন্ন পাইলের জাহাজ কিছুদূরে প্রকাশ পায়। উক্ত জাহাজের আরোহিগণ সঙ্কেতে আপনাদের বিপদ্ জ্ঞাপন করে। কাপ্তেন টেরভাকে উক্ত জাহাজের অভিমুখে চালনা করেন। সেই জাহাজখানা কোকনদ হইতে আরাকাণের অভিমুখে চালিত হইয়াছিল, কতকগুলি মাদ্রাজী লোক তাহাতে ছিল, পূর্ব্বদিন মঙ্গলবার ঝড়ে উক্ত জাহাজ জলমগ্ন হইতেছিল, যাত্রিকগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কোন রূপে প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে খাদ্য সামগ্রী কিছুই ছিল না, কখন আরাকাণে পঁহুছিতে পারিবে তাহারও কোন স্থিরতা ছিল না। বিপন্ন আরোহিগণ টেরভার কাপ্তেনের নিকটে সুকাতরে খাদ্য দ্রব্য ভিক্ষা করে। কাপ্তেন নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করেন, কাল কাল মাদ্রাজী লোক দেখিয়া ঘৃণা করিয়া বা মিথ্যা কথা কহিতেছে ভাবিয়া তিনি তাহাদিগকে খাদ্য সামগ্রী দানে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। আমাদের এক জন মোসলমান সহযাত্রীর দয়া হয়, তৎক্ষণাৎ তিনি দশটি টাকা প্রদান করেন। তাহারা টেরভার গুদাম হইতে ১০ টাকার চাউল খরিদ করিয়া লইয়া যায়।

বর্ম্মদেশে যাই বার সময় দ্বিতীয় দিবস সমুদ্রের অনেক দূর স্থান ব্যাপিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড্ডীয়মান মৎস্য দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তাহারা সাগরগর্ভ হইতে উঠিয়া কিছুদূর উড়িয়া পুনর্ব্বার সাগরে পড়িতেছিল। আমরা জানিতাম পক্ষীই উড়ে, জলের মাছের পাখা আছে, উড়িতে পারে, পূর্ব্বে আমরা কখনও দেখি নাই, অতিশয় কৌতূহলজনক ব্যাপার।

বুধবার মধ্য রাত্রিতে গঙ্গার মোহনার অদূরে জাহাজের লঙ্গর করা হয়। ৭ই বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন আমরা কলিকাতায় পঁহুছিব এরূপ আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই দিন প্রায় বেলা ১২টা পর্য্যন্ত জোওয়ার প্রতীক্ষা করা হয়, জোওয়ার আরম্ভ হইলে পর জাহাজ পরিচালিত হইয়াছিল। ক্রমে সাগরের ঘন নীল জল ঈষৎ সবুজ জল, পরে সাদা জল, অবশেষে ভাগীরথীর ঘোলা জল দেখা দিল। অপরাহ্ণ চারিটার পর মঙ্গলময় বিধাতার কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় পঁহুছান যায়। জাহাজঘাটে বন্ধুবর লালমোহন রায় আমাদের বাড়ীর দরবাণকে সঙ্গে করিয়া আমাদের প্রতীক্ষা

করিতেছিলেন। পরে আমরা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া বন্ধুদিগের সঙ্গে মিলিত হই।

আকস্মিক ঘটনা ও সামান্য রোগাদির গৃহচিকিৎসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যদি ক্ষত অধিক রূপে বিস্তৃত ও গভীর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বর কিম্বা অন্য উপসর্গাদি থাকে ও প্রদাহযুক্ত হয় বা তাহা হইতে পুঁজ নিঃসৃত হইতে থাকে, তাহা হইলে চিকিৎসার ভার উপযুক্ত চিকিৎসকের হস্তে ন্যস্ত করিবে।

কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত বা ক্ষতস্থানে প্রথমেই চূণ হলুদ ইত্যাদি দেওয়া উচিত নহে। নূতন আঘাতে চূণ হলুদ দিলে কোন উপকার হয় না, বরঞ্চ অপকার হইবার সম্ভাবনা। আঘাতের পর যদি বেদনা অধিক দিন থাকে তবে চূণ হলুদ, তেঁতুলের বীচি বাটা বা পোড়া মৃত্তিকার গরম প্রলেপ ইত্যাদি দিলে কখন কখন বেদনার উপশম হইতে দেখা যায়।

সময়ে সময়ে কঠিন আঘাতে শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি থেঁতলাইয়া যায় বা তাহাতে ক্ষত উৎপন্ন হয়। এইরূপ অবস্থা অতিশয় গুরুতর এবং প্রায় সাংঘাতিক হইয়া থাকে, এজন্য ইহার চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ তৎপর হওয়া আবশ্যক। লাঠির প্রহারে গৃহের ছাদ বা অন্য কোন উচ্চ স্থান হইতে অশ্ব বা হস্তিপৃষ্ঠ হইতে পতনে, ট্রাম ও রেলওয়ে সম্বন্ধীয় দৈবিক ঘটনাতে সাধারণতঃ এইরূপ আঘাত লাগিয়া থাকে।

মস্তকে আঘাতবশতঃ মস্তিষ্ক থেতলাইয়া গেলে মানুষ মূর্চ্ছিত ও অচেতন হয়। সামান্য আঘাত লাগিলে এই অচৈতন্য অবস্থা অধিকক্ষণ থাকে না, কয়েক মিনিট পরে আপনা হইতেই চৈতন্য হয়। চৈতন্য হওয়ার পূর্ব্বে সচরাচর বমন হয়। কঠিন আঘাতের ফলস্বরূপ ২।৪ দিন বা তদধিক দিনও অচেতন থাকিতে দেখা যায়। এই অবস্থায় আহত ব্যক্তির হস্তপদাদি নিশ্চল ভাবে পড়িয়া থাকে, নাড়ী ক্ষীণ, ক্ষুদ্র ও দ্রুত হয়। নিঃশ্বাসও ক্ষীণ ও দীর্ঘ হয়, শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত হয়। এই রূপ অবস্থা হইতেও কোন কোন ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে চৈতন্যলাভ করিয়া বিনা চিকিৎসাতেই আরোগ্য লাভ করে। কাহারও বা চৈতন্য আর ফিরিয়া আসে না। কেহ বা ডাকিলে ও নাড়া চাড়া দিলে একটু চৈতন্য লাভ করিয়া পুনর্ব্বার অচৈতন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়,এবং শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কেহ কেহ এই অবস্থা হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াও পরে শিরঃপীড়া, স্মৃতি ও মানসিক শক্তিহীনতা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস এবং মৃগী বা উন্মাদ ইত্যাদি পীড়াগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইয়া থাকে। আহত ব্যক্তির অচৈতন্য ভাব হইবামাত্র তাহার পরিধানের বস্ত্রাদি শিথিল করিয়া দিয়া তাহাকে মেজেতে শোয়াইয়া দিবে, মাথায় বালিস দিবে না, কেননা মাথা নীচু করিয়া রাখা আবশ্যক। মস্তকে ও মুখে শীতল জল সিঞ্চন করিবে, এবং যত শীঘ্র সম্ভব চিকিৎসককে সংবাদ দিবে।

মস্তকে আঘাত লাগা হেতু মস্তিষ্ক ক্ষত বা মস্তিষ্কের কোন শিরা বা ধমনী ছিন্ন হইলেও মানুষ অচেতন হয়। এই অচৈতন পূর্ব্ববর্ণিত থেতলান আঘাতের অচৈতনা অপেক্ষা গভীর হয়, ডাকিলে বা নাড়াচাড়া দিলে চেতনা হয় না। এক হস্ত ও এক পদ কিম্বা উভয় হস্ত ও পদ অসাড় হয়। উহা নাড়িবার শক্তি থাকে না, মুখ কখন বিবর্ণ কখন বা লালবর্ণ হয়, শরীরের উত্তাপ কখন স্বাভাবিক অপেক্ষা কম কখন বা বেশী হয়। নাড়ীর গতি অতিশয় মৃদু হয়, মিনিটে ৪০ হইতে ৬০ এর অধিক হয় না। (স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থায় ৭৫ হইতে ৮০ হইয়া থাকে) নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অতি ধীরে যেন একটু কষ্টের সহিত বহে, এবং উহাতে নাক ডাকার মত শব্দ হয়। চক্ষুদ্বয়ের তারা কখন প্রসারিত কখন সঙ্কুচিত এবং কখনবা একটী প্রসারিত অপরটী সঙ্কুচিত হয়। উপরিউক্ত অবস্থা অধিক কাল স্থায়ী হইলে অজ্ঞাতে বাহ্যে ও প্রস্রাব নির্গত হয়। মধ্যে মধ্যে মুখের ও হস্ত পদাদির মাংসপেশীতে আক্ষেপ (খিঁচুনী) উপস্থিত হয় এবং আহত ব্যক্তি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বা এই রূপ অবস্থা হইতেও আরোগ্যলাভ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অর্দ্ধাঙ্গাদি রোগে কষ্ট পায়।

আহত ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রাদি শিথিল করিয়া দিয়া তাহাকে মেজেতে উপধানহীন শয্যাতে শয়ন করাইবে, এবং মস্তকে শীতল জলসিক্ত (বরফ জল হইলে ভাল হয়) বস্ত্রখণ্ড রাখিয়া তাহা অনবরত ভিজাইয়া রাখিবে ও অনতিবিলম্বে চিকিৎসককে সংবাদ দিবে। শরীর শীতল হইলে বোতলে গরম জল পুরিয়া আশে পাশে রাখিয়া দিবে, উষ্ণ বস্ত্রে শরীর আবৃত করিবে।

শিরদাঁড়ার থেঁতলান আঘাত ও ক্ষত। ইহাতে আঘাত প্রাপ্ত স্থান ফুলিয়া উঠে ও বেদনাযুক্ত হয় ও আহত স্থানের নীম্নে সমুদয় শরীর কিয়ৎ পরিমাণে বা সম্পূর্ণরূপে অবশ ও অসাড় হইয়া যায়। অর্থাৎ উহাতে স্পর্শানুভব ও সঞ্চালনশক্তি থাকে না। শিরদাঁড়া ক্ষত হইলেও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়, তদ্ভিন্ন রক্ত স্রাব হইয়া থাকে। এতদুভয়েরই প্রাথমিক চিকিৎসা আহত ব্যক্তিকে বক্ষের উপরে (অর্থাৎ উপুড় করিয়া) শয়ন করাইয়া, আহত স্থানে শীতল জল ঢালা এবং শীতল জলের পটী দিয়া অনবরত উহা ভিজাইয়া রাখা।

ফুস্‌ফুসের ও হৃৎপিণ্ডের থেঁতলান আঘাত ও ক্ষত।

পৃষ্ঠে বক্ষে বা পার্শ্বে কোনরূপ কঠিন আঘাত লাগলে বা চাপ পড়িলে ফুস ফুস ও হৃৎপিণ্ড ক্ষত হইতে পারে, বা তাহা থেঁতলাইয়া যাইতে পারে।

লক্ষণ—বেদনা, নিঃশ্বাসের কষ্ট, সময়ে সময়ে কাশী ও কাশীর সহিত রক্ত উঠা। হৃৎপিণ্ডে আঘাত লাগিলে অচৈতন্যও উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং নাড়ী অতিশয় ক্ষীণ হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা। শয়ান অবস্থায় কিম্বা যে অবস্থায় থাকিলে নিঃশ্বাসের

কষ্ট অধিক হয় না, এরূপ অবস্থায় রাখিবে, এবং ছোট ছোট বরফের টুকরা চুষিয়া খাইতে দিবে, উহা চিবাইয়া খাওয়া উচিত নহে। বক্ষে শীতল জলের পটী দিবে। পিপাসা বোধ হইলে বেদানার বা লেবুর সরবত দিবে।

হৃৎপিণ্ড অধিকরূপে থেঁতলাইয়া গেলে বা ক্ষত হইলে জীবনের আশা অতি অল্পই থাকে, সচরাচর অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যু হয়।

পাকস্থলী ও অন্ত্রাদি এবং প্লীহা, যকৃত ও মূত্রাগারের আঘাত বা ক্ষত প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া থাকে।

লক্ষণ—অচৈতন্য বা অর্দ্ধচৈতন্য ও অতিশয় দুর্ব্বলতা আঘাত প্রাপ্ত স্থানে ফুলা ও বেদনা। পাকস্থলীতে ক্ষত হইলে রক্ত বমন হয়, এবং অন্ত্রাদি ক্ষত হইলে বাহ্যেতে রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় আহত ব্যক্তিকে শয়ন করাইয়া চৈতন্য উৎপাদনজন্য মুখে, মস্তকে ও বক্ষে জল সিঞ্চন করিবে। রক্ত বমন বা রেচন হইলে বরফ খাইতে দিবে, এবং পেটে শীতল জলের পটী দিবে। যদি প্রথম হইতেই শরীর হিম হইয়া যায় তবে কোনরূপ শীতল উপাচার করা উচিত নহে, বরঞ্চ গরম জলের বোতল আশে পাশে, হাতে পদতলে রাখা এবং শরীর উষ্ণবস্ত্রে আবৃত রাখা উচিত।

মূত্রাশয়ে ক্ষত হইলেও উপরি উক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়, তদ্ভিন্ন তল-পেটে বেদনা, তলপেট, জননেন্দ্রিয় ও উরুদ্বয়ের অভ্যন্তর দিকে ক্রমশঃ ফুলিয়া উঠে, প্রস্রাব খুব অল্পমাত্রায় হয়, কিম্বা আদৌ হয় না। ইহার কোনরূপ গার্হস্থ্য চিকিৎসা অসম্ভব। মূর্চ্ছা অপনোদন, ও শরীর উষ্ণ রাখার চেষ্টা বই আর কিছু করা যাইতে পারে না। ইহাতে অস্ত্র চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন হয়, সুতরাং শীঘ্র চিকিৎসককে সংবাদ দিয়া রোগীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবে।

আমেরিকাযাত্রিকের পত্র।

বৃহস্পতিবার, ১৫ই আগষ্ট ১৯০৭।

আমরা সোমবার বেলা ২টার সময় সুয়েজে পৌঁছুই। তখন খুব রদ্দুর, গরমও খুব ছিল। দূর থেকে,—অনেক দূর থেকে সুয়েজ দেখা যাচ্ছিল। সুয়েজ দেখতে মন্দ নয়,—বালির মাঠের মধ্যে একটা শহর, গাছপালা খুব কম থাকায় বালির Back groundএ বাড়ীগুলি খুব স্পষ্ট দেখায়—কেমন একটু অদ্ভুত বলে যেন মনে হয়, এত স্পষ্ট। তা, বাড়ী বড় কম নেই,—অনেক পাকা বাড়ী ও বাংলা আছে,—কতগুলি বেশ বড় বড়। জাহাজ যেমন সুয়েজ-এর দিকে এগুতে লাগলে অমনি জলের রং বদলাতে লাগলো,—সুন্দর নীল জল ক্রমে ময়লা রকমের সবুজে পরি-ণত হল, শেষে যত জাহাজ কাছিয়ে এল, সমুদ্দুরের কিনারার কাছের জল বেশ সুন্দর পাতলা সবুজ রংএ পরিণত হল। এ এক বড় মজার দৃশ্য, আরও মজার দেখতে জাহাজ থামলে পর, জাহাজের উপর থেকে পেছনে সমুদ্দরের দিকে

তাকিয়ে দেখলাম,—দেখলাম যেন আলাদা আলাদা রংএর জল পাশাপাশি সাজানো রয়েছে, পাতলা সবুজ থেকে ক্রমে এক এক সেড ঘন হয়ে horizonএর কাছে ঘন নীলে পরিণত হ'য়ে আকাশ ও সমুদ্দুরের মিলন রেখা খুব স্পষ্ট করে তুলেছে; সত্যি এই বিভিন্ন রংএর এক স্থানে পাশাপাশি মিলন দৃশ্য বড় সুন্দর লাগলো।

সুয়েজ শহর থেকে হারবার খানিকটা দূর। এখান থেকে কয়রো যাবার জন্যে রেলওয়ে আছে। ডেক থেকে ট্রেণ যেতে দেখলাম। সুয়েজএ আমরা নাবিনি, কারণ জাহাজ মোটে দুই ঘণ্টা ছিল। জাহাজ আসবা মাত্তোর নৌকা করে আরবেরা আঙ্গুর ইত্যাদি ফল ও নানান রকমের সুন্দর সুন্দর জিনিষ নিয়ে এলো, জাহাজের ডেকে ৫ মিনিটের মধ্যে বাজার বসে গেল, খুব কেনা বেচা চললো, যথেষ্ট ভীড় হলো। যেমন জাহাজ ছাড়বার ঘণ্টা পড়লো, ৫ মিনিটের ভেতর দাঁড় বয়ে বয়ে জাহাজ থেকে তাদের ছোট নৌকা গুলিতে নেবে তারা চলে গেল,—ভারি মজা, না? আমি ও সেই বাঙ্গাল ছেলেটী ১ সিলিংএ ৬ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩ সের আঙ্গুর কিনলাম। শস্তা, না? বড় সুন্দর আঙ্গুর? সুয়েজএর কথা আর কি বলবো এইবার কেনালের কথা বলি।

কেনাল কাটবার প্রথম প্রস্তাব নেপোলিয়নের। তিনি প্রথমে কেনাল-সম্বন্ধে প্ল্যান দেবার জন্যে একজন ইঞ্জিনিয়ার পাঠান, কিন্তু তার বোকামি ও কুড়েমির দরুণ কেনাল কাটা হয় নি। তার পর ১৮৮৫ সালে নেপোলিয়ন প্রথমে কেনাল কাটার প্ল্যান করেন, এবং ইজিপ্টের ভাইসরয় সেইডের প্ল্যানের হুকুম নিয়ে ১৮৫৬ সালে কেনাল কাটতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৯ সালের নভেম্বর মাসে কেনাল কাটা শেষ হয়, এবং ইউরোপ ও এসিয়ার জলের প্রথম মিলন হয়। ১৮৬৯ সালের ১৬ই নভেম্বর ফ্রান্সের সম্রাট্ ইয়ুজিন এই কেনাল ওপেন করেন। যে কাঠের ছোট বাড়ীটী তাঁর জন্যে তয়েরি হয়েছিল আজও তা আছে। যাহক যদিও কেনাল ফরাসীরা কেটেছিল, এবং এটা একটা ফ্রেন্স কোম্পানির হাতে, তবু এর বেশীর ভাগ কাজ কর্ম্ম ইংরেজদের হাতে, এবং শতকরা ৬৮ ভাগ ইংরেজদের জাহাজ এই কেনাল দিয়ে যাতায়াত করে। আমরা কেনালে ঢুকলাম প্রায় ৪ টের সময়। কেনালটী হ্যারিসন রোডের তিন গুণের চেয়ে বোধ হয় কম চওড়া হবে,—দুপাশে জলের ওপরে লাল রংএর বয়া দেওয়া,—রাত্তিরে তাতে গ্যাস ল্যাম্প জ্বলে,—সেই বয়া গুলির মাঝখান দিয়ে আস্তে আস্তে জাহাজ যায়। এই যে, ওয়াটারওয়ে ৩০ গজ চওড়া,—কোথায় প্রকাণ্ড অকূল সমুদ্দুর আর কোথায় ৩০ গজ চওড়া জল দিয়ে এই প্রকাণ্ড জাহাজ চলতে লাগলো, ভারি অদ্ভুত বোধ হয়। জাহাজের Forecastle deckএ দাঁড়িয়ে মিসরের মরুভূমির ওপর সূর্য্য ডুবতে দেখলাম। এখানকার সূর্য্যি ডুবায় সমস্ত আকাশ ভয়ানক লাল হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে এরকম দেখা যায় না। যেমন

সূর্য্যি ডুবলো অমনি জাহাজের ঠিক সামনে "search light" জ্বলে উঠ্‌লো। ১৩০০ গজ স্পষ্ট দেখা যায়, এমন search light না থাকলে রাত্তিরে কেনালে জাহাজ ঢুকতে দেয় না। আমাদের ভাগ্য ভাল ছিল, আমরা তাই এগুতে লাগলাম্। অবিশ্যি কেনালে পাশাপাশি দুখানা জাহাজ যেতে পারে না, তাই সাইডিং ষ্টেশন আছে, টেলিগ্রাফে লাইন ক্লিয়ার খবর পেলে তবে এক ষ্টেশন থেকে অন্য ষ্টেশন পর্য্যন্ত জাহাজ যাবার হুকুম পায়। আমাদের কপাল ভাল ছিল, তাই কোথাও সাইডিংএ যেতে হয় নি। search lightএর আলোতো কত জাহাজ সাইডিংএ দেখলাম। সমস্ত রাত্তির কেনাল দিয়ে গিয়ে ভোরে উঠে দেখি পোর্ট সেইডে পৌঁছেচি।

পোর্ট সেইড, আগে যে ইজিপ্টের ভাইসরয় সেইড পাশের কথা উল্লেখ করেচি, তাঁর নামে হয়েছে। নীল নদীর দৃশ্য সকাল বেলায় সূর্য্যের আলোয় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। পোর্ট সেইড এ আমরা ব্রেক ফাষ্টের পর নাবলাম। কদিন পরে খুব খানিক বেড়ালাম,--Apples, ডালিম ইত্যাদি কিছু কিনলাম, বেলা ১২টার সময় জাহাজে ফিরলাম। পোর্ট সেইড সহরটী ছোট হলেও বাড়ীগুলি খুব উঁচু উঁচু, দোকানগুলি বেশ সাজানো, রাস্তা গুলি ঠিক paralled ও সোজা, কিন্তু বড় ধুলো। সমুদ্দুরের ধারে অনেক বাথিং হাউস আছে। কেনাল কোম্পানির বাড়ীটী বেশ। এখানের বাহারটী বেশ দেখতে, অনেক জাহাজ দেখলাম P &O mail boatএর সঙ্গে দেখা হল—কলিকাতার চিঠি পেলাম। এখানেও জাহাজ থামা মাত্তোর ডেকে খুব বাজার বস্‌লো, বাজীকরেরা বাজী আরম্ভ করলো, কত magic হলো। যেমন সাড়ে তিনটার সময় জাহাজ ছাড়বার ঘণ্টা পড়লো, অমনি সব ভেঙ্গে গেল ১মিনিট দুই এর ভেতর ডেক ফাকা হয়ে গেল। পাইলট আমাদের পোর্ট সেইড থেকে সমুদ্দুরে দিয়ে ছোট একখানি নৌকো করে নাচতে নাচতে চলে গেল। আমরা দেখতে দেখতে পোর্ট সেইডের বাড়ী ঘর, বন্দর, জাহাজ, ব্রেক ওয়াটার ও তার ওপরে স্থাপিত, beautifully situated Lessep এর প্রকাণ্ড statue দেখতে দেখতে ক্রমে সবুজ থেকে সমুদ্দুরের নীল জলে এলাম। সে হচ্চে মঙ্গলবার বিকাল বেলা। একটু পরে নীল জলে টকটকে লাল সূর্য্যি ডুবতে দেখলাম, কিন্তু সে কথা থাক্। সেই অবধি ভূগোল পড়া সেই মেডিটেরিয়াণ সমুদ্র দিয়ে চলেছি,—আজও যাব, কালও সমস্ত দিন যাব, কাল রাত্তির ২টায় হয়তো ন্যাপোলেসে পৌঁছুবো। আজ এই পর্য্যন্ত।

নূতন পুস্তক।

শ্রীমান্ নিশিভূষণ, অর্থাৎ নিশিভূষণ নামক একটি ষোড়ষ বর্ষীয় বালকের জীবনী। নিশিভূষণ তাহার পিতার সঙ্গে শৈশবকালে আমাদের নিকটে স্থিতি করিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন, শিশুকাল হইতে আমরা তাঁহাকে বিশেষরূপে জানি।

তিনি বুদ্ধিমত্তা দয়া নম্রতা ও শীলতাগুণে সকলের প্রিয় ছিলেন, পরে পিতামাতার সঙ্গে যশোহর নগরে স্থিতি করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন। দুঃখীর প্রতি দয়া ও পরসেবা তাঁহার চরিত্রের বিশেষ সৌন্দর্য্য ছিল। তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা দিদীমার যত্নে তাঁহার ধর্ম্মভাব ও সদ্‌গুণের বিকাশ হইয়াছিল। গতবৎসর নিজের একটী আত্মীয় বালক বিকার জ্বরে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। নিশিভূষণ দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত কয়েক দিন তাঁহার সেবা করে, পরে নিজেও বিকার জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পিতামাতা আত্মীয়বর্গকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোকে চলিয়া যান। নিশির পিতৃদেব শশিভূষণ মিত্র তাঁহার জীবনচরিত লিখিয়াছেন। তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;—পুস্তখানা পড়িলে সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন নিশিভূষণ কেমন দেবচরিত্র বালক ছিলেন।

"নিশিভূষণ তাঁহার দিদিমাতার শিক্ষা-প্রভাবে সামান্য ভাবে চলিতেন, দেশে থাকিলে তাঁহার দিদিমাতার নিকট হইতে খাবারের পয়সা লইয়া দোকানে যাইতেন, দোকানে নানাবিধ মিষ্টান্ন সজ্জিত থাকা সত্বেও এক পয়সার মিশ্রী কিংবা মুড়ি অথবা বাতাসা খরিদ করিয়া আনিতেন। কোন দিন ছোলা বা কড়াই ভাজা কিনিয়া খাইতেন, এই অভ্যাস তাঁহার বয়োবৃদ্ধি কালে কলিকাতার শহরেও দেখা গিয়াছিল, স্কুলে টিফিনের সময় তিনি মিঠাই মোণ্ডা খাইতেন না, স্কুলে যাইবার কালে বাসা হইতে মিশ্রী বা বিস্কুট পকেটে করিয়া লইয়া যাইতেন। খাবার খাইতে বলিলে প্রকাশ করিতেন "বেশী পয়সা খরচ করিয়া না খাইলে কি পেট ভরে না? তাহাপেক্ষা এই প্রকার খাওয়া ভাল।"

"তিনি যেমন মিতব্যয়ী, তেমনি কর্ত্তব্য পরায়ণ বালক ছিলেন, এবং দীন দরিদ্রের প্রতি দয়া মমতাও তাঁহার ছিল। বলিষ্ঠকায় কর্ম্মঠ ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষা দিতে নারাজ থাকিলেও অন্ধ এবং আতুরদিগকে বঞ্চনা করিতেন না, এবং বৃদ্ধবয়স্ক ভিক্ষুক কিছু যাচ্ঞা করিলে ক্ষমতানুসারে কিঞ্চিৎ দান করিয়া আহ্লাদিত হইতেন। উপযুক্ত প্রার্থী পাইলে নিজের পরিত্যক্ত পুরাতন বস্ত্রাদি প্রদান করিতেন। কোন দরিদ্র যদি ক্ষুধিত হইয়া অন্ন ভিক্ষা করিত, তবে অন্ন প্রস্তুত থাকিলে নিজে বসিয়া তাহার ক্ষুধানল নিবৃত্তি করাইতেন। আবার দরিদ্র স্কুলের ছাত্র দেখিলে, শ্রীমানের বড়ই দয়ার্দ্র হইত। তাঁহার স্কুলের কোন একটি বালকের নিকট তিনি সময় সময় অঙ্কবিদ্যার চর্চ্চা করিতেন, ঐ বালকটীর সাংসারিক অবস্থা মন্দ ছিল, তিনি প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, নিশিভূষণ ঐ বালকের দুঃখে বড়ই কাতর হইতেন, এবং তাঁহার জননীর নিকট ঐ বালককে বস্ত্র বিনামা ইত্যাদি খরিদ করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, গৃহে যে দিবস কোন মিষ্টান্ন বা ভাল খাদ্য প্রস্তুত হইত, প্রায়ই নিশিভূষণ ঐ বালককে সাদরে ডাকাইয়া আনিয়া খাওয়াইতেন। একদা আমাদিগের

কোন একটী নিম্নস্থ কর্ম্মচারী বিশ্বাসঘাত. কতার অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিল। নিশিভূষণ কর্ম্মচারীটী না বুঝিয়া ঐ কার্য্য করিয়াছে, সুতরাং কর্ম্মচ্যুত হইলে তাহার অশেষ কষ্ট হইবে বিবেচনা করিয়া তাহাকে কর্ম্ম প্রত্যর্পণ করাইবার জন্য অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃত কার্য্য হইতে না পারিয়া দুঃখিত হইলেন। পরিশেষে তাহাকে আহার দিয়া বিদায় দিবার জন্য তাঁহার জননীর নিকটে প্রস্তাব করেন, কিন্তু অতিরিক্ত অন্ন প্রস্তুত না থাকায় প্রস্তুত অন্নের নিজাংশ কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিকে প্রদান করিয়া বিষণ্ণ মনে তাহাকে বিদায় করিয়াছিলেন। এপ্রকার অনেক সহৃদয়তার পরিচয় তাঁহার জীবনে লক্ষিত হইয়াছিল।"

ভাই করুণাচন্দ্র।

(বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।)

[১]

আবার কি বজ্রপাত বজ্রাহত শিরে !
আবার কি শুনি আজ দরিদ্র কুটীরে !
প্রাণের করুণা নাই, আজি কি শুনিতে পাই
শোকের প্রবাহ বহে অন্তরে অন্তরে !
নয়নে সবার আজ তীব্র অশ্রু ঝরে !

[২]

প্রাণের করুণা নাই কি শুনিতে পাই !
বিরলে বিজনে আজ কাঁদরে সবাই,
সেই মুখচ্ছবি হায়, দেখিতাম সদা যায়,
আচার্য্যের মুখছবি মুখেতে যাঁহার,
নাই সেই সুন্দর মূর্ত্তি মরধামে আর !

[৩]

প্রাণের করুণা নাই কি শুনিতে পাই !
নীরব নিস্তব্ধ সবে—মুখে কথা নাই !
নীরব ভগিনীগণ, কন্যা পুত্র বন্ধুজন !
নীরব—নীরব আজ কমলকুটীর !
নীরব ও পরিবার শোকেতে অধীর !

[৪]

কমলকুটীরবাসী আজ সে কমল
চলিলেন ত্যজি আজি এই মরুস্থল,
চলিলেন আজি তথা, আচার্য্য কেশব যথা
ভগিনী 'মোহিনী' মাতা 'জগৎ মোহিনী'
চলিলেন তথা আজ ত্যজিয়া ধরণী।

[৫]

কাঁদের আত্মায় আজ আত্মার মিলন,
তাঁদের ভস্মেতে আজ ভস্মের মিশ্রণ,
তাঁদের সনেতে আজি, নশ্বর শরীর ত্যজি
চলিলেন সেই স্থানে ইঙ্গিতে তাঁহার,
ইহ পরলোক যথা হয় একাকার।

[৬]

সিন্ধুপার হ'তে আজি ব্যাকুল অন্তরে,
না দেখি পিতারে আজ কমলকুটীরে,
স্নেহের 'সুনন্দ' হায়, শোকে মর্ম্মাহত প্রায়
না জানি কেমনে তাঁর কোমল অন্তর
করিবে বহন এই শোক ভয়ঙ্কর !

কলিকাতা, ১।১২।০৭ } শোকসন্তপ্ত

কেশব-জননী।

কি দেখিনু আজ ভারতশ্মশানে !
দেবী-মূর্ত্তি আজ ফুলের মালায়
শোভিত, সজ্জিত, কেন রে এখানে
বল না ? চলেছে কোথায় ?

এই শ্মশানেতে ভক্ত "কেশবের"
এই শ্মশানেতে ভগিনী "মোহিনী"
এই শ্মশানেতে "প্রতাপচন্দ্রের"
এই শ্মশানেতে "জগৎ মোহিনী"
এই শ্মশানেতে ভ্রাতা "করুণার"
এই শ্মশানেতে ভকত জনের
দেহ ভস্ম হায়! হয়েছে সবার
কেবল শ্মশানে আজি এ দলের?
দেখেছিনু এঁরে এই পরিবারে
যোগিনীর মত বসিয়া বিজনে,
তপ যপে রত সাজিতে তাঁহারে
দেখি সমাহিত নীরবে শ্মশানে।
যোগীর জননী আমাদের তাই
ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ণ পিতামহী মত
দেখিতাম যাঁরে আজি তিনি নাই
কি বলিব আজ কাঁদি অবিরত।
"করুণার" ভস্ম প্রোথিত যেমন,
না হইতে শেষ শোক দুর্ণিবার,
দুঃখী পরিবারে বজ্রের মতন
দহিল আবার পরাণ সবার।
দেহ ভস্মীভূত পবিত্র চিতায়,
নাহ ভস্মীভূত জীবন তাঁহার,
প্রেম, ভক্তি, নিষ্ঠা পরম পিতায়
রবে তাঁর চির অক্ষুণ্ণ অপার।
রবে চিরদিন প্রার্থনা তাঁহার,
রবে চিরদিন সে শান্ত মূরতি,
রবে চিরদিন তপ, জপ তাঁর,
রবে চিরদিন প্রেম পুণ্যমতি।
যা ছিল যাবার গিয়াছে কেবল,
ধূলার শরীর মিশিল ধূলায়,
কিন্তু সেই আত্মা পবিত্র নির্ম্মল
পুত্র-আত্মা সহ মিলিল তথায়।

মহিতা সহ পুত্র "মেরীর" মতন
স্বর্গধামে আজ শঙ্খনাদ হয়,
দেবগণ আজ মিলিয়া এখন
কহিছেন সবে "বিধানের জয়"
যাও মাতা "মেরী" যাও না তথায়,
যাও তুমি যাও দেবনিকেতনে,
যাও তুমি যাও কেশব যথায়,
রও তথা "কৃষ্ণ" "নবীনের" সনে।
শান্তির আলয়ে শান্তির ক্রোড়েতে
শান্তিধামে রও চির সমাহিত,
শান্তি সুধা পানে শান্তির বারিতে
রও চিরদিন তাঁহাতে মিলিত।

স্নেহের সেবক,
শ্রীগৌরী প্রসাদ।

মহিলাদিগের রচনা।

নিশীথে।

জাগে নাই যবে একটি মানব
গায়না পাখীরা ললিত তানে
সমস্ত জগত নিস্তব্ধ নীরব
প্রকৃতি আছেন গভীর ধ্যানে।

এখনও চাঁদিমা আকাশে হাসে
রজত কিরণ ছড়ায়ে ধরা,
এখনও তারা মধুর প্রকাশে
যায়নি নিবিয়া একটী ওরা।

শান্ত যামিনীর কি মধুর ছবি
মরম পরশী তুলিছে তান।
সাধনা সঙ্গীত নীরবেতে সবি,
নীরবেই আহা মগন প্রাণ।

এ হেন সময়ে আছিনু নিদ্রায়
খুলে দিলে কে গো আঁখির পাতা

সুপ্ত এ জগত, বহে নৈশ বারি
সম্মুখে শয়ান নিদ্রিতা মাতা।

আঁখি মেলি চাহি দেখিনু সুন্দর
শান্তির ত্রিদিব ওঁর এ ধরা
বহিল হৃদয়ে প্রীতির নির্ঝর
হে দেব, ওঁর মধুরূপে ভরা।

আভাষ।*

[১]
ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ
পূরবে জলদঘটা
কৃষ্ণবর্ণ মেঘচ্ছটা
এবার ডুবিল বুঝি বঙ্গীয় আবাস!
ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ!

[২]
ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ
হু হু করে ছুটে বায়ু
নিঃশেষ হয়েছে আয়ু
বুঝি এই বার জগতের মহা নাশ
ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ!

[৩]
ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ
শঙ্কাকুল প্রাণ মন
শুধু বিষাদ বেদন
শস্য ছাড়ি হয় বুঝি মানবের চাষ,
ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ!

[৪]
ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ
কোথায় শরতকালে
রবি-শশী-রশ্মিজালে
ঘুচাবে মানবতাপ পুরি অভিলাষ
ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ!

[৫]
ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ
দিবা-নিশী একাকার
সবি আঁধার আঁধার
হায় হায় একি দেব! হ'ল সর্ব্বনাশ!
ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ!

[৬]
ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ
গভীর জলদ তায়
সকলি নাশিতে চায়
কেমনে পড়িল হায় এ আশ্বিন মাস
ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ

[৭]
ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ
যেদিকে চাহি'ছি পিত!
জলভারে আবরিত
দেখেছি সকলে যেন গলে-রজ্জু ফাঁস
ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ!

[৮]
ঘনায়ে আসিছে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ
সন্তান-কুশল ভাবি
ক্রোধ পরিহর দেবি!
রক্ষা কর জীব জন্তু দাও গো আশ্বাস
ঘনায়ে এলো যে দেবি! দীপ্ত বঙ্গাকাশ!

[৯]
ঘনায়ে এলো যে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ
জল ঝড় এক রথে
আসিতেছে এক পথে
আসিছে আসিছে দেবি! দেখ গো আভাষ
ঘনায়ে এলো যে ওই দীপ্ত বঙ্গাকাশ!

[১০]
রক্ষা কর মাতঃ তুমি বঙ্গীয় আবাস
হু হু করে ছুটে জল
কিবা কি বলিব বল
রক্ষা কর রক্ষাময়ি! দিইয়া আশ্বাস
বাঁচাও মানব প্রাণী জীব অভিলাষ!

* ১৩০৭ সালের প্রবল ঝড় বৃষ্টির প্রথম আভাষে লিখিত।

প্রলয়ে। *

[১]

গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া
ঝম্ ঝম্ রব ক'রে
সতত সলিল ঝরে
দিন রাত অবিরাম আকাশ ভেদিয়া
ভাঙ্গিয়া প্রাসাদ চূড়া
হ'য়ে গেল গুঁড়া গুঁড়া
তবুও মিটে না আশ দেখ গো চাহিয়া
গেল যে তোমার বিশ্ব সলিলে ডুবিয়া।

[২]

গেল যে তোমার বিশ্ব সলিলে ডুবিয়া
হায় হায় একি দায়
সকলি ভাঙ্গিয়া যায়
তোমার সাধের বিশ্ব গেল যে ভাঙ্গিয়া
দেখ দেব দেখ চেয়ে!
দশ কোটি ছেলে মেয়ে
উর্দ্ধ মুখে উর্দ্ধ নেত্রে রয়েছে চাহিয়া
গেল যে তোমার ধরা পবনে উড়িয়া

[৩]

গেল যে তোমার বিশ্ব সলিলে ডুবিয়া
কিবা কি দেখিব বল
ব্রহ্মাণ্ড ছেয়েচে জল
শত শত প্রাণী যায় স্রোতেতে ভাসিয়া
বুঝে না মানবমন
তাই খুলিয়া নয়ন
দেখিতেছে বারে বার উরধে চাহিয়া
গেল যে তোমার বিশ্ব পবনে উড়িয়া।

[৪]

গেল যে তোমার বিশ্ব সলিলে ডুবিয়া
"রেল" পথ হ'য়ে চূর্ণ
শুষ্ক স্থান জল পূর্ণ
হায় হায় একি খেলা দিতেছ আনিয়া
মাতারে জড়ায়ে শিশু
কিবা নর কিবা পশু
ক্ষণে ক্ষণে উচ্চরবে উঠিছে কাঁদিয়া
গেল যে তোমার বিশ্ব পবনে উড়িয়া।

* ১৩০৭ সনের আশ্বিনের জল ঝড়ে লিখিত।

পথিক।

১

এসেছি জগতে মোরা দুদিনের তরে
এই যে বিশাল ধরা
পিতা মাতা সুত দারা
চিরদিন কারো কিছু রবে না সংসারে
আমার স্বগণ যত
ভাবি মোরা অবিরত
দুদিনের পরে সব ফুরাবে অচিরে
এসেছি জগতে মোরা দুদিনের তরে।

২

এসেছি জগতে মোরা দুদিনের তরে
সংসারের যত আশ
সকলি হইবে নাশ
থাকিবে না কভু আর চিরদিন তরে
সুখের যৌবন কাল
থাকিবে না চিরকাল
যাহা যাবে তাহা আর আসিবে না ফিরে
এসেছি জগতে মোরা দুদিনের তরে।

৩

এসেছি জগতে মোরা দুদিনের তরে
প্রভাতে তপন দেব,
পড়িয়া লোহিত বেশ
বিতরিছে আলোরাশি যত মানবেরে
সেও চিরদিন তরে,
থাকিতে নাহিক পারে
যামিনীর আগমনে পালায় সত্বরে।
আমরাও আসিয়াছি দুদিনের তরে

৪

এসেছি জগতে মোরা দুদিনের তরে
এই যে সুনীলাকাশে
চাঁদ ও তারা হাসে
তারাও প্রভাত হলে সরে যায় দূরে
ছয় ঋতু আসে যায়
কেহ না থাকিতে পায়,
এ জগত মাঝে হায় চির দিন তরে
আমরাও আসিয়াছি দুদিনের তরে।

এসেছি জগতে মোরা দুদিনের তরে
এই যে সুখের গেহ,
আত্মীয় স্বজন কেহ
রবে না মোদের হায় চিরদিন তরে
না বুঝি কিছুই মোরা
মিছে ভেবে হই সারা,
না বুঝিয়ে ভ্রমনদে ঝাঁপ দেই পড়ে
এসেছি জগতে মোরা দুদিনের তরে

৬

এসেছি জগতে মোরা দুদিনের তরে
সামান্য ধনের লোভে
পরমার্থ ধন কূপে
ফেলে দিতে কভু ভয় না ভাবি অন্তরে
জীবনের পরিণাম
মনেতে না দেই স্থান
অহঙ্কার ভরে প্রভু না ডাকি তোমারে
ভাবি না এসেছি মোরা দুদিনের তরে

৭

এসেছি জগতে প্রভু দুদিনের তরে
দেও মতি ভগবান্
যত দিন থাকে প্রাণ
পাপেতে ডুবিয়ে যেন না ভুলি তোমারে
আমরা অবোধ অতি
নাই প্রাণে ভক্তি প্রীতি
শিখাও ধর্ম্মের নীতি পাপী সন্তানেরে
এসেছি জগতে মোরা দুদিনের তরে

৮

এসেছি জগতে মোরা দুদিনের তরে
আমাদের পাপ আশ
সকলি হইবে নাশ
যেতে হবে ত্বরা সেই মহাসিন্ধুতীরে
তাই ডাকি দীননাথ
প্রসারি স্নেহের হাত
রাখ মোরে প্রলোভন হতে অতি দূরে
পথিক এসেছি মোরা দুদিনের তরে।

সংবাদ।

গত ২৮শে অগ্রহায়ন শনিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭টার সময় পরম ভক্তিভাজন আচার্য্য কেশব সেন মহাশয়ের বন্দনীয়া মাতৃদেবী নূনাধিক ৯০ বৎসর বয়সে নিমোনিয়া রোগে কলুটোলাস্থ ৫৯। ৩নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট ভবনে স্বর্গগত হইয়াছেন। সেই দিন অপরাহ্ণে ৩টার সময়ে তাঁহার পরিত্যক্ত দেহ তাঁহার ব্রাহ্ম ও হিন্দু আত্মীয়গণ বহন করিয়া শ্মশানঘাটে লইয়া গিয়াছিলেন। পরম বন্দনীয়া মাতা অতিশয় সেবাপরায়ণা মধুরপ্রকৃতি ধর্ম্মানুরাগিণী ভক্তিমতী পরম দয়াবতী ছিলেন। আমরা আগামীতে তাঁহার পবিত্র জীবন কাহিনী প্রকাশ করিতে যত্ন করিব।

বারিষ্টার এ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় রাজবিদ্রোহিতাসূচক বক্তৃতার জন্য ধৃত হইয়া বিচারাধীন ছিলেন, তিনি আত্ম অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করাতে দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন, অব্যাহতি না পাইলে বারিষ্টারী হারাইতেন। সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারাধীন ছিলেন, বিচারনিষ্পত্তি হওয়ার পূর্ব্বে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রিণ্টার ও ম্যানেজার ক্ষমা প্রার্থনা করাতে মুক্তি পাইছেন। স্বদেশী বক্তা লিয়াকত হোসেন এক বক্তৃতার জন্য বরিশালে ধৃত হইয়া জামিন দিয়া বিচারাধীন আছেন, তিনি আর সভা সমিতি না করেন তাঁহার প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেটের এইরূপ আদেশ ছিল, সেই আদেশ অমান্য করার অপরাধে তাঁহার ৬ মাসের জন্য কারাবাস দণ্ড হইয়াছে। বাবু বিপিনচন্দ্র পাল কলিকাতা জেইল হইতে বক্সার জেইলে প্রেরিত হইয়াছেন।

মহিলার ত্রয়োদশ বৎসরের ৫ মাস অতীত হইয়াছে, যাঁহারা দ্বাদশ বৎসরের মূল্য এ পর্য্যন্ত প্রদান করেন নাই, অন্ততঃ সেই বৎসরের মূল্য অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠাইয়া আমাদিগকে যেন উক্ত করেন এই প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে আমাদের সময় ও অর্থ ক্ষতি হয়।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

গার্হস্থ্যস্বাস্থ্যরক্ষা। *

জীবনধারণ করিতে হইলে স্বাস্থ্যই সর্ব্বপ্রধান দরকারী জিনিষ। প্রত্যেকেরই ইহা জানা থাকা প্রয়োজন যে কি প্রকারে সেই স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয়, তাহার উপায় জানা না থাকিলে নানা রকম রোগ ভোগ করিতে হয়। আমাদিগের হিন্দু প্রচলিত প্রথা জানা আছে, অন্যান্য দেশীয় প্রচলিত প্রথা আমরা তত জানি না, হিন্দুরা এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা কুসংস্কার বলিয়া অগ্রাহ্য করা উচিত নয়, ইহার প্রতি একটু মনোযোগ করিলে দেখা যায় যে, এক একটা পদ্ধতিতে এমন আশ্চর্য্য বিষয় আছে যে, ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যথা, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য, বৈধব্যাবস্থায় ধর্ম্মবিষয় চর্চ্চা ও কিরূপে তাহা লাভ করা যায় এ বিষয় চিন্তা করাই উচিত; এই জন্যই তাহারা বিধবাদের প্রতি নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহাতে দুটী উপকার হয়, প্রথমতঃ এক বেলা নিয়মিত রূপে আহার করিলে পেটের অসুখ প্রভৃতি হওয়ার সম্ভাবনা কম; দ্বিতীয়তঃ মাছ, মাংস প্রভৃতি আহার করিলে শরীর উত্তেজিত হয়, নিরামিশ আহারে তা হয় না, এবং কতক পরিমাণে চিত্ত সংযত থাকে, মনে ধর্ম্মভাব জাগরূক থাকে। জীবনধারণ করিতে দুইটী জিনিস প্রধানতঃ দরকার—বায়ু ও জল জল না হইলে কতকক্ষণ তবুও থাকা যায়, কিন্তু বায়ু না হইলে এক দণ্ডও বাঁচিতে পারা যায় না। অপিচ ইহা জানা থাকা চাই যে সেই বাতাস অতি বিশুদ্ধ বাতাস হওয়া চাই; আমরা যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করি তাহাতে বায়ু দূষিত হয়, কিন্তু ঈশ্বর তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বৃক্ষ লতার এমন শক্তি আছে, যাহার দ্বারা তাহারা সেই দূষিত পদার্থ টানিয়া লইয়া বায়ু শোধিত করিয়া দেয়। যে বাড়ীতে যে ঘরে আমরা বাস করি তাহাতে যাহাতে সুন্দররূপে বায়ুসঞ্চালন থাকে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। মাছকে যেমন এক বোতল জলে রাখিলে সে বাঁচিতে পারে না, মানুষের পক্ষেও বন্ধ ঘরে থাকিলে তাই। বায়ু সঞ্চালন বন্ধ করিয়া ঘরে বাস করা যে কত খারাপ তাহা প্রকাশ করা যায় না, এবং ইহাতে যে কত প্রকার রোগ হইবার সম্ভাবনা আছে। নৈসর্গিক নিয়মে বায়ু সঞ্চালিত হয়, মাটী হইতে ১০।১৫ ফিট ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত বাতাস দূষিত, কারণ যত প্রকার পচা ভিজা জিনিষের কাটানু ঐ বাতাসের সহিত মিশিয়া যায়। বর্ষাকালে ঐরূপ হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী; কারণ সব জিনিষ ভিজা থাকে, স্বাস্থ্যের পক্ষে বিতল বাড়ীই ভাল। হিন্দু জাতি জলকে মহা মান্য করিতেন, এবং যে জল খাইয়া প্রাণধারণ করা যায় তাহা যিনি দিয়াছেন সেই জগদীশ্বরকে প্রণাম করিতেন। তাদের একটা প্রথা আছে যে, পুষ্করিণীর ৫০ হাত দূরে যত আবর্জ্জনা ময়লা ফেলিবে আর প্রত্যেকে স্নান করিবার সময় ডুব দিয়ে এক আঁজলা করিয়া মাটী তুলিয়া আনিবে। ইহারও একটী সুন্দর অর্থ আছে, বৃষ্টিতে এবং নানা কারণে যে সব দূষিত পদার্থ জলে পড়ে পুষ্করিণী ক্রমে ভরিয়া আসে, ঐ রকম করিয়া যদি সকলে মাটী তুলিয়া আনে, তবে আর ভরিয়া আসিতে পারে না। পরিষ্কার জল যে দরকারী সে বিষয় আর বোধ হয় বেশী বলিয়া দিতে হইবে না।

জল ও বাতাসের পরে দরকার আহার। বয়স অনুসারে আহারের প্রভেদ। শারিরীক অবস্থা ও পরিশ্রমের পরিমাণের উপরে আহার নির্ভর করে, এবং অভ্যাসের

---

* ২০শে এপ্রিল তারিখে শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবেন্দ্র নাথ রায় যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন তম্মূলক।

উপরও কতক পরিমাণে নির্ভর আছে। স্বভাবতঃ এমন জিনিষ আছে যাহা সকল সুস্থ দেহের পক্ষেই সমান। যেমন ডাল, ভাত, তরকারী, মাছ প্রভৃতি সকলেই হজম করিতে পারেন, তবে পরিমাণের প্রভেদ আছে। সকল শরীরে সকল জিনিষ হজম হয় না, যথা ঘৃত, ঘন দুধ ইত্যাদি। এ সকল জিনিষের সহিত স্বাভাবিক অভ্যাসের তত সম্বন্ধ নাই, হজম হয় ও অনেক সময় নাও হয়। স্বাস্থ্যের পক্ষে ডাল, ভাত, মাছ, মাংস, দুধ রুটী প্রভৃতিই নিয়মিত পরিমাণে আহার করিলে ভাল হয়। দুই ছটাক মাছই যথেষ্ট। গরপরতা দশ ছটাক করিয়া চাউল লোকে খায়, শ্রমজীবী লোকেরা অবশ্য পরিমাণে ঢের বেশী খায়। যাহারা রুটী খায়, যারা দেড় পোয়া পরিমাণে আটা একেবারে খায় তাহাদের জোরও বেশী হয়। আমাদের জানা থাকা উচিত কোন্ জিনিষ কি রকম উপকারী এবং তাহা কত পরিমাণে খাইলে শরীর ভাল থাকে। ডাল ;—সব ডাল সমান পরিমাণে উপকারী নয়, মুগুর ডাল সকল ডাল অপেক্ষা বেশী উপকারী। খাদ্যদ্রব্যমাত্রেই পোষণের জিনিষ আছে, তবে পরিমাণে বেশী ও কম, মাংস যে পরিমাণে খাইলে যে ফল হয় মাছ সেই পরিমাণে খাইলে কম ফল হয়, মাংস পরিমাণে মাছ হইতে খাওয়াও যায় বেশী। মস্তিষ্কের কাজ যারা করে তাহাদের জন্য পরিমাণে অল্প অথচ উপকারে বেশী হয়, এমন খাদ্যই উপযুক্ত।

মুল্যপ্রাপ্তি।

১০ম বৎসর।

শ্রীমতী সুশীলাবালা সিংহ,	দ্বারভাঙ্গা	

১১শ বৎসর।

শ্রীমতী সুশীলাবালা সিংহ,	দ্বারভাঙ্গা	২৲
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মল্লিক,	গোবিন্দপুর	২৲

১২শ বৎসর।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মল্লিক,	গোবিন্দপুর	২৲
” মহারাজা দিনাজপুর	দিনাজপুর	২৲
” গোপীমোহন চৌধুরী,	হরিপুর	২৲
শ্রীমতী নলিনী দেবী,	কোচিন	২৲
শ্রীযুক্ত আবদোল্ মজিদ সাহেব,	রাজশাহী	২৲
” পুলিনচন্দ্র দত্ত,	শিলং	১৲
” কালিদাস দাস,	খুরুট	১৲
” তরেণনাথ সেন,	শিমলাপাহাড়	
” বিনয়ভূষণ ঘোষ,	লাহোর	

১৩শ বৎসর।

শ্রীমতী নলিনী দেবী,	কোচীন	২৲
শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায়,	লোক্ষ্ণ	২৲
” জি, পি, সুকুল,	নাটোর	২৲
শ্রীমতী সুধাংশু বিকাশিনী,	কোচবিহার	
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার সেন,	বহরমপুর	
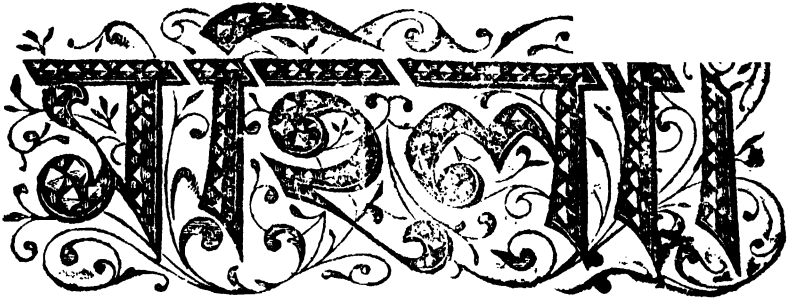
মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৩শ ভাগ] পৌষ ১৩১৪ ; জানুয়ারী ১৯০৮। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

স্ত্রীনিতীসার।

প্রাচীন শ্রেণীর মহিলাদিগের সাধারণতঃ আতিথ্য সৎকারে বিশেষ নিষ্ঠা দেখা যায়। তাঁহারা অতিথির সেবা করা পরম ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। আমরা স্বর্গগতা কোন প্রাচীনা মহিলাকে জানি যে, তিনি প্রতিদিন স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া অভ্যাগত জনকে সাদরে নানা উপচারে ভোজন করাইতেন। শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্ত পরিব্রাজককে আশ্রয় ও অন্নদান করা যে মহাপুণ্য তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতিথির সেবা করিয়া বাস্তবিক সেবিকা ধন্যা হন। আতিথ্য সৎকার পরম ধর্ম্ম, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকের এই বিশ্বাস। সেবাপরায়ণা কোমলহৃদয়া নারীগণ অতিথিসেবা করিতে পারিলে বিশেষ প্রীতি লাভ করেন।

একদা আমরা প্রাতঃকালে হিমাচলের উপত্যকা প্রদেশ দেরাদুন হইতে ৮ মাইল দূরে গিরিপাদমূলে সহস্রধারা নামক স্থান দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গে একটি বন্ধু ও তাঁহার পত্নী সঙ্গে ছিলেন। সহস্রধারার অদূরে পথিমধ্যে একটী বৃদ্ধা পাহাড়ী স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আমরা কোন্ পথে তথায় যাইব তাহাকে জিজ্ঞাসা করি। স্ত্রীলোকটি সস্নেহ নয়নে আমাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলে, বাবা, তোমরা বড় ক্লান্ত হইয়াছ, আমার বাড়ী নিকটে, আমি রুটি প্রস্তুত করিয়া দিতেছি খাইয়া বিশ্রাম করিয়া যাও। একজন অসভ্য পাহাড়ী স্ত্রীলোকের কেমন দয়া ও অতিথি সেবার প্রতি কেমন অনুরাগ?

ইয়ুরোপীয় মহিলাদের আতিথ্য সৎকারে নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় না। এদেশের নব্য মহিলাদিগের মধ্যে সেই ভাবের অভাব দেখা যায়। বিলাতে পথিকদিগকে নিজ অর্থ ব্যয়ে হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ না করিলে উপায়ান্তর নাই। এদেশেও এক্ষণ সেই অবস্থা হইয়াছে; সহরাঞ্চলে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি স্থান পায় না। মহিলারা অতিথিকে আর দেবতাজ্ঞানে সেবা করেন না। জাতীয় পবিত্র ভাব ও পবিত্র নীতি সকল ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে।

রুষ সাম্রাজ্ঞী ক্যাথারিণা।

সম্রাট্ পিটের দি গ্রেট রুষকে একটি বলশালী এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। রুষেরা জাহাজ নির্ম্মাণ কার্য্য শিক্ষা করিতে পারে এজন্য তিনি ছদ্মবেশে ওলান্দাজদের দেশে বাস করিয়া জাহাজনির্ম্মাণকার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করেন; এবং তাঁহার নিজ শিক্ষা গুণে তিনি রুষের লোকদিগকে জাহাজনির্ম্মাণাদি কার্য্যে শিক্ষা দান করেন। তিনি পুরুষ জাতির শক্তি সমূহ বিকশিত করিতে জীবন অতিবাহিত করিছিলেন, এবং তাঁহার পরমা ধার্ম্মিকা রাজ্ঞী ক্যাথারিণা নারীজাতির উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করেন। ক্যাথারিণার জীবনে আমরা জানিতে পাই যে, ঈশ্বরেচ্ছা করিলে কাঙ্গালিনীও মহারাণী হয়। আমরা অদ্য এই সদাশয়া রমণীর জীবনবৃত্তান্ত যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি। ভরসা করি ইহার মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ হস্ত দেখিয়া, নারীগণ স্ব স্ব জীবনের উন্নতিতে মনোনিবেশ করিবেন।

লিভোনিয়ার অন্তর্গত ডারপট নগরের সন্নিকটে ক্যাথারিণা আলেকসিওনার জন্ম হয়। তাঁহার পিতামাতা অতি দরিদ্র ছিলেন, সুতরাং ক্যাথারিণা তাঁহাদের নিকট হইতে কোন সম্পত্তি লাভ করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের সদ্গুণরাশি এবং মিতব্যয়িতার উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। তিনি পিতৃবিয়োগান্তে সামান্য পর্ণকুটীরে মাতাসহ বাস করিতেন। দরিদ্রতাসত্বেও মাতা ও কন্যা উভয়ে মনের সুখে ছিলেন। কন্যা কায়িক পরিশ্রম দ্বারা বৃদ্ধা মাতার ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। যখন ক্যাথারিণা সুতা কাটিতেন তখন তাঁহার বৃদ্ধা জননী নিকটে উপবেশন করিয়া কোন না কোন রূপ ধর্ম্মভাবোদ্দীপক গ্রন্থ পাঠ করিতেন। দিবসান্তে ঈশ্বর গুণানুবাদ এবং প্রার্থনান্তে উভয়ে অগ্নির পার্শ্বে বসিয়া স্বোপার্জ্জিত অন্ন ভোজন করিতেন। ক্যাথারিণার মুখশ্রী এবং শরীর এরূপ নিরুপম সুন্দর ছিল যে তৎকালে সেইরূপ সুন্দরী নারী আর কুত্রাপি ছিলেন না, কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাঁহার সমগ্র মন প্রাণ চিত্তের উৎকর্ষসাধনেই একান্ত রত ছিল। তিনি মাতার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং একজন লুথার মতাবলম্বী ধর্ম্মযাজকের নিকটে ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। যথাযথরূপে ধর্ম্মপালনে, ঈশ্বরের অভিপ্রেত কর্ত্তব্য সাধনে তাঁহার জীবন পরিচালিত হইত। জন্ম হইতেই তাঁহার বুদ্ধি ও প্রতিভা প্রবল এবং বিশুদ্ধ ছিল। তাঁহাকে সদ্গুণ শালিনী এবং ভদ্রব্যবহারে নিপুণা দেখিয়া স্থানীয় অনেক কৃষক যুবক তাঁহার পাণিগ্রহণ প্রার্থী হইয়াছিল, কিন্তু তিনি মাতার প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন, এরূপ বিবাহ প্রস্তাব তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না।

পঞ্চদশবর্ষ বয়সের সময় তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। একাকিনী গৃহে অবস্থান করা দুষ্কর মনে করিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মশিক্ষাদাতা ধর্ম্মযাজকের গৃহে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সেই

গৃহের ছেলেদের তত্ত্বাবধারিকারূপে বাস করিতেছিলেন। বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক তাঁহাকে আপন সন্তানবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। সেই গৃহের ছেলেদের শিক্ষকের নিকট নারীজনোচিত উৎকৃষ্ট বৃত্তি নিচয় বিকশিত হয়, এমন শিক্ষালাভ করিতে তিনি সুবিধা করিলেন। এইরূপে বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজকের মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি আত্মোৎকর্ষসাধনে রত ছিলেন। ধর্ম্মযাজকের মৃত্যুতে তাঁহাকে পুনরায় পূর্ব্ববৎ দরিদ্রতার হস্তে পড়িতে হইল। এই সময়ে লিভোনিয়া দেশে যুদ্ধ হইতেছিল, সুতরাং অতীব শোচনীয়রূপে দেশ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এরূপ যুদ্ধজনিত বিপদে দরিদ্রেরই অত্যন্ত গুরুতর ক্ষতি ঘটিয়া থাকে। অতুল গুণরাশির অধিকারিণী হইয়াও ক্যাথেরিণাকে দরিদ্রতা এবং সহায়হীন অবস্থায় যাবতীয় দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইয়াছিল। দিন দিন খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হইতে লাগিল, এবং তাঁহার নিজের সঞ্চয় সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়া যাওয়াতে তিনি সমৃদ্ধিসম্পন্ন মেরিয়েনবর্গ নগরে পদব্রজে যাইতে স্থির করিলেন। নিজের যৎসামান্য পরিচ্ছদ ব্যাগের ভিতর পুরিয়া তিনি পদব্রজে যাত্রা করিলেন। অনুর্ব্বর বন্ধুর ভূমির উপর দিয়া পথ চলিতে হইয়াছিল। সেই রাজপথে অসভ্য ভীমপ্রকৃতি সুইড কিম্বা প্রুশিয়ারা যে যখন আক্রান্ত করিত লুণ্ঠন করিত। আহারাভাব এত প্রবল হইয়াছিল যে, এ সমস্ত ভীষণ অবস্থা এবং পথ ক্লান্তিও তিনি দৃক্‌পাত করিতে পারিলেন না। যাইতে যাইতে সন্ধ্যার আগমন হইল, আশ্রয় গ্রহণার্থে ক্যাথেরিণা পথপার্শ্বস্থ একটি কুটীরে প্রবেশ করিবার সময় দুই জন সৈন্যের দ্বারা অপমানিত হন। কেবল অপমান করিয়া তাহারা ছাড়িল না, ক্রমে বল প্রয়োগের উদ্যোগ হইলে তিনি অনন্যগতি হইয়া একান্ত প্রাণে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তথায় একজন নিম্নপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারীর আগমন হইলে সৈনিকদ্বয় নিরস্ত হইল। এইরূপ ঈশ্বরকৃপায় তিনি এই বিষম সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইলেন। ক্যাথেরিণা দেখিলেন যে, তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তা তাঁহার পূর্ব্ব শিক্ষক আশ্রয়দাতা বন্ধুর পূর্ব্বোক্ত লুথার সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মযাজকের পুত্র। তাঁহার প্রাণ বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল এই সাক্ষাৎকার ক্যাথারিণার পক্ষে ভগবানের বিশেষ বিধান বলিয়া প্রতীতি হইল। কেন না তাঁহার সমস্ত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, কপর্দ্দকও সম্বল ছিল না। পথে যে যে গৃহে আহার এবং শয়ন করিয়াছেন তাহাদিগকে আহার দান এবং আশ্রয়দানজন্য এক এক খানি বস্ত্র দিতে দিতে সমস্ত বস্ত্রও নিঃশেষিত হইয়াছিল। সেই উদার হৃদয় ধর্ম্মযাজকের পুত্র সৈনিক পুরুষ নিজের সঙ্গে যে অর্থ ছিল সমস্ত ক্যাথেরিণাকে প্রদান করিলেন, এবং তাঁহাকে একটী ঘোটকও দিলেন। তাঁহার পিতার জনৈক বিশ্বস্ত বন্ধু ম্যারিয়ানবর্গের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট ক্যাথরিণাকে যত্ন করার জন্য অনুরোধ পত্র প্রদান করিলেন। এই সুন্দরী ম্যারিয়ান-

বর্গে সুপারিণ্ডেণ্ডের পরিবারে সাদরে গৃহীত হইলেন, এবং তাঁহার দুইটী কন্যার তত্ত্বাবধয়িকার পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার বয়স মাত্র ১৭ বৎসর, এই অল্প বয়সে মেয়েদিগকে নানা সদ্‌গুণ এবং শিষ্টাচার শিক্ষা অতি দক্ষতার সহিত প্রদান করিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য এবং সদ্‌গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহার প্রভু তাঁহার পাণি গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু তিনি প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। তাঁহার উদ্ধারকারী সেই ধর্ম্মযাজকের পুত্র যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে একটী বাহুচ্যুত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তিত হইলেন। কৃতজ্ঞতার স্বরূপ তিনি সেই ধর্ম্মযাজকের পুত্রকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু যেদিন বিবাহ হইল সেই দিনই তাঁহার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া রুষীয় সৈন্যের হস্তে প্রাণ হারাইলেন। রুষিয়ারা মেরিয়াণবর্গ অধিকার করিলে রুষীয় সৈন্যেরা কুমারী মেয়েদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করে, এবং পুরুষ নারী বালক সকলকে হত্যা করে। সমস্ত বিপ্লব অত্যাচার শেষ হইলে ক্যাথেরিণাকে একটি উনুনের ভিতর পাওয়া যায়। এত দিন তিনি গরিব হইয়াও স্বাধীন ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি এক জন সৈনিকের ক্রীতদাসী হইলেন। এরূপ হীনাবস্থায় নিজের বিশ্বাস ভক্তি এবং বিনয় রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন, কিছুতেই বিচলিত হইতেন না। দুর্ভাগ্যের কালিমা তাঁহার উৎসাহ উদ্যম খর্ব্ব করিলেও তাঁহার চিত্তের প্রফুল্লতা হরণ করিতে পারে নাই। তাঁহার ঈশ্বরে নির্ভর এবং গুণের খ্যাতি রুশীয়ার সেনাপতি যুবরাজ মেনজিকের কর্ণ গোচর হইল। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, অবিলম্বে তাঁহাকে ক্রয় করিয়া স্বীয় ভগিনীর কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়া দিলেন।

এই অবস্থায় ক্যাথেরিণাকে অধিকদিন অতিবাহিত করিতে হয় নাই। একদা রুষ সম্রাট্ সুবিখ্যাত পিটের ডি গ্রেট সেই গৃহে ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া আইসেন। ভোজনকালে ক্যাথারিণা কতক গুলি শুষ্ক ফল এমন এক বিশেষ ভাবে পরিবেশন করিলেন যে, সম্রাটের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল। তিনি তাঁহার অনুপম রূপে আকৃষ্ট হইলেন। সম্রাট্ পরদিবস আসিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিলেন যে, রূপাপেক্ষা তাঁহার গুণ আরও উৎকৃষ্টতর এবং মনোহর। আনুপূর্ব্বিক সমস্ত জীবনকাহিনী শুনিয়া সম্রাট্ দেখিলেন যে, এই রমণী সর্ব্ব প্রকারের নিকৃষ্ট অবস্থায় এবং বিপদে উৎপীড়নে যথার্থ উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন। সম্রাট্ তাঁহার রূপ অপেক্ষা গুণে বশীভূত হইলেন। তাঁহার ঈশ্বরে নিষ্ঠা এবং গুণের পক্ষপাতী হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার সামান্য বংশে জন্ম এই বিবাহের অন্তরায় হইল না। ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হইলে তাঁহার গুণ সমস্ত আরও উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। নিয়ত ভগবানে চিত্ত রক্ষা, তাঁহার পূজা বন্দনা এবং রুষিয়ার সমগ্র নারীজাতির উন্নতিকল্পে তিনি আপন সমগ্র জীবন উৎসর্গ

করিলেন। রাজ্ঞী বিলাসিতা ও আমোদ প্রমোদে দিনপাত করিতেন না। তিনি স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করেন, ধনী দরিদ্র নানা সম্প্রদায়ের এবং নানা বংশীয় নারীগণকে লইয়া একটী সম্মিলনসভা স্থাপন করেন, নারীদের মধ্যে কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও ধর্ম্মে নির্ম্মল বিশ্বাস এবং নির্ভর সাধনে সহায়তা করেন। বন্ধু, স্ত্রী, এবং মাতা হইয়া বন্ধুর ধর্ম্ম, স্ত্রীধর্ম্ম ও মাতৃধর্ম্ম মহানুভাবকতার সহিত পালন করিয়া আনন্দে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। সর্ব্ব শ্রেণীর প্রজাই তাঁহার অভাবে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।

মাতৃস্নেহ ও আদর্শ মাতা।

জীবমাত্রই জননী গর্ভসম্ভূত। নিকৃষ্ট জীব পশু পক্ষ্যাদি হইতে শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই জননীগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কোন জীব বিদ্যমান, কিন্তু তাহার মাতা নাই, বা কখনও ছিল না ইহা হইতে পারে না। প্রত্যেক জীবের জীবনের সঙ্গে জননীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। জীবের জন্ম হইলে জননী স্তন্যদান বা অন্যরূপ খাদ্য দান করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাহাকে নিজের আশ্রয়ে সস্নেহে রক্ষা করে।

পক্ষিশাবক অণ্ডজ; পক্ষিমাতা অণ্ড প্রসব করে, কিছুদিন অণ্ডকে বক্ষের নিম্নে রাখিয়া উত্তাপ দান করিয়া থাকে। উপযুক্ত সময়ে অণ্ড বিদীর্ণ হয়, তাহা হইতে শাবক বাহির হইয়া পড়ে। তখন পক্ষিমাতা অতুল স্নেহ ও যত্নে তাহাকে নিজের আশ্রয়ে রাখিয়া প্রতিপালন করে। কোন পক্ষিশাবক স্তন্যে প্রতিপালিত হয় না, বিধাতা পক্ষিমাতাকে স্তন দান করেন নাই। হংসকুক্কুটাদি পক্ষীর শাবক অণ্ড হইতে বাহির হইয়াই দৌড়িতে থাকে, এবং নিজে চঞ্চুপুটে ভূতল হইতে শস্যাদি কুড়াইয়া খায়, কিন্তু মাতা সর্ব্বক্ষণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, কোন আততায়ী উপস্থিত দেখিলে ছানাকে রক্ষা করিবার জন্য নিঃশঙ্কভাবে তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাড়াইয়া দিতে প্রবৃত্ত হয়। পক্ষিমাতা স্নেহবশতঃ মৃত্যুভয় না করিয়া অসম সাহসিকতার কার্য্য করে। একদা আমাদে[র] পল্লীতে রাস্তার এক পার্শ্বে একটী কুক্কু[টী] কয়েকটি ক্ষুদ্র ছানাসহ বিচরণ করিতেছিল আমরা তথায় উপস্থিত ছিলাম। হঠা[ৎ] একটি প্রকাণ্ড কুকুর দৌড়িয়া সেখা[নে] উপনীত হয়। কুক্কুটী তাহার ছা[না] সকলকে আক্রমণ করিতে আসিয়া[ছে] ভাবিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জ[ন্য] নির্ভয়ে নিজের উভয় ডানা বিস্তার করি[য়া] মুখব্যাদানপূর্ব্বক সবেগে কুকুরটি[কে] এমন ঝাপটা মারে যে, সে কেঁউ কেঁ[উ] শব্দ করিয়া মহাবেগে পলাইয়া যা[য়]। কুকুর ইচ্ছা করিলে পলকের মধ্যে [এক] কামড়েই মুরগীটীকে সংহার করি[তে] পারিত। কিন্তু আশ্চর্য্য! বিধাতা সা[মান্য] জীব পক্ষিমাতার অন্তরে এমন অপত্য[স্নেহ] দিয়াছেন যে, সেই স্নেহবশতঃ শাব[কের] জীবন-রক্ষার জন্য নিজের জীবনকে [তুচ্ছ] করিল। শুক পারাবত বুলবুলি ইত[্যাদি] কয়েক জাতি পক্ষিমাতা কুলায়স্থিত

শাবকদিগকে তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ সযত্নে চঞ্চুপুটে আহার যোগায়, এবং নিশাকালে পক্ষপুটে আচ্ছাদিত করিয়া নিজবক্ষে ধারণ করিয়া থাকে। ছানার প্রতি পক্ষিমাতা যে কত দূর আদর ও স্নেহ প্রকাশ করে তাহা বলিয়া উঠা যায় না। কাক চিল ইত্যাদি কোন মাংসাশী প্রবল হিংস্র পক্ষী ছানাকে আক্রমণে উদ্যত হইলে পক্ষিমাতা তাহার সঙ্গে অকুতোভয়ে সংগ্রাম করে। শাবক স্বচ্ছন্দে উড়িবার সামর্থ্য লাভ করিলে এবং নিজে আহার কুড়াইয়া জীবন ধারণ ও আত্ম রক্ষা করিতে সুক্ষম হইলে তাহার সঙ্গে মাতার সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। তৎপূর্ব্বে পক্ষিজননী সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সাবধানে তাহাকে রক্ষা করে ও আহার যোগায়। একদা আমরা ঢাকা নগরে কিয়দ্দিন স্থিতি করিয়াছিলাম। আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম, সেই বাড়ীর এক পার্শ্বে একটি পল্লবাকীর্ণ ক্ষুদ্র তরুর শাখায় বুলবুলি পক্ষী কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া দুইটি অণ্ড প্রসব করিয়াছিল। কিছু দিন তাপ দেওয়ার পর তাহা হইতে দুইটি ছানা হয়। পক্ষিমাতা সর্ব্বদা ছানা দুইটিকে বক্ষোনিম্নে যত্নে রাখিয়া রক্ষা করিত, পুংপক্ষীটি আহার খুঁজিয়া আনিয়া চঞ্চুপুটে যোগাইত। যখন পক্ষিমাতা আহারান্বেষণার্থ উড়িয়া দূরে যাইত তখন পুংপক্ষী কুলায়ের পার্শ্বে বসিয়া প্রহরীর কার্য্য করিত। আমরা সর্ব্বদা ইহা লক্ষ্য করিতেছিলাম। একদিন ঝড়ে ছানাশুদ্ধ কুলায় ভূতলে পতিত হয়। পক্ষী দুইটি তাহাতে অস্থির হয় ও কিচিমিচি করিতে থাকে, কি উপায় করিবে স্থির করিতে পারে না। তখন ছানা দুইটির পালক উঠে নাই। ইহা দেখিয়া আমাদের দয়া হইল, আমরা কুলায়সহ ছানা দুইটিকে উক্ত তরুশাখায় যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম। তাহাতে পক্ষী দুইটির অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি দেখা গেল। তখন হইতে আবার তাহারা উড়িয়া গিয়া চঞ্চুপুটে আহার আহরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে খাওয়াইতে লাগিল। অল্প দিন পরেই ছানা দুইটী বড় হইল, নীড় হইতে উড়িল, শাখান্তরে যাইয়া বসিল। তখন দুষ্ট দাঁড়কাক দেখিতে পাইয়া এক একটি করিয়া দুইটি শাবককেই গ্রাস করিল। দাঁড়কাক ছানা মুখে করিয়া উড়িয়া যাইবার সময় সেই ক্ষুদ্র পক্ষিমাতা আর্ত্তনাদ করিয়া তাহার পশ্চাতে উড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু কাকের করাল কবল হইতে নিজ শাবককে রক্ষা করিতে পারে নাই। পরে ২।৩ দিন পর্য্যন্ত পক্ষী দুইটি সেখানে থাকিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিল।

পশুর মাতৃস্নেহ অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। গাভী প্রসব করিয়াই বাছুরের গা সাদরে চাটিতে থাকে। কোন লোক বা অন্য কোন জন্তু নিকটে গেলে বৎসের অনিষ্ট করিবে আশঙ্কা করিয়া তাহাকে গুঁত মারিতে আইসে। পশুমাতা স্তন্যদান করিয়া নিজ শাবককে প্রতিপালন করে। বৎস প্রসূত হইবা মাত্র গাভী তাহাকে স্তন্যদান করিতে থাকে। ময়মনসিংহ জিলার পশ্চিমাংশে বহুদূরব্যাপী ঘোরতর অরণ্য আছে।

তাহাকে মধুপুরের গড় বা মধুপুরের বন বলে। সেই অরণ্যে কিয়ৎকাল পূর্ব্বে হস্তিযূথ বিচরণ করিত। মুক্তাগাছার পরলোকগত জমীদার বাবু কেশবচন্দ্র আচার্য্য মহাশয় এক জন হস্তিশিকারী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কতকগুলি শিকারী হস্তী এবং হস্তিশিকারে নিপুণ কতকগুলি লোক ছিল। শিকারী হস্তীর যোগে, সেই শিকারী লোক সকল বিশেষ কৌশলে অরণ্য হইতে হস্তী ধরিয়া আনিত। একদা বসন্তকালে কেশব বাবু মধুপুরের বনে হস্তী শিকারের জন্য নিজের লোক ও হস্তী প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সকল শিকারী হস্তীর সঙ্গে এক দল বন্য হস্তীর দেখা সাক্ষাৎ হয়। তখন বন্য হস্তী সকল শিকারী হস্তীদের সন্নিহিত হইয়া তাহাদের সঙ্গ আপ্যায়িত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যখন কোন বন্য হস্তীকে অন্যমনস্ক দেখিয়া কৃষ্ণবস্ত্রে আচ্ছাদিত শিকারী হস্তীর পৃষ্ঠে শায়িত দাইধার (হস্তী শিকারী) উঠিয়া উক্ত বন্য হস্তীর পদে শিকল সংলগ্ন করিতেছিল তখন বুনো হাতীটি টের পাইয়া দৌড়িয়া পলায়ন করে, তাহার সঙ্গে দলস্থ অপর হস্তী সকলও পলাইয়া যায়। উক্ত হস্তিযূথের অন্তর্গত একটি দুগ্ধপোষ্য শাবক ছিল, তাহার মা পলায়ন করিয়াছিল, শাবকটি যূথের সঙ্গে সবেগে দৌড়িতে পারে নাই, দাইধার তাহার পায়ে রজ্জু সংলগ্ন করিয়া তাহাকে আবদ্ধ করে, এবং উহার গলে ফাঁস লাগাইয়া আঁটিতে প্রবৃত্ত হইল। করিশাবক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, দূর হইতে উহার মা আর্ত্তনাদ শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া দল ছাড়িয়া তাহার নিকটে চলিয়া আসিল, এবং শুঁড় দ্বারা তাহার গলার ফাঁস ঢিল করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময়ে তাহাকে অন্যমনস্ক পাইয়া দাইদার পোষা হস্তীর সঙ্গে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। শাবকটিকে ছাড়িয়া ছিল, সে মাতার প্রতি প্রেমের কার্ষণে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। মাতা ও সন্তান দুই ধরা পড়িল। পশুমাতা সন্তানের প্রতি স্নেহের অনুরোধে এইরূপে শত্রুহস্তে বাঁধা পড়ে বা প্রাণদান করে। বিধাতার বিচিত্র প্রেমের লীলা পশুপক্ষীদিগের জীবনে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মাতৃস্নেহের আশ্চর্য্য প্রভাব।

সন্তানের প্রতি মানবজননীর স্নেহের কত বিচিত্রতা, ও গভীরতা এবং কত সৌন্দর্য্য! শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার মুখ দর্শনে তিনি স্নেহরসে বিগলিত হইয়া প্রসব যাতনা ভুলিয়া যান. সেই সময়ে পরম জননীর স্নেহ তাঁহার স্তনদ্বয়ে শুভ্র সুমধুর দুগ্ধরূপে, অন্তরে সুকোমল স্নেহরূপে অবতীর্ণ হইয়া জড়পিণ্ডস্বরূপ সদ্যোজাত শিশুর জীবন রক্ষার উপায় হয়। মা সেই শিশুটির জন্য সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ক্লেশ বহন করিতে প্রস্তুত হন। তিনি তাহার সুখ স্বাস্থ্যের জন্য নিজের সুখ স্বাস্থ্য পরিত্যাগ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। মা শিশুর সঙ্গে সুখ দুঃখে অভিন্ন হইয়া পড়েন, তাহার সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ বোধ করেন, আপনাকে ভুলিয়া তাহার সেবাতে দিবারাত্রি ব্যস্ত থাকেন শিশু তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়া উঠে। এইরূপ

অকৃত্রিম ভালবাসার দৃষ্টান্ত কোথায়? আবার অন্য দিকে মানবজননী ক্রোধাদি রিপুর বশবর্ত্তিনী হইয়া আপন সন্তানের প্রতি যেরূপ দুর্ব্ব্যবহার ও অত্যাচার করে এবং তাহার চরিত্রকে বিকৃত করিয়া তাহার জীবনের যে প্রকার অকল্যাণসাধন করে সেরূপ পশুমাতা ও পক্ষিমাতা কখনও করে না। অনেক মাতা ক্রোধান্ধ হইয়া সুকোমল শিশুকে ঠেঙ্গাইয়া রক্তারক্তি করিয়াছেন, এরূপ দেখা গিয়াছে। পশু পক্ষী স্বভাবের নিয়মে চলে। তাহারা স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না। যত দিন সন্তানের প্রতি স্নেহ যত্ন করা প্রয়োজন, পশুমাতা পক্ষিমাতা ততদিন স্নেহ যত্ন করিয়া থাকে, সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত ও নিজে আত্মরক্ষায় সক্ষম হইয়া উঠিলে মা আর তাহার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখে না। তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। কিন্তু মানবমাতার স্নেহ চিরকাল সন্তানের প্রতি বিদ্যমান থাকে, কিন্তু সন্তানের শৈশব জীবনে জননীর সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে তজ্জন্য তাহার প্রতি জননীর স্নেহও ঘনীভূত থাকে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার হ্রাস হয়, ক্রমে স্নেহেরও হ্রাস হইয়া থাকে, পশু মাতার ন্যায় মানব জননীর সন্তানের সঙ্গে কখনও সম্বন্ধ কাটিয়া যায় না, হৃদয়ে স্নেহ শূন্য হয় না। সন্তানের প্রতি স্নেহবন্ধনে তিনি আজীবন সম্বদ্ধ থাকেন, তাহার সুখবর্দ্ধন ও কল্যাণসাধনে যত্ন করেন, কিন্তু পরে তাঁহার পূর্ব্ববৎ ঘনীভূত স্নেহ থাকে না। সন্তানের শৈশবাবস্থায় মা তাহাকে কাছছাড়া করিয়া তাহাকে না দেখিয়া এক দিনও থাকিতে পারিতেন না, বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানের সম্বন্ধে তাহা আর হয় না। তখন ২।৪ বৎসর স্থানান্তরে চক্ষুর অগোচরে পুত্র কন্যা থাকিলেও মা তত কষ্ট বোধ করেন না।

সহস্র জননীর মধ্যে একজন আদর্শ জননী আছেন কি না সন্দেহ। আদর্শ জননী দেবচরিত্রে গঠিত, তাঁহার চরিত্রে পশু ভাব প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। তিনি শিশুর দেহ পোষণের জন্য যেমন স্বীয় স্তন নিঃসৃত দুগ্ধ তাহার মুখে অর্পণ করেন, তদ্রূপ ভাবভঙ্গি ও আকার ইঙ্গিতে ধর্ম্মজীবনবর্দ্ধনের জন্য তাহার অন্তরে সরল ধর্ম্ম ও নীতি সঞ্চার করিয়া থাকেন। স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর চরিত্র গঠিত ও দেবভাব প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। শিশু বয়োবৃদ্ধি সহকারে সুমাতার সুদৃষ্টান্তে সত্যনিষ্ঠা ভক্তি প্রেম বিশ্বাস পবিত্রতা আত্মস্থ করিয়া উন্নত ধর্ম্মজীবন লাভ করে। যে মাতা দ্বারা সন্তান দেবত্ব লাভ করে, ধর্ম্ম জীবনে বর্দ্ধিত হয় তিনিই আদর্শ মাতা। আদর্শ জননীর জীবনপ্রভাবে বড় বড় সাধু মহাজনগণ পৃথিবীকে জীবন-জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন। সুবিখ্যাত ধর্ম্মবীর থিয়োডোর পার্কারের জীবনের মূলে তাঁহার সাধ্বী জননী। অন্তরে বিবেকবাণী রূপে ঈশ্বর যে কথা কহেন-নিষেধ বিধি করিয়া থাকেন, পঞ্চমবর্ষীয় বালক থিয়োডোর পার্কার বুঝিতে না পারিয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তিপরায়ণা জননী বালকের মুখে

এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হন, এবং তাঁহাকে সস্নেহে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক প্রেমবিগলিত হৃদয়ে সাশ্রু নয়নে বলেন, "বাছা! লোকে উহাকে বিবেক বলে, আমি বলি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের আজ্ঞা। তুমি সেই আজ্ঞা শুনিয়া তদনুসারে জীবনের কার্য্য সম্পাদন করিলে ধন্য হইবে, তোমা দ্বারা জগতে মহৎকীর্ত্তি স্থাপিত হইবে, তুমি আলোকস্বরূপ হইয়া বিপথগামী নরনারীদিগকে স্বর্গ লোকের পথে লইয়া যাইবে।" জননীর এই বাক্য বালক পার্কারের অন্তরে প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায় দৃঢ় বদ্ধমূল হইল। তদবধি তিনি অন্তরে কি আদেশ হয় তাহা শুনিয়া চলিতে লাগিলেন। বিশুদ্ধ ধর্ম্মালোক বিকীর্ণ করিয়া কত সহস্র সহস্র নরনারীকে সৎপথে লইয়া গেলেন। বিগর্হিত দাস-বাণিজ্য পৃথিবী হইতে উচ্ছেদ করিবার কারণ হইলেন। মহাত্মা পার্কারের রচিত ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বহু ব্রাহ্ম বিশেষ রূপে উপকৃত হইয়াছেন। শ্রীঈসার দেবজীবনের মূলে তাঁহার পরমা সাধ্বী জননী মেরী দেবী বিদ্যমান। ঈসার নামের সঙ্গে মেরীর নাম সংযুক্ত। ক্যাথলিক সম্প্রদায় ঈসার সঙ্গে মেরীর পূজা করিয়া থাকে। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের উন্নত জীবনের মূলে তাঁহার সাধ্বী জননী শারদা দেবী বিদ্যমান। আচার্য্য যখন শেষ জীবনে রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন মা আকুল হইয়া বলিয়াছিলেন, "কেশব, তোমার এই রূপ ক্লেশ কেন হইল? বুঝি আমার পাপে হইয়াছে।" তাহাতে, তিনি বলেন, "মা, তুমি ইহা বলিও না, আমার জীবনে যাহা কিছু ভাল যাহা কিছু সদ্‌গুণ আমি তোমা হইতে পাইয়াছি।" আচার্য্য আমাদের কাছে বলিয়াছেন, "আমার মা বড় ভাল।" এরূপ জননীই আদর্শ জননী।

কেশব জননী সাধ্বী শারদাদেবী।

পরম ভক্তিভাজন নববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বন্দনীয়া জননী শারদা দেবী যে, প্রায় নব্বই বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া বিগত ২৮শে অগ্রহায়ণ দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন, এই সংবাদ গত অগ্রহায়ণ মাসের মহিলায় সংবাদস্তম্ভে প্রকাশ করা গিয়াছে। মা অতিশয় সতী সাধ্বী ভক্তিমতী পরসেবানুরক্তা ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই। তিনি শত্রু মিত্র সকলকে সমান ভাবে স্নেহ ও আদর করিতেন ভালবাসা ভিন্ন তিনি জানিতেন না কাহারও বিরুদ্ধে কখনও কোন কথা বলিতেন না। সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি, সকল সাধু সজ্জনের প্রতি তাঁহার সমান আদর ছিল। তিনি কুলপাবন পুত্র কেশবচন্দ্রকে যে স্নেহ করিতেন তাহা নয় দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। তাঁহার শ্বশুরকুল বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী, তিনি সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয়ের পুত্রবধূ প্যারীমোহন সেন মহাশয়ের ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। দেবী হিন্দুসমাজভুক্ত থাকিয়াও ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিতে রীতিপূর্ব্বক যোগ দিয়াছেন,

আর্য্যনারী সমাজের উৎসবে এবং নব দেবালয়ের উপাসনাতে যোগদান করিয়া প্রার্থনাদি করিয়াছেন, উপাসনা প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদিতে অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহ সহকারে যোগদান করিতেন। আমরা বহুদিন প্রতিসপ্তাহে তাঁহার অনুরোধে তাঁহার কলুটোলাস্থ গৃহে যাইয়া উপাসনাদি করিয়াছি; তাহাতে তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং উপাসনান্তে মিষ্টান্ন ভোজন না করাইয়া আমাদিগকে বিদায় দান করিতেন না। তিনি প্রথম বয়সে ধনী পরিবারের বধূ ছিলেন, সম্পদের ক্রোড়ে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় বৈরাগ্যপ্রধান অনাসক্ত ছিল। তিনি ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিধবা হইয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে তিন পুত্র চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পুত্রের মধ্যে কেশবচন্দ্র মধ্যম ছিলেন। তিনি জীবদ্দশায় সমুদায় পুত্র কন্যা ও অনেক পৌত্র পৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রী ও জামাতার বিয়োগ শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মাতা জরা-দুর্ব্বল শরীরেও কিয়দ্দিন পূর্ব্বে স্বয়ং হবিষ্যান্ন রন্ধন করিয়া ভোজন করিয়াছেন, কাহারও সেবার প্রত্যাশা করেন নাই। নিজে সর্ব্বদা বিস্তীর্ণ পরিবারের সেবা করিয়াছেন। মাতৃগুণ পাইয়া কেশবচন্দ্র অত বড় লোক হইয়াছিলেন। মাতা সুপাচিকা ছিলেন, স্বয়ং রন্ধন পরিবেশন করিয়া স্নেহের পাত্র পাত্রীদিগকে ভোজন করাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ ছিল। যখন অত্যন্ত জরা-দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন তখনও রন্ধন করিয়া আমাদিগকে ভোজন করাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা করিতে বারণ করিয়াছি। একদা ইন্দোরের মহারাজ টুকাজী রাও হোলকার কলিকাতায় আসিয়া মার স্বহস্তে প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মা কয়েক প্রকার ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার স্নেহমধুর-প্রকৃতি ভগবদ্ভক্তি বৈরাগ্য নিষ্ঠা সেবানুরাগ সকলের হৃদয়ের ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছে। তিনি সর্ব্বদাই ইচ্ছা করিতেন, তাঁহার স্নেহাস্পদ প্রচারকগণ সময়ে সময়ে তাঁহার নিকটে যাইয়া ভগবৎ-প্রসঙ্গ উপাসনাদি করেন, দুঃখের বিষয় সেই সেবা প্রচারকদিগের দ্বারা অতি অল্পই হইয়াছে। তিনি অনেক সময় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নাম করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, অমুকে আমাকে একবার দেখিতেও আইসে না। ২৮শে অগ্রহায়ণ প্রাতে তিনি স্বর্গগতা হন, পূর্ব্বদিন রাত্রিতে তাঁহার স্নেহের পৌত্র শ্রীমান্ প্রমথলাল তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রমথলালকে দেখিয়াই তিনি গান কর, তাঁহার নাম কর বলিতে থাকেন। অপরাহ্ণ ৩টার সময় সতীর পবিত্র দেহ তাঁহার ব্রাহ্ম ও হিন্দু আত্মীয়গণ সম্মিলিত ভাবে বহন করিয়া শ্মশান ভূমিতে লইয়া যায়। হিন্দু পৌত্রগণ হিন্দুমতে ব্রাহ্ম পৌত্র শ্রীমান্ প্রমথলাল সেন নবসংহিতা মতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন। ১৫ দিবস অন্তে ব্রাহ্ম পৌত্রগণ

মিলিত ভাবে নবসংহিতানুসারে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। আচার্য্য-মাতা নববিধানমণ্ডলীর মাতৃস্বরূপা ছিলেন। তাঁহার প্রতি বিধানাশ্রিত ভক্তিমান লোক মাত্রই অন্ততঃ সপ্তাহ কাল শোকচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মচার্য্য ব্রত পালন করিয়াছেন। লাহিরিয়াসরাই হইতে শ্রদ্ধাস্পদ ভাই দীননাথ মজুমদার মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন ;—

"আচার্য্যজননী নিত্যধামে গমন করিয়া পরম শান্তিলাভ করিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে দৃষ্টিক্ষীণা বলহীনা হইয়াও পরিবারটাকে নানা বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, চিরজীবন কেবল বংশসম্ভূত নরনারীদের সেবাই করিয়াছেন, সেবা গ্রহণের অবকাশ পান নাই। আহা! সতী পরম বৈরাগিণী স্বীয় শ্বশুর, স্বামী, সন্তান প্রভৃতি স্বর্গগত দিব্যাত্মাদের সঙ্গে মিলিয়া পরম সুখ শান্তি সম্ভোগ করুন। আমি সপরিবারে অষ্টাহকাল হবিষ্যান্নাদি ব্রতপালন করিয়া গত রবিবারে তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছি। আজ প্রাতে কলুটোলায় পৌত্রেরা করিয়াছেন, আশা করি আপনারা উপস্থিত ছিলেন। এত দিনে তাঁর বিস্তীর্ণ পরিবারস্থ লোকগুলি সত্য সত্য আশ্রয়হীন হইল। বীরপ্রসবিনী রত্নগর্ভা জননী ধন্যা হউন।"

শারদা দেবী, স্বীয় নাতজামাতা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গগত কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরলা দেবীর স্বামী পূর্ণিয়ার ডিপুটী কালেক্টার শ্রীমান্ যোগীন্দ্রলাল কাস্তগিরের বিশেষ অনুরোধে ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে নিজের জীবনবৃত্তান্ত ক্রমশঃ বলিয়াছিলেন। যোগীন্দ্রলাল তাহা তাঁহার মুখে শ্রবণ করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। মহিলায় প্রকাশ করিবার জন্য যোগীন্দ্রলালের পত্নী উক্ত কন্যা হইতে তাহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। উহা সুবিস্তৃত ও চিত্তাকর্ষক, আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব মনস্থ করিয়াছি, এবার নিম্নে কিয়দংশ প্রকাশিত হইল ;—

প্রথম দিবস।

আজ ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন প্রায় ৭৩ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিবেণীতে আমার মামার বাড়ীতে আমার জন্ম হয়। আমি গৌরিভার মানুষ হই, গৌরিভাতেই আমার বাপের বাড়ী। আমার বাবার নাম গৌর হরি দাস। আমরা চারি বোন এক ভাই। আমার ভাই খুব বিদ্বান্ ছিলেন। তিনি বিন্ধ্যাচলে কর্ম্ম করিতেন। আমার বাবা জাতীয় চিকিৎসার ব্যবসা করিতেন। তিনি বড় ধার্ম্মিক ছিলেন। আমার ভাই এর যোগের কথা শুনিয়াছিলাম, দেখি নাই, মার মুখেই শুনিতামমাত্র। কিন্তু শেষে আপন ঘরে নিজের চক্ষে সেই যোগ দেখিয়াছিলাম। আমার ৯ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। হিন্দু নিয়মমত এক বৎসর বাপের বাড়ীতে ছিলাম। তার পর ১০ বৎসর বয়সে শ্বশুর বাড়ী আসি। শ্বশুর বাড়ী ও বাপের বাড়ী এ পাড়া ও পাড়া বলিলেই হয়। বাবা আমার বিবাহের পর আমায় শ্বশুর বাড়ী রাখিয়া কাশীধামে গিয়াছিলেন। শ্বশুর বাড়ী আসিবার পূর্ব্বে

আমার বড় ভয় মনে হইত, কোথায় যাইব। ভাবিতাম যেন আমায় কয়েদ করিবে, কিম্বা ফাঁসি দিবে। এই ভাবিয়া এক মাস পর্য্যন্ত কাঁদিয়াছিলাম। শেষে আমার বাবা জোর করিয়া যখন শ্বশুর বাড়ী রাখিয়া গেলেন তখন মনে হইল যেন আমায় জলে ফেলিয়া দিলেন। যদিও বহুদিন হইতে মনে করিতাম আমাদের এই সব হিন্দু নিয়ম খুব ভাল কিন্তু এখন দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় বেশ বড় হইয়া বিবাহ হইলেই ভাল, কেন না তাহা হইলে আর এই সব কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসিয়া যখন এক এক জনের মুখ পানে চাইতাম, আমার এক এক পোয়া করিয়া রক্ত শুখাইয়া যাইত। ভয় হইত কে কি বলিবেন, আমি তিন সন্তানের মা হইলাম, তখন পর্য্যন্ত আমার ভয় ছিল। শাশুড়ীর মুখপানে তাকাইতে ভয় হইত। আমার শাশুড়ী কত ভাল ছিলেন, কিন্তু একটু রাগ বেশী ছিল। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি প্রথমে আমায় ভাল চোখে দেখেন নাই, বোধ হয় সে আমার দোষ। তাঁর এক প্রকার বিশ্বাস ছিল। তখন আমার দশ বৎসর হইতে অনেক বেশী বয়স। আমার একটু দোষ দেখিলেই তিনি আমার শ্বশুরকে ব'লে দিতেন, এবং আমায় বকুনি খাওয়াইতেন। যদি আমরা দু চারজন সমবয়সী একত্র বসিয়া খেলা করিতে দেখিতেন, তাঁহার রাগ হইত। আমরা একটু এ ঘর ও ঘর করিলে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। আমরা ভয়ে কাঁপিতাম। আমরা চার জা ছিলাম। আমার বড় জা (জয়পুরের যদুনাথ সেন ও নরেন্দ্রনাথ সেনের মা) ও আমি একত্রে ঘর করিয়াছি। আমার সঙ্গে তাঁহার বেশ ভাব ছিল। সংসারের কাজ আমরা দু'জনে ভাগ করিয়া করিতাম। তিনি আমার চেয়ে দুই বৎসরের বড় ছিলেন। কিন্তু আমরা সংসারের কাজ এক সঙ্গেই আরম্ভ করি। আমাদের অনেক দাস দাসী ছিল, কিন্তু আমার শাশুড়ী দাসীকে ঘরে আসিতে দিতেন না। সেই বড় বড় ঘরগুলি আমাদের ধুইতে হইত। কোন রকমে কষ্টে সৃষ্টে যদি ধুইতাম, কিন্তু ন্যাকড়া দিয়া মুছিতে পারিতাম না, অত বড় ঘর মুছিবার ন্যাকরা হাতে ধরিতে পারিতাম না, সমস্ত দিন এই রূপ কাজ করিতে করিতে এক এক বার খেলা করিতে ইচ্ছা হইত, কিন্তু একটু খেলা করিতে দেখিলেই শাশুড়ী বিরক্ত হইতেন। এখন যেমন মেয়েরা সচ্ছন্দে লেখা পড়া করিতে পারে, এবং কত ভাল ভাল বিষয় শিক্ষা পায়, আমাদের এ সকল কিছুই ছিল না, সুতরাং এক একবার খেলা করিতে ইচ্ছা হইত। আমার ছোট খুড়তুত শ্বশুরের বড় মেয়ের (সিভিল সার্জ্জন গোপালরায়ের মা) সঙ্গে আমার বড় ভাব ছিল, তাঁর সঙ্গেই আমি খেলিতাম। এগার বৎসর বয়সে আমার দীক্ষা হয়, দীক্ষার পরই আমি পূজা করিতে শিক্ষা করি। বিবাহের পরে এবং দীক্ষার পূর্ব্বে আমি ধর্ম্মসম্বন্ধে কোনও বিশেষ উপদেশ পাই নাই; কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে ছেলে বেলায় আমার মা

আমায় ব্রত উপবাস ইত্যাদি করাইতেন। মার উপদেশই বেশ ভাল লাগিত। তিনি শাশুড়ীর সেবা ইত্যাদি করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিতেন, এবং শিখাইতেন। আমিও যত দূর সাধ্য শাশুড়ীর সেবা করিয়াছি, কিন্তু স্বামীর সেবা এবং শ্বশুরের সেবা করিতে পারিতাম না। কারণ সেই সময়ে এই সব কাজ মহৎ হইলেও করিতে দেখিলে লোকের নিকট নিন্দনীয় হইতে হইত। শ্বশুরের সেবা করিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইত, কিন্তু অনেক কারণে ভালরূপ হইয়া উঠিত না। তিনি প্রথমতঃ কাহারও সেবা লইতে ভাল বাসিতেন না। কেবল তাঁহার এক বিধবা কন্যা এই বিষয়ে পরম ভাগ্যবতী ছিলেন। এই মেয়ে তাঁহার সেবা করিত, এবং তিনিও কেবল ইঁহারই সেবামাত্র গ্রহণ করিতেন। তাঁহার এই মেয়ে অতি ছেলে বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন, (১৪ বৎসরে) সেবার দ্বারা ইঁহার মন ভাল থাকিবে বলিয়া তিনি ইঁহার সেবা লইতেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমিও যৎকিঞ্চিৎ সেবা করিতে সমর্থ হইতাম। তিনি সকাল বেলায় কুঠীতে যাইবার সময় তাঁহার সেই মেয়েকে টাকা দিয়া বলিতেন, "বিন্দু, এই টাকা নিয়ে তোমাতে ও তোমাদের বৌ'য়েতে মিলে আমার জন্য খাবার ক'রো, আমাকেও কখন কখন বলিতেন। আমরা সমস্তদিন এই আমোদে থাকিতাম; সমস্ত দিন বসিয়া বসিয়া খাবার করিতাম। এই উপায়ে তাঁহার মেয়ের মন সকল সময় অন্যমনস্ক থাকিত। অক্রুর বলিয়া আমাদের এক চাকর ছিল। তাহাকে আমরা বড়বাজারে গদা ময়রার দোকানে পাঠাইয়া দিতাম, ভাল খাবার কি করিয়া করে দেখিবার নিমিত্ত। গদা ময়রা আমার শ্বশুরবাড়ীর ময়রা ছিল। অক্রুর আমাদিগকে ভাল খাবার কি করিয়া করিতে হয় শিখাইয়া দিত। আমরা সমস্ত দিন ভাল খাবার করিতাম। খাবার প্রস্তুত হইলে বড় বড় রূপার থালায় খাবার সাজাইয়া বিকেলে তিনি আপিষ হইতে আসিলে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতাম। তিনি দেখিয়া অতি আহ্লাদ করিতেন। কিন্তু বিশেষ কিছুই খাইতেন না; কেবল একটু আধটু আহ্লাদ করিয়া খাইতেন।

আমেরিকাযাত্রিকের পত্র।

১৯শে আগষ্ট, ১৯০৭।

১৩ই তারিখ বিকেল বেলা আস্তে আস্তে আমাদের জাহাজ পোর্ট সেইড বন্দর ছেড়ে, ভূমধ্য সাগরের খোলা বুক পেয়ে খুব ছুটতে আরম্ভ করলো। খানিক পরে আকাশ লাল করে জলে সোণা ঢেলে দিয়ে, সূর্য্য ডুবে গেল। ১৪ই ও ১৫ই দুটো দিন আর মাটীর মুখ দেখা গেল না,—সাগরের সুন্দর নীল জল আর পরিস্কার আকাশের সুনীল আবরণ দেখতে দেখতে চললাম।

১৬ই তারিখ ভোর বেলায় ডেকে এসে দূরবীণ দিয়ে দেখি যে, পাহাড় দেখা যাচ্ছে—জীবনে এই প্রথম ইউরোপের

মাটী দেখা, মন এক অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠলো।

বেলা যত বাড়তে লাগলো, পাহাড় ততই স্পষ্ট হয়ে উঠলো। দূরবীণ দিয়ে দেখলাম—পাহাড়ের পাদদেশে সমুদ্রের ধারে কত ছোট ছোট গ্রাম, কত সুন্দর সুন্দর বাগান, কত নদী, কত পুল, কত দুর্গ, কত গির্জ্জে—যত দূর চোখ যায়, সব বিস্তৃত হয়ে রয়েছে—যেন একখানি ছবি! আমরা তখন মেসিনা বন্দরে ঢুকছিলাম। আমাদের ডান দিকে ইটালীর এই সব ছোট ছোট ছবির মত পাহাড়ের বুকে গাঁথা গ্রামগুলি যেমন দেখা গেল, বাঁদিকে ক্রমেই সিসিলীর দৃশ্য ফুটে উঠতে লাগল, ইটনার প্রকাণ্ড দেহ আকাশ জুড়ে দেখা দিল! আমরা strait of Messinaর ভেতর দিয়ে চলতে লাগলাম। ইহা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য খুব বিখ্যাত। ২১ মাইল লম্বা, আর এক জায়গায় দুই মাইল চওড়া, আবার অন্য জায়গায় মাত্র ১২ মাইল চওড়া। এর ভেতর দিয়ে যাবার সময় বরাবর দুধারের জমী দেখা যায়।

এই ষ্ট্রেইটের ডান ধারে সিলা নামে একটা জায়গার পাশ দিয়ে এলাম। সেখানে সমুদ্রের ধারে কতকগুলি গহ্বর আছে, তাদের ভেতর জোয়ারের সময় সমুদ্র ভয়ানক গর্জ্জন করতে করতে ঢোকে। জাহাজের ডেক থেকে দূরবীণ দিয়ে দুএকটা গহ্বর দেখা যায়। আর বাঁ ধারে মেসিনার গভীর প্রায় সম্পূর্ণ গোল বন্দর। এই খানে উত্তর দিক থেকে সমুদ্রের স্রোত কখনও কখনও বন্দরে ঢুকবার সময় এক প্রকাণ্ড ঘূর্ণী তয়েরী করে—এই দুটীই আগেকার সেই বিখ্যাত "সিলা এবং চারিবডে"।

এইবার সিসিলী ও ইটনার কথা একটু বলি। কেউ কেউ বলেন যে মেসিনার বন্দরের কাস্তের আকার থেকে এই দ্বীপের নাম সিসিলি হয়েছে। এই দ্বীপ একে একে ১০ বিভিন্ন জাতির দ্বারা অধিকারভুক্ত হয়ে এসেছে। প্রায় আড়াই শতাব্দি ধরিয়া মুসলমানেরাও ইহার উপর রাজত্ব করেন। অবশেষে ১৮৬০ সালে ইটালীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

এই বার ইটনার কথা। ইটনা একটা আগ্নেয় গিরি, ছেলে বেলায় ভূগোলেতে পড়েছিলাম—এইবার চোখে দেখলাম।

এই আমার প্রথম আগ্নেয় গিরি দেখা। তখন বেলা প্রায় দুটো। অবিশ্যি, দূরে বলে খুব স্পষ্ট দেখা যায় না, তবে আমরা যখন দেখছিলাম তখন চূড়ো থেকে খুব ধোঁয়া বেরুচ্ছিলো, দেখলে যেন কেমন একটা ভয় হয়, বুক গুর্ গুর্ করে ওঠে। ইটনা খুব উঁচু পাহাড়, প্রায় ১০' ৭৪০ ফিট উঁচু। অনেক দিন চুপ চাপ থেকে ১৮৯২ সালে হঠাৎ এক নতুন Crater ফুটিয়ে ইনি সাড়া দিয়ে ওঠেন, সেই অবধি আবার এক রকম চুপচাপ আছেন, তবে সকল সময়ই ধোঁয়া বার করছেন।

বেলা ৪॥০ টার সময় আমরা মেসিনা ছাড়িয়ে আবার খোলা সমুদ্রে এসে পড়লাম—ইটালীর ও সিসিলীর পাহাড় ও তটদেশ ক্রমেই অস্পষ্ট হতে লাগলো। এই

সময় হঠাৎ জাহাজখানা একেবারে ঘুরে সমুদ্রে একটা প্রকাণ্ড (বৃত্ত) এঁকে, একটা কাট সমুদ্রে ফেলে, আবার আর একবার ঘুরলো। ব্যাপারটা এই যে, যদি কোন মানুষ জলে পড়ে যায়, তবে জাহাজ-টাকে কেমন করে ঘুরিয়ে নৌকো নাবিয়ে তাকে উদ্ধার করা হবে, সেই বিষয়ে নাবিকদের অভ্যাস করান হলো। দুবার এই রকম হলো, খুব মজা লাগলো।

ক্রমে বিকেল হয়ে এলো, ডেকে গিয়ে বসলাম। সমুদ্র তখন পুকুরের জলের মতন শান্ত, যেন এক খানি কাচ। অথবা যেন প্রকাণ্ড ফ্রেম দিয়ে বাঁধান এক খানি চিত্রপট—আর ঐ শান্ত পটের উপর, সূর্য্যের লাল রংএর পাত্রে তুলি ডুবিয়ে, কে যেন নানান রংএর আভা ফুটিয়ে এক "সোণার নদীর" ছবি আঁকছিলো।

দূরে একটি পাহাড় দেখা দিল। ক্রমে যখন সে কাছে এল, দেখি তার মাথা দিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রকাণ্ড এক ধোঁয়ার স্রোত আকাশে উঠে চার দিক ভস্মের রংএ আচ্ছন্ন করে ফেলছে। এ আর একটা আগ্নেয়গিরি, নাম ষ্ট্রম্বলী। ক্রমে ক্রমে এর আশে পাশে আরও গুটী কয়েক সহচর দেখা দিল। যখন আরও কাছে এল, তখন এর শরীর খুব স্পষ্ট দেখা গেল—জলের ভেতর থেকে সোজা আকাশের দিকে ৩০২০ ফিট উঠে গেছে। সমস্ত শরীর ভয়ানক উবড় খাবড়, কিন্তু মাঝে মাঝে ছোট গাছ পালা ও শস্যক্ষেত্রও আছে—নীচের দিকে সমুদ্রের ধার দিয়ে মানুষের বসতিও আছে। মাঝে মাঝে চূড়ো থেকে প্রকাণ্ড চওড়া নরদামার মত এক একটা পথ সোজাসুজি চলে এসে সমুদ্রে নেবে গেছে। এই পথ দিয়ে জলন্ত তপ্ত "লাভা" চূড়ো থেকে বেরিয়ে, চার দিক ছারকার করে, সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে নিজের জীবন নিবিয়ে ফেলে। আগ্নেয় গিরির দৃশ্য যে কি রকম একটা মনে ভয় ও বিস্ময় সঞ্চার করে, এবং সমস্ত মনের ওপর মরণের গাম্ভীর্য্য ও ছায়া এনে দেয়, তা যে দেখেছে সেই অনুভব করেছে, তা বলে বোঝান যায় না। ক্রমে বাহিরের দৃশ্য চোখের সামনে থেকে মুছে গেল, খালি এক চাঁদ এই অন্ধকারের মাঝে সমুদ্রের বুকে নিজের শুভ্র জ্যোতিতে ফুটে উঠলো। আমারও তবে আজকের কথা ফুরুক।

২য়।

১৭ই তারিখ ভোর বেলা তাড়াতাড়ি ডেকে এসে দেখি যে, ডান দিকে কোয়াশার ভেতর দিয়ে অতি অস্পষ্ট কতকগুলি পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যাচ্চে। খানিক পরে রদ্দুর উঠল, কোয়াসা একটু কেটে গেল, পাহাড়ের গায়ে ঘর, বাড়ী, গির্জ্জে, দেখা দিল। আর খানিক পরে ভিসুভিয়াস আগ্নেয় গিরির চূড়ো চোখে পড়লো, তখন তা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল।

আস্তে আস্তে বন্দরে ঢুকে জাহাজ নঙ্গর করল। আমরা ছোট ষ্টীমারে করে নেপল্‌স্‌এর জেটীতে উপস্থিত হলাম, ইউরোপের জমীতে প্রথম দাঁড়ালাম—ইতিহাসে কত চিত্রে চিত্রিত বীর ভূমি *

* ইটালীদেশের বিখ্যাত কবি।

(ভার্জিল ও ডান্টেএর জন্মস্থান,) (এঞ্জেলো ও * (রাফেল) এর প্রতিভায় উজ্জ্বল ইটালীর মাটী স্পর্শ করলাম। এই মাটী কত ধর্ম্মবীরের রক্তে পবিত্র। তাঁদের রক্ত এই মাটীকে—পৃথিবীর আরও কত স্থানকে—উর্ব্বরা করেছে, ধর্ম্মের বীজ রোপণ করতে ও ফলবান্ হতে সাহায্য করেছে। সেই মাটী জীবনে এই প্রথম স্পর্শ করে ধন্য বোধ করলাম, মনে মনে ভগবানকে কৃতজ্ঞতাভরে প্রণাম করলাম।

জেটীতে নেবে, কলকাতা থেকে যে ইংরাজ বন্ধুটী ও বর্ম্মিজ বন্ধুটীর সঙ্গে টেনে এসেছিলাম, তাঁদের সহিত একজন গাইড নিয়ে নেপলস্ ও পম্পী দেখতে একখানি ঘোড়ার গাড়ী করে বেরুলাম। এখানকার ভাড়াটে গাড়ীর ঘোড়া কলকাতার মতন নয়। ঘোড়া এমনি ছোটে যে, থামাবার জন্য ব্রেক আছে, গাড়ী থামাবার জন্য সেই ব্রেক ব্যবহার করতে হয়। আমি চোগা চাপকান পরে পাগড়ী মাথায় দিয়ে গাড়ীতে বসলাম, আর বন্ধু দুটী আমার পাশে বসলেন। যখন গাড়ী চলতে লাগল, রাস্তার দুধারের লোক হাঁ করে দেখতে লাগল। এমন কি, রাস্তায় দুজন মেয়েমানুষ ঝগড়া করছিল, এক জন আমাকে তাদের চোখে এই অপরূপ বেশে দেখে, তখনি আর একজনকে ডেকে আমার দিকে তাকাল—ঝগড়া থেমে গেল। দুজনে অবাক হয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। আমার পোষাকের গুণে যে, এই শান্তি সংস্থাপিত হল, এজন্যে কি আমার পোষাককে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত নয়?

নেপ্লস্এর পাথরে বাঁধান, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দোকান দিয়ে সাজান, রাস্তা দিয়ে গাড়ী চলতে লাগল। শেষে যাদুঘরে পৌঁছিলাম। এই যাদুঘর পৃথিবীর মধ্যে একটী বিখ্যাত জিনিষ। ইহাতে অনেক পুরণো মারবেল পাথরের ও ব্রোঞ্জের (মিশ্রিত ধাতু) প্রতিমূর্ত্তি আছে। ফ্রেস্কো পেণ্টিং * ও রাফেল এবং টিসিয়ান এর হাতের কয়েকখানি ছবি, ও পুরণো বইও অনেক সংগ্রহ করা আছে। তা ছাড়া ধ্বংসপ্রাপ্ত পম্পী ও হারকিউলেনীয়াম নগরের যে সকল জিনিষ সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহারও কিছু কিছু ইহার ভিতর রক্ষা করা হইতেছে।

ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্ত্তিগুলি দেখলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। মনে হয় ঠিক যেন জীবন্ত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তাদের ভেতরকার ভাব, চোখে, মুখে, এমন কি সমস্ত শরীরে প্রকাশিত হয়ে, আমাদের মনকে শ্রদ্ধা, বিস্ময়, ভয়, কিংবা করুণায়, পূর্ণ করে। এইখানে † প্লেটো (Plato) নিরো ‡ ক্যালিগোল এবং § আলেকজন্দারের, প্রতিমূর্ত্তি

* ইটালীদেশের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী।

* ফ্রেস্কো পেণ্টিং—দেওয়ালে বালি লাগাইয়া তাহা শুকাইবার পূর্ব্বে তাহার উপর চিত্র অঙ্কন করিলে, তাহাকে ফ্রেস্কো পেণ্টিং বলা হয়। ইহা এক প্রকারের বিখ্যাত চিত্র অঙ্কন।

† বিখ্যাত দার্শনিক।

‡ রোমের দুই জন সম্রাট্।

§ গ্রীসের বিখ্যাত সম্রাট্।

আছে। তা ছাড়া কত যুদ্ধ, কত কবি, কত লোকের যে মূর্ত্তি দেখলাম, তা বলে ওঠা অসম্ভব! একটা ঘোড়ার প্রতিরূপ দেখলাম—যেন ঠিক একটি জীবন্ত, তেজস্বী ঘোড়া নিজের শক্তির অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই ঘোড়ার এই সুন্দর মূর্ত্তিটী ব্রোঞ্জের ৭০০ টুকরা দিয়ে প্রস্তুত।

মার্ব্বেল পাথরের প্রতিমূর্ত্তিগুলিও অতি চমৎকার। যে সকল ঘরে এইগুলি আছে, তাদের দেওয়াল ঘন লাল রংএর ভেলভেট্ দিয়ে মোড়া—এতে প্রতিমূর্ত্তি গুলি দেখা যায় ভাল। রোমের প্রায় সকল সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি আছে। তা ছাড়া, অন্যান্য বিখ্যাত লোকদেরও আছে।

ফ্রেস্কো পেণ্টিংগুলি খুবই সুন্দর, প্রতিমূর্ত্তির তুলনায় তাহা হার মানে।

এইবার পম্পী ও হারকিউলেনিয়মে যে সব জিনিষ খুঁড়তে খুঁড়তে পাওয়া গিয়াছে, তাহার সংগ্রহ দেখিলাম। এও বড় কম ব্যাপার নয়। একটা ঘরের পর আর একটা ঘর, যত যাই, ততই এই ব্যাপার। দুটী সেকালের সমৃদ্ধিশালী নগরের নানান রকমের জিনিষের সংগ্রহ—সে কি সামান্য হতে পারে? এখানে আমি মোটামুটি গোটাকতক জিনিষের নাম মাত্র করছি, তা থেকে কিছু বুঝতে পারবে, ব্যাপারখানা কি রকমের। প্যাপিরাস্ এর পাতায় লেখা বই, চিত্রিত জলপাত্র, কাঠ, পাথর, ও লোহার চেয়ার এবং টেবিল, অনেক রকমের সুন্দর সুন্দর অস্ত্র করিবার লোহার যন্ত্র, কাঁচের সরু নল, বোতল, হাঁড়ি, ইত্যাদি, আয়না চিরুণী, ফুলের সাজী, তখনকার মুদ্রা, থিয়েটারের টিকিট (হাতীর দাঁতের), সোণা রূপার নানান রকমের ও অত্যন্ত সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট গয়না, মূল্যবান্ পাথর বসান ও প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আঙটী, সোণার ও পেতলের প্রদীপ ও ঝাড়, এবং উনুনের ভেতরে পাওয়া রুটি, খাবার টেবিলে পাওয়া ডিম ও অন্যান্য খাবার জিনিষ—যাদের বয়স আজ ১৮২৮ বছর হল—এই সব জিনিষ ভিন্ন ভিন্ন আলমারিতে দর্শকগণের বিস্ময় উৎপাদনের ও শিক্ষার জন্য সুন্দর করে সাজান রয়েছে।

যাদুঘর অনেকক্ষণ দেখা হল, এই বার চল পম্পীতে যাই।

বাঁকিপুরস্থ বালক বালিকা সম্মিলনীর পারিতোষিক বিতরণ।

নিতান্ত অনুপযুক্ত জানিয়াও যে, আজ আমি আমাদের এ অতি সামান্য ক্ষুদ্র বালক বালিকা সম্মিলনীর দুটি একটি কথা সকলের সমক্ষে বলিতে সাহস করিয়াছি, কেবল এই আশা করিয়া যে, আপনাদের আশীর্ব্বাদে ও সহানুভূতিতে আমাদের এ দুর্ব্বল জীবন আবার সবল হবে, আমাদের নিরাশ মন আবার আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হইবে, এবং নূতন উৎসাহে নূতন উদ্যমে, নূতন বিধি ও নিয়মের সহিত নবভাবে পুনরায় আমরা কার্য্য আরম্ভ করিতে সক্ষম হইব। আমাদের এ

বালক বালিকাসম্মিলনীর বিষয় বোধ হয় অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। গত ১৭ই নভেম্বর (১৯০৭) এই সম্মিলনীর বালক বালিকাদিগকে প্রথম পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। যিনি প্রায় দুই বৎসর কাল নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন ও অভাব সত্ত্বেও এই মঙ্গল কার্য্যে আজ আমাদের আশা ও চেষ্টার কিছু মাত্র সফলতা বিধান করিলেন আমরা সকলের আগে সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পিতার চরণে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সহিত বার বার প্রণাম করি। আমাদের যোগ্যতা, জ্ঞান ও চরিত্রবলের অত্যন্ত অভাব জানিয়াও কেবল তাঁরই মধুর আহ্বানে এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি।

যাঁহার আন্তরিক আগ্রহে বিশেষ উৎসাহ ও চেষ্টায় এই কার্য্য আরম্ভ হয়, এবং যাঁহার সঙ্গে কত আশা ও উৎসাহে আমরা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম, তিনি আজ আর ইহলোকে নাই; কিন্তু দিব্যধামবাসী সেই আত্মার ব্যাকুল প্রার্থনা ও পবিত্র আশীর্ব্বাদ আমাদের জন্য রহিয়াছে। আমার অতি প্রিয় দিদী, (হামিদা দেবী) এই বালক বালিকাগণের মঙ্গলের জন্য যিনি এত ভাবিতেন, এবং যাহারা তাঁর এত প্রিয় ছিল আজকার দিনে এই অবসরে আমরা তাঁর উপস্থিতি অনুভব করি। ইহারা আজ যেন তাঁর আরও কত প্রিয়; ইহাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য সেই মুক্ত, দিব্য আত্মার কত আগ্রহ, কত আবেগময় প্রার্থনা। ভগবানের নিকট এই বিশেষ আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি যে, তাঁহার চরিত্র, তাঁহার শুদ্ধতা আমাদিগের ও এই বালক বালিকাদিগের মধ্যে অবতীর্ণ হউক, এবং তাঁহার স্বর্গীয় ভাব এই অনুষ্ঠানকে চিরদিনের জন্য অনুপ্রাণিত করুক। দিদীই ইচ্ছা করিয়া ইহার নাম নীতিবিদ্যালয় না রাখিয়া বালক বালিকাসম্মিলনী রাখেন।

বিগত ১৯০৬ সনের ১৮ই মার্চ্চ দিদীর বাড়ীতেই বালক বালিকা সম্মিলনী প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তিনি নিজেই ইহার সম্পাদিকা হন। অল্প বয়স্ক সরল বালক বালিকাগণের কোমল হৃদয়ে নীতি, ধর্ম্মভাব ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সকল জাগ্রত করিয়া তোলাই ইহার প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বালক বালিকাদিগকে নীতিপূর্ণ উপদেশ ও জীবনচরিত প্রভৃতির সাহায্যে নীতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। শিক্ষা-কার্য্যের সুবিধার জন্য বালক বালিকাদিগকে বিভক্ত করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়। উচ্চ শ্রেণীর বালিকাগণকে গৃহ হইতে প্রতিদিনকার ডায়েরী লিখিয়া আনিতে হয়, এবং নিম্ন শ্রেণীর বালক বালিকাগণের চরিত্রপুস্তক অভিভাবক দ্বারা লিখিত হয়। ইহাতে তাহাদের আত্মদৃষ্টি ও ভাল হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইতেছে সন্দেহ নাই। মধ্যে মধ্যে ইহাদিগকে মেজিক লণ্ঠেণ এবং মাইক্রেস্কোপ দেখাইয়া বিশুদ্ধ আমোদ ও তৎসঙ্গে শিক্ষা দান করা হয়।

গ্রীষ্ম ও শারদীয় অবকাশ ব্যতীত আমাদের সম্মিলনীর অধিবেশন প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া হয়। যে কার্য্যে

আমরা হস্তক্ষেপ করিয়াছি তাহার দায়িত্ব অনেক, এবং তাহার জন্য আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য ও সহানুভূতির অনেক প্রয়োজন। কিন্তু আশা ও প্রার্থনা এই যাঁহার আহ্বানে আমরা এই ব্রতে ব্রতী হইয়াছি তাঁহার কৃপায় আমাদের সমস্ত অপূর্ণতা পূর্ণ হইবে, সমস্ত অযোগ্যতা দূর হইবে, এবং ইহাতে আমাদের ও এই শিশুদিগের অশেষ কল্যাণসাধন হইবে।

সুজাতা চট্টোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত এই কবিতাটী বালক বালিকা সম্মিলনীর পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে রচিত হইয়াছে।

প্রতিধ্বনি।

১। আমি বসে থাকি কত নীরব পরাণ
নীরবে সঙ্গীত গাহিয়া যায়
আমি শুনি হেথা কত অনাহত ভেরী
তালে তালে উঠি উছলি ধায়।

২। আমি নিভৃতে দেখিগো কত পরলোক
আশার আলোকে ফুটিয়া উঠে
কত সাধু সাধ্বী বীর স্বদেশপ্রেমিক
বিহরে নূতন জীবনতটে।

৩। কত আকাশের চাঁদ, কুসুমের হাসি
করে কত আবাহন
কত তটিনী-তরঙ্গ নাচিয়া মাতিয়া
করে কত আলাপন।

৪। কত মৃতকল্প প্রাণে জীবনের রেখা
প্রাণময় করি তোলে
কত নিরাশ আঁধারে আশার আলোক
বিজুলী চমকে খেলে।

৫। কত অকথিত কথা আছিল মরমে
তটিনী শুকায়ে গেল
কত অকৃত সাধনা রহিল পড়িয়া
দীপ শিখা নিবে গেল।

৬। সাধিতে জীবনে কোন আরো উচ্চ ব্রত
হামিদা সুন্দরী হেথা
আমাদের হাতে দিয়ে এই কর্ম্মভার
গাহিল অগীত গাথা।

৭। তাঁহাতে পরলোক আরও পূর্ণা লোকে
বাণী তাঁর বাজে হেথা
পরাণে পরাণে উঠে তাঁহারি সঙ্গীত
প্রতিধ্বনি হয় হেথা॥

১৭, ১১, ০৭,

একটি আদর্শ পরিবার।

(প্রাপ্ত।)

সম্প্রতি কিছুদিন আগে আমার একজন বিলাতফেরত মহিলা বন্ধুর নিকটে লণ্ডনের একটি পরিবারের কথা শুনিয়াছি, এই পরিবারের কথা আমার এত ভাল লেগেছিল যে, সেই আদর্শ পরিবারের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার চোখে জল এসেছিল, এবং মনে হইতেছিল কবে আমাদের ভারতের ঘরে ঘরে এই রূপ কন্যাগণ জন্মগ্রহণ করিবেন? আমাদের ভারত ভূমিতে যে সুমাতার ও সুগৃহিণীর জন্ম হয় নাই এরূপ বলিতেছি না, তবে বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এখন সমাজ অন্যরূপ হইয়াছে। তাই পাশ্চাত্য দেশের একটি পরিবারের কয়েকটী কথা যা শুনিয়াছি, বলিতে ইচ্ছা করি।

আমার বন্ধুটি উল্লিখিত পরিবারে কয়েক বার অতিথি হইয়াছিলেন। এই

পরিবারের কর্ত্তা লণ্ডনের একজন বড় বণিক্। ইনি লণ্ডন বণিক্‌সভার সভাপতি, পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর রূপে কয়েকবার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই পরিবারে কর্ত্তা, কর্ত্রী, আটটী কন্যা ও তিনটী পুত্র; এতদ্ব্যতীত দশ জন পরিচারিকা ও পাঁচ জন পরিচারক। আমাদের দেশের সাধারণতঃ পনের কুড়ি জন পরিচারিকার বেতনের সহিত বিলাতের এক জন পরিচারিকার বেতন সমান। পুরুষ চাকর রাখা আরও কষ্টকর, কারণ পুরুষ চাকর রাখিতে হইলে গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদির ট্যাক্স দেওয়ার মত ট্যাক্সও দিতে হয়। এরূপ অবস্থায় এত গুলি পরিচারক পরিচারিকা যাঁর বাড়ীতে তাঁরা কিরূপ ধনী সহজেই বুঝা যায়।

যে পরিবারের গৃহিণী সুশিক্ষিতা ও সুশৃঙ্খলসম্পন্না সে পরিবারে কাজ কর্ম্ম লইয়া কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে না। নচেৎ বহু দাস দাসীসত্ত্বেও নানাপ্রকার বিশৃঙ্খল ঘটে। এই পরিবারের গৃহিণীর গুণে দাস দাসীগণ যে যাহার কার্য্য এরূপ সুন্দর ভাবে ও শৃঙ্খলার সহিত করে সে কার্য্য লইয়া কোন গোলযোগ হয় না, এবং বিনা বাক্যব্যয়ে নীরবে সকল কার্য্য সুন্দর ভাবে সাধিত হয়। প্রতিদিন বাড়ীর সিঁড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া সকল দ্রব্যাদি এরূপ ভাবে ঝাড় পোছ হয় যে, দেখিলেই মনে হয়, নূতন বাড়ীতে নূতন দ্রব্য সমস্ত সজ্জিত। আমাদের দেশে অনেক ধনী পরিবারে দাস দাসী ও ঘরের কোন অভাব নাই, অথচ মূল্যবান্ দ্রব্যাদি বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, সমস্ত জিনিষ এলোমেলো ভাবে রক্ষিত। এই পরিবারের গৃহকর্ত্তা প্রতি দিন প্রাতে ভোজনের পর কাজে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান, রাত্রি বারটার পর বাড়ী ফেরেন, গৃহকর্ত্রী ঘরের বাইরের সমস্ত কাজ চালান। আমাদের দেশে পুরুষে যে কেবল অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাহা নয়, সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর ফিরে হয়তো বাড়ীতে কার অসুখ, কি অভাব সব দেখ্‌তে শুন্‌তে হয়, কিন্তু এই গৃহকর্ত্রী ছেলে মেয়েদের সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা ও সংসারে যা কিছু প্রয়োজন সমস্ত নিজে দেখেন ও শুনেন। স্বামীকে এ সমস্ত কিছু দেখতে শুনতে হয় না। তিনি কেবল যে সংসার ও সন্তানাদির শিক্ষা প্রভৃতি দেখা শুনা নিয়ে থাকেন, তাহা নয়, যেমন স্বামী পুত্র কন্যা দাস দাসী প্রভৃতির তাঁহার উপর একটী দাবী আছে, সেইরূপ সমাজেরও একটী দাবী তাহার ওপর আছে। কত সভায় তাঁকে সভাপতির কাজ করিতে হয়, কত বন্ধুবান্ধবের নিমন্ত্রণই রক্ষা করিতে হয়। নিমন্ত্রণরক্ষার অর্থ এখানে যেন কেহ কেবল লোকের বাড়ী গিয়ে পেটভরে খাওয়া মনে না করেন, নিমন্ত্রণরক্ষার অর্থ লোকের বাড়ী গিয়ে সদালাপ করা। এই তো গেল সংসার ও সমাজের কথা।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য পরিচারিকা থাকিলেও তিনি ছেলেমেয়েদের প্রকৃতি কেমন ভাবে বিকশিত হইতেছে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একবার ছেলে

মেয়েদের কাছে ডেকে তাদের সমস্ত দিনের কাজ, অর্থাৎ কি শিখেছ, কি করেছে সব শুনেন, যাহা অন্যায় তাহা ভাল করে বন্ধুভাবে বুঝিয়ে দেন। ছেলেমেয়েরা মাকে পরমবন্ধু বলিয়া মনে করিয়া সরল ভাবে সব কথা বলে।

এই পরিবারে প্রত্যেক ছেলেমেয়ে হাত খরচ টাকা পায়। ২॥ বৎসর হইলে তাদের হাতে টাকা দেওয়া হয়। পাঠিকা ভগিনীদের মধ্যে অনেকে মনে করিতে পারেন যে ২॥০ বৎসরের মেয়ে কিরূপে টাকা ব্যয় করিতে পারে। কিন্তু সুশিক্ষিতা মাতার আশ্চর্য্য শিক্ষার প্রভাবে ক্ষুদ্র শিশুও অর্থের সদ্ব্যয় বুঝিতে পারে। মাতা ২॥০ বৎসর শিশুর হাতে টাকা দিয়ে বলেন, এটাকা তোমার, ইহা তিন ভাগে ভাগ করিয়া এক ভাগ তোমার নামে জমা করা হইবে, বাকি দুই ভাগের এক ভাগ তোমার নিজের জন্য খরচ করিবে, অন্য এক ভাগ গরিব দুঃখী জনের জন্য ব্যয় করিবে। নিজের জন্য যা' দরকার তাহা কিরূপে ব্যয় করিতে হইবে, তাহা ২॥০ বৎসর মেয়ে বুঝিতে পারে, কিন্তু গরিব দুঃখীদের জন্য কিরূপ ব্যয় করিতে হইবে, তাহা এত ছোট শিশু বোঝে না। তাই হয়তো মাতা একদিন গাড়ীতে ছোট শিশুকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াইতে গিয়েছেন, পথে একটা নিরাশ্রয় অনাথ শিশুকে দেখিয়ে বলেন "দেখ, এই শিশুর তোমার মত মাও নেই, তোমার মত টাকাও নেই, কিন্তু টাকাও চায়, মাও চায়, তুমি তাকে কি দিবে? তোমার মাকে দিবে, না টাকা দিবে?" শিশু বলে "না, মা আমি মাকে দিতে পারিব না, টাকা দিব।" মা তখন শিশুর হাতে দিয়ে অনাথ শিশুটীকে টাকা দিয়ে দেন। এই রূপে সংক্ষে সরল ভাবে শিশুর হৃদয়ে দয়ার ভাব জাগ্রত করিয়ে দেন, এবং এই ভাবে শৈশবাবস্থা হইতে সকল প্রকার নীতি, দয়া, ধর্ম্ম সন্তানের জীবনে বিকশিত করে দিয়ে তার জীবনকে মহৎ করে তুলেন।

আমার বন্ধু দেখিলেন এই পরিবারের ২॥০ বৎসরের মেয়েটী বাগানে দাসীর সহিত বেড়াইতে যাবার সময় প্রতিদিন একটী ছোট ঝুড়িতে রুটীর টুকরা কতকগুলি নিয়ে যায়। বন্ধুটী একদিন শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি বাগানে বেড়াতে যাচ্ছ, তা' রুটীগুলি নিয়ে যাচ্ছ কেন? শিশু বলিল "আকাশের পাখীকে দিব।" বন্ধু বলিলেন "কেন?" শিশুটী বলিল "মা বলেছেন আকাশের পাখীরা শীতকালে খেতে পায় না, তাই আমি তাদের রুটী দিতে নিয়ে যাচ্ছি"। বন্ধুর মুখে এই কথা শুনিয়া আমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, ভাবিলাম হায়! আমাদের দেশে এরূপ কয়টী মাতা আছে!! যেখানে ধন সম্পদ্, সেখানে অধিকাংশ স্থলে কেবল বিলাসিতা, আমোদ প্রমোদ দেখা যায়।

এই পরিবারের জ্যেষ্ঠা কন্যা এত ধনী ব্যক্তির কন্যা হইয়াও প্রত্যেক রবিবারে দুপুর বেলা একটা গরিব ছেলেদের স্কুলে নীতি শিক্ষা দেন; এবং সন্তানদের জননী রবিবার প্রাতঃকালে স্বামী সন্তানগণসহ গির্জ্জায় যান, বিকাল বেলা ছোট

ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়ী থাকেন, দাস দাসীরা গির্জ্জায় যায়।

এই পরিবারের আর একটী কথা বলিয়া লেখা শেষ করিব। উক্ত বন্ধুটীর সহিত এই পরিবারের ষোল বৎসর বয়সের একটী বালক পকেটে হাত দিয়ে (বিলেত ফেরতেরা আমাদের দেশে যেমন পকেটে হাত দিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়ান) কথা বলিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার পিতা পুত্রকে এইরূপ ভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলিতে দেখিয়া ধীরে ধীরে পুত্রের কাঁধে হাত রেখে মিষ্ট ভাবায় বলিলেন "তোমার সময়ে সময়ে ছুটীতে বাড়ীতে আসিয়া মার নিকট হইতে ভদ্র মহিলাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় শেখা উচিত। পুত্র লজ্জিত হইয়া পিতার নিকট ক্ষমা চাহিলেন। পিতা হাঁসিয়া সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। আমাদের দেশের অধিকাংশ বিলাত ফেরতেরা পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়ান একটা বিশেষ সভ্যতা মনে করেন। কিন্তু বিলাতে ভদ্র মহিলাদের সাক্ষাতে এরূপ ভাবে দাঁড়ান অসভ্যতা।

ভগবানের চরণে প্রার্থনা যে, ভারতের ঘরে ঘরে যেন এইরূপ সুমাতা আসিয়া ভারতকে নিত্য উন্নতির পথে লইয়া যান।

কটক। শ্রীমতী রে-—

মহিলাদিগের রচনা।

তবে আসি।

১

কত ব্যথা পাই হেথা ডেকে যদি লও নাথ
শরীর অসার মম; তোল যদি ধরে হাত।
প্রাণনাথ প্রাণ মম, আরাম অক্ষয়তম,
কভিবে হে দয়াময় পাই যদি তব সাথ।
তা না পেলে চিরদিন সহিব কি এ আঘাত?

২

আবর্ত্তে হইয়া ভ্রান্ত,—গিয়েছিনু প্রাণকান্ত,
এখন যে প্রাণ অন্ত হারাইনু তব পদ।
নারিনু চরণে দিতে প্রেম ভক্তি কোকনদ।

৩

সবতো হইল ছাই, আর প্রভু আশা নাই,
দেখিয়া এহেন জ্বালা তুমি যদি ছেড়ে যাও
বিপদে বিপদহারি পদছায়া নাহি দাও,
তা হ'লে বালিকা নাথ, সংসারের কষাঘাত,
কেমনে সহিয়া স্থির রহিবে হে এ বিপদে।
না যদি জানাতে পারি অভাব তোমার পদে।

৪

এ মুকুল প্রাণ মম, ব্যাধিতে বিশুষ্কতম,
জীবন উন্নতি বাতী সবি যদি নিভে গেল,
সমূলে উন্নতি আশা আজি যদি ফুরাইল।

৫

পরিপূর্ণ হৃদাকাশ, আশার অনন্তোচ্ছ্বাস,
বিষম ব্যাধিতে যদি চলিয়া গিয়াছে তাহা,
তাহেও ভাবি না প্রভো, তোমা না পাইলে
কেমনে জীবন যাবে ভাবিয়া ব্যাকুল তাহা।

৬

রোগেতে আমার হিয়া কঠোর বার্দ্ধক্য দিয়া
করিয়াছে একেবারে, আশা নিরমূল হায়,
বয়সে প্রাচীনা হলে ক্ষতি না আছিল তায়।

৭

তুমি হরি সর্ব্বময়, আমি শুধু বিন্দু সম,
ও চরণ পারাবারে লুকায়ে আরাম পাব,
ত্যজিলে তুমিও মোরে আমি নাথ কোথা যাব।

বলিয়া কি লাভ তার, আশা বীজ প্রাণ ছায়
কতরূপ ধরি আহা অঙ্কুরিতে এসেছিল,
সময়ে অঙ্কুর গুলি ধীরে ধীরে দেখা দিল।

৯

ভেবেছিনু
তাদের সৌন্দর্য্য দিয়ে, সুন্দর করিবে হিয়ে,
ব্যাধিরূপ কালরৌদ্রে, মহা অনাবৃষ্টি শেষে
সার শুধু মরুভূম হইয়াছে সেই দেশে।

১০

একটী অঙ্কুর হ'তে, এই আশা পল্লবিত,
হৃদয় নিভৃতে মম প্রিয়দেবে বসাইয়া।
কবিতা কুসুমোচ্ছ্বাসে ও চরণে পূজা দিয়া,

১১

গাহিব বিহ্বল হয়ে, তব আবির্ভাব লয়ে,
ভেবেছিনু তব নামে গলায় পরিব হার,
গাব প্রাণেশের জয় জয় বিশ্ব দেবতার।

১২

আমার হৃদয়মালী, প্রিয় হরিনামমালা,
জপিব হৃদয় মাঝে জাগাব মানব প্রাণে,
প্রিয় দেবতার গুণ শুনাইব নরগণে।

১৩

কি জানাব আমি, কি না তুমি জান স্বামী
পাপী মনে উচ্চ আশা জান কত অসম্ভব।
জান তুমি আমি নাহি পাব সাধুর বিভব।

১৪

রোগের তুফানে পড়ি, ডুবু ডুবু জীব তরী
তবুও ডোবে না প্রভো, একি জ্বালা ভয়ঙ্কর
ডুবে যাক্ নহে শান্ত হউক অসাস্থ্যকর।

১৫

কেমনে সহি এজ্বালা, প্রাণ মন ঝালা পালা
হয় প্রভো স্বাস্থ্য দেও পালি বসে তবাদেশ
নতুবা এজীবনের করে ফেল একশেষ।

১৬

আর সুখে সাধ নাই, মরিয়া জ্বালা জুড়াই
অসহ্য বেদনা যবে করে প্রাণ ঝালাপালা
ভাবি এই নাটকের করে ফেল শেষ পালা।

১৭

পুন ভাবি মনে মনে, কেজানে মরণে ত্রাণে,
মরণ ওপারে যদি এযাতনা রয়ে যায়,
অথবা যাতনা যদি এর চেয়ে বেশী হয়,
ইহকাল পরকাল তবে কি খোয়াব তায়?

ভেঙ্গে দাও ভুল।

ঝরে গেছে জীবনের বাসনা বকুল!
তাহাতে নাহিক আর, অশান্তি যাতনা সার
স্মরিতে চাহি না সেই জীবন মুকুল।

ঝরে গেছে জীবনের বাসনা-বকুল।
তোমারি ২ দান, কেন তাহে অভিমান
বুঝাইয়া দাও আজি জীবনের মূল।

বুঝাইয়া দাও প্রভু জীবনের ভুল।
এই দুঃখ মনস্তাপ, নহে তব অভিশাপ
তোমার চরণরেণু ওঁর পদধূল।

বুঝাইয়া দাও প্রভু জীবনের ভুল।
এই দুঃখ মনস্তাপ, যেন তব অভিশাপ
আমি কেন ভাবি বসে সদা মন্ত্রমূল।

আমি কেন ভাবি বসে সব বিপরীত।
মোরে দিলে যাহা, আমি যে পারিনে
সহিতে লইতে কেন ব্যথিত এ চিত।

দাও শক্তি প্রাণে বল ভেঙ্গে দাও ভুল
মহান্ কর্ত্তব্য ব্রত, সাধিবারে কর রত
ঝরে যাক্ জীবনের বাসনা বকুল।

ঝরে গেছে জীবনের বাসনা বকুল।
তাহাতে নাহিক ক্লেশ, এই ভিক্ষা জগদেশ
অন্তিমে দিওগো তব ও চরণমূল
ভেঙ্গে দাও আজ প্রভু জীবনের ভুল।

সংবাদ।

একত্র যে তিনটি ছবি প্রকাশিত হইল, তাহার প্রথমটি আচার্য্যমাতা শারদাদেবীর ছবি, দ্বিতীয় আচার্য্যের পিতৃদেব স্বর্গগত প্যারীমোহন সেনের, তৃতীয় সকলের উপরে পিতামহদেব রামকমল সেন মহাশয়ের ছবি।

ইতিমধ্যে একদিন অপরাহ্নে ছোটলাট সাহেবের পত্নী লেডী ফ্রেজার মহোদয়া রাজধানীস্থ স্কুল সমূহের হিন্দু খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম আদি সকল শ্রেণীর ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকে নিজভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া সাদরে লজেঞ্জেস ও সুন্দর সুন্দর পুতুল দান করিয়াছিলেন। প্রায় ছয় শত বালক বালিকা তাঁহার প্রাসাদের সংলগ্ন খোলা মাঠে সমবেত হইয়া ছল। প্রত্যেক স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদিগের সঙ্গে ২।৩ জন শিক্ষয়িত্রী তত্ত্বাবধায়কাস্বরূপ গিয়াছিলেন। বালক বালিকাদিগের প্রতি তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত মহিলার আদর ও স্নেহ প্রদর্শন তাহাদের পক্ষে অতিশয় উৎসাহ ও আনন্দজনক হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালী শিক্ষয়িত্রীদের জন্য বসিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল ছিল। ৩ ঘণ্টাকাল মাঠে দণ্ডায়মান থাকা অনেকের পক্ষে কষ্টকর হইয়াছিল।

কটক নগরস্থ শ্রীমতী রেবা দেবীর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণর বাহাদুর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের গভর্ণমেণ্ট সাহায্য বৃদ্ধি করিয়া দিবেন, গাড়ীর জন্য ১৫০০৲ দান করিবেন এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ছাত্রীনিবাসের প্রত্যেক ছাত্রীর জন্য কিছু কিছু মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ, ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে স্কুল ঘর প্রস্তুত করার কথা হইয়াছে।

ঢাকা জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন সাহেব বড় দিনের সময়ে ঢাকা হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন, রাত্রিকালে গোওয়ালন্দের ঘাটে ষ্টিমার হইতে ট্রেণে আরোহণ করিবার উদ্যোগী হইয়াছেন, এমন সময়ে এক দুরাত্মা তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছোড়ে। গুলি পৃষ্ঠদেশ ভেদ করিয়া উদরের ভিতরে প্রবিষ্ট হয়। সেই দুরাত্মা পলাইয়া যায়, তাহাকে কেহ ধরিতে পারে নাই, চিনিতেও পারে নাই। সাহেবকে শয্যাগত অবস্থায় কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। ডাক্তারগণ বিশেষ যত্নে গুলি বাহির করিয়াছেন। সাহেবের জীবন রক্ষা পাইয়াছে। যে ব্যক্তি গুলি চালাইয়াছে তাহাকে যে ধরিয়া দিতে পারিবে সে দশ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে, এরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

বৃক্ষ লতাদির জীবন। *

আজ বৃক্ষ লতার বিষয় আপনাদিগকে কিছু বলিব। পূর্ব্বে দেহ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, এখন বৃক্ষাদির বিষয় বলিয়া পরে আবার দেহ সম্বন্ধে বলিব।

সাধারণ ভাবে কতক গুলি কথা বলেছিলাম সে কথা সকলেরই উপর খাটে। অর্থাৎ জীব জন্তুর প্রতি আবার বৃক্ষ লতাদিরও প্রতি নিয়োজিত হইতে পারে। যাহা এই আত্মরক্ষা ও দেহ বর্দ্ধন। এইটী প্রাণি মাত্রেরই আছে।

প্রথমতঃ বীজ হইতে কিরূপে অঙ্কুর হয়। ছোলা জলে ভিজিয়ে তার খোসা তুলে ফেল্‌লে দুই খানা হইয়া যায়। সেই আধখানাতে অঙ্কুর দেখতে পাওয়া যায়। মনে করুন সিম, আমি এই বোর্ডে দেখাই, সিমের এই দুটী বিচি খুলে যায় এবং ঐ যে অঙ্কুর ঐ থেকেই বৃক্ষ জন্মায়। এই অনুসারে সিমেরও হয়, শস্যেরও হয়, আবার বট গাছেরও হয়। বটের বিচি কত ছোট আপনারা দেখেছেন, অত ছোটতেও অত বড় বড় শাখা প্রশাখা জন্মায়।

যখন কোন একটা বীজ মাটীতে থাকে শুধু মাটীতেই গাছ হয় না; একটু রৌদ্রের উত্তাপ ও একটু জল না পেলে দেহ বর্দ্ধিত হয় না। শুক্‌নো কেন বাড়ে না? কারণ খাম্বির নামে একটা জিনিষ আমাদের লালা রসের ভিতর থাকে সেইটেতে খাবার জিনিষ তরল হয়ে পরিপাকের সহায় হয়। খানিকটা এরারুট যদি খুব ঘন করিয়া জ্বাল দিয়ে খাম্বিরের সঙ্গে মিশিয়ে রাখা হয় তবে সেটা তরল হয়ে চিনি হয়। এটা খাম্বিরের জন্যই হয়ে থাকে। পরিপাকের মানে হইতেছে এই যে খাদ্য বস্তুকে তরল করা।

ছোট অঙ্কুর জল না পেলে কাযে লাগে না। সেই খাম্বির দিয়ে তরল হ'লে তখন সব পরিপাক হবে। কিন্তু ইহাতে কত দিন বাঁচিয়ে রাখবে? যতদিন না ছোট একটি চারা গাছ হবে। যখন বিচি থেকে শেকড় নেবে মাটীতে চলে গেল তখন গাছ হবে বিচি পড়ে যাবে। যেমন তেঁতুল বিচির কটা রংয়ের ছাল পড়ে যায়। শেকড়ের পরেই কাণ্ড অর্থাৎ গুঁড়ি হয়। তারপর এই ডাল থেকে সব পাতা ফুল ফল হতে থাক্‌বে। প্রথমে একটি চারা গাছ হবে তারপরে বড় গাছ। এখন আর আগেকার খাদ্যতে হবে না। কিন্তু ঐ গাছই নিজে জোগাড় করে নেবে।

খাবার জিনিষ তিন জাতীয় আছে। এক মাছ মাংস আর এক চিনি জাতীয় ও আর এক ঘি বা চর্ব্বি জাতীয়। অর্থাৎ এক অণ্ডলাল, এক শ্বেত সার ও ঘি বা চর্ব্বি। ভাতে ও আলুতে তিন জাতীয় জিনিষই আছে। গাছরা অবশ্য আমাদের মত মাছ বা ভাত খায় না কিন্তু পরিণামে যদিও গাছ হইতে ঐ সব জিনিষ হয়। তারা নিজেরা সব তয়ের করে। প্রধানতঃ তারা নিজেদের জন্য সঞ্চিত করে রাখে। এটী প্রধান। মাংসাশী বৃক্ষের বিষয় পরে বলব। দেখা যায় এক রকম গাছ আছে তার পাতাটা বাটীর মত তাতে মাছ বা মাংস দিলে অল্পে অল্পে পরিপাক করে নেয়। সাধারণত গাছ উদ্ভিদ ভোজী নয়। গাছ গাছকে খায় ইহা কেহ শোনেনি। বরং জন্তু জন্তুকে খায় ইহা সকলেই জানেন। ছোট জীবকে বড় জীব খাইয়া থাকে। বৃক্ষাদি যাহা খায় তাহা কতক মাটী হ'তে ও কতক বাতাস হ'তে লয়। তাহারা নিজেরাই সংগ্রহ করিয়া লয়। মাটীর সঙ্গে অনেক রকম খনিজ পদার্থ থাকে সেই সব উহাদের খাদ্য হয়। ছাই সোরা নানা রকম নুন এই সব মাটীর সঙ্গে থাকে। সেই জন্য গাছের গোড়ায় জল দিলে মাটীর সঙ্গে জলে গোলা সেই খনিজ পদার্থ সকল গাছরা শুষে লয়, তাহাতেই গাছদের খাওয়া

---

* বিগত ১৯০৩ সনের ২৮শে জুলাই অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধ মহালানবিশের বক্তৃতামূলক।

হয়। ক্রমে সেই গুলিতেই শ্বেতসার অর্থাৎ চিনি ইত্যাদি হইয়া থাকে আর কতকটা বাতাস থেকে পায়। সেইটা বাষ্পের আকারে অন্য সব গুদের নিজেদের ভিতরেই আছে। আমরা সর্ব্বদা যে কার্ব্বোলিক অ্যাসিড গ্যাস অর্থাৎ দুষিত বায়ু পরিত্যাগ করি, সেই গ্যাসটা যদি জমা হত তবে এতদিনে সকলে মারা পড়ত। সেই কার্ব্বোলিক অ্যাসিড গ্যাসটা গাছরা নিজেরা লয় এবং দুষিতটা নিজে লইয়া আমাদের নিশ্বাস লইবার জন্য ভাল গ্যাস দিয়া থাকে। যেন ফিলটারএর মত সর্ব্বদা ভাল দিচ্চে মন্দ নিচ্চে। এই গাছে যাহা আছে নানা রকম রাসায়নিকরাও সে জিনিষেব ঠিক করতে পারেন।

বিনা মাটীতে কেবল জলেতেও গাছ থাকে। যদি জলেতে সোরা নুন ইত্যাদি দিয়ে রাখা যায় তবে থাকতে পারে। বোতলে ঐ জল পূরে একটা কর্ক দিয়ে তাতে গাছের কাণ্ড দিয়ে রাখলে বাড়ে। বৃক্ষ দেহে যাহা আছে এখনও তাহা কেহ বুঝিতে পারেনি। বৃক্ষদের খাদ্যের বিষয় এই মোটামুটী বলা হ'ল। এখন গাছ, ছোট চারা গাছ, শেকড়, তার কাণ্ড এবং তারপর অনেক শাখা প্রশাখা এই গেল মোট।

এখন একটু সূক্ষ্ম ভাবে দেখা চাই। এক রকম আছে তাহারা পর গাছা। একটা গাছের মধ্যে কতক গুল শিকড় যায় এবং সেই পরগাছা কিছু করে না অন্য গাছের খাদ্য তারা মজা করে আত্মসাৎ করে। গাছের প্রথম শিকড়, তারপর কাণ্ড, তারপর শাখা প্রশাখা, তারপর পাতা ফুল ফল। প্রথম শেকড়, মাটীর ভিতর শেকড় বড় হলে শাখা হয় মূল হতে ক্রমাগত শাখা বাহির হয়। দুর্ব্বা যে কত ছোট গাছ, ভাল করে দেখলে তারও অনেক শেকড় আছে। বড় বড় গাছের অনেক শেকড় চাই নইলে তারা কি করে থাকবে। ঝড়েতে সেই জন্যেই ভেঙ্গে দিতে পারে না। মাটীর মধ্যে শিকড় গুল যদি আপনাদের স্থান এত বিস্তৃত করে না নিত তাহলে ঝড়েতে এতদিনে উড়িয়ে নিত। যেটা আসল প্রধান শিকড় সেই খুব মোটা হয় তাইতেই তাকে অন্য শিকড় থেকে পৃথক্ রূপে চিনে নেওয়া যায়। কতক গুল শিকড় খুব স্ফীত হয়। কত গাছ আছে যে বছরে জন্মায় সেই বছরেই ফুল ফল হয়। কত গুলি দুবছর বাঁচে, তাদের শেকড় খুব মোটা হয়।

যেখানে দেখা যায় শিকড় বেশী স্ফীত হয়েছে তার কারণ সেই স্থানে গাছদের আহার সঞ্চিত থাকে। মূলার যে অংশ খাওয়া যায় সেইটে খুব মোটা হয়, তার মধ্যেই বৃক্ষদের খাদ্য সঞ্চিত থাকে। কতক গাছের খাদ্য নিজে থাকে কতক গুলির শাখাতে এবং কতক গুলির মূলে যেমন মূল গাজর ইত্যাদ। মূল ও গাজরের কি প্রভেদ? দুইই স্ফীত হ'য়েছে, কিন্তু মূলর দুদিকই মোটা গাজরের একদিকটা মোটা অন্য দিকটা সরু। মনে করুন একটা শাখা তার অনেক শিকড় বার হ'ল পরে ডাল পালা হ'ল। শাঁকালু এই রকম আরও অনেক আছে যাদের অনেক শিকড় বেরিয়ে স্ফীত হ'য়ে পড়ে ইত্যাদি নানা আকারের হয়। শিকড় গাছের খাদ্য সঞ্চয় করে ও চারিদিকে বিস্তৃত হয়ে গাছকে রক্ষা করে। কতকগুল গাছ বাতাসে ঝোলে তাদের এরিসরোটস্ বলে। শিবপুরের বাগানে যাঁহারা গিয়েছেন কত ঝোলান গাছ দেখে থাকবেন আবার বট গাছ প্রভৃতির শিকড়ে মালীরা বাঁশ লাগিয়ে দেয় তারপর সেইটে বড় হতে থাকে শেষে বাঁশ খুলে নিতে হয়। সে শিকড় অন্ধকার ভালবাসে সুতরাং বাঁশ দেওয়াতে তার খুব সুবিধাই হয়। গাছের ডগা ও পাতারা আলো চায় কিন্তু শিকড় অন্ধকার ভালবাসে। বাঁশের দ্বারা এই রকম করাতে খুব মোটা হয়। আর এক রকম শিকড় যা' লতার গা দিয়ে বাহির হয় তারা লতাকে আটকে রাখে। টিউ নামে এক রকম লতা আছে সে পাহাড়ে দেখা যায়। সে লতার শেকড় ঐ পাহাড়ের গায় আটকে থাকে স্থানীক শিকড় যাহা মূল, আর অস্থানীক শিকড় যাহা সেগুলি ঐ আটকাইবার জন্য।

মাসিক পত্রিকা

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৩শ ভাগ] মাঘ ১৩১৪ ; ফেব্রুয়ারী ১৯০৮। [৭ম সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

নারীজাতি কোমলপ্রকৃতি, স্বভাবতঃ তাঁহারা পরসেবানুরাগিণী। ইয়ুরোপীয় নারীদিগের এবং ভারতবর্ষীয় হিন্দুনারীদিগের সেবার প্রণালী একরূপ নয়, অবস্থাভেদবশতঃ স্বতন্ত্র। ইয়ুরোপীয় পরসেবাপরায়ণা মহিলারা ভয়ঙ্কর সমরক্ষেত্রে যাইয়া অস্ত্রাহত সেনাদিগের সেবা পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া থাকেন, চিকিৎসালয়ে উপস্থিত হইয়া রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষা করেন, এ কার্য্যে তাঁহারা বিশেষরূপে শিক্ষিত হন, অস্ত্রাহত ও রোগযন্ত্রণাগ্রস্ত লোকদিগের যন্ত্রণানিবারণের জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন করেন। হিন্দু মহিলাদিগের পরসেবা অন্যরূপে হয়, তাঁহারা নিজ নিজ অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া রণক্ষেত্রে, বা সাধারণ চিকিৎসালায়ে কিংবা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে যাইয়া সেবা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন, নিজ-গৃহে বা প্রতিবেশী পরিবারমধ্যে কাহারও রোগ বিপদাদি ঘটিলে তাহার সেবা পরিচর্য্যা করেন, কোন আত্মীয় বন্ধু অভ্যাগতরূপে গৃহে উপস্থিত হইলে রন্ধন পরিবেশন করিয়া তাহাকে ভোজন করাইয়া থাকেন। বঙ্গীয় হিন্দু পরিবারের গৃহিণী নিজে পরোক্ষে থাকিয়া অতিথি অভ্যাগতের সেবা প্রায়শঃ অন্যের দ্বারা সম্পাদন করেন। মহারাষ্ট্রীয় মহিলাগণ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভ্যাগতের সেবা করিয়া থাকেন।

এদেশে অনেক হৃদয়হীনা গৃহিণী দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরিবারভুক্ত আত্মীয় বন্ধুদিগের দুঃখ ক্লেশ ও অভাব ঘটিলে উপেক্ষা করেন, তাহাদের দুঃখ ক্লেশ ও অভাবমোচনে কিছুই মনোযোগ বিধান করেন না, তাঁহারা সর্ব্বদা আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত থাকেন।

যে নারীর স্নেহ মমতা নাই, যিনি আত্মীয় জনের প্রতি সহানুভূতি করেন না, তিনি মানবী নহেন, দানবী।

হিন্দু রমণীদিগের গঙ্গাস্নান।

বিগত ১৮ই মাঘ রবিবার অর্দ্ধোদয়ের মহাযোগ হইয়াছিল। সেই অর্দ্ধোদয়োপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য স্থানান্তর হইতে লক্ষ ২ হিন্দু স্ত্রী পুরুষ কলিকাতায় আসিয়াছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশই রমণী ছিল। এজন্য প্রবন্ধের শিরোনাম "হিন্দু রমণীদিগের গঙ্গাস্নান" বলিয়া লিখিত হইল। মাঘ বা পৌষ মাস, রবিবার, অমাবস্যা ও শ্রবণানক্ষত্র এবং ব্যতিপাত যোগ এই পাঁচটির মিলন হইলে অর্দ্ধোদয় হইয়া থাকে। সচরাচর ৩০।৪০ বৎসর পরে অর্দ্ধোদয় হয়। এই মহাযোগে গঙ্গাস্নানে মহা ফল, তাহাতে কোটি কোটি জন্মের পাপ ধৌত হইয়া যায়, হিন্দুদিগের এরূপ বিশ্বাস। তজ্জন্য নানা দূরদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু নর নারী সেইদিন গঙ্গা নদীতে যাইয়া স্নান করিয়া থাকে। এপ্রকার অনুমান যে এবারকার অর্দ্ধোদয়ে পূর্ব্ব বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ৪।৫ লক্ষ স্ত্রীপুরুষ গঙ্গাস্নান করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিল। গঙ্গাস্নানের যাত্রিকদিগের নিমিত্ত পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে কোম্পানি অনেকগুলি অতিরিক্ত ট্রেণ চালাইয়াছিলেন। যাত্রিকদিগের এত ভিড় হয় যে, ট্রেণ যোগাইয়া উঠা দুষ্কর হইয়াছিল। কালীঘাটের কাটীগঙ্গাতে স্নানে অধিক পুণ্য হয় ভাবিয়া অধিকাংশ যাত্রিকেরই সেখানে যাইবার আগ্রহ হইয়াছিল। সহস্র সহস্র স্ত্রীপুরুষ যাত্রিক ছুটাছুটি করিয়া ট্রাম গাড়ীতে চড়িতে গিয়া অনেকে বা পড়িয়া মারা যায়, এই আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, কিন্তু স্বদেশী ভলণ্টিয়ারদিগের যত্নে কোন বিপদ্ ঘটিতে পারে নাই।

আমরা হ্যারিসন রোডে সেই দিন প্রাতঃকালে যাইয়া দেখি পিপীলিকার দলের মত স্নানার্থী লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে গঙ্গার ঘাটের দিকে ছুটিয়াছে। তন্মধ্যে বারআনাই স্ত্রীলোক, ভদ্র পরিবারের যুবতী বধূ পর্য্যন্ত ছিল। ১৫।২০ জনে দল বাঁধিয়া চলিয়াছিল, দুই চারি জন পুরুষমাত্র সঙ্গে ছিল। পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা একজন অপর জনের আঁচল ধরিয়া শৃঙ্খলের আকারে সবেগে ধাবিত হইয়াছিল। ট্রামগাড়ী গঙ্গাযাত্রিকদলে পূর্ণ ছিল। রেলওয়ে কোম্পানি ও ট্রাম কোম্পানি সেই একদিনে হয়তো এক মাসের লাভ হস্তগত করিয়াছেন। এরূপ জনতা কখনও নয়ন গোচর হইয়াছে কিনা সন্দেহ। ঘাটে পুলিস ও স্বদেশী ভলণ্টিয়ার যুবকগণ সম্মিলিত ভাবে এরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছিল যে, সেই ভিড়ের মধ্যেও স্নান করিতে যাত্রিকদিগের কোন কষ্ট ও অসুবিধা হয় নাই. স্ত্রীলোকেরা কোনরূপ অসম্মানিত হন নাই। কালীঘাট সঙ্কীর্ণ স্থান ও ক্ষুদ্র খালের ন্যায় তথাকার গঙ্গা, সেখানেও নির্ব্বিঘ্নে স্নানার্থীরা স্নান করিতে পারিয়াছে। ট্রামে উঠিতে ও তাহা হইতে নামিতে ভলণ্টিয়ারগণ সাহায্য করিয়াছেন, ট্রেণ পঁহুছিবার ও ছাড়িবার সময় শিয়ালদহ ষ্টেশনে দলে দলে ভলণ্টিয়ার যুবকগণ উপস্থিত থাকিয়া যাত্রিকদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, টিকিট করিয়া দিয়াছেন, স্ত্রীলোকদিগকে সম্মান সহকারে বিনীত ভাবে নামাইয়া-

ছেন ও উঠাইয়াছেন। তাঁহারা একার্য্যে অশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। পুলিশ কমিশনর হেলিডে সাহেবের শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা অতিশয় উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। কোন গোলযোগ ঘটে নাই।

গঙ্গা যমুনা নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী গোদাবরী ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি হিন্দুদিগের অনেকগুলি তীর্থ নদী নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সকল নদীতে স্নান করিলে অত্যন্ত পুণ্য হয়, জন্ম জন্মান্তরের পাপপুঞ্জ প্রক্ষালিত হইয়া যায়; অমাবস্যা পূর্ণিমাদি বিশেষ বিশেষ তিথিতে তীর্থনদীতে স্নানে মহাপুণ্য হয়; অর্দ্ধোদয় ও চূড়ামণি যোগ ইত্যাদি উপলক্ষে গঙ্গা স্নানে অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া থাকে আর পুনর্জন্ম হয় না, হিন্দুদিগের এইরূপ বিশ্বাস। সমস্ত তীর্থ নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীর্থ নদী গঙ্গা। গঙ্গার মাহাত্ম্যবিষয়ে শাস্ত্রীয় বচন এই ;—"গঙ্গা "গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।" অর্থাৎ শত যোজন পথ দূর হইতে যদি কেহ গঙ্গা গঙ্গা বলে, সে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠে চলিয়া যায়। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির পক্ষে চণ্ডালাদি নীচ বংশসম্ভূত লোকের সংস্পৃষ্ট জল পান করা অবৈধ। তাহা পান করিলে ব্রাহ্মণকে পতিত হইতে হয়, যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাহার উদ্ধার হয় না। কিন্তু পবিত্র গঙ্গোদকের সম্বন্ধে একথা খাটে না। হাঁড়ি বাগ্‌দি ডোম ইত্যাদি অন্ত্যজ লোকেরা গঙ্গাতীরস্থ ব্রাহ্মণাদির পানের জন্য গঙ্গার জল যোগাইয়া থাকে, তাহা ব্রাহ্মণকুলের বিধবাগণপর্য্যন্ত সাদরে পান করেন। হিন্দু গৃহস্থদের গৃহে গঙ্গোদক একটি পাত্রে সংরক্ষিত থাকে। কোন হিন্দু কোন প্রকারে আপনাকে অশুচি বোধ করিলে, তিনি কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক স্পর্শ করেন, তাহাতেই পবিত্র হইলেন, মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাকে আর সাধারণজলে স্নান করার প্রয়োজন হয় না। আত্মীয় স্বজনেরা অন্তিমকালে মুমূর্ষু ব্যক্তির মুখে গঙ্গোদক অর্পণ করেন, তাঁহাদের বিশ্বাস যে, এক বিন্দু গঙ্গার জল গলাধঃকৃত হইলে মৃত ব্যক্তির আত্মার উপর যম দূতের অধিকার থাকে না। মৃত ব্যক্তির দেহ শ্মশানবহ্নিতে ভস্মে পরিণত হইলে তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় চিতাভূমি হইতে ভস্মাবশিষ্ট দুই এক খানা ক্ষুদ্র অস্থি কুড়াইয়া আনিয়া একটি পাত্রমধ্যে সযত্নে গৃহে রক্ষা করে, পরে তাহা গঙ্গার গর্ভে বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, তাহাতে মৃত ব্যক্তির আত্মার স্বর্গবাস হয়, হিন্দুদিগের এই রূপ বিশ্বাস। গঙ্গাতীর হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে কোন ভাগ্যবান্ হিন্দুর মৃত্যু হইলে সচরাচর এইরূপ অস্থি সংরক্ষণ ও পরে গঙ্গা জলে বিসর্জ্জন করা হয়। অনেক আসন্নমৃত্যু পিতামাতাকে তাহার পুত্রকন্যাগণ গঙ্গাতীরস্থ করে, কণ্ঠাগতপ্রাণ দেখিলে তাহার দেহ নাভী পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করিয়া থাকে, সেই অবস্থায় প্রাণ বহির্গত হইলে মৃত ব্যক্তির আত্মা দিব্যলোকবাসী হয়। এই বিশ্বাস।

কাশী প্রয়াগ হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্র গঙ্গা নদীর তীরবর্ত্তী; সেই সকল স্থানের গঙ্গার বিশেষ মাহাত্ম্য, সেই সমস্ত তীর্থভূমিতে প্রবাহিত গঙ্গার জলে স্নানে অধিকতর পুণ্য হয়, হিন্দুদিগের এরূপ সংস্কার। কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী কালীঘাট একটি প্রধান তীর্থভূমি, এক সময় গঙ্গানদী কালীঘাটের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ছিল, ক্রমে সেই স্রোত বন্ধ হইয়া যায়, মেটে বরুজের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গার প্রবল প্রবাহ চলিতে থাকে। পরে কালীঘাটে খাল কাটিয়া জলস্রোত রক্ষা করা হইয়াছে, উহাকে "কাটীগঙ্গা" বলে। কলিকাতার বড় গঙ্গাতে স্নানাপেক্ষা কালীঘাটের উক্ত গঙ্গায় স্নানে অধিক পুণ্য হয় সাধারণতঃ হিন্দু স্ত্রীপুরুষের এই বিশ্বাস। পূর্ব্বে কালীঘাটের অনতিদূরবর্ত্তী গ্রাম বারৈপুর ও হরিনাভি প্রভৃতি অঞ্চলে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল, তাহা ভরাট হইয়া স্থানে স্থানে ডোবার আকারে জল বদ্ধ হইয়া আছে। সেই জলকে পবিত্র ভাবিয়া লোকে পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য তাহাতেও স্নান করিয়া থাকে। হিন্দুদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মাদির মধ্যে তীর্থনদীতে স্নানাবগাহন প্রধান। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রাদিতে স্নান করিবার সময় তাঁহারা স্তুতি বন্দনা ও প্রার্থনা করেন, ব্রাহ্মণে মন্ত্র পড়াইয়া থাকেন, ভোজ্যাদি উৎসর্গ করা হয়, নদী দেবতার উদ্দেশ্যে বলিদানও হয়। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু সরোবরাদিতে প্রত্যহ স্নান করিবার কালে মন্ত্রবিশেষ পাঠ করিয়া সেই জলে তীর্থ নদী সকলকে আহ্বান করেন, যথা "গঙ্গেচ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি নর্ম্মদে সিন্ধো, কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।" অর্থাৎ হে গঙ্গে হে যমুনে, হে গোদাবরি, হে সরস্বতি, নর্ম্মদে, সিন্ধো কাবেরি, তোমরা এই জলে উপস্থিত হও।

বঙ্গদেশের বক্ষঃস্থলে দুইটি প্রধান তীর্থ নদী প্রবাহিত। গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র; ব্রহ্মপুত্রকে নদী বলে না, নদ বলে, ব্রহ্মপুত্রের অন্যতর নাম লৌহিত্য। জলাকারে পরিণত ব্রহ্মপুত্রদেব অমোঘা দেবীর গর্ভসম্ভূত সান্তনু মুনির পুত্র পৌরাণিক আখ্যায়িকায় এরূপ বর্ণিত। গঙ্গানদী পশ্চিমবঙ্গে, ব্রহ্মপুত্র পূর্ব্ববঙ্গে প্রবাহিত। চৈত্র মাসের অষ্টমী তিথিতে ব্রহ্মপুত্র স্নানে মহা ফল। ঢাকা জিলার অন্তর্গত নাঙ্গলবন্ধনামক স্থান ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্ত্তী উক্ত অষ্টমী তিথিতে সেই স্থানে মহামেলা হয়, নানা স্থান হইতে যাত্রিক সকল স্নানার্থে সমাগত হইয়া থাকে, ও মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক স্নান করে, এবং করপুটে এরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকে, যথা, "ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনুকুল নন্দন, অমোঘাগর্ভ সম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর।" আমরা ব্রহ্মপুত্র নদের আখ্যায়িকা বলিয়া পরে গঙ্গা নদীর পৌরাণিক আখ্যায়িকা বলিতেছি;—

পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় কুঠারাঘাতে মাতৃহত্যা করিয়া মহাপাতকী হন। কথিত আছে যে, কুঠার তাঁহার হস্তে সংলগ্ন হইয়া থাকে, কিছুতেই হস্তচ্যুত হয় না। পাপের সন্তাপে তাঁহার গৌরাঙ্গ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। নানা তীর্থ পরিভ্রমণে ও তীর্থ নদীতে স্নানে তিনি পাপমুক্ত হইতে পারেন নাই। আসাম দেশের উত্তর

সীমায় হিমালয়-বক্ষে ব্রহ্মকুণ্ড, সেখানে যাইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিবামাত্র, তাঁহার হস্তসংলগ্ন পরশু স্খলিত হয়, তিনি গৌরকান্তি ধারণ করেন। ব্রহ্মকুণ্ডের পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া তিনি মহাপাপ হইতে মুক্ত হইলেন ভাবিয়া মহা আনন্দিত হইলেন, পাপীদিগের উদ্ধারের জন্য সেই জল দেশ দেশান্তরে প্রবাহিত করিবেন সঙ্কল্প করিয়া উক্ত কুণ্ড হইতে জলপ্রবাহ বাহির করিলেন, তিনি নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আসাম দেশ ও পূর্ব্ববঙ্গের বক্ষঃস্থল দিয়া সেই প্রবাহ সাগর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন। ব্রহ্মকুণ্ড হইতে নির্গত সেই জলপ্রবাহের নামই ব্রহ্মপুত্র নদ। পরশুরাম ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে সঙ্গে পতাকা হস্তে চলিয়াছিলেন। এক্ষণ পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত পাঁচদোনাপল্লী যেস্থানে, এরূপ কিম্বদন্তী যে, সেই স্থানে আসিয়া তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন, হস্তস্থিত ধ্বজদণ্ড মৃত্তিকায় স্থাপন করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করেন, পরে ধ্বজদণ্ড তদবস্থায় রাখিয়া চলিয়া যান; উহা জীবিত হইয়া অশ্বত্থ তরুতে পরিণত হয়। সেই তরু ধ্বজেশ্বর নামে এক্ষণও বিদ্যমান। পল্লীনিবাসিগণ ধ্বজেশ্বরকে বিশেষ সম্মান করে, উহার উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে পূজা দিয়া থাকে। সেই স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের চিহ্নমাত্র আছে, স্রোতোবিহীন দল পানাতে পূর্ণ ক্ষুদ্র খালের আকার হইয়া আছে। অনেক স্থানে জলের লেশও নাই, চাষ আবাদ হইয়া থাকে, কোন কোন নিম্ন স্থানে ২।১ ফুট পরিমাণ বৃষ্টির জল বদ্ধ হয়। তন্মধ্যে মণ্ডূককুল আনন্দে নৃত্য ও কীর্ত্তন করে। ভক্তিমতী নারীগণ পবিত্র-জ্ঞানে সেই জলে কোনরূপে শরীর নিমজ্জিত করিয়া থাকে। সময়ে সময়ে মৃত দেহ ও দলপালাপূর্ণ উক্ত মৃত ব্রহ্মপুত্র চারি দিকে এরূপ দুর্গন্ধ বিস্তার করে যে, তাহাতে অদূরবর্ত্তী পল্লীবাসিগণ জ্বর প্লীহার আক্রমণে শয্যাগত হইয়া পড়ে। ব্রহ্মপুত্রের প্রবল প্রবাহ টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জ সব্‌ডিভিশনের পার্শ্ব দিয়া যমুনা নামে প্রবাহিত হইয়া গোওয়ালন্দে পদ্মানদীর সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছে। সেই যমুনা জলের কোন মাহাত্ম্য নাই। এক শত দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে যমুনা নদী ছিল না। এই প্রবল প্রবাহের সঞ্চার হওয়াতে ব্রহ্মপুত্রের মূল প্রবাহ ক্ষীণ বা একে বারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

গঙ্গা স্নানের প্রসঙ্গোপলক্ষে গঙ্গার প্রতিবেশী নদ ব্রহ্মপুত্রের স্নানের প্রসঙ্গ করিয়া আমরা অনেক কথা কহিলাম, এবং অনেক দূর অগ্রসর হইলাম। এক্ষণ গঙ্গার উৎপত্তি ও তাঁহার মাহাত্ম্যসূচক আখ্যায়িকার সংক্ষেপে অবতারণা করা যাইতেছে। গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক পুস্তকে এ বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

পুরাণে এরূপ বর্ণিত যে, পুরাকালে ভারতবর্ষে সগর নামক মহাপ্রতাপান্বিত এক রাজা ছিলেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞের অশ্ব দেবরাজ ইন্দ্র হরণ করিয়া পাতালে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সগর রাজার

ষষ্টিসহস্র পুত্র অশ্বের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পাতালে ধ্যানস্থ কপিলমুনির পার্শ্বে তাহা প্রাপ্ত হন। উক্ত মুনি যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহারা তাঁহার প্রতি অত্যাচার করেন। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে অভিসম্পাৎ করিয়া ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। ভগীরথ সগর রাজার পৌত্র ছিলেন, তিনি কপিলের অভিশাপে ভস্মীভূত ষষ্টিসহস্র পিতৃপুরুষদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য কৈলাস পুরীতে গঙ্গার আরাধনা করেন। গঙ্গাদেবী মহাদেব শূলপাণির অন্যতর প্রিয়তমা পত্নী, ভগবতী পার্ব্বতীর সপত্নী। তিনি মহাদেবের এত আদরের যে মহাদেব তাঁহাকে স্বীয় মস্তকের উপর জটাপুঞ্জের ভিতরে ধারণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক গঙ্গাদেবী ভগীরথের কঠোর তপস্যা ও স্তবস্তুতিতে প্রসন্ন হইয়া তাঁহার পিতৃপুরুষদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য নদীরূপধারণে কৈলাস গিরি হইতে মহাবেগে অবতরণ করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবত তাঁহার গমনে বাধা দিতে যাইয়া মহাবিপদ্‌গ্রস্ত হয়, প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গড়াইতে গড়াইতে নীচে পড়িয়া যায়। দেবী গঙ্গার বিপুল পরাক্রমে সুবিশাল তরুরাজি উৎপাটিত প্রকাণ্ড শৈলশিলা সকল বিচূর্ণ হইয়াছিল, গিরিপাদদেশে বসিয়া জহ্নুমুনি আহ্নিক করিতেছিলেন, গঙ্গা তাঁহার কোশাকুশী ভাসাইয়া লইয়া যান। তাহাতে মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া গণ্ডুষ যোগে গঙ্গাকে উদরস্থ করেন। ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে দেখিতে না পাইয়া পিতৃকুল বুঝি উদ্ধার হইল না ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়েন, পরে মহামুনি জহ্নু পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গাকে গ্রাস করিয়াছেন জানিতে পারিয়া তাঁহার স্তব স্তুতি করেন। তাহাতে মুনি প্রসন্ন হইয়া নিজের জানু বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাকে বাহির করিয়া দেন, জহ্নু মুনি হইতে উৎপন্ন বলিয়া গঙ্গা জাহ্নবী নাম প্রাপ্ত হন। ভগীরথ তাঁহাকে কৈলাসশিখর হইতে অবতারণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অন্যতর নাম ভাগীরথী হইয়াছে, এই রূপে ভাগিরথী ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া পাতাল পুরীতে প্রবেশপূর্ব্বক কপিল শাপে সগররাজার ভস্মীভূত সন্তানগণের দেহভস্ম স্পর্শ করেন, তাহাতে ষষ্টিসহস্র সগর-তনয় সজীব হইয়া দিব্য দেহধারণপূর্ব্বক দিব্য রথের উপর আরোহণে স্বর্গলোকে চলিয়া যান। ইহাই গঙ্গার পৌরাণিক আখ্যায়িকা। ভক্ত হিন্দুগণ গঙ্গার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। গঙ্গাদেবী চতুর্ভূজা, মকর মৎস্য তাঁহার বাহন।

প্রাকৃত গঙ্গার বিষয় যাহা স্বকর্ণে শুনা গিয়াছে, স্বচক্ষে দেখা গিয়াছে, এক্ষণ তাহা বলা যাইতেছে। সাধারণতঃ সমুদায় নদ নদীর মূল গিরি নিঃসৃত প্রস্রবণ। হরিদ্বার তীর্থের ন্যূনাধিক সাত মাইল উত্তরাংশে হিমাচলের বক্ষঃস্থল হইতে গঙ্গা নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। গঙ্গার মূল হিমালয়ের একটি প্রস্রবণ। উক্ত প্রস্রবণনিঃসরণ স্থান গোমুখাকৃতি, এজন্য লোকে সেই স্থানকে গোমুখী বলে। গঙ্গাকেও গোমুখী গঙ্গা বলিয়া থাকে।

সেই প্রস্রবণ ক্রমে নিম্নগামী হইয়া হরিদ্বারের অনতিদূরে ভীমগড়া নামক স্থানে অপর ছয়টি প্রস্রবণের সঙ্গে সংযুক্ত হওতঃ প্রবল বেগে হরিদ্বারের পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্ব দক্ষিণাভিমুখে সাগর সম্মিলনের জন্য প্রবাহিত হইয়াছে। হরিদ্বারে প্রবাহিত গঙ্গা সলিল শুভ্র স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ, তুষারবৎ শীতল, অতিশয় বেগগামী। আমরা নিদাঘ-ক্লান্ত ও পথশ্রান্ত কলেবরে আমরা তাহাতে স্নান করিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়াছি। সেস্থান হইতেই গঙ্গার প্রসিদ্ধ জলপ্রণালী (কেনাল) গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খাত। ভূমির উর্ব্বরতা-সাধনের জন্য মূল জলপ্রণালী হইতে ক্রমে বহু শাখা প্রশাখা বাহির করিয়া ইতস্ততঃ বিস্তার করা হইয়াছে। নানা দিকে জল নিঃসৃত হওয়াতে সে দেশে মূল গঙ্গা অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। কেনাল কাণপুরে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হইয়া নিঃশেষিত হইয়াছে। পরিশেষে যমুনা সরযু গোমতী প্রভৃতি নদী ক্রমে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহাকে সমধিক হৃষ্ট পুষ্ট ও বেগগামী করিয়া তুলিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জিলার সবডিভিশন জঙ্গীপুরের অনতিদূরে শরদানামক স্থানে গঙ্গা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, এক ভাগ পূর্ব্ব বঙ্গের দিকে মহাবেগে প্রবাহিত হইয়া রামপুর বোওয়ালিয়া, দামোগ দিয়া প্রভৃতি স্থান হইয়া গোয়ালন্দে ব্রহ্মপুত্রের নামান্তর, যমুনাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কাঁচিকাটা বলাসিয়া নামক স্থানে মেঘনা নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। গঙ্গার এই ভাগকে পদ্মা নদী বলে। পদ্মার কোন মাহাত্ম্য নাই, পদ্মার জলে স্নান করিলে পুণ্য হয় না, হিন্দুদিগের এইরূপ বিশ্বাস। ভাগীরথীর অপর ভাগ জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ, পলাশী, কাটওয়া, নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া কলিকাতার পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণাভিমুখে ৬০ মাইল যাইয়া সাগরের সঙ্গে মিলিত হইয়া অদৃশ্য হইয়াছেন। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে গঙ্গার অতিশয় ক্ষীণাবস্থা, বর্ষাপগমে অন্য ঋতুতে তিনি এই রূপ ক্ষীণতোয়া হইয়া পড়েন সহজে তাঁহার বক্ষে সামান্য নৌকাও চালিত হইতে পারে না। এই গঙ্গারই অতিশয় মাহাত্ম্য। রেলওয়ে হওয়ার পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা নৌকা-রোহণে মহাকষ্টে মুর্শিদাবাদে যাইয়া যোগ-স্নানাদি করিতেন।

ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান স্থান। দৈহিক উত্তাপ ও তৃষ্ণানিবারণের জন্য এদেশে জলের বড় আদর। নদীর জলে সিক্ত হইয়া ভূমি উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে প্রচুর শস্য জন্মে। ভারতমাতার বিশাল বক্ষে স্বচ্ছসলিলা নদী সকল মুক্তাহারের ন্যায় শোভা পায়। গঙ্গা সিন্ধু কৃষ্ণা নর্ম্মদা গোদাবরী কাবেরী ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি সুদূরগামী নদ নদী সকল ভারতের বিশেষ হিতসাধন করে বলিয়া ভারতবাসী হিন্দু নরনারী সে সকলকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তির সহিত পূজা করেন। অন্য কোন দেশের লোকের নিকটে নদ নদীর তাদৃশ আদর ও মাহাত্ম্য নাই, খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় জুড়িয়া দেশে প্রবাহিত জর্ডন নদীকে তীর্থ নদী বলিয়া মান্য করেন, জর্ডনের

জলে বিশেষ পাবনী শক্তি আছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। পাদরী সাহেবেরা জর্ডনের জল সংগ্রহ করিয়া পাত্র মধ্যে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করেন। ধর্ম্ম গ্রহণার্থীর অভিষেকের সময় মস্তকে সেই জল কিঞ্চিৎ সিঞ্চন করিয়া থাকেন। তাহাদের গুরু যিশুখ্রীষ্ট জর্ডন নদীতে অভিষিক্ত হইয়া নিজ আত্মাতে পবিত্রাত্মার প্রভাব বিশেষরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মোসলমানেরা তাঁহাদের পরম তীর্থ মক্কানগরস্থ জমজম্ কূপের জলকে অতিশয় পবিত্র মনে করেন। তৎসংস্পর্শে দেহ মন পবিত্র হয় তাঁহাদের এই বিশ্বাস। জমজম্ প্রস্রবণ বিশেষ, উহা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে, মোসলমানশাস্ত্রে এরূপ লিখিত। ভক্ত বিশ্বাসী ব্রাহ্মগণের পক্ষে সমুদায় নদীই পবিত্র তীর্থ নদী, সর্ব্বত্র ভগবানের আবির্ভাব। তাঁহারা সকল নদ নদীতে ঈশ্বরের লীলা ও তাঁহার শক্তির প্রকাশ দর্শন করেন। গঙ্গাতে ঈশ্বর আছেন, পদ্মাতে নাই, ব্রহ্মপুত্র দেবত্বে পূর্ণ, মেঘনা নদী দেবত্ববিহীন, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। এরূপ নদী বিশেষে বদ্ধ ভাবিলে সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ করা হয়। তাঁহারা সমুদায় নদ নদীকে তুল্য দেবভাবাপন্ন বিশ্বাস করেন।

খদিজা দেবী।

(১২৬ পৃষ্ঠার পর)

মহাপুরুষ মোহম্মদ খদিজা দেবীর ভৃত্যরূপে তাঁহার বাণিজ্য ব্যবসায় সম্পাদনার্থে বসোরা অঞ্চলে গিয়াছিলেন, সেবার বাণিজ্যে প্রচুর লাভ হয়, এরূপ লাভ পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। তিনি বাসনানুরূপ ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া সঙ্গী বণিগ্‌বৃন্দসহ বসোরা হইতে মক্কাভিমুখে যাত্রা করেন।

খদিজা যদবধি হজরত মোহম্মদের অলৌকিক ভাব চরিত্র এবং সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রণিধান করিয়াছেন, তদবধি তাঁহার সঙ্গে উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি নফিসানাম্নী এক চতুরা নারীর নিকটে আপনার মনোগত ভাব জ্ঞাপন করেন। নফিসা হজরতকে বিবাহে প্ররোচিত করিবার জন্য দূতী হইয়া তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হয়, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, "মোহম্মদ, বিবাহ করিতে তোমার অন্তরায় কি?" হজরত বলিলেন, "উদ্বাহক্রিয়ার আয়োজন করি আমার এরূপ অর্থসম্বল নাই, এক্ষণও এই ভার যথোপযুক্তরূপে বহন করিতে সুক্ষম নহি।" নফিসা বলিল, "যদি কোন রূপবতী ধনশালিনী সীমন্তিনীর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ হয়, এবং তিনি বিবাহে তোমার পক্ষের সমুদায় ব্যয়ভার বহন করেন, তাহাতে সম্মত আছ কি?" তখন হজরত ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই যুবতী কে?" নফিসা বলিল, "তিনি খবিলদের বিধবা কন্যা খদিজাদেবী।" হজরত মোহম্মদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লক্ষ্যসাধনে আমি কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতে

পারি ?" নারী বলিল, "তোমার মত গ্রহণ করিবার জন্য আমিই নিযুক্ত হইয়াছি।" তৎক্ষণাৎ সে খদিজার নিকটে যাইয়া এই সুসংবাদ জ্ঞাপন করিল; বর কন্যার মধ্যে প্রেমবন্ধন দৃঢ় হইল। অতঃপর খদিজা বিবাহের শুভ লগ্ন স্থির করিলেন, আপন পিতৃব্য ওমর ও পিতৃব্যপুত্র অরকাকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা হজরতের নিকটে বলিয়া পাঠাইলেন যে, অমুক সময়ে সবান্ধবে তুমি আমার গৃহে উদ্বাহসভায় আগমন করিবে, সমুদায় আয়োজনের ভার আমার উপরে রহিল। সেই সময় আবুতালেব ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ সকলেই যেমন আনন্দিত তেমনই ক্ষুব্ধ হইলেন। যেহেতু সেই বিবাহযোগ্য পরিচ্ছদ হজরতের ছিল না, এবং হজরতের উপযুক্ত যে যৌতুক দান করিবেন তাঁহাদিগের তাহার অভাবও ছিল। মহাপুরুষ মোহম্মদও এ বিষয়ে চিন্তাকুল হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে আবুকহাফার পুত্র হজরতের পরমহিতৈষী আবুবেকর আসিয়া তাঁহাকে ক্ষুণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়দর্শন, প্রেমাস্পদ, তুমি আমাদের নয়নের মণি, আজ তোমাকে কেন বিষণ্ণচিত্ত দেখিতেছি। যদি কোন কার্য্য আমার চেষ্টা যত্নে হইতে পারে, আমি তজ্জন্য প্রাণপণ করিব, আমার দেহ তোমার কার্য্যে উৎসর্গ করিব, শরীর মন প্রাণ ও ধন সম্পত্তি, তোমার সেবাতে বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইব না। বল, তোমার কি সঙ্কট উপস্থিত ?" তখন হজরত তাঁহাকে বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। তাহা শুনিয়া আবুবেকর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন যে, "আব্‌দোল্‌মোত্তালেব সহস্র দিনার (মুদ্রা বিশেষ) ও কতকগুলি উৎকৃষ্ট সামগ্রী আমার নিকটে গচ্ছিত রাখিয়াছেন, এবং এই উপদেশ করিয়াছেন যে, মোহম্মদের বিবাহাদি কার্য্য উপস্থিত হইলে ইহা তাহাকে অর্পণ করিবে। এক্ষণ সে সমুদায় মুদ্রা ও দ্রব্যজাত আমার নিকটে আছে, তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদও আছে।" ইহা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, এবং মুদ্রাপূর্ণ মুদ্রাধার ও কয়েক খানা উত্তম বস্ত্র হজরতের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। উহার প্রত্যেক পরিচ্ছদ পাঁচ শত টাকা মূল্যের ছিল। মহাপুরুষ মোহম্মদ সেই পোষাক পরিলেন। ইতিমধ্যে খদিজা দেবীও রাজযোগ্য পরিচ্ছদ তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। হজরত বলিলেন, "আমি আবুবেকরের প্রদত্ত পরিচ্ছদের উপরে অন্য কাহারও পরিচ্ছদকে গৌরব দান করিব না।" লোকে বলে, সেই বসন ও মুদ্রা আবুবেকরেরই ছিল। তাঁহার ধন বা হজরত গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন, অথবা তাঁহার প্রতি তজ্জন্য হজরতের বাধ্যতা ও কৃতজ্ঞতা হয়, এই ভাবিয়া তিনি উহা আব্‌দোল্‌মোত্তালেবের গচ্ছিত ধন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পরে আবুবেকর সমুদ্যোগী হইয়া বরযাত্রার সমুদায় আয়োজন করিলেন ও সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। খদিজা আপন প্রাসাদকে নানা বিলাস সামগ্রীতে অমরপ্রাসাদের ন্যায় সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। থালাপূর্ণ মণি মুক্তা দাসগণের

হস্তে অর্পণ করিয়া আদেশ করিয়াছিলেন যে, সম্মানপ্রদর্শনের জন্য বরের চরণে তাঁহার শুভাগমনমাত্র এ সকল উৎসর্গ করিবে। শুভ বিবাহ দিনে তিনি আপনার ক্রীত দাস দাসীকে দাসত্ববন্ধন হইতে মুক্ত করেন। হজরত পিতৃব্য হাম্জাকে সঙ্গে করিয়া খদিজার গৃহে পদার্পণ করিলেন। আবুতালেব পরিণয়ব্যাপারের সমুদায় তত্ত্বানুসন্ধান করার পর স্বীয় বংশের প্রধান লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খদিজার আলয়ে লইয়া আসলেন। খদিজার পক্ষে এরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, তাঁহার পিতৃব্য ওমর তাঁহার কার্য্যসম্পাদক হইবেন, উদ্বাহবন্ধন তাঁহার দ্বারা দৃঢ়ীভূত হইবে। বরপক্ষে স্থির হইয়াছিল যে, হজরতের পিতৃব্য আবুতালেব খেত্‌বা অর্থাৎ উদ্বাহবচন উচ্চারণ করিবেন। আবুতালেবের খেত্‌বা পাঠ সমাপ্ত হইলে খদিজার পিতৃব্য পুত্র অরকা আবুতালেবের অনুরূপ কন্যা-পক্ষে খেতবা পাঠ করেন। তৎপর উভয় পাত্র পাত্রী পক্ষের অনুমোদন ও সম্মতি ধার্য্য হয়। তখন বরযাত্রিগণের ও কন্যার বন্ধু বান্ধবদিগের হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠে। অনন্তর অরকা নীরব হইলে আবুতালেব বলিলেন, "হে অরকা, এক্ষণ এই ইচ্ছা যে পাত্রীর পিতৃব্য ওমর এই পরিণয়কার্য্যে তোমার সঙ্গে ঐক্য হন।" তখন ওমর বলিলেন, "হে কোরেশদল, তোমরা সাক্ষী থাক যে, খবিলদের কন্যা খদিজাকে, আমি মোহম্মদের হস্তে তাঁহার পত্নীত্বে সমর্পণ করিলাম।" উভয় পক্ষের অনুমোদন ও সম্মতি হইল। কেহ বলেন, খদিজা দেবীর কাবিনের শর্ত্ত চারি শত মেশকাল স্বর্ণ, কেহ বলেন পাঁচ শত মেশকাল সুবর্ণ * এবং বিংশতি উষ্ট্র নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। শুভ বিবাহান্তে আবুতালেব একটি উষ্ট্র বধ করিয়া আত্মীয় কুটুম্বদিগকে ভোজ দেন। খদিজার কিঙ্করীগণ মহা আনন্দে ঢোলক বাজাইয়া নৃত্য করে। বিবাহ-নিকেতনে রাজকীয় উৎসব হয়। হজরত আপন সঙ্গীদিগকে আদর সম্মান সৎকারে বিদায় দান করেন। জফাফের † দিনে খদিজা ভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক সমুদায় ধন হজরতকে অর্পণ করিয়া তাহাতে তাঁহার স্বত্ব স্থাপন করিলেন, এবং বলিলেন, "আমি ইচ্ছা করি না যে, তুমি অর্থব্যয়সম্বন্ধে আমার অনুগ্রহের প্রত্যাশী হইয়া থাক, আজ হইতে সমুদায় ধন তোমার হইল, আমি তোমার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া রহিলাম।" এই ব্যাপারে আবুতালেব অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, যেহেতু হজরতের সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইল, তাঁহার ভরণপোষণাদি সাংসারিক চিন্তা হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিলেন। অনন্তর খদিজা হজরত মোহম্মদের সেবা পরিচর্য্যায় নিষ্ঠাপূর্ব্বক রত হইলেন। তাহাতেই তিনি আপনার ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ মনে করিতে লাগিলেন। বিবাহকালে হজরত মোহ

* মেশকাল পরিমাণবিশেষ। সাড়ে চারি মাষার পরিমাণ এক মেশকাল।

† বিবাহান্তে নব বধূকে স্বামিগৃহে প্রেরণ করাকে জফাফ বলে।

ন্দের বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসর, খদিজার বয়স চল্লিশ বৎসর ছিল। ক্রমশঃ।

কেশবজননী সাধ্বী শারদাদেবী।

২য়।

"আমার বড় সাধ যাইত তাঁহাকে (শ্বশুর মহাশয়কে) রাঁধিয়া দিবার জন্য, কিন্তু তিনি খাইতেন না। কারণ তিনি নিজেই রান্না করিয়া খাইতেন। ছেলেদের খেলানার মত তাঁর ছোট ছোট হাঁড়ী, হাতা, বেড়ী ও বোগ্‌নো ছিল। সমস্ত দিন উপোস করিয়া বিকেলে নিজে রাঁধিয়া খাইতেন। তিনি বেশী জিনিষ কিছু খাইতেন না। শুধু ভাতেভাত কিম্বা ডাল ভাতই খাইতেন। তিনি দুধ খাইতেন না, বলিতেন "গোরস"। চা খাইবার সময় শুধু জলে চা ভিজাইয়া মিছ্‌রি দিয়া খাইতেন।

"আমার শ্বশুরেরা ছয় ভাই ছিলেন, তার মধ্যে তিন ভাইএর সংসার হইয়াছে। আর এক ভাইএর একটী মাত্র কন্যা ছিলেন, তাঁহার নাম গৌরমণি, তিনি প্রতাপ মজুমদারের ঠাকুরমা। সেই সম্পর্কে প্রতাপ আমার নাতী। যে সব ভাইএর সন্তান হইয়াছিল, তাঁহাদের নাম মেজ মদনমোহন সেন, ইহাঁরই নামে এখন ঐ পুরাণ বাড়ীর পাশের রাস্তা হইয়াছে। সেজ, রামমোহন ইনি প্রতাপের ঠাকুরমার বাবা। চতুর্থ আমার শ্বশুর দেওয়ান রামকমল সেন। পঞ্চম, রামধন সেন, প্রসিদ্ধ মাধব সেন ও ঠাকুর চরণ সেনের বাবা। জয়কৃষ্ণ সেন ও রাজকৃষ্ণ সেন মাধব বাবুর ছেলে। আমার শ্বশুরের ছয় ছেলে, প্রথম, হরিমোহন সেন, জয়পুরের যদুনাথের ও নরেন্দ্র নাথ সেনের বাবা। দ্বিতীয়, আমার স্বামী প্যারীমোহন সেন। তৃতীয়, হলধর সেন, ১২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। চতুর্থ, শ্রীধর সেন, তিনিও সাড়ে দশ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন। পঞ্চম, বংশীধর সেন, তাঁহার দুইটী মাত্র কন্যা। কনিষ্ঠ, প্রসিদ্ধ এটর্ণি মুরলীধর সেন।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন আমরা এ বাড়ীতে আসি নাই। তখন রাস্তার ওধারের বাড়ীতেই (যাহা এখন ঠাকুর চরণ সেনের বাড়ী) আমরা সকলে একত্রে ছিলাম। কিন্তু আমাদের সন্তান হইবার পূর্ব্বেই আমরা এ বাড়ীতে উঠিয়া আসি। এ বাড়ীতে আসার পর আমরা শ্বশুরের নিকট হইতে বেশ সৎশিক্ষা পাইতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের পরিবার বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। আমার শ্বশুর পরম বৈষ্ণব ছিলেন। যদিও তিনি অতি ধনবান্ এবং বিষয়ী লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ বৈরাগ্যে পূর্ণ ছিল। পূর্ব্বেই শুনিয়াছ আচারসম্বন্ধে তিনি কিরূপ কঠোর ব্রত প্রতিপালন করিতেন। যখন বাড়ীতে থাকিতেন পোষাক সম্বন্ধেও তাঁহার সেইরূপ ভাব ছিল। তিনি নাতীদের বড় ভাল বাসিতেন, কিন্তু ততটা কোলে করিতেন না। তাঁহার তখনকার ভাব আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি, তিনি ঠিক

নির্লিপ্তভাবে সংসার করিতেন। সংসারে থাকিতেন কিন্তু সংসার তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারিত না। আমি দেখিয়াছি যখন তাঁহার এক একটী সন্তানের মৃত্যু হইত, তিনি কখনই চক্ষের জল ফেলিতেন না। শুধু হরিনামের মালা লইয়া ছাদে বসিয়া থাকিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নূতন বাড়ীতে আসার পর পর্য্যন্ত শ্বশুর আমাদের উপদেশ দিতেন। আমরা যখন ঠাকুর ঘরে নমস্কার করিতে যাইতাম, তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করিতেন 'তোমরা কি বলিয়া নমস্কার কর? তোমরা কি এই বলিয়া নমস্কার কর যে, হে ঠাকুর আমাদিগকে ধন দাও, দৌলত দাও, ছেলে দাও, সুখ দাও, তোমরা কি লক্ষ্মীকে নমস্কার কর টাকা দিবেন বলিয়া? ও ষষ্ঠীর নিকট ছেলে কামনা করিয়াই কি নমস্কার কর?' আমরা বলিতাম, 'হাঁ আমরা এইরূপই করি।' তাহা না হইলে কি বলিয়া নমস্কার করিব বলিয়া দিন।' তিনি উত্তরে বলিতেন, 'এই বলিয়া নমস্কার কর—হে মধুসূদন, হে ভগবান্, তুমি আমাদের ইহকাল পরকাল রক্ষা করো। তুমি আমাদের পাপ হইতে রক্ষা করো। বিপত্তির মধুসূদন তুমি বিপদভঞ্জন কর।' তিনি আমাদের হরিনামের মালা দিয়াছিলেন। দুই বেলা জপ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। বার মাসই তাঁহার নিকট ভাগবত পাঠ হইত। তিনি আমাদিগকে ও আমার শাশুড়ীকে ভক্তির সহিত ঐসব ভাগবত পাঠ শুনিতে উৎসাহিত করিতেন। তিনি ঠাকুরের জন্য অনেক দেবত্তর, ১০,০০০ টাকা এবং কিছুর সোনা রূপার বাসন রাখিয়া গিয়াছিলেন। আমরা যমনই কোন ব্রত ইত্যাদি গ্রহণ করিতে চাহিতাম তিনি আহ্লাদের সহিত স্বীকৃত হইতেন ও আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেন।"

দ্বিতীয় দিন ৬ই জুন ১৮৯২।

"আমার শ্বশুর আমায় বড় ভাল বাসিতেন। আমার বিবাহের পর আমি যখন এক বৎসর বাপের বাড়ী ছিলাম, তিনি প্রত্যেক রবিবারে আমাকে দেখিতে যাইতেন। যখনই যাইতেন আমার জন্য টাকা ও টাঁকশাল হইতে নূতন রাঙা পয়সা লইয়া যাইতেন। তিনি ঠিক বাপের মতন আমাদের ভাল বাসিতেন। প্রত্যেক দিন আমার বিষয় খোঁজ লইতেন। একটু অসুখ করিলে নিজে আসিয়া চা চিড়ে ভাজা ইত্যাদি আমাদিগকে দিয়া যাইতেন। তিনি সব সময় বাগানে থাকিতেন। শুধু একবারটী মাত্র সকালে বাড়ী আসিয়া জল খাইয়া আফিসে যাইতেন। কোন কোন দিন রাত্রিতেও বাড়ী থাকিতেন। তাঁর আফিসের সমুদায় লোকেরা তাঁহাকে অতি ভক্তি করিত। তাঁহারা বলিতেন যে, সকালে তাঁহার মুখ দেখিলে সমস্ত দিন তাঁহাদের ভালয় কাটিয়া যায়, সেই বিশ্বাসে তাঁহারা প্রতিদিন ভোরে তাঁহাকে একবার দেখিতে আসিতেন। যে দিন তাঁহার সঙ্গে দেখা না হইত সেইদিন তাঁহার এক খানি ছবি ছিল সেই খানি

দর্শন করিয়া যাইতেন। আমার শ্বশুরের দেড় হাজার টাকা মাহিনা, ট্যাঁকশাল এবং বাঙ্গাল বেঙ্কের দেওয়ান ছিলেন। সেই কর্ম্ম এবং সেই মাহিয়ানা প্রথমে তাঁহার বড় ছেলেকে দেন। আমার শ্বশুরের শেষ ব্যামুর সময় আমার বড় ভাশুর ট্যাঁকশালের কর্ম্ম ছাড়িয়া বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ান হন। শ্বশুরের রোগশয্যার সেবার নিমিত্ত আমার স্বামী বাড়ীতেই থাকিতেন, কোন কর্ম্ম করিতেন না। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তিনিই তার পর ট্যাঁকশালের দেওয়ান হইলেন। এইরূপে আমার শ্বশুরের দুই কাজ তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রে ভাগ করিয়া লইলেন। আমার শ্বশুর যখন যান আমার ছোট দেওর মুরলী তখন অতি ছোট ছিলেন। তিনি আমার ছেলে নবীনের চেয়ে দুই বৎসরের ছোট, আমিই তাঁহাকে আমার নিজের ছেলের মতন করিয়া মানুষ করিয়াছি।

"আমার শ্বশুরের মৃত্যুর ঠিক পরেই আমার স্বামী যে ট্যাঁকশালের কাজ লইয়াছিলেন তাহা নয়। আমার শ্বশুরের জীবদ্দশাতেই তিনি যোগ সাহেবের হাউসের মুচ্ছুদ্দী হইয়াছিলেন। এই হাউস কয় দিন পরে ফেল্ হয়। হাউস ফেইল হইবার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি বাড়ীতে বসিয়া ছিলেন। তিনি এই হাউসে কর্ম্ম করিবার পর অল্প দিনের ভিতরই বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু হাউস ফেলের সঙ্গেই তাঁহার সমস্ত টাকা নষ্ট হইয়া যায়। কারণ এই সময়েতে তিনি যে কয় নৌকায় মাল পশ্চিমে চালান দিয়াছিলেন তাহা নষ্ট হয়, এবং ঝড়ের বেগেতে হাউসের বাড়ী পড়িয়া যায়। তাহাতে অনেক টাকার শাঁক নষ্ট হইয়া যায়।"

"হাউস ফেলের দরুণ তাঁহার উপর অনেক টাকার দেনা হয়। এই সব কারণে তিনি সব সময়ে দুঃখিত থাকিতেন, এবং চিন্তা করিতেন। তাঁহার দুঃখ দেখিয়া আমিও বসিয়া বসিয়া কাঁদিতাম। সাহেব আমার স্বামীকে অতি ভাল বাসিতেন, আমার শ্বশুরকে বলিতেন, "আপনার ছেলেকে ঘরে বসাইয়া রাখিবেন না, ফের কর্ম্ম করিতে দিন, তবেই ধার শোধ যাবে।' কিন্তু আমার শ্বশুর দিতেন না। তার পর আমার শ্বশুরের মৃত্যুর ২।৩ বৎসর পরে যখন আমার স্বামী ট্যাঁকশালের দেওয়ান হইলেন, সেই টাকা হইতে তিনি ক্রমে ক্রমে যোগ সাহেবের হাউসের ধার শোধ দিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যখন আমার স্বামী হাউসে কর্ম্ম করিতেন তিনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বাক্স পূর্ণ করিয়া টাকা ও কোম্পানির কাগজ বাড়ী আনিতেন। আমি কিন্তু কখনও কোনও টাকা চাহিতাম না। পাছে তিনি মনে করেন আমি গরিবের মেয়ে কখনও টাকা দেখি নাই, তাই টাকা চাহিতেছি। এই ভয়ে আমার টাকা লইতে ইচ্ছা হইত না। তিনি থলে থলে নূতন পয়সা, সিকি, দুয়ানি ইত্যাদি আনিয়া আমার হাতে দিতেন, এবং বলিতেন এই সব তোমার ইচ্ছা মতন সমস্ত লোক জনকে হাতে করিয়া বিলাইয়া

দাও। আমি নিজে বিলাইতাম না, লজ্জা করিত। তাহাতে তিনি বলিতেন, 'এখন বিলাতেছ না বটে শেষে পাবে না, কেউ এমন করিয়া তোমায় দেবে না।' তিনি সব সময় আমায় উপদেশ দিতেন। বলিতেন 'যাতে ভাল হও তার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। কখনও খুব চেঁচিয়ে হাসিও না, কাহারও সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা কহিও না' ইত্যাদি। তিনি কখনও বেআব্রু ভাল বাসিতেন না, এবং যাহাতে সর্ব্বদা আব্রুতে থাকি সেই জন্য চেষ্টা করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন 'যখন কোথাও যাই তাহারা যখন তোমার সুখ্যাৎ করে শুনে বড় আহ্লাদ হয়।'

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি তখনকার মেয়েদের আজ কালের মেয়েদের মতন লেখা পড়া শিখিবার এমন সুবিধা ছিল না, শিখিতে চাহিতও না, এবং গুরুজনেরাও তাহা ভাল বাসিতেন না। কিন্তু আমার স্বামীর মত এই বিষয়ে সকল অপেক্ষা উন্নত ছিল। তিনি একান্ত ইচ্ছা করিতেন যে, আমি লেখা পড়া করি। অন্যত্র শিখিবার কোনও সুবিধা ছিল না বলিয়া তিনি নিজেই আমায় রাত্রেতে পড়াইতেন। তাঁহার হাতের অক্ষর অত্যন্ত সুন্দর ছিল, তিনি নিজে লিখিয়া আমায় সেই রকম করিয়া লিখিতে বলিতেন। আমিও চেষ্টা করিতাম। হাতের লেখাসম্বন্ধে কেশব তাঁহার পিতার গুণ অনেকটা পাইয়াছিলেন। অনেক দিন লিখি নাই বলিয়া আমি লিখিতে পারি না, কিন্তু পড়িতে পারি। ধরিতে গেলে ব্যাগ সাহেবের হাউস ফেল্ হওয়া হইতে আরম্ভ হইয়া আমার মেজ মেয়ে ফুলেশ্বরী ও সেজ মেয়ে চুণীর সময়েতেই আমাদের অত্যন্ত আর্থিক এবং মানসিক কষ্ট হয়। আমার সেজ মেয়ে চুণী যখন নয় মাসের তখন আমার শ্বশুরের কাল হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের পরিবার পরম বৈষ্ণব, সুতরাং পরিবারের চির নিয়মানুসারে আমার শ্বশুরের সমাধি বৃন্দাবনেই হইয়াছিল আমার চতুর্থ মেয়ে পান্না হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে আমার স্বামীর পুনরায় ট্যাঁকশালে কর্ম্ম হয়। এই সময় হইতে পুনরায় আমরা কিছু সুখের দেখা পাইয়াছিলাম। আমার ছোট ছেলে কৃষ্ণবিহারীর সময় আমাদের অবস্থা আবার খুব ভাল হইয়াছিল। ভেবেছিলাম বুঝি পূর্ব্বের সুখ আবার হইল। এক অগ্রাহয়ণে আমার কৃষ্ণবিহারীর জন্ম হয়, ফিরে কার্ত্তিকে আমার সেই সুখের জাহাজ ডুবিয়া যায়, আবার দুঃখের সাগরে ভাসিলাম। এত বড় সাগর যে তাহার আর কুল কিনারা পাইলাম না। আমার স্বামী কখনও কোন দিন বিদেশে বাহির হইতেন না। কি কুক্ষণে সেইবার তাঁহার বৈদ্যনাথে বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা হইল। বলিলেন 'দাদার সঙ্গে আমিও বৈদ্যনাথে যাব।' পূজার ১২ দিনের ছুটীতে বেড়াইয়া আসিবেন সমস্ত ঠিক হইল। পাল্কীর ডাক বসিল। দুই ভাইতে ডাকে রওনা হইলেন। যাইবার পূর্ব্বে যত ভারি ভারি দামের শাল ছিল তাহা চারি ভাগ করিয়া সিন্দুকে রাখিয়া দিলেন। তাঁহারা পঞ্চমীর দিন বাহির

হইলেন। আমরাও এদিকে নৌকা করিয়া গৌরিভার যাইবার জন্য কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলাম। আমাদের বজ্রার সঙ্গে তাঁহাদের পাল্কীর পুনরায় চুঁচুঁরার ঘাটে দেখা হইল। তিনি পাল্কী হইতে নামিয়া বজ্রার আসিলেন। এ:স ১১ মাসের কৃষ্ণবিহারীকে কোলে করিয়া পাল্কীতে তুলিয়া লইলেন। পাল্কী একটু দূর গেলে আবার বেহারা কৃষ্ণবিহারীকে আনিয়া আমার নিকট দিয়া গেল। আমরা বাড়ী গেলাম, খুব ধুমধামের সহিত পূজা হইয়া গেল। দশমীর পরদিন আমি আমার মামার বাড়ী ত্রিবেণীতে বেড়াইতে গেলাম। সেইখানে খুব আমোদ আহ্লাদ হইল। সঙ্গে অনেক টাকা ও লোক জন লইয়া ছিলাম, এবং গাঁয়ের সকলকেই টাকা দিয়া আশীর্ব্বাদ লইলাম। কিন্তু, হায়! সেই আশীর্ব্বাদ মিথ্যা হইল। এখন মনে হয় যেন সে আশীর্ব্বাদ নয়, গালাগালি। এক দিন পরেই গৌরিভার চলিয়া আসি।"

"অনেক দিন হইতে আমার সাধ ছিল একবার ত্রিবেণীতে যাই। তাহা লইয়া সব সময় আমার স্বামীকে এত বিরক্ত করিতাম যে, শেষে তিনি বলিতেন 'তোমায় আমি অনেক গুলি কড়ি আনিয়া গুণিতে দিব, তাহা হইলে তুমি ও কথা ভুলিয়া যাইবে।' শেষে তিনি আমার এই সাধ পূর্ণ করিলেন, এবং ত্রিবেণীতে খরচ করিবার জন্য যথেষ্ট টাকা দিলেন, এবং আমার ননদ ও অন্যান্য লোকজনকে বলিয়া গেলেন আমার সঙ্গে যাইবার জন্য। আমরা ত্রয়োদশীর দিন গৌরিভা হইতে কলিকাতায় আসিলাম। আমার স্বামীও কোজাগর পূর্ণিমার পরদিন কলিকাতায় আসিলেন। আসিবার সময় পাটুলিতে নামিয়া আহার করিলেন। সেই খানেই তাঁহার ভয়ানক জ্বর হইল। ৩। ৪ দিনের সেই জ্বর লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিলেন, কবিরাজ রামমোহন সেনকে ডাকান হইল। কিন্তু তিনি প্রথম দিন ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন না। তার পরদিন ঔষধ দিলেন, এবং বলিলেন সামান্য জ্বর শীঘ্রই সারিয়া যাইবে। তিনি ব্যারামের সময় মোচা ও পলতা ভাজা ভাল বাসিতেন। সেই দিন তাহাই খাইতে চাহিলেন। এই দুই জিনিষ প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি আর দেখি কিনা তিনি সেই তেতালা থেকে দোতলার বড় ঘরে আসিয়া পড়িয়াছেন। যে ঘরে এখন কৃষ্ণবিহারী বসেন। যে জ্বর একটু কমিয়াছিল, তাহা গঙ্গার পুরস্ত জোয়ারের মত বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন, আর বলিতেছেন, 'আমি যাই, আমায় ধর।' সর্ব্বনাশ! আমার কান্না আসিল, কাঁদিয়া ফেলিলাম। শাশুড়ীকে খবর দিলাম, তিনি দৌড়িয়া আসিয়া কোলে করিয়া বসিলেন।"

তৃতীয় দিন, ১২ই জুন, ১৮৯২।

"আমার ভাশুর বাড়ী ছিলেন না। তিনি আমার শ্বশুরের বন্ধু রাজা রাধাকান্ত দেবের মোকর্দ্দমায় সাহায্য করিতে হুগলিতে গিয়াছিলেন। আমার জ্যেঠ্‌ শ্বশুরের ছেলে গোবিন্দবাবুকে আমার

শাশুড়ী ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তিনি প্রসিদ্ধ (ক্রোড়পতি) গোবিন্দবাবু, ইহঁার জমীদারী চট্টগ্রামেও ছিল। তিনি আসিয়া প্রথম দেশী ডাক্তার কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু ব্যারাম আরও বৃদ্ধি পাইয়া গেল। সেই দিন আমার ভাশুর আসিয়া কেল্লা হইতে চারি জন সাহেব ডাক্তার আনাইলেন। সাহেবেরা চিকিৎসা করিলেন না, অনেক আপশোষ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমার ভাশুর আসিবার পূর্ব্বের দিন রাত্রিতে যখন তাঁহার ব্যামু বাড়িয়া গিয়াছিল, তিনি আমার দেওর গোবিন্দবাবুকে বলিয়াছিলেন, যখন তোমরা বুঝিবে আমার ব্যাম খারাপ হইয়াছে, তখন আমার পরিবারকে আমার কাছে আনিয়া দিও। তাঁহার এই সব কথা শুনিয়া আমার মন কেমন করিতেছিল, তাই আমার বড় ছেলে নবীনের দ্বারা তাঁহাকে বলিলাম, যেন তিনি ঐরূপ কথা না বলেন। নবীন যখন বলিলেন, 'বাবা, আপনি অমন কথা বলিবেন না, মার ভারি কষ্ট হইতেছে।' তিনি তখন হইতেই কথা বন্ধ করিলেন আর কথা কহিলেন না। তার পর দিন সকাল বেলা গোবিন্দবাবু আমায় একবার সেই ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। তখন যদিও বেশ জ্ঞান ছিল, কিন্তু বিধর কিছুই ছিল না। আমি তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আছড়াইয়া পড়িলাম। আমার এই অবস্থা দেখিয়া তিনি একবারে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। ক্রমশঃ।

আমেরিকা যাত্রিকের পত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পম্পী।

পম্পী নেপল্‌স্‌ হইতে প্রায় ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। বরাবর ঘোড়ার গাড়ীতে গেলাম। ধন্য এ দেশের ঘোড়া! একটা ঘোড়া দু ঘণ্টায় নিয়ে গেল, আবার দু ঘণ্টায় ফিরিয়া আসিল—সর্ব্বশুদ্ধ ২৮ মাইল পথ। বেলা প্রায় একটার সময় ভিসুভিয়াসের পাদদেশে পম্পী নগরের দরজায় উপস্থিত হইলাম। একটী ছোট রকমের হোটেলে একটু জলখাবার খাইয়া লইলাম। এইখানে আমার পোষাক দেখিয়া আমাকে এক জন ভারতবাসী রাজা আর আমার ইংরাজ ও বর্ম্মিজ বন্ধু দুটিকে আমার সেক্রেটারী ঠিক করিয়া নিয়াছিল। খুব মানটা পাওয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ যখন পম্পী থেকে ফিরে আসি তখন এক জন মেম এসে আমাদের জুতোর ধূলো পর্য্যন্ত মুছে দিয়েছিল।

পুরাকালে পম্পী একটী ধনধান্যে ও সৌধমালায় পরিপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগর হইয়া উঠিয়াছিল। ৭৩ খৃঃষ্টাব্দে একবার ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, তাহাতে পম্পীর বিশেষ ক্ষতি হয়। পম্পীবাসীরা কিন্তু তাহাতে নিরাশ না হইয়া আবার তাদের দেবমন্দির ও বাড়ী ঘর প্রস্তুত করে। ৭৯ সালের ২৪শে আগষ্ট আবার সমস্ত দিন ধরে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। পম্পীবাসীরা ভয়ে অস্থির হইয়া পড়ে। এমন সময়ে হঠাৎ ভিসুভিয়াসের মাথা ফাটিয়া

আগুনের স্রোত, ও জলন্ত লাভা এবং ছাই ভয়ানক বেগে আসিয়া পম্পী ও হারকিউলেনিয়ান আক্রমণ করে, এবং ধনধান্যে পূর্ণ সুন্দর এই সহর দুটীকে পৃথিবীর চোখ থেকে লুকিয়ে ফেলে। অধিকাংশ নগরবাসীরাও সেই লাভা ও ছাইএর চাপে জীবন্ত অবস্থাতেই গোরপ্রাপ্ত হয়।

১৭১৮ সাল পর্য্যন্ত এই নগরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও অবগতি ছিল না। সেই বৎসরে প্রথম খনন কার্য্য আরম্ভ হয়। আস্তে আস্তে বড় বড় দেবমন্দির, স্নানাগার, প্রতিমূর্ত্তি, ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের জিনিষের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। ক্রমাগত খননের ফলে পাঁচ ভাগের প্রায় তিন ভাগ এখন উদ্ধার করা হয়েছে।

পম্পী নগরের আটটী গেট (প্রবেশের পথ) ছিল। সবগুলিই পাওয়া গিয়াছে। ইহার একটী দিয়া আমরা সহরে ঢুকিলাম। এই পুরনো সহরের জনশূন্য নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়ে যখন চলিতেছিলাম, নিজের পায়ের শব্দের ভিতর দিয়া পম্পীবাসীদের পায়ের শব্দ যেন বাতাসের সঙ্গে মিশে আমার কানে প্রবেশ করিল। তাদের ধনরত্ন, নানা কারুকার্য্যে খচিত উন্নত বিশাল দেবমন্দির, বিচারালয়, বিদ্যামন্দির, নাট্যশালা, সব তাদের ইতিহাসের নির্ব্বাক ভাষায় পূর্ণ হয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে দেবার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজও তাদের গাড়ীর চাকার দাগ প্রশস্ত রাস্তার ওপর আঁকা রয়েছে। দোকানে দেওয়ালের কুলুঙ্গীতে আজও তেলের বড় বড় ভাঁড় সাজান রয়েছে। বহুদিনের ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত পাথরের "জলাধার" আজও পথের ধারে তাদের ইতিহাস হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। এই সব দেখে মনে হয় যেন পম্পীবাসীরা নগর ছেড়ে কোনও আনন্দ উৎসব উপলক্ষে কোথাও গিয়াছেন, আবার এখনই ফিরিয়া আসিয়া তাঁদের গৃহ আনন্দের হাসিতে পূর্ণ করিবেন!

যা যা দেখিলাম তাহা বর্ণনা করিতে গেলে একখানি বড় পুস্তক লিখিতে হয়। আমি এখন কেবলমাত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটী জিনিষের নাম করিতেছি।

গেট দিয়ে ঢুকেই একটী ঘর দেখিতে পেলাম সেটী একটী ছোট রকমের যাদুঘর। কাঁচের আলমারীতে পম্পীর কোন কোন জিনিষ রক্ষা করা হইতেছে। পুরাতন দরজা, তালা, অস্ত্রশস্ত্র সাজান রয়েছে। একটী আলমারীতে একটী কুকুরের দেহ আছে, তার গলায় শিকল লাগান। কয়েকটী মনুষ্যেরও দেহ ঐ ঘরেতে রক্ষা করা হইতেছে। তার পরে ব্যাসিলিকা নামক একটী প্রকাণ্ড হল দেখিলাম। ছাদ নাই, কেবল মাত্র থামগুলির ভগ্নাবশেষ আছে। সবশুদ্ধ ৪৮টী থাম আছে। হলটী প্রায় ৪০ ফুট লম্বা ও ২০ ফুট চওড়া হইবে। ইহাতে ফৌজদারী বিচারালয় বসিত।

চারিদিকে থাম দিয়ে ঘেরা কয়েকটী প্রকাণ্ড স্থান দেখিলাম। কোনটা বেড়াবার জায়গা ছিল, কোনটায় বা সাধারণ সভা হইত। বিদ্যামন্দির ও দেবমন্দিরও

দেখিলাম। রাস্তার ধারে বিবিধ প্রকারের দোকান সব রহিয়াছে। সাবানের ও অন্য জিনিষের দোকান, নাপিত ও কামারের দোকান, সবই আছে। একটী রুটীর দোকানে দেখিলাম যে সেই ভূমিকম্পের দিনে উনুনের ভিতর যে রুটী সেঁকতে দেওয়া হয়েছিল আজও তা রয়েছে।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নাটাশালাও রয়েছে। একটী এম্ফিথিয়েটার আছে। চারিদিকে সিঁড়িদিয়ে ঘেরা একটী প্রশস্ত প্রাঙ্গন। এইখানে বন্য জন্তুদের সহিত মানুষের লড়াই হত।

পুরাতন পম্পীর স্নানাগারগুলি খুবই চমৎকার। মেয়েদের ও পুরুষদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্নানাগার। এক একটী স্নানাগারে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ। কোথাও বা তৈল মাখিবার স্থান, কোথাও বা কাপড় ছাড়িবার জায়গা, কোথাও বা ঠাণ্ডা জলের বন্দোবস্ত, কোথাও বা গরম জলের ব্যবস্থা। পুরুষদের আবার স্নানাগারের ভিতরই খেলিবার বন্দোবস্ত। একটী ফুটবল লাভার শক্ত হয়ে খেলিবার মাঠে পড়ে রয়েছে।

কত যে দেখিলাম তা কি বলে ফুরাতে পারি। আর যখন এই সব দেখিতেছিলাম তখন শ্রদ্ধা, ভয় ও বিস্ময়ে সমস্ত শরীর মন যেন স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছিল।—এই মানুষের জীবন! এই পৃথিবীর ধন ঐশ্বর্য্য!! আর তার এই পরিণতি!!!

পম্পী থেকে ফিরে ঠিক সময়ে জাহাজে পৌঁছিলাম। বেলা ৫টার সময় জাহাজ ছাড়ল। আবার সমুদ্রে ভাসতে লাগলাম। তার পরদিন জাহাজের দু ধারে দুটা বেশ প্রকাণ্ড তিমি মাছের সঙ্গে দেখা হল। কি প্রকাণ্ড জানোয়ার—না দেখলে তার ধারণা করা খুবই শক্ত। আস্তে আস্তে মার্শেল পৌঁছিলাম। জাহাজ এখানে ঘণ্টা দুই ছিল, তাই নেবে সহর দেখার সুবিধা হল না। জাহাজ থেকে যতদূর পারা যায় দেখে নিলাম। খুব প্রকাণ্ড বন্দর, কত দেশের জাহাজই না এখানে রয়েছে।

তিনদিন পরে ইংলণ্ডের গৌরবস্বরূপ জিব্রল্‌টারে এসে জাহাজ লাগল। বাস্তবিক, ইহা একটা দেখ্‌বার জিনিষ। ইহার পর্ব্বত সকল সমুদ্র হতে সোজা উঠে গেছে। পাহাড়ের গায়ে ও মাথায় যে কত শত শত কামান পাতা তা বলা যায় না। এখানে সমুদ্র মোটে আট মাইল চওড়া এবং এই সব কামানের গোলা সমুদ্রের এপার থেকে বরাবর ওপারে পৌঁছতে পারে—অর্থাৎ ইউরোপ থেকে আফ্রিকায় যেতে পারে। সুতরাং ইংলণ্ড ইচ্ছা করিলে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে এই পথ বন্ধ করিতে পারেন।

জিব্রল্‌টার বন্দরটাও বেশ সুন্দর। প্রায় খান দশেক বড় বড় যুদ্ধের জাহাজ দেখ্‌লাম। এখানে আমাদের জাহাজ ঘণ্টা পাঁচেক ছিল, সুতরাং নেবে সহরটা দেখে নিলাম। সহরটা ছোট, চারিদিকে পাঁচিল ও কামান দিয়ে রক্ষিত। খানিকটা দার্জ্জিলিঙের মতন বোধ হচ্ছিল। বাড়ীগুলি বেশ বড় বড় ও পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন দোকান গুলি বেশ সুন্দর, রাস্তাগুলিও খুব পরিষ্কার ও সুন্দররূপে বাঁধান। এখানে আঙ্গুর খুব সস্তা—ছপেন্সে (৫ বা ৬ আনা) এক ঝুড় আঙ্গুর কিনেছিলাম—খুব টাট্‌কা, কলকাতায় এমন আঙ্গুর সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না।

২০শে আগষ্ট সকালে প্লাইমাউথ বন্দরে পৌঁছিলাম। এখানে এসে ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রথম দেখা হল। ঝক্‌ঝকে রদ্দুরে প্লাইমাউথের চারিপাশে বাগানের মতন সাজান সুন্দর সুন্দর শস্যক্ষেত্র ও ফলের গাছের ঝোপ দেখলাম—বাস্তবিক চক্ষু একেবারে জুড়িয়ে গেল। কাল দুপুরবেলা লণ্ডনে পেঁ ছিব।

নারীই মানবকুলের মহত্ত্বের নিদান।

উন্নতমনা নারীগণই জগতের কুশল সম্পাদন করেন। মনুষ্য শরীর এবং চরিত্র নারীরাই গঠন দান করেন। অতএব জগতে নারীজাতিই মানব জাতির উন্নতির মূলাধার। এই জন্যই যে দেশে যত নারীর চরিত্র উন্নত সেই দেশ তত গৌরবান্বিত। ইউরোপ প্রভৃতি দেশের এত উন্নতি নারী মাহাত্ম্যে। ভারতের এই যে ধর্ম্মপালনতা ইহাও নারীপ্রসাদাৎ। সত্য বটে জগতের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মাত্রেই পুরুষ। কিন্তু সেই পুরুষ চরিত্র নারী দ্বারাই গঠিত এবং সেই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদের ধর্ম্ম নারীগণ দ্বারাই পরিপুষ্ট এবং পরিবর্দ্ধিত। আজকাল আমাদের দেশে দেখা যায় যে নারীরা যেমন নিষ্ঠা সহ দেব ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন তদ্রূপ পুরুষের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপের মূলে নারীজাতি প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মাদি কখনও যদি পরিপুষ্ট পরিবর্দ্ধিত হয় তাহা নারীগণ দ্বারাই হইবে। নববিধান সমাজের কোন কোন নারী সময়ে সময়ে ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া স্বাধীন ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। এবং এখনও করিতেছেন। এইরূপ ভগবান প্ররোচনায় প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা এসব অনুষ্ঠানে পর্দ্দার আবরণ উন্মোচন করেন। কিন্তু এতদপেক্ষা তাঁহাদের আরও দৃঢ় নিষ্ঠ এবং গভীরতর নীতি ধর্ম্ম এবং চরিত্রে বল দেখাইতে হইবে। এ পর্য্যন্ত আমাদের কোন রমণীকে সৎসাহসিকতার জন্য জীবন অর্পণ করিতে হয় নাই। ইউরোপে এরূপ জীবন দান বিরল নহে। আমরা নিম্নস্থ লেডি এলিসিয়া লাইলের জীবন উৎসর্গ বৃত্তান্ত প্রদান করিয়া দেখাইতেছি নারীর কত ধর্ম্মবল এবং সাহস।

সম্ভ্রান্ত মহিলা এলিসিয়া লাইলের প্রাণদানেতে এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হইল যে মৃত্যুও শ্রেয় তথাপি শরণাগত দুঃস্থ লোককে ধরাইয়া দেওয়া উচিত নহে, (যখন সেই ব্যক্তি নিজের গুপ্তরহস্য ব্যক্ত করিয়া আত্ম সমর্পণ করিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হয়।)

এলিসিয়ার স্বামী জন লাইল ইংলণ্ডেশ্বর ১ম চার্লসের সময়ে পার্লিয়েমেণ্টে মহাসভায় মেম্বর ছিলেন। ইংলণ্ডের

ইতিহাস পাঠ করিলেই জানা যায় ইংলণ্ডের সম্রাট ১ম চার্লসকে প্রজাগণ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সম্রাটের বিচার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে জন্ লাইলও একজন ছিলেন। কিন্তু তদীয় পত্নী এলিসিয়া অত্যন্ত রাজভক্তি পরায়ণা ছিলেন। তাঁহার একান্ত আগ্রহে জন্ লাইল ১ম চার্লসের মৃত্যু দণ্ডের অনুজ্ঞা মধ্যে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করেন নাই (যদিও তিনি অন্যান্য বিচারকদের সঙ্গে মিলিত হইয়া বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।) ইংলণ্ডে কিছুকাল সাধারণতন্ত্র রাজ্য চলিয়াছিল। কিন্তু অচিরেই রাজ্যতন্ত্র প্রণালী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। দ্বিতীয় জেম্স্ যখন রাজা ছিলেন তখন একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্রোহীরা পলায়ন করিয়া নানা আত্মীয়ের গৃহে শরণাপন্ন হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এলিসিয়া বিদ্রোহ দমন পর্য্যন্ত লণ্ডনেই অবস্থান করিয়া স্বীয় প্রতিভা বলে রাজার যাহাতে জয় হয়, বিদ্রোহ অচিরে দমন হয় তাহার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। বিদ্রোহ শান্তি হইলে তিনি কোন দূরবর্ত্তী পল্লিবাসিনী হইলেন। অল্প দিন মধ্যে তাহার কোন বন্ধু পত্র দ্বারায় আশ্রয় প্রার্থী হইলেন। এলিসিয়া মনে করিলেন ধর্ম্মমত বিরোধীরা ইহাকে ধরিয়া বিপন্ন করিবে তজ্জন্য কৌশলে রাজার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সেই বন্ধু পূর্ব্বোক্ত বিদ্রোহ সংসৃষ্ট ছিলেন যে তাহা তিনি জানিতেন না এবং সেই জন্যই যে ধৃত হইবার ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন তাহাও বুঝিতে পারেন নাই। তিনি যেমন চিরকাল বিপন্নকে আশ্রয় দান করিয়াছেন তদ্রূপ তাঁহাকেও আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন কিন্তু তাঁহার বন্ধু আরও দুইটী অপরিচিত বন্ধুকে সঙ্গে নিয়া আসিলেন। তিনি তিন জনকেই আশ্রয় দিলেন। অবিলম্বে রাজানুচরেরা সৈন্যবল সহ আশ্রিতদিগকে ধরিয়া নিতে উপস্থিত হইল। এলিসিয়া আশ্রিতদিগকে শত্রুহস্তে দিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু রাজানুচরেরা সৈন্যসহ গৃহে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বন্ধুকে এবং আরও একজনকে ধরিয়া ফেলিল। তৃতীয় ব্যক্তি যে তখনও ছিল তাহার জন্য সৈন্যরা পীড়াপিড়ি করিতে লাগিল। এলিসিয়া কিছুতেই তাহাকে ধরাইয়া দিলেন না। কিন্তু গৃহ তন্ন তন্ন রূপে অন্বেষণ করার পর তৃতীয় ব্যক্তিও ধৃত হইল। তখন সৈন্যেরা রাজদ্রোহিকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে এলিসিয়াকেও বন্দী করিল। এলিসিয়া তাহাদের রাজদ্রোহিতার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারেন নাই। যে নারী রাজদ্রোহ দমনে এত ব্যস্ত ছিলেন তিনি রাজদ্রোহের প্রশ্রয় দিবেন তাহা কখনও সম্ভব ছিল না। কিন্তু সেই সময় জেফ্রিজ নামে বিবেক শূন্য লোক প্রধান বিচারপতি ছিলেন। জুরীরা নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলে পাছে তাহাদিগকে রাজদ্রোহীর অভিযোগে ফেলিয়া বিপন্ন করে এই ভয়ে শেষ এলিসিয়াকে দোষী বলিলেন। বিচারক তাঁহাকে অগ্নিতে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া হত্যা করার দণ্ড প্রদান

করেন। এই নিদারুণ দণ্ড রহিত করার জন্য অনেকানেক সম্ভ্রান্ত লোক বিচারকের নিকট এলিসিয়ার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ দিয়া তাঁহার মুক্তি লাভে উদ্যোগী ছিলেন। এমন কি স্বয়ং সম্রাটের নিকট আবেদন হইল কিন্তু কোন ফল দর্শিল না। শেষ এলিসিয়া সম্রাটের নিকট এই প্রার্থনা জানাইলেন যে তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ না করিয়া ঘাতক হস্তে হনন করা হয়। সম্রাট এই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। এলিসিয়া তজ্জন্য সম্রাটকে ধন্যবাদ দিলেন এবং অবশেষ স্বীয় রাজভক্তি এবং নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিয়া এক সুদীর্ঘ লিপি রাখিয়া গেলেন। এবং উক্ত কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য বিচারক এবং অন্যান্য যাহারা অন্যায় করিয়া তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়া অকালে প্রাণদণ্ড করাইল তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন এবং তাহাদের হিতের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। খ্রীষ্টের এই ক্ষমার ধর্ম্ম তাঁহার অনুগামী প্রকৃত ভক্ত মাত্রই লাভ করিয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত খ্রীষ্ট জগতে ভূরি ভূরি আছে। আমাদের মহিলারাও যদি এইরূপ অনিষ্টকারীকে ক্ষমা এবং তাহার জন্য প্রার্থনা করিয়া সর্ব্বভূতে মৈত্রী এবং জীবনের ঘটনাতে সৎসাহস প্রদর্শন করিতে পারেন তবে ধন্য হইবেন। এবং দেশকে জাগরিত করিতে পারিবেন।

মহিলাদিগের রচনা।

অকালে। *

কোন্ গ্রহবৈগুণ্যে এ জীবন বল্লরী
না ধরিতে ফুল ফল শুকাইল? (মরি!)

* * * *

আক্ষেপ! আমার হৃদয়-কলিকা
বিকশিত হইতে না পাইল,
জীবন কুঞ্জের পূর্ণ যৌবনে
বসন্ত না এসে গ্রীষ্ম আইল!
জীবন গগনে পূর্ণিমা তিথিতে
পূর্ণেন্দু না এসে অমা আইল!
জীবন-সরসে কমল কলিকা
আশায় অরুণ পানে চাহিল,—
নলিনীর পূর্ণ বিকাশ-দিবসে
মধ্যাহ্ন না এসে সন্ধ্যা আইল!

সকলি অস্থায়ী। †

মিশিয়াছে ধূলিসনে নবযুবা কত,—
হইয়াছে সমাহিত বীরশ্রেষ্ঠ কত।

* * *

ধরণী কাননে ফুল ফোটে কত শত,—
আকাশে মেঘের বর্ণ (দেখি) নানামত।

* "কিস্ গরদিশে আফ্‌লাকসে
ফুলে না ফলে হাম্"—এই গজলের ভাবাবলম্বনে রচিত। কোন কোন পদ্যের অবিকল অনুবাদ হইয়া পড়িয়াছে।

† "মিলে থাক্ মেঁ লও জওয়াঁ কায়সে কায়সে" এই গজলের অংশ বিশেষের অনুবাদ।

মোসলমান কন্যা, আর্. এস্ হোসেন

নাই সেকেন্দর কিংবা দারার কবর,—
মুছে গেছে মানীদের স্মৃতিচিহ্ন কত!

* * *

মৃত্যুযন্ত্র কত জনে করেছে পেষণ,—
হয়েছে ভূগর্ভে লীন যশস্বীরা কত।

———

নবমীতে বিসর্জ্জন।

১

ওরে নিদারুণ কি করিলে হায়
কি দোষেতে সাধি বাদ
হৃদেতে হানিলে বাজ
তীক্ষ্ণ অসি বসাইলে সবার মাথায়
হলনা একটু দয়া পাষাণ হিয়ায়।

২

বিনাশ করিলে কার সোণার সংসার
ছিঁড়িলে ছিঁড়িলে কার
পবিত্র প্রণয় হার
কাহার হৃদয় আহা করিলে আঁধার
হায় বোন্ অভাগিনী
হারায়ে নয়নমণি
শূন্যময় ধরা আজ হের চারি ধার।

৩

কাহার স্নেহের ধন করিলে হরণ
অভাগিনী জননীর
হৃদয় করিয়ে চির
জ্বালিয়ে তাঁহার প্রাণে অনন্ত অনল
নিঠুর পাষাণ সম
এক মাত্র পুত্রধন
কেড়ে নিয়ে গেলে হায় জন্মের মতন।

৪

হায় সর্ব্বনাশ তুই করিলি এমন
ওরে কাল দুরাচার
বুঝিয়াছি এইবার
এযে সেই আমাদের আপনার বলে
পাষাণে বাঁধিয়ে হিয়ে
দয়ামায়া বিসর্জ্জিয়ে
শরতে দুঃখিনী দেশ সাজালি এখন।

৫

কি বলিব হায় হায়
এ দৃশ্য কি দেখা যায়
দুঃখিনী সেজেছ বোন শরৎ আমায়
দেখে বোন তোর দশা
প্রাণে হারায়েছি দিশা
শিশুসহ পড়িয়াছ অকূল পাথার
এ জীবনে তব দুঃখ ঘুচিবেনা আর।

৬

কোন সুখ তব আর নাহি এ ধরায়
সিঁথির সিন্দুর তব
ঘুচেছে জনম মত
কে আর তুষিবে তোরে স্নেহ মমতায়
সুখ সাধ শান্তি যত
চির জীবনের মত
তব কাছে একেবারে নিয়েছে বিদায়
কেবল সম্বল তোর
হয়েছে নয়ন লোর
ইহা ভিন্ন তব কিছু নাহি এ ধরায়।

৭

হয়েছে জগৎ তব মরু সাহারা
এ জগতে কিছু আর
নাহি তব আপনার
তব তরে নাহি যায় রবিশশী তারা
বসন্ত মলয় বায়

লাগিবেনা তব গায়
বিষাক্ত বাতাসে দগ্ধ হইবে এ ধরা।
৮
চিরকাল দুঃখানলে যাপিবে জীবন
না হতে দশমী নিশি
তোমার জীবন শশী
নবমীতে একেবারে দিলে বিসর্জ্জন
না হতে সায়াহ্ণ বেলা
তব জীবনের খেলা
প্রভাতে হইল সাঙ্গ জনম মতন
তোমার সুখের দীপ
অকস্মাৎ অস্তমিত
কালের বাতাসে হায় হইল এমন।
৯
কি করিবে সব তব করমের ফল
অদৃষ্টের ভোগ যাহা
কে খণ্ডাতে পারে তাহা
কাহারও সাধ্য নাহি সকলি বিফল
দুঃখতাপ সহ্য করি
পবিত্রতা হৃদে ধরি
এক মনে স্মর বিভুর চরণকমল।
১০
তোমার দুঃখের ভার
ঘুচাতে শকতি আর
নাহি এ ধরায় কেহ দয়াময় বিনে
যে করেছে এই দশা
যিনি বিনে আর আশা
নাহি তব কিছু হায় এ শূন্য ভুবনে
তাঁর পদে মন প্রাণ
করিলে গো সমর্পণ
বহু শান্তি পাবে তুমি এ দগ্ধ পরাণ
তাই বলি বোন আর
ফেলনা নয়নাসার
এক মনে ডাক সেই ব্রহ্ম সনাতন
তিনি করিবেন রক্ষা তোমায় এক্ষণ।

সংবাদ।

নববিধান প্রচারক শ্রীযুক্ত ভাই দুর্গানাথ রায় সপরিবারে মজফ্‌ফর পুরে বাস করিতেছিলেন। কয়েক বৎসর হইতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। বিগত অর্দ্ধোদয়ের যোগ স্নানের সময়ে হঠাৎ এক দিন রাত্রি ৮ টার সময় তিনি গৃহের বাহির হইয়া চলিয়া যান। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া দুর্গানাথ রায় তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হন, দীর্ঘ রাত্রি পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আইসেন। একটী নারী রেলের রাস্তার পার্শ্ব দিয়া দ্রুতগতি চলিয়া গিয়াছিলেন, কোন কোন রেলওয়ে কর্ম্মচারী দেখিতে পাইয়াছিলেন। দুর্গানাথ রায় এই মাত্র সংবাদ পাইয়াছিলেন। ৬।৭ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। তিনি কোন নদীতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, বা হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক অরণ্যে নিহত হইয়াছেন, সকলে এইরূপ নানা প্রকার কল্পনা করিতেছিলেন। দুর্গানাথ রায় তাঁহার কোন অনুসন্ধান না পাইয়া তাঁহার জীবনে নিরাশ হইয়া একান্ত শোকগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ৬ দিন বা ৭ দিন পরে তিনি ঢাকা নগর হইতে এই মর্ম্মে টেলিগ্রাফ প্রাপ্ত হন যে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ঢাকা নগরে নিজালয়ে পঁহুছিয়াছেন। কেমন করিয়া সেই রোগগ্রস্তা মহিলা দূরদেশ মজফ্‌ফার পুর হইতে ঢাকা নগরে চলিয়া গেলেন, তাঁহার সঙ্গে ট্রেণভাড়ার একটি পয়সাও ছিল না, ইহা ভাবিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। পরে সবিশেষ জানিতে পাওয়া গেল, তিনি গঙ্গাস্নানের যাত্রিকের দলের সঙ্গে হাবড়াতে আসিয়াছিলেন, কেহ ট্রেণভাড়ার সাহায্য করিয়াছিল, বা বিনা ভাড়াতে আসিতে পারিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে স্বদেশী ভলণ্টিয়ারগণ তাঁহার অবস্থা দর্শনে দয়া করিয়া চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক এক খানা ঢাকার

টিকিট খরিদ করিয়া দেন, এবং চাবি আনা সঙ্গে দিয়া ঢাকার গঙ্গাস্নানের যাত্রিকদের সঙ্গে ঢাকায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শোকার্ত্ত দুর্গানাথ বাবু টেলিগ্রাফ পাইয়াই ঢাকায় চলিয়া গিয়াছেন, তথায় সহধর্ম্মিণীকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সকল দুঃখ ক্লেশের নিবৃত্তি হইয়াছে। ভগবান্ আশ্চর্য্যরূপে মহিলার জীবন রক্ষা করিয়াছেন।

বিগত অর্দ্ধোদয়ের গঙ্গাস্নানের সময় স্বদেশী ভলণ্টিয়ারগণ বিদেশ হইতে আগত স্ত্রীলোকদিগের আশ্চর্য্যরূপে সেবা করিয়াছেন, ভিড়ের মধ্যে প্রাণপণ যত্নে তাহাদিগকে শ্রদ্ধা ও সম্মানসহকারে রক্ষা করিয়াছেন, যাহার টাকার অভাব হইয়াছিল টাকা দিয়া টিকিট করিয়া তাহাকে সযত্নে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছেন। স্নানার্থি নারীদিগকে কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। একটি আসন্ন প্রসবা মহিলা স্নান করিবার জন্য কোনরূপে গঙ্গার ঘাটে গিয়াছিলেন, এরূপ অবস্থা যে তাঁহার জলে নামিবার শক্তি ছিল না। দুই এক জন ভলণ্টিয়ার যুবা তাঁহাকে দেখিয়া বলেন, মা তুমি কি ভয়ানক অসমসাহসের কাজ করিয়াছ? স্ত্রীলোকটি বলিলেন, বাবা, কি করিব, এমন দিন কি আর পাইব? তখন ভলণ্টিয়ারগণ গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া আনিয়া তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া স্নান করান্ এবং তাঁহাকে সযত্নে বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। বাস্তবিক সেই সময় ভলণ্টিয়ারগণ পবিত্র মাতৃসেবা করিয়াছেন, নারীজাতি মাতৃ জাতি। তাঁহারা এই সেবা কার্য্যের জন্য সকলের শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, এবং মহাপুণ্য লাভ করিয়াছেন।

বিগত মাঘোৎসবের সময়ে মেছুয়াবাজার রোডস্থ ৬৪। ২ নং ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বিস্তৃত পটমণ্ডপের মধ্যে বালকবালিকাদিগের সাপ্তাহিক নীতিবিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। রায়বাহাদুর ডাক্তার চুনীলাল বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজ রাজকুমারদ্বয়সহ উপস্থিত ছিলেন, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারের বালক বালিকাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া প্রায় ২৫০ দুই শত পঞ্চাশ জন মহিলা সেই উৎসবক্ষেত্রে আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ ৬।৭ শত ভদ্র স্ত্রী পুরুষ উপস্থিত ছিলেন, উভয় বিদ্যালয়ের সম্পাদক বিস্তৃত কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। এক জন হরবোলা নানা প্রকার বুলি বলিয়া সকলের হাস্যোদ্দীপন করিয়াছিল। এক ভদ্র যুবা আশ্চর্য্যরূপে ভেল্কীবাজী করিয়াছিলেন। পরে বাইয়সকোপ হয়, বাইয়াসকোপ অতিশয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সভাপতি বালক বালিকাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন, বালিকারা সঙ্গীত ও আবৃত্তি করিয়াছিল, বালকেরাও আবৃত্তি ও অভিনয় করিয়াছিল। ময়ূরভঞ্জের মহারাজ ও সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় বিশেষ বিশেষ বালকের অভিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া পারিতোষিক দান করিবেন এরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কার্য্য বিবরণ পাঠে জানা গেল, নীতিবিদ্যালয়ের দিন দিন উন্নতি হইয়াছে। কয়েকজন কৃতবিদ্য যুবা এবং কয়েকটী মহিলা উভয় বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন। বিদ্যালয়ের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্র নাথ সেন। প্রকৃতি নামক এক সচিত্র মাসিক পত্রিকা এই নীতিবিদ্যালয় সংক্রান্ত। পত্রিকা খানি সকলের আদরের হইয়াছে। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য হইয়াছিল। সভার কার্য্য অতিশয় শিক্ষাপ্রদ ও আনন্দজনক হইয়াছে।

আমাদের খাদ্য *

আগেরবারে আমি আপনাদিগকে বলেছি আমরা কি জন্য খাই, খাওয়ার দরকার কি। দেহের চারিদিকে দিনরাত আগুণ জ্বলে, সেই জন্য প্রতিক্ষণ আমাদের দেহ পুড়ে পুড়ে ক্ষয় হয়। সেই ক্ষতিপুরণের জন্য খাদ্যের দরকার। বাতি পুড়ে জল এবং কারবন গ্যাস হয়। আমাদের দেহে অঙ্গার অম্লজান এবং উদজান তিনটী প্রধানতঃ ক্ষয় হয়। তা ছাড়া যবক্ষারজানও ক্ষয় হয়। আমরা কাজের সময় পুড়ি বিশ্রামের সময়ও পুড়ি। দেহের উপাদান কি? কতকগুলি যৌগিক এবং কতকগুলি নানারকম জিনিষে আমাদের দেহ নির্ম্মিত। দেহরক্ষা করতে হলে এই চারিটী জিনিষ যোগাইতে হইবে। সুতরাং আমরা যাহা খাই তাহার ভিতরে এই চারিটী জিনিষ থাকা চাই। শ্বেতসার বা চিনি জাতীয় জিনিষ, অণ্ডলাল জাতীয় জিনিষ, চর্ব্বি বা তেল। তা ছাড়া লবণ জাতীয় জিনিস, শ্বেতসারের ভিতর অঙ্গার, অম্ল এবং উদযান এই তিনটী থাকে। যবক্ষারযান অণ্ডলালের ভিতর পাওয়া যায়। অতএব দেহকে অণ্ডলাল জাতীয় জিনিস দেওয়া দরকার। অণ্ডলাল ব্যতীত কোন জানোয়ার বাঁচতে পারে না। তা বলে ডিম না খেলে যে চলবে না তা মনে করবেন না। আমরা যা খাই তাহাতে এই ৪টী জিনিস থাকে। কোনটাতে বা অণ্ডলাল বেশী কোনটাতে বা শ্বেতসার বা চিনি জাতীয় জিনিস বেশী। চালের ভিতর শ্বেতসার বেশী, ডিম এবং মাংসের ভিতর অণ্ডলাল বেশী। কোনটাতে কোন্ জিনিস কি পরিমাণ আছে জানা দরকার। শরীরের ক্ষতিপূরণের জন্য কোন জিনিস কত দরকার তাহাও জানা প্রয়োজন কিরূপে পরিপাক হয়? শ্বেতসার বা চিনি জাতীয় জিনিস মুখে গেলেই লালারস সংযোগে খানিকটা হজম হয়, তৎপরে পাকাশয়ে যায়।

এরারুট করিতে হয় কি করে আপনারা সকলেই জানেন। প্রথমে জল ফুটিয়ে তারপর এরারুট গুলে দিতে হয়, খানিকক্ষণ জ্বাল হলে ঘন হয়ে যায়। খানিকটা খুব ঘন শক্ত এরারুট মুখে দিলে খানিক পরে দেখা যায় তরল হয়ে গেছে। মুখের ভিতর কোন খাদ্য গেলেই চারিদিক হইতে লালারস আসে। এক ডেলা মিছরি মুখে দিলে গলে যায়। শ্বেতসার হজম হয়ে চিনিতে পরিণত হয়। লালাতে খামির বলে একটা জিনিস আছে। ইংরাজীতে Ferment বলে। সরু কাচ পাত্রে শক্ত এরারুট একটু লালা মিশিয়ে উনানের কাছে (কিন্তু উনানের খুব কাছে নয়) রাখলে ১৫।২০ মিনিট পরে তরল হয়ে যায়। শ্বেতসার জাতীয় জিনিস মুখের ভিতর মিনিট দশ রাখলেই সম্পূর্ণ হজম হয়ে যায়; কিন্তু এরূপ করতে গেলে আমাদের খাওয়াই হয় না। মুখে যতটা সম্ভব হজম হয়ে পরে পাকাশয়ে যায়। লালারসের ক্ষমতা শ্বেতসারের উপর। অণ্ডলাল মুখে একটুও হজম হয় না। পাকাশয়ে যাইবা মাত্র পাকাশয়ের চারিদিক্ হইতে একরূপ খামির আসে। যখন আমরা খাই সেই রবারের মত থলিটা নড়ে।

দাঁতে চিবান মাছ মাংসের ছোট ছোট টুকরা পাকস্থলীতে গিয়ে খামিরের সঙ্গে মিশে আস্তে আস্তে তরল হয়ে সুরুয়ার মত হয়ে যায়। আপনাদের শুনলে ঘৃণা হ'তে পারে কিন্তু আমরা কখন কখন শূয়রের পাকস্থলীর খামির যোগাড় করে পরীক্ষা করে দেখিছি। খামির (Pepsin) ডাক্তারখানায় এবং বাজারেও পাওয়া যায়। Pepsin আর অম্ল মিলে ঐ সুরুয়াকে হজম করে দেয়। অল্প Pepsinএর অত্যন্ত ক্ষমতা। যদি কাচপাত্রে মাংস ছোট ছোট করে কেটে রেখে একটু জল এবং চার চামচে অম্ল এবং একটু Pepsin দিয়ে রাখলে ২০ ঘণ্টার মধ্যেই হজম হয়ে যায়। অনেক সময় মাংস

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধ মহালানবিশের বক্তৃতামূলক।

সুস্বাদু করবার জন্য একটু দই মাখিয়ে রাখা হয় তাহাতে শীঘ্র সিদ্ধ হয় এবং খেতেও সুস্বাদু হয়। ডিম সিদ্ধ হলে খুব শক্ত হয়, জলে দিলে আর গলে না। অল্প পরিমাণে অম্ল এবং Pepsin দিলে একটু পরেই গলে যায়। এইরূপ যখন আমাদের খাদ্য হজম হয়ে তরল হয়ে যায় তখন সহজেই চারিদিকের ধমনী ও শিরার মধ্য দিয়া শরীরের চারিদিকে প্রবাহিত হয়। আমাদের দেশে যেমন প্রধান খাদ্য ভাত আয়র্লণ্ডে তেমনি আলু। শ্বেতসার পাকাশয়ে হজম হয় না, তাহার নীচে আর একটা ছোট থলি আছে। সেই থলিতে এর এক রকম খামির আছে তাহার সাহায্যে শ্বেতসার হজম হ'য়ে চিনিতে পরিণত হয়।

চর্ব্বি হজম হয় কি করে? যাঁরা মাংস খান তাঁরা চর্ব্বি খান। তরল অবস্থার চর্ব্বিকে আমরা তেল ব'লি। সচরাচর গাছ পালা হইতেই প্রায় তেল বাহির হয়, দুধের ভিতর চর্ব্বি আছে। চর্ব্বি কোথায় পরিপাক হয়? পাকস্থলী হইতে সরু একটা থলিতে গিয়া পরিপাক হয়। শিশিতে একটু তেল একটু জল দিলে দুটো কিছুতেই মেশে না, দুজনে এত ঝগড়া যে কিছুতেই মিশতে চায় না। কিন্তু এমন উপায় আছে যাহাতে মেশান যেতে পারে। জলে অল্প ক্ষার দিয়ে একটু তেল দিয়ে নাড়িলেই সাদা দুধের মত রং হয়ে যায়। তেল অসংখ্য টুকরো হয়ে জলে ভাসতে থাকে। দুধেও ঐরূপ ভাসে, আপনাদের আগে দেখিয়েছি। উহা এত ছোট যে দেখা যায় না। সেইরূপ চর্ব্বি যখন ঐ থলিতে যায় একটু ক্ষারের সাহায্যে হজম হয়। ছোট ছোট তৈলাণুকে Emulsion বলে। Codliver oil খেতে বড় খারাপ লাগে সেই জন্য তাহাতে একটু ক্ষার মিশিয়ে Codliver Emulsion হয়।

রক্তস্রোতের সঙ্গে স্বভাবতঃই তেলের কণিকা আছে। আর একটা আশ্চর্য্যের বিষয় যে আমাদের পেটের ভিতর সাবান প্রস্তুত হয়। দেশী সাবান কি করে প্রস্তুত হয় জানেন, সাজিমাটী এবং কোন রকম তেল দিয়ে। সাজিমাটী একরূপ ক্ষার। সোডা এবং সাজিমাটীতে নিকট সম্বন্ধ। সোডা পরিষ্কার ক্ষার, সাজিমাটী অপরিষ্কার ক্ষার। তেল এবং ক্ষার উত্তাপ সংযোগে সাবান হয়। এই শ্বেতসার, অণ্ডলাল এবং চর্ব্বি দেহকে দিতেই হবে; লবণও দিলে ভাল। কোন জাতীয় জিনিষ দেহকে কি পরিমাণ দিতে হবে? শ্বেতসার ৭৫ তোলা, অণ্ডলাল ১১তোলা, চর্ব্বি ৫ তোলা, লবণ ২॥ তোলা দিতে হবে। একজন মানুষ উপবাসের পর ওজন করলে জানা যায় কত কমেছে। যাহা ক্ষয় পায় তা আমরা যাহা খাই তার ভিতরে থাকা চাই। যদি কেহ পুঁইশাক খেয়ে থাকতে চায়, এত বেশী পুঁইশাক তাকে খেতে হয় যে পেটে আর ধরে না। সব জিনিষ বুঝে শুনে খাওয়া উচিত। সাধারণতঃ আমরা যা খাই তার কোন টাতে কোন জিনিষ কি পরিমাণ আছে তাহার একটা তালিকা দিচ্ছি। পরীক্ষার সময় সব জিনিষ সমান ওজনের করে নিতে হবে।

১০০ তোলা	অণ্ডলাল	শ্বেতসার বা চিনি	চর্ব্বি বা ঘী বা তেল	লবণ
ডিম	৬২	½	½	½
মাংস	২৫	০	৪	১½
দুধ	৪	৪	৪	½
চাল	৭॥	৭৭	১	১
ময়দা	১২½	৬৭½	১॥	২
মুগুরি	২৪	৫০	১৷৷	২
ছোলা	২৩	৫০	১॥	৩
আলু	২	২০॥	¼	১

দেশ কাল ভেদে ও খাদ্য দ্রব্যেরও ভেদ হওয়া চাই।

মাসিক পত্রিকা

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৩শ ভাগ] ফাল্গুন ১৩১৪ ; মার্চ্চ ১৯০৮। [৮ম সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

অনেক মহিলা সহজে ক্রুদ্ধ হন। তাঁহারা ক্রোধ দমন করিতে পারেন না, রেগে ছেলে মেয়েকে ঠেঙ্গান, বা পাড়ার লোকের সঙ্গে ঝগড়া করেন, কিম্বা স্বামীকে শাসাইয়া থাকেন। তাঁহাদের রাগ দেখে পরিবারস্থ সকলে তটস্থ হয়। নারীর পক্ষে ইহা অতিশয় দুঃখজনক ব্যাপার ও অস্বাভাবিক। নারী কোমলতা ও মাধুর্য্যগুণে সকলের হৃদয়কে মুগ্ধ করিবেন। তিনি নিজের চরিত্রের সৌন্দর্য্যে সমস্ত লোকের মনে আনন্দ বর্ষণ করিবেন ইহাই স্বাভাবিক। আমরা তদ্বিপরীত দর্শন করিলে বড়ই ব্যথিত হই। তাঁহাদের ক্রোধ ও উচ্ছৃঙ্খলতার দৃষ্টান্তে তাঁহাদের বালক বালিকাদিগের অতিশয় অনিষ্ট হয়। তাহারা সেই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করে।

ক্রোধ লোভাদির বশীভূত হইলে নারীর দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। যিনি লোভাদি রিপুকে সংযত ও ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারেন, তিনি আদ্যা শক্তি মহাদেবীর প্রকৃত কন্যা। যিনি ক্রোধাদি রিপুর বশীভূত, আত্মসংযম করিতে অক্ষম তাঁহার আর শক্তি কোথায়? তাঁহাকেই বাস্তবিক অবলা বলা যায়! যিনি পুণ্যবলে প্রেম-বলে রিপু সকলকে পরাজয় করিয়াছেন তিনি অবলা নামে বাচ্য হইতে পারেন না। তাঁহার প্রভাব দেখিয়া সমরবিজয়ী বীরপুরুষগণও মস্তক অবনত করে। শাক্ত সম্প্রদায়ের আরাধ্যা দেবী নারী। তাঁহাকে শক্তি বলে। আখ্যায়িকায় বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি পাপাসুর সংহার করিয়া জগতে পুণ্য শান্তি বিস্তার করেন।

মাতৃগণ, কন্যাগণ, তোমরা পুণ্যশান্তি লাভ করিয়া পাপ দমন ও শান্তি কল্যাণ বিস্তার কর। তোমাদের প্রেম পুণ্যের সুদৃষ্টান্তে তোমাদের পুত্র কন্যাগণ ও পরিবারস্থ সকলে যেন পাপবিজয়ী ও চরিত্রবান্ হয়।

পত্নীপ্রেম ও আদর্শ পত্নী।

জগতে প্রকৃত পত্নীপ্রেম সুদুর্লভ। "যদি তুমি আমাকে ভালবাস তবে আমি তোমাকে ভাল বাসিব, তুমি আমাকে ভাল বাসিয়া, আদর সোহাগ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিলে আমি তোমার অনুগত থাকিব, তোমার সোহাগ ও আদর না পাইলে আমি তোমাকে ভাল বাসিব না।" পতির প্রতি পত্নীর যে এরূপ ভালবাসা তাহা নিকৃষ্ট পার্থিব ও স্বার্থমূলক অস্থায়ী ভালবাসা। বাণিজ্যব্যবসায়ীর ন্যায় ইহা এক প্রকার প্রেমের বাণিজ্য, পরস্পর বিনিময়। তুমি দাও, তবে আমি দিব। এইরূপ পরস্পর আদান প্রদান ও বিনিময়ের অভাব যে স্থানে, সেই স্থানে এই বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যায়, এই প্রেম থাকে না। এই ভালবাসা আন্তরিক নহে, বাহ্যিক। পতি যখন উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কার যোগাইয়া পত্নীর বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিতে পারেন না তখনই তিনি পত্নীর বিরাগভাজন হন। তখন হইতে পত্নীর বিবাদ কলহের সূত্রপাত হয়। প্রেমের পরিবর্ত্তে পতি তাঁহার অপ্রেম লাভ করেন।

এক প্রকার সাম্য প্রেমের পত্নী আছেন, তিনি নিজে পতির তুল্য সুখ ইচ্ছা করিয়া থাকেন। তিনি বলেন, "তুমি সুখে থাক, আমাকেও সুখে রাখিতে হইবে। আমি যাহাতে সুখে থাকি তোমার এইরূপ ব্যবস্থা না করিলে চলিবে না। তাহা না হইলে আমি তোমার প্রতি অপ্রসন্ন থাকিব। তুমি সুখে থাকিবে, আমি দুঃখে কষ্টে থাকিব ইহা হইতে পারিবে না।"

এক প্রকার প্রেম নিতান্ত শারীরিক। পত্নী কেবল পতির শরীর লইয়াই দিবা রাত্রি ব্যস্ত। পতির শরীরের প্রতিই তাঁহার একান্ত দৃষ্টি, শরীরের সঙ্গে তাঁহার প্রেমের যোগ, পতির শরীরের সেবাতেই তাঁহার পূর্ণ অনুরাগ; মন প্রাণ শরীরেতে বদ্ধ, আত্মাতে নয়। সেই আত্মার সঙ্গে যে তাঁহার অনন্ত কালের সম্বন্ধ ইহা তিনি বুঝেন না। পতি যে শরীর নহে, শরীরস্থ আত্মা, এই জ্ঞান তাঁহার নাই। তিনি বাহ্যিক রূপে মুগ্ধ, গুণেতে আকৃষ্ট নহেন। নশ্বর শরীর বিলুপ্ত হইলে তাঁহার প্রেমও বিলুপ্ত হয়। ইহা অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর নিতান্ত বাহ্যিক নিকৃষ্ট প্রেম।

যে প্রেম পার্থিব সুখ বস্ত্রালঙ্কার ও দেহেতে বদ্ধ নহে পতির আত্মাতে বদ্ধ উহা পতির প্রতি পত্নীর প্রকৃত প্রেম। তিনি বলেন, আমার দুঃখ হয় হউক, তুমি সুখে থাক। তোমার সুখ দেখিলেই আমি কৃতার্থ হই। আমি সুখ চাহি না, তোমার সুখেই আমার সুখ। তোমার যেন কোন দুঃখ ক্লেশ না হয়। আমি ভাল খাওয়া পরার সুখে সুখী হইতে চাহি না, নিজের সহস্র অভাবের মধ্যে তোমার মুখ প্রসন্ন দেখিলেই আমার সকল দুঃখ দূর হয়। যে নারী শুদ্ধাচারা, যাঁহার পতির প্রতি প্রাণের যোগ, তিনিই পুণ্যবতী সতী পতিব্রতা।

সতী নারীর সম্বন্ধে শাস্ত্রে ঈদৃশী উক্তি সকল আছে।

"পতিব্রতা পতিগতিঃ পতিপ্রিয়হিতে রতা, যস্যস্যাত্তাদৃশী ভার্য্যা ধন্যঃস পুরুষো ভুবি।" শান্তি পর্ব্ব।

যে নারী পতিব্রতা পতিই যাঁহার গতি, এবং যিনি পতির প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা রত, যাঁহার এতাদৃশী ভার্য্যা আছে, পৃথিবীতে সেই ব্যক্তিই ধন্য।

"নাস্তি ভার্য্যা সমো বন্ধুর্নাস্তি ভার্য্যা সমা গতিঃ; নাস্তি ভার্য্যাসমোলোকে সহায়ো ধর্ম্মসংগ্রহে।" শান্তি পর্ব্ব।

ভার্য্যার সমান আর বন্ধু নাই, ভার্য্যার সমান আর গতি নাই, ইহলোকে ধর্ম্ম-সাধনে ভার্য্যার সমান আর সহায় নাই।

"এতদ্ধি পরমং নার্য্যা কার্য্যংলোকে সনাতনম্। প্রাণানপি পরিত্যজ্য যদ্ভর্ত্তৃর্হিত মাচরেৎ।" শান্তিপর্ব্ব।

প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও স্বামীর হিত সাধন করিবে। ইহলোকে নারীগণের ইহাই শ্রেষ্ঠ সনাতন ধর্ম্ম।

"যা সাধ্বী নিয়তাচারা সা ভবেদ্ধর্ম্ম চারিণী। শ্রুত্বা দম্পতী ধর্ম্মং বৈ সহধর্ম্মং কৃতং শুভম্।" অনুশাসন পর্ব্ব।

যে সাধ্বী স্ত্রী সদাচারা হইয়া দম্পতী ধর্ম্ম শ্রবণপূর্ব্বক উত্তম রূপে তদ্ধর্ম্ম সাধন করিয়াছেন, তিনিই ধর্ম্মচারিণী হন।

"শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ দেবতুল্যাং প্রকুর্ব্বতী, বশ্যভাবেন সুমনাঃ সুব্রতা সুখ দর্শনা।" অনুশাসন।

সদাচারা প্রিয়দর্শনা নারী সন্তুষ্ট চিত্তে দেবতুল্য স্বামীর বশ্যভাবে সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকেন।

"পরুষাণ্যপি চোক্তা যা দৃষ্টা ক্রুদ্ধেন চক্ষুষা; সুপ্রসন্নমুখী ভর্ত্তুর্যা নারী সা পতিব্রতা।" অনুশাসন।

কঠোর কথা বলিলে, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিলেও যিনি ভর্ত্তার প্রতি প্রসন্নমুখী তিনিই পতিব্রতা।

"দরিদ্রং ব্যাধিতং দীনমধ্বনা পরিকর্ষিতম্। পতিংপুত্রমিবোপাস্তে সা নারী ধর্ম্মচারিণী।" অনুশাসন।

দরিদ্র রোগী, দীন ও পথশ্রান্ত স্বামীকে পুত্রের ন্যায় যিনি সেবা করেন, তিনিই ধর্ম্মাচরণ করেন।

"শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ করোত্যাব মনাঃসদা, সুপ্রীতাচ বিনীতাচ সা নারী ধর্ম্মভাগিনী।"

যে নারী প্রীতমনে বিনীত ভাবে সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্তে পতির সেবা শুশ্রূষায় তৎপর সেই নারীই ধর্ম্মভাগিনী হন।

"বিভর্ত্যান্নপ্রদানেন কুটুম্বঞ্চৈব নিত্যদা ন কামেষু ন ভোগেষু নৈশ্বর্য্যে ন সুখে তথা। স্পৃহা যস্যা যথা পত্যৌ সা নারী ধর্ম্মভাগিনী।" অনুশাসন।

যে নারী নিত্য অন্নদান করিয়া কুটুম্বদিগকে প্রতিপালন করেন, পতিতে যেমন স্পৃহা এমন ভোগ ঐশ্বর্য্য সুখ ও কামনার বিষয়ে যাঁহার স্পৃহা নাই, সেই নারী ধর্ম্মভাগিনী।

"ব্রতং চরতি যা নিত্যং দুশ্চরং লঘু সত্বরা, পতিচিত্তা পতিহিতা সা পতি ব্রতভাগিনী।" অনুশাসন।

যে অনলস নারী পতির প্রতি অনুরক্তা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া ব্রত দুশ্চর

হইলেও অবহেলায় তাহা নিত্য আচরণ করেন তিনিই পতির ব্রত ভাগিনী হন।

"পুণ্য মেতত্তপশ্চৈব স্বর্গশ্চৈব সনাতন: যা নারী ভর্ত্তৃপরমা ভবেৎ ভর্ত্তৃপরা সতী।" অনুশাসন।

যে সতী স্ত্রী স্বামীর প্রতি ভক্তি করেন, এবং স্বামীর ব্রতই যাঁহার একমাত্র ব্রত তাঁহার সেই ভক্তি ও ব্রতই তাঁহার পক্ষে তপস্যা, পুণ্য ও নিত্য স্বর্গ।

যে নারী স্বামীর আত্মার কল্যাণের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাঁহার ঈশ্বরে অবিশ্বাস ও ধর্ম্মে অনাস্থা এবং পাপাচারে মতি দেখিলে ম্রিয়মাণা হন, স্বামীর ক্ষণভঙ্গুর শরীর অপেক্ষা অমর আত্মাকে সমধিক আদর করেন, ভগবানের চরণতলে তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া জীবনের কার্য্য সম্পাদন করেন, পতির সঙ্গে মিলিত হইয়া সর্ব্বদা ভগবৎপ্রসঙ্গ ভগবদুপাসনায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন, পতির ধর্ম্মপথের চির সহায় হইয়া প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হন, তিনি আদর্শপত্নী সতী।

আখ্যায়িকায় বর্ণিত হইয়াছে যে, একটী পুণ্যবতী যুবতী বিবাহিতা হইয়া দেখেন, পতির ধর্ম্মকর্ম্মে মতিগতি নাই, সে দিনান্তে ভগবানের নামপর্য্যন্ত উচ্চারণ করে না, এই অবস্থা দেখিয়া তিনি দুঃখে ম্রিয়মাণা হন, গাত্র হইতে অলঙ্কার সকল উন্মোচন করিয়া মলিন বসনে বিষণ্ণ বদনে দিন যাপন করিতে থাকেন, কোন উৎসবে, আমোদ প্রমোদে যোগ দান করেন না, কাহারও সঙ্গে হাসিয়া কথা কহেন না। পরিবারস্থ সমুদায় লোক নববধূকে এইরূপ ভাবাপন্ন দেখিয়া দুঃখিত হন। "তুমি কেন এরূপ বিষণ্ণ থাক? তোমার কি দুঃখ? তুমি ঐশ্বর্য্য সম্পদের মধ্যে থাকিয়াও দুঃখিনী কাঙ্গালিনীর ন্যায়, বিধবার ন্যায় দিনযাপন কর। ভাল খাওয়া পরায় তোমার কিছু মাত্র রুচি নাই, কাহারও সঙ্গে হাসিয়া কথা কও না, এই অবস্থা তোমার কেন হইল? বল, তোমার কি দুঃখ?" শ্বশুর শাশুড়ী দেবর ও ননদেরা দুঃখের সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। বধূ কাহারও কথায় কোন উত্তর দান করেন না, তিনি বিষণ্ণ বদনে চুপ করিয়া থাকেন। পরে তাঁহার স্বামী এক দিন প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিবার সময় হঠাৎ হরি হরি বলিয়া উঠে। স্বামীর মুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া তাহার জীবনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে ভাবিয়া সতী আনন্দে বিহ্বল হন, অলঙ্কারাদি পরিধান করেন, প্রতিবেশী আত্মীয় কুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন, স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সকলকে ভোজন করান, সহাস্য বদনে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কথা কহেন। হঠাৎ তাঁহার এই রূপ ভাবের পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হন, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আজ তুমি এরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতেছ, আনন্দোৎসবে মত্ত হইয়াছ, কেন?" তিনি বলিলেন, "আজ আমার শুভদিন, বিশেষ আনন্দের দিন; আজ প্রাতে আমার স্বামী হরিনাম করিয়াছেন।" এইরূপ পত্নীই স্বামীর প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী সতী লক্ষ্মী আদর্শ পত্নী। অনেক সংসারাসক্তা পত্নী দ্বারা স্বামীর

ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সাধুভাব সকল বিলুপ্ত হয়, তিনি তাঁহাকে পাপহ্রদে, বিলাসসাগরে নিমগ্ন করেন। পতিপ্রাণা সীতাদেবী আদর্শপত্নী ছিলেন। তিনি অযোধ্যাধিপতি স্বামী শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক বিনা অপরাধে অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় অরণ্যে বিসর্জ্জিত হইয়া এবং নানা প্রকার অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া ও এক মুহূর্ত্তের জন্য স্বামীর প্রতি তাঁহার হৃদয়ের ভক্তি টলে নাই। রাজরানী ছিলেন, পরে অরণ্যবাসিনী দুঃখিনী কাঙ্গালিনী হইয়াও স্বামী রামচন্দ্রের সর্ব্বদা গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। অনেক পাঠিকাই সীতার বনবাস পুস্তকে তাহা পড়িয়া থাকিবেন। সীতাদেবী সতীত্ব সহিষ্ণুতা ও পতিভক্তির যে স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত জীবনে প্রদর্শন করিয়াছেন জগতে তাঁহার তুলনা নাই। সেই পরমা সতীর নামস্মরণেও লোকে মহাপুণ্য মনে করিয়া থাকে। তিনি আদর্শ পত্নীর উচ্চাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধ্বী সাবিত্রীর সতীত্বের প্রভাবে স্বামী সত্যবান্ করাল কৃতান্তের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাকে তোমরা উপন্যাস বলিয়া উপেক্ষা করিও না। ইহার মধ্যে গম্ভীর আধ্যাত্মিক ভাব আছে, গ্রহণ করিও। একটী আদর্শ পত্নী দ্বারা বংশ পবিত্র, দেশ পবিত্র হয়; নারীজাতির মুখোজ্জ্বল হইয়া থাকে। আদর্শ পত্নী শারীরিক পাশবভাবে পতির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন না, তিনি পতিতে পরমপতি পরমেশ্বরের আবির্ভাব দর্শন করিয়া অনন্তকালের পবিত্র আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপন করেন।

খদিজা দেবী।

স্বামীসেবা ও ধর্ম্মদীক্ষা।

(১৮১ পৃষ্ঠার পর।)

মহাপুরুষ মোহম্মদ ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মক্কানগরের অদূরস্থ হেরা পর্ব্বতের নিভৃত গহ্বরে যাইয়া বসিয়া ধ্যান মনন করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি তিন বৎসরকাল প্রায় প্রতিদিন গৃহত্যাগ করিয়া মনের ব্যাকুলতায় সেই নির্জ্জন স্থানে ভাবে মগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিতেন, লোক সংসর্গ ভাল বাসিতেন না। ক্রমে সেই নির্জ্জন প্রদেশে ঐশ্বরিক জ্যোতি ও একত্ববাদের গূঢ় তত্ত্ব তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত ও প্রতিফলিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রশান্ত চিত্তে অনুপ্রাণনের লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশিত হইল। সময়ে সময়ে দেবদূত জেব্রিল (পবিত্রাত্মা) তাঁহাকে দর্শন দান করেন। একদা জেব্রিল আবির্ভূত হইয়া বলিয়াছিলেন, "মোহম্মদ, তুমি ঈশ্বরের প্রেরিত, আমি জেব্রিল।" ইহা শুনিয়া তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী খদিজাদেবী তাঁহার অনুসন্ধানে ভৃত্য পাঠাইয়া দেন। প্রেরিত লোক তাঁহাকে খদিজার নিকটে লইয়া যায়। তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, চৈতন্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তিনি খদিজার নিকটে আস্তে ব্যস্তে যাইয়া মহাত্রাসে "জম্মলোনি জম্মলোনি" অর্থাৎ আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত কর, আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত কর, এরূপ পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। খদিজা তাঁহাকে কম্বল দ্বারা

আচ্ছাদন করিলে তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থির হইলেন, তাঁহার মন হইতে ভয় ভাবনা দূর হইল। তিনি আপন ধর্ম্মপত্নীর উরুদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহাকে সবিশেষ জানাইলেন। খদিজা বলিলেন, "ভয় নাই, পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল করিবেন না। আমার প্রাণ যাঁহার কৃপাহস্তে স্থাপিত, সেই ঈশ্বরের নামে বলিতেছি যে, আমি আশা করিতেছি, তুমি দুঃখীর দুঃখহারী, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দীনহীনের হিতৈষী বন্ধুহীনের অবলম্বন সত্যপ্রিয় পেগাম্বর (স্বর্গের সংবাদবাহক) হইবে।" দেবশ্বসিত হইবার কালে হজরতের শরীর মনে যেন বৈদ্যুতিক ক্রিয়া হইত, সময়ে সময়ে তিনি একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, শরীরে এরূপ উত্তাপের সঞ্চার হইত যে,শীতের সময়েও গাত্র হইতে ঘর্ম্ম বিন্দু সকল নির্গত হইয়া পড়িত।

খদিজা হজরতকে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিলেন, "নাথ, যদি তুমি সম্মত হও, তবে আমি এ বিষয় আমার ভ্রাতা পরম জ্ঞানী খ্রীষ্টবাদী অরকাকে জ্ঞাপন করিতে পারি, দেখা যাউক তিনি কি বলেন ?" অরকা যেমন ধর্ম্মানুরাগী তেমনি ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বাইবল পুস্তক আরব্য ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। সেই সময় অন্ধ ও বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। খদিজা হজরতের অনুমতি গ্রহণ করিয়া অরকার নিকটে উপস্থিত হন। তাঁহাকে জেব্রিলের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন। অরকা বলেন, "জেব্রিল অতি পবিত্র, এক্ষণ এই পৌত্তলিকতার ভূমিতে তাঁহার প্রয়োজন কি ? এদেশে তাঁহাকে কে স্মরণ করে ? জেব্রিল পরমেশ্বরের দূত।" খদিজা বলিলেন, "আমার স্বামী মোহম্মদ বলেন যে, "জেব্রিল তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছেন।" খদিজা যেরূপ শুনিয়াছিলেন, সবিশেষ অরকাকে জ্ঞাপন করিলেন। তখন অরকা বলিলেন, "সত্যই যদি জেব্রিল অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে পরমেশ্বর এ দেশের মহাকল্যাণ ও উন্নতি বিধান করিবেন। ভগিনি, তুমি যাহা বলিলে তাহা যথার্থ হইলে নিশ্চয়ই মহাপুরুষ মুসা ও ঈসার প্রতি যে প্রত্যাদেশ অবতরণ করিয়াছিল মোহম্মদের প্রতিও তাহা ঘটিয়াছে।" ইহা শুনিয়া খদিজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বর্ত্তমান সময়ে পেগাম্বরের অভ্যুত্থান হইবে, এরূপ তত্ত্ব কি তুমি রাখ ?" অরকা বলিলেন, "হাঁ, শাস্ত্রে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী আছে। মোহম্মদকে সেই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের লক্ষণযুক্ত দেখিতেছি। নিশ্চয় তিনি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকরূপে অভ্যুত্থিত।" খদিজা ইহা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হন, তথা হইতে হজরতের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে সবিশেষ নিবেদন করিয়া বলেন, "প্রিয়তম, ভয় করিও না, যাঁহার দর্শন হইয়া থাকে, তিনি অপদেবতা নহেন, দেবতা ; ঈশ্বরের আজ্ঞাবাহক শুভ দূত জেব্রিল।" তৎপর এক দিন খদিজাদেবী অরকার নিকটে হজরতকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হন। তখন মহানুভব অরকা বলিলেন, "মোহম্মদ, আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি যে, তুমি ঈশ্বরের প্রেরিত, যে পবিত্রাত্মা ঈসার

প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এক্ষণ তিনি তোমার প্রতি অবতীর্ণ। সম্মুখে তোমার অনেক পরীক্ষা আছে, তুমি আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও উৎপীড়িত হইবে। এমন কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক অভ্যুথান করেন নাই যে, স্বদেশীয় লোক তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়ায় নাই, তুমিও বহু শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইবে, পরে যুদ্ধ করিয়া ঈশ্বর-প্রসাদে অরাতিকুলের উপর জয়লাভ করিবে।" অরকা দিব্যচক্ষে দর্শন করিয়া হজরতসম্বন্ধে সম্ভাব্য এরূপ আরও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী বলেন ও হজরতকে উৎসাহ ও সান্ত্বনা দেন, এবং প্রেমভরে তাঁহার মস্তক চুম্বন করেন।

অনন্তর হজরত সময়ে সময়ে হেরা পর্ব্বতের গুহায় যাইয়া পূর্ব্ববৎ নির্জ্জনে অবস্থিতি করেন। এক দিন খদিজাকে বলিলেন, "প্রিয়তমে, যখনই আমি নির্জ্জন স্থানে যাই, তখন 'মোহম্মদ, মোহম্মদ' শব্দ যেন শুনিতে পাই, কাহাকেও দেখিতে পাই না, আমার মহাত্রাস উপস্থিত হয়। আমি দৌড়িয়া পলায়ন করি।" এই কথা শুনিয়া খদিজা তাঁহাকে পুনর্ব্বার অরকার নিকটে লইয়া যান। হজরত, অরকাকে সবিশেষ জ্ঞাপন করেন। বৃদ্ধ অরকা বলেন, "পুনরায় যখন তুমি এইরূপ শব্দ শুনিতে পাইবে, তখন স্বস্থানে স্থির-ভাবে দণ্ডায়মান থাকিও, কি কি শব্দ হয় শ্রবণ করিও।" ইহা শুনিয়া হজরত চলিয়া যান। পরে যখন আহ্বানধ্বনি শুনিতে পাইলেন, স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া কহিলেন, "লবয়ক" অর্থাৎ আপনার নিকটে উপস্থিত আছি। আহ্বানকারী বলিলেন, "আশহদো আন্‌লাএলাহ্ এল্লেল্লাহ ও আন্নকা রসুলাল্লাহ্ *। তৎপর কহিলেন, বল, "বেসমল্লাহ্ অর্‌-রহমান আররহিম। অল্‌হমদ লেল্লাহ্ রব্বেল্‌আলমিন" † ইত্যাদি কোরাণের ফাতেহ সূরার (অধ্যায়ের) শেষ পর্য্যন্ত। অতঃপর সূরার পর সূরা আয়তের পর আয়ত ক্রমশঃ অবতীর্ণ হয়। হজরতের একচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রবিয়ল্-আওলমাসে স্বপ্নাবস্থায় তৎপ্রতি প্রত্যাদেশ আরম্ভ হইয়াছিল উক্ত বৎসর রম্‌জান মাসে সচেতন অবস্থায় প্রথম প্রত্যাদেশের অভ্যুদয় ও কোরাণের অবতরণ হয়। তত্ত্বজ্ঞ লোকেরা বলেন যে, উক্ত রম্‌জান মাসের সপ্তবিংশ রজনীতে প্রত্যাদেশের প্রকাশ হয়, তজ্জন্য সেই রজনীকে "লয়লতোল্-কদর" (সম্মানের রাত্রি) বলে। কথিত আছে যে, সেই রাত্রিতে স্বর্গ হইতে পৃথিবীর আকাশে কোরাণের আয়ত (বচন) সকল অবতীর্ণ হয়, পরে ক্রমশঃ হজরতের অন্তরে তাহা প্রকাশ পায়। হজরত মোহম্মদ লেখা পড়া জানিতেন না, তিনি "নবি ওম্মি" অর্থাৎ অশিক্ষিত স্বর্গীয় সংবাদদাতা বলিয়া পরিচিত। প্রত্যাদেশ পাইয়া তিনি মুখে ব্যক্ত করিতেন, অন্য লোকে লিখিয়া রাখিতেন, তৎসমুদায়ের সমষ্টিই

* আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি যে, ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই এবং তুমি ঈশ্বরের প্রেরিত।

† দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। বিশ্বপালক পরমেশ্বরেরই প্রশংসা।

কোরাণ গ্রন্থ। কেহ কেহ বলেন, সুরা মোদ্দসসরই প্রথম অবতীর্ণ হয়। কিন্তু খদিজা দেবী বলিয়াছেন যে, সুরা ফাতেহ সর্ব্বপ্রথমে অবতারিত হইয়াছিল হজরত তেতাল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রীতিমত প্রকাশ্যে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন। ইতি-পূর্ব্বে পণ্ডিতবর মহানুভব অরকা লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন।

যখন হজরত এরূপ প্রত্যাদেশ পাইলেন যে, "তোমার প্রতি যাহা অবতারিত হইয়াছে তাহা প্রচার কর।" তখন তিনি প্রচারে বদ্ধপরিকর হইলেন, এবং লোকদিগকে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের দিকে উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে গুপ্তভাবে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রথমে যিনি তাঁহার আহ্বানকে সম্মান করিয়া গৌরবান্বিত হইলেন, ভ্রান্তির আবরণ জ্ঞানাস্ত্রে ছিন্ন করিলেন, বিশ্বাসপরিচ্ছদে অঙ্গ আচ্ছাদন ঈশ্বরতত্ত্বের স্বর্গীয় কিরীট শিরে ধারণ করিলেন, তিনি সাধ্বী খদিজা দেবী যখন উজ্জ্বল নিদর্শনে স্থিরীকৃত ও স্পষ্ট প্রমাণে প্রমাণিত হইল যে, হজরত মোহম্মদ যথার্থই পেগাম্বর, তখন আর্য্যা খদিজাই বিলম্ব না করিয়া এস্লাম ধর্ম্ম * গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, তিনি সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মপথে পদ স্থাপন করিলেন। হজরত তাঁহাকে হেরাগিরির পার্শ্বস্থ প্রস্রবণের নিকটে যেখানে পবিত্রাত্মার অভ্যুদয় হইয়াছিল লইয়া গেলেন, এবং পবিত্রাত্মা দ্বারা যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন তদনুসারে খাদিজা খাতুনকে * ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন, তিনি নমাজ নিয়াজে অর্থাৎ উপাসনা প্রার্থনায় সমুন্নত হইলেন। ঐহিক পারত্রিক সমুদায় কার্য্যে, সুখ সম্পদ, দুঃখ বিপদে, খদিজাদেবী হজরতের চিরসঙ্গিনী ছিলেন। হজরত বাহিরে শত্রুগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ও নির্য্যাতিত হইয়া গৃহে আগমন করিলে খদিজাই প্রীতিমধুর সান্ত্বনাবাক্যে ও নানাপ্রকার যত্ন শুশ্রূষায় তাঁহার মনের ক্ষোভ দূর করিতেন।

খদিজাদেবীর মৃত্যু।

হজরতের পিতৃব্য আবুতালেবের মৃত্যুর পরে খদিজা খাতুন মানবলীলা সংবরণ করেন। তাহাতে হজরতের শোকযন্ত্রণার দ্বিগুণ হইল; যেহেতু খদিজা তাঁহার সুখ দুঃখভাগিনী ধর্ম্মানুগামিনী প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী ছিলেন। কয়েক দিন পর্য্যন্ত হজরত শোকদুঃখে অভিভূত হইয়া গৃহ হইতে প্রায় বাহির হন নাই। তিনি সেই বৎসরের নাম "আমোলহজন" অর্থাৎ শোকের বৎসর রাখিয়াছিলেন। উহা তাঁহার প্রেরিতত্ব লাভের দশম বৎসর। মুমূর্ষুকালে খদিজা স্বীয় প্রিয়তমা কনিষ্ঠা কন্যা ফাতেমাকে হজরতের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহদৃষ্টি রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, এবং হজরত

* এস্লাম শব্দের অর্থ ঈশ্বরপূজার অধীন হওয়া। হজরতমোহম্মদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম এস্লাম ধর্ম্ম নামে অভিহিত। যাঁহারা এই ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহাদিগকে মোসলমান বলে।

* গৃহকর্ত্রী বা সম্ভ্রান্ত মহিলাকে খাতন বলে।

যে উষ্ণীষ মস্তকে ধারণ করিয়া প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাদ্বারা তাঁহার শব আচ্ছাদন করা হয় এরূপ বাসনা জানাইয়াছিলেন। মৃত্যুযন্ত্রণায় খদিজা আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিলে হজরত অশ্রুপাতসংকারে প্রার্থনা করেন, এবং তাঁহাকে বলেন, "প্রিয়তমে, স্বর্গ তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষী, তুমি নারীকুলশ্রেষ্ঠ, পূর্ব্বতন সাধ্বী কন্যাগণ অপেক্ষাও তোমার গৌরব অধিক; আমি তোমাকে পরলোকগতা স্বীয় মাতার হস্তে অর্পণ করিতেছি, স্বর্গলোকে আদিপিতা এব্রাহিমের সহধর্ম্মিণী সারা তোমার ভগিনী হইবেন। খদিজা, তুমি সহর্ষে সুরলোকবাসিনী স্বীয় শ্বশ্রূকুলের সঙ্গে যাইয়া মিলিত হও।" এই কথা শুনিয়া সেই মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও খদিজার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠে। তিনি হজরতকে ধন্যবাদ দেন।

খদিজার গর্ভে কাসেম, তয়িব ও তাহের, হজরতের এই তিন পুত্র এবং জয়নব, রোকইয়া, ফাতেমা ও ওম্মকলসুম এই চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাসেম সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র, এজন্য হজরত আবুওল্‌কাসেম" অর্থাৎ কাসেমের পিতা বলিয়া পরিচিত। কেহ কেহ বলেন, আব্দোল্লানামক তাঁহার আর এক পুত্র ছিলেন। সমুদায় পুত্র সন্তানই শৈশবকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তিন কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা ও বিবাহিতা হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের গর্ভে সন্তানাদি হইয়াছিল। হজরতের এই সন্তানবর্গের মধ্যে ফাতেমা সর্ব্বকনিষ্ঠা ছিলেন। কাসেম, জয়নব, রোকইয়া, ফাতেমা, ওম্মকলসুম তাঁহার প্রেরিতত্ব লাভের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

খদিজাই সর্ব্বাগ্রে এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার বিশেষ গৌরব ছিল। খদিজা বিদ্যমানে হজরত মোহম্মদ আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। খদিজা স্বীয় ধন সম্পত্তি সমুদায় হজরতের সন্তোষসাধনার্থ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। হজরত তাহা সদুদ্দেশ্যে ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। একদা তিনি বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন, এমন সময় খদিজা তাঁহাকে বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তিনি বলিলেন; "দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, লোকসকল অন্নপ্রার্থী, যদি দীন দুঃখী ভিক্ষুকদিগকে দান বিতরণ করি, তবে তোমার ধনের বিশেষ ক্ষতি হয়, সাহায্যদানে নিবৃত্ত থাকাও পাপ বোধ করিতেছি।" ইহা শ্রবণ করিয়া খদিজা কতিপয় কোরেশকে ডাকিয়া আনিলেন, তাঁহাদের সাক্ষাতে অগণ্য স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া বলিলেন, "কোরেশগণ, আপনারা সাক্ষী থাকুন, এই ধনপুঞ্জের স্বত্বাধিকারী আমার স্বামী মোহম্মদ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় ইহা দান করুন, যে বিষয়ে ইচ্ছা ব্যয় করিতে থাকুন।" হজরতের দ্বিতীয় পত্নী আয়শা এক দিন বলিয়াছিলেন, "নাথ, যাহার দন্ত ছিল না, এমন একটী বৃদ্ধা কোরেশনারীকে তুমি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া শোক প্রকাশ কর, এ কেমন? এক্ষণ পরমেশ্বর তোমাকে তাহার উত্তম বিনিময় প্রদান করিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া হজরত ক্ষুব্ধ হন, এবং

বলেন, "আয়শা, সেই বরাঙ্গনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ভার্য্যা আমি প্রাপ্ত হই নাই। যখন সমুদায় লোক ধর্ম্মদ্রোহী ও আমার ভয়ানক শত্রু ছিল, তখন তিনি সর্ব্বপ্রথমে আমাকে প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, এবং ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সকল লোক আমাকে অসত্যবাদী বলিয়াছে ও ঘৃণা করিয়াছে, তিনি হৃদয়ের সহানুভূতি-দানে আমাকে আদর করিয়াছেন।" আয়শা এই কথা শুনিয়া লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, "আমি সঙ্কল্প করিলাম যে, অতঃপর কখনও ব্যঙ্গ ও অবজ্ঞা করিয়া খদিজাদেবীর প্রসঙ্গ করিব না।"

জুহননামক মক্কার সমাধিক্ষেত্রে হজরত স্বয়ং খদিজার শব সমাহিত করিয়াছিলেন। হজরতের প্রেরিতত্বলাভের দশম বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তখন তাঁহার পঁয়ষট্টী বৎসর বয়ঃক্রম ছিল। পঁচিশ বৎসর তিনি হজরতের সহবাসে ছিলেন।

মা ও মেয়ে—নারীজাতির লক্ষ্য।

একদিন একটি মেয়ে বড় দুঃখ করিয়া তাহার মাকে বলিল, "মা, আমার যেন আর বোন্ না হয়। খোকা হওয়াই ভাল।" "কেন, বোনের উপর এত হিংসা কেন?" "হিংসা নহে, মা, আমার মনে হইতেছে স্ত্রীলোকের জীবন বড় দুঃখের জীবন। সংসারে তাহাদের দ্বারা কোন বড় কিম্বা ভাল কাজ হয় না। তাহারা গৃহের অন্তরালে থাকিয়া কেবল খাটিতে খাটিতে দেহপাত করিয়া যায়। দেখ না কেন, মা, এই তুমিত প্রাতঃকাল হইতে উঠিয়া সারাদিন কেবল পরিশ্রম করিয়া দেহশীর্ণ করিতেছ। তোমার কোন ভাল খাবার ইচ্ছা দেখি না, ভাল পোষাকের আড়ম্বর দেখি না। কেবল আমাদের জন্য দিনরাত খাটুনি।"

কন্যার এরূপ আক্ষেপোক্তি শুনিয়া মা বলিলেন, "তুমি কি মনে কর সংসারে খুব ধুমধাম না করিতে পারিলে কোন কাজ হয় না? পৃথিবীতে যুগে যুগে কত গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ? আকাশে সূর্য্য চন্দ্রের দিকে একবার তাকাও দেখি, তাহারা নিঃশব্দে দিনরাত মনুষ্যের কত সেবা কত কল্যাণ সাধন করিতেছে, কেহ কি তাহা ভাবিয়া দেখে? আমাদের পায়ের নীচে শ্যামল তৃণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ-লতা নীরবে কত উপকার করিতেছে, কত শোভা বিস্তার করিতেছে, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ? ক্ষুদ্র এক একটি ধান্যবীজ মাটীর ভিতরে পড়িয়া থাকে, কয়েক দিন পরে পচিয়া যায়। কিন্তু তাহার ভিতর হইতে কেমন আস্তে আস্তে একটি ছোট অঙ্কুর বাহির হয়, এবং মাটী ঠেলিয়া উপরে উঠে। এইরূপ শত শত অঙ্কুরোদ্গত হইয়া এক একটি ক্ষেত্র পূর্ণ করিয়া ফেলে, এবং প্রচুর শস্য উৎপাদন করিয়া আমাদের আহার বিধান ও শরীর পোষণ করে। এই সকল ভাল কাজ ঢাক ঢোল বাজাইয়া হয় না, বিনাড়ম্বরে, নিঃশব্দে সম্পন্ন হয়। ভগবান্ যেমন প্রকৃতিরাজ্যে এইরূপে এই সকল কাজ

করিতেছেন, আমাদের ক্ষুদ্র জীবন দ্বারাও মনুষ্য-রাজ্যে সেইরূপ কার্য্য করিতেছেন।"

কন্যা। "পৃথিবীতে যাহার বাহুতে বল আছে, মনে শক্তি ও প্রখর বুদ্ধি আছে তাহা দ্বারাই জগতের বিশেষ কল্যাণ হয়, ইহাইত সচরাচর দেখিতে পাই। পুরুষের শরীরের বল, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও উদ্ভাবন শক্তি দ্বারা কত উন্নতি হইতেছে। তাহারা যুদ্ধ করিতে পারে, নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারে, কল কারখানা, ব্যবসায় বাণিজ্য, জাহাজ ও রেল, অট্টালিকা ও সেতু নির্ম্মাণ ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারের কার্য্য উদ্ভাবন ও পরিচালন করিতে সমর্থ। অবশ্য বলিতে হইবে অসাধারণ ধীসম্পন্না কতিপয় রমণীও গ্রন্থ প্রণয়ন, বক্তৃতা ও উপদেশপ্রদানে পুরুষজাতির কার্য্যের কিছু সহায়তা করিতেছে। কিন্তু দশ হাজারের মধ্যে একটী নারী দ্বারাই এইরূপে জগতের কল্যাণ হইতেছে। অপর সাধারণত কেবল সন্তান-প্রসব, সন্তান-পালন, রন্ধন পরিবেশন ও গৃহকর্ম্মেই দিন পাত করিতেছে! তাহাদের জীবনে তেমন বিশেষত্ব কি?"

মা। "সন্তান-পালন, রন্ধন পরিবেশন, গৃহকার্য্য ও গৃহপরিচালন কি এমনই তুচ্ছ মনে কর যে, তাহা যে কেহ করিলেও চলিতে পারে? তুমি হয়ত: মনে করিতেছ যে, মেয়েরা সন্তান প্রসব করিয়াই খালাস। সন্তান বোঁট লাগান বোতল দ্বারা গাভী দুগ্ধ পান করিবে, বাবুর্চ্চি, খানসামারা রন্ধন পরিবেশন ও গৃহের যাবতীয় কার্য্য চালাইবে, মেয়েরা পুরুষের পার্শ্বে বসিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া হাওয়া খাইয়া আসিয়াই সন্তুষ্ট। তাহাতেই বোধ হয় তোমার মনে হইতেছে এইরূপ অসার অকর্ম্মা জীবনের বৃদ্ধি হইয়া কি লাভ? পুরুষেরা যেমন বাহিরের দশকর্ম্ম করিতেছে, গৃহের কর্ম্মও না হয় তাহারা করুক। নারী সংখ্যা জগতে কম হইলেও কিছু আসে যায় না।"

কন্যা। "হাঁ, মা, তুমি বেশ আমার মনের ভাব বুঝিয়াছ। আমি অবশ্য নারীজাতির লয়প্রাপ্তি ইচ্ছা করি না। তাহা অসম্ভব, এবং তাহাতে ঈশ্বরের সৃষ্টিক্রিয়া স্থগিত হইবে। তবে দুঃখী জাতির সংখ্যা কম হওয়াই ভাল, এইমাত্র আমার বলিবার উদ্দেশ্য।"

মা। "তুমি মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছ। পৃথিবীতে কি কেবল বাহুবল ও বুদ্ধিবলের পরিচয়ই পাইয়া থাক? স্নেহবল, প্রেমবল অর্থাৎ হৃদয়কে কি উড়াইয়া দিয়া সৃষ্টি প্রবাহ ও মানব জাতির উন্নতি চলিতে পারে? পূর্ব্বে যে ধান্যবীজের দৃষ্টান্ত দিয়াছি তাহার বিষয় ভাবিয়া দেখ। মাটীর ভিতরে গোপনে লোকচক্ষুর অগোচরে থাকিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, অথচ তাহা হইতে আমাদের সুস্বাদু আহার্য্য উৎপন্ন হইতেছে, আমরা প্রাণে বাঁচিতেছি। বীজটুকু আমাদের কল্যাণের জন্য দেহপাত করিতেছে। ঠিক সেই রূপ গৃহের অভ্যন্তরে আমরা মা হইয়া জগতের সেবা করিতেছি। পৃথিবী তাহার খবর লয় না, সংবাদপত্রে আমাদের সুখ্যাতি হয় না,

এবং সেই সুখ্যাতি আমরা চাহিও না। কিন্তু মানবজাতির মাতা রমণী। নারীদেহ হইতে নরদেহের সৃজন ও পোষণ, নারী হৃদয়ের স্নেহ ও প্রেম হইতে মানবের হৃদয় ও মনের বল। এই তুমি যে বাহুবল ও বুদ্ধিবলের এত সুখ্যাতি করিলে, আমরা কি সেই সকল বলের প্রসূতি নহি? বিধাতা আমাদের হাতে জগতের কত গুরুভার ন্যস্ত রাখিয়াছেন, চিন্তা কর। আমরা মা হইয়া মনুষ্য শিশুকে দেবতা কিম্বা পশু করিতে পারি। আমাদের স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি সংস্থাপিত হইতেছে। মনে করিয়া দেখ সামান্য সূত্রধরের ঘরে মেরী মাতার ক্রোড়ে দেব শিশু যীশু বিকশিত হইয়াছিলেন, মাতা মণিকার অশ্রুজলে সাধু অগষ্টাইনের হৃদয় ও আত্মা বিধৌত ও পূত হইয়াছিল, মাতৃহৃদয়ের বল ভুবনবিজয়ী নেপোলিয়নের বাহুতে সিংহ বল সঞ্চারিত করিয়াছিল। পক্ষান্তরে মাতার পৈশাচিক প্রকৃতি, উদ্ধত স্বভাব ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যাবহারে কত সন্তানকে রসাতলে লইয়া গিয়াছে। কথিত আছে সুকবি বাইরণ ক্রূরপ্রকৃতি মায়ের দুর্ব্যবহারে বাল্যকাল হইতে দুর্বৃত্ত ও উদ্ধত হইয়াছিলেন। মা যেমন এক গুঁয়ে, রুক্ষ, কর্কশ ও বিবাদপ্রিয় সন্তানও তদ্রূপ হইয়াছিলেন, এক একদিন মা ও শিশু হাতাহাতি করিতেন, অবশেষে সন্তান পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে উভয়ের যুদ্ধ থামিয়া যাইত।"

কন্যা। "মা কথাপ্রসঙ্গে অনেকটা গম্ভীর উচ্চ কথা উপস্থিত করিলে। কিন্তু সামান্য কথা সব চাপা পড়িল। আচ্ছা, বল দেখি, মেমেরা যে ফিডিং বোতল, বাবুর্চি খানসামার হাতে সন্তান পালন, ও ঘরকন্নার ভার দিয়ে নিজেরা স্বাধীন ভাবে বেড়ায় খেলায় তাহাতে দোষ কি?"

মা। "তোমরা সকল খবর জান না বলিয়া মনে কর ইয়ুরোপীয় রমণীরা সন্তানপালনে ও গৃহকর্ম্মে উদাসীন। অথবা যাহারা তাহা করে, তাহারা প্রশংসার পাত্র। এই শ্রেণীর নারীদের বড় নিন্দা। তুমি আমাদের ভূতপূর্ব্ব মহারাণী ভিক্টোরিয়া কিম্বা বর্ত্তমান জর্ম্মাণ সম্রাটের মাতার জীবনের কথা যদি পড় তবে জানিতে পারিবে তাঁহারা সন্তানপালনে ও গৃহকর্ম্মে কেমন সুদক্ষা ছিলেন। মেয়েদিগকে রন্ধন, শেলাই ইত্যাদি সামান্য সামান্য কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া কত উচ্চ উচ্চ বিষয় ইহাঁরা যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। সারাদিন পরিশ্রম করিয়া, বিলাস ভোগ পরিহার করিয়া যদি আমরা এক একটী মনুষ্য সন্তানকে সুশিক্ষিত করিতে পারি ও সত্যের বীজ তাহাদের কোমল হৃদয়ে রোপণ করিয়া ধাত্রীবীজের ন্যায় দেহপাত করিয়া যাইতে পারি, আমরা ধন্য হইব, ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ আমাদের মস্তকের উপর বর্ষিত হইবে। যে সকল মেয়ে কেবল বিবিয়ানা করাই জীবনের লক্ষ্য মনে করে পরিশ্রম ও গৃহকার্য্য অপমানজনক মনে করে, তাহারা প্রজাপতির ন্যায় সুন্দর বেশে সজ্জিত হইয়া ফর্ ফর্ করিয়া উড়িয়া উড়িয়া অসার জীবন শেষ করিয়া যাইবে। পৃথিবীতে তাহাদের জীবনের কোন চিহ্নও

থাকিবে না। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য তাহা নহে। সূতিকাগৃহ স্বর্গের সোপান, গৃহ বিদ্যালয়। ভগবান্ আমাদিগকে এই উন্নতস্থানে তাঁহার পবিত্র কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। ঈশ্বরই আমাদিগকে এই কার্য্য সাধনে যথোপযুক্ত উৎসাহ, উদ্যম ও সহিষ্ণুতা বিধান করিবেন।"

নির্ম্মলা ও সরলা।

নির্ম্মলা। কি সরলা যে, অনেক দিন পরে এসেছ, ভাল আছ, বাড়ীর সমস্ত ভাল?

সরলা। হাঁ সকলে ভাল আছে। ভাই তোমার মত তো আর আমি ভাগ্যবতী নই, আমাকে নিজেই সংসারের অনেক কাজ করিতে হয়, তোমার কত লোক জন আছে।

নির্ম্মলা। হাঁ ঈশ্বরের কৃপায় লোক জন আছে বটে তা বলে কি আমি কাজ করি না।

সরলা। তা বটে, আমি যখন আসি তখনই দেখি তুমি কিছু না কিছু কাজ করিতেছ, ঘরকন্নার কাজ লেখা পড়া শিল্প কাজ কত কি কর। তার উপর সভা সমিতিতে যাওয়া, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করা আছে, আবার তোমার কর্ত্তার লেখাপড়ার কাজে কত সাহায্য কর। এত রকম কাজ করেও আমাদের সঙ্গে গল্প করিতে সময় পাও কি করে?

নির্ম্মলা। ব্যবস্থা করিয়া কাজ করিলে সময় নষ্ট হয় না, এবং কাজও ভাল হয় আর আরাম আহ্লাদ করিবার সময় পাওয়া যায়। আমাদের বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া, কাজ কর্ম্ম, পড়া শুনা, খেলা আমোদ, গান বাজনা, সকলেরই নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, তাই আমাদের নিজেদেরও কষ্ট হয় না, এবং লোক জনদেরও কষ্ট হয় না, সকলেই অবকাশ পায়। নিয়ম না থাকিলে কষ্ট হয়, এবং স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। নিয়ম নিষ্ঠা স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান কারণ। সময় নষ্ট করা মহাপাপ, ইহাতে ইহকাল এবং পরকালের অনিষ্ট হয়। জীবনের প্রত্যেক মূহুর্ত্তই মূল্যবান, এ কথা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত।

সরলা। যা বলিলে ঠিক, আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর খাবার নাবার সময় ঠিক নাই, তাঁর খাবার আগে আমি খাই না, সে জন্য বামুণঠাকুরাণী এবং ঝি খেতে পায় না। এতে আমাদের সকলেরই কষ্ট হয়, এবং অসুখ করে। এ সকল কথা যাউক, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে এসেছি। আজ কাল যে দিন পড়েছে তাতে কে কবে পুলিসের হাতে প'ড়ে জেলে যাবে তার ঠিক নাই। দুই এক খানা সংবাদপত্র যা পড়িতে পাই, তাতে দেখি এখন একেবারে অরাজক। গবর্ণমেণ্ট নাকি আর আমাদের জাত কুল ধন মান রক্ষা করিবেন না। কাগজ গুলো প'ড়ে আমার বুক কাঁপে। উনি আপিস থেকে প্রায় রাত্রে আসেন, কবে ওঁকেই বা ধরে নিয়ে যায়! কি হবে বল দেখি? ইংরাজদের নাকি আর রাজ্য থাকিবে না,

বড় বড় বাবু আর জমিদারেরা নাকি এক এক জন রাজা হবেন, তবেইতো সর্ব্ব নাশ! আমরা যে আমাদের দেশের জমিদার বাবুর অত্যাচারে দেশত্যাগী হয়েছি, ইনি যদি রাজাদের মধ্যে এক জন হন তবেইতো ঘোর বিপদ্। ইংরাজদের শাসন মধ্যে থেকে যিনি এত অত্যাচার করেন, তিনি নিজে হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হ'লে কি আর রক্ষা থাকিবে!

নির্ম্মলা। বল কি সরলা, এ গূঢ় তত্ত্ব তুমি কোথা পেলে? তোমার কর্ত্তা গবর্ণমেণ্ট আপিসে কাজ করেন, তিনি আন্দোলনের কোন ধার ধারেন না, তাঁকে ধরে নিয়ে যাবে কেন? যে সকল সংবাদপত্রের লেখক ইংরাজরাজত্ব নষ্ট করিবার জন্য জনসাধারণকে উত্তেজিত করেন তাঁদের রাজপুরুষেরা আদালতে লইয়া গিয়া বিচার করাইয়া দণ্ডিত করিতেছেন, এবং তাঁরা নির্দ্দোষী প্রমাণিত হইলে দণ্ড-মুক্ত হইতেছেন। ইংরাজদের কত ক্ষমতা তাঁদের রাজ্যে কি ব্যবস্থা এবং নিয়মে চলে, তা তুমি যদি জানিতে তা হ'লে তোমার মনে এমন ভয় হইতো না। বাবুরা গোটাকত প্রবন্ধ লিখিয়া রাতারাতী ইংরাজদের তাড়াইয়া এ দেশের রাজা হবেন! এ অপেক্ষা বাতুলতা আর কি হতে পারে?

সরলা। ইংরাজ-রাজ্য কি রূপে শাসিত হয়, আর কেনই বা বাবুরা তাঁদের তাড়াতে পারিবেন না সে কথা গোটাকত আমায় বল দেখি, আমার মনে একটু সাহস হউক।

নির্ম্মলা। দেখ, এখন ছেলে মেয়েদের পড়িবার জন্য যে সকল ইতিহাস হয়েছে, তা পাড়লে ইংরাজ-শাসনপ্রণালীর মোটামুটি জ্ঞান হয়। তুমি এক খানি সেই প্রকার বই পড়িবে। এখন আমি মোটামুটি দুই চারিটী কথা বলি। কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ কেমন করে ও কেনই বা ইংরাজদের হাতে গেলে, এবং কেনই বা আমাদের আচার্য্য দেব কেশবচন্দ্র এ দেশে ইংরাজ-আগমন বিধাতার বিধান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন সে বিষয় একটু বলি।

সরলা। একটু সহজ করিয়া বল। আচ্ছা তুমি তো ইংরাজরাজ্যের বিষয় অনেক জান, তুমি বল দেখি ইংরাজদের উপর তোমার কি ভক্তি বিশ্বাস আছে?

নির্ম্মলা। এ যে একটা নূতন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আচ্ছা, এই কথার উত্তর প্রথম দেই। আমার স্বামী ইতিহাস এবং অর্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক, তিনি এই বিষয়ের পুস্তক রাশী রাশী পাঠ করেন, তিনি রাজনীতিবিষয়ক পুস্তকও খুব অধ্যয়ন করেন। তাঁর মুখে যা শুনেছি, এবং অল্প সল্প যা নিজে পড়েছি তাতে তাঁর এবং আমার স্থির বিশ্বাস যে শত ভুল ভ্রান্তি দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও ইংরাজদের মত রাজা আমাদের কখনও হয় নাই। তাঁদের রাজ্যেই আমাদের মঙ্গল হচ্ছে, আরও হবে। তাঁরা যে চিরদিনই এইরূপ ভুল ভ্রান্তি করিবেন, তাহা নয়। তাঁদের ত্রুটী সংশোধন করিতেই হইবে, নতুবা অন্য কোন ইউরোপীয় রাজা বিধাতার চক্রে তাহাদের হাত

হইতে ভারতবর্ষ কাড়িয়া লইবেন। ইংলণ্ড ছাড়িয়া ভারতের চলিবে না, এবং ভারত ছাড়িয়া ইংলণ্ডেরও চলিবে না। এইটী বিধাতার লেখা এ লেখা কেহই খণ্ডন করিতে পারিবে না। এত গেল সাধারণ কথা, আমার নিজের সম্বন্ধে বলি, আমি ইতিহাস এবং হিন্দু শাস্ত্র অল্প সল্প পড়ে যা বুঝেছি তাই তোমাকে বলি। শ্রীমতী রাজকুমারী দাস M, A, বেথুন কালেজের ভূতপূর্ব্বক Principal, কুমারী চন্দ্রমুখী বসুর ভগ্নী। অবরোধ—আমাদের বর্ত্তমান অবরোধ প্রথার সম্বন্ধে একটি গবেষণা পূর্ণ সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়া গত বৎসরের বিরাট মহিলা সম্মিলনীতে পড়িয়াছিলেন, ভারতমহিলার তৃতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যায় সেটি মুদ্রিত হইয়াছে, সেটি পড়িলে তুমি এবিষয় অনেক জানিতে পারিবে।

সরলা। তবে ভারত মহিলার সেই সংখ্যা খানা আমার পড়িতে দিও। আমি কোন পত্রিকা লইতে পারি না। তোমার দেওয়া বই ও কাগচ টাগচ একটু আদটু পড়ি, তাতেও কত বিঘ্ন বাধা হয়।

নির্ম্মলা। দেখ পূর্ব্বকালে ভারতে এমন দিন ছিল যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বোধ হয় অন্যান্য উচ্চ জাতীয় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রচলন ছিল। নৃত্য গীত বাদ্য শিল্প চিত্র এবং অন্যান্য কলা বিদ্যা এবং লেখা পড়ার বেশ চর্চ্চা ছিল। স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেহ কেহ এত উন্নত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের মেয়েদের বিদ্যা শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল কি না তা জানা যায় না। মহিলাগণের অবস্থা যেরূপ থাকুক না কেন, কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহাদের উপর গভীর অবজ্ঞা ছিল, স্ত্রী সঙ্গ পুরুষের পক্ষে ব্রহ্মলাভের প্রতিকূল এজন্য গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে গিয়া ব্রহ্ম সাধন করা শ্রেয় মনে করিয়া পুরুষেরা ত্যাগী হইতেন। আজ পর্য্যন্ত ত্যাগীর ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ এরূপ ধারণা দেশব্যাপী হইয়া আছে। আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধান বলেন যে, স্ত্রী এবং পুরুষের মিলন ব্যতীত ব্রহ্ম লাভ হয় না। স্ত্রী এবং পুরুষ আত্মার সম্মিলনেই মানব আত্মার পূর্ণতা একটি অপরটি ছাড়িয়া পূর্ণ হইতে পারে না।

সরলা। আচ্ছা আমি তোমার সঙ্গে একটু তর্ক করি। আমাদের তো এতদিন বিবাহ হইয়াছে, কৈ আমরা [illegible] হইতে পারিতেছি না। তাঁর সঙ্গে আমার সঙ্গে অনেক অমিল। তুমি যে বল স্ত্রী স্বামী এক হৃদয় এক প্রাণ হয় তা তো আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

নির্ম্মলা। তোমাদের যে কিছুই মিল হচ্ছে না তা বলিতে পার না, এবং পরস্পরের সহায়তায় পরস্পরের উপকার হচ্ছে না তাও বলিতে পারি না। তবে আশারূপ মিলন হচ্ছে না, তার বিশেষ কারণ আছে। বিবাহের উচ্চ লক্ষ্য স্মরণ রাখিয়া তোমরা চল না, ঘরকন্না করা, সন্তান উৎপাদন এবং পালন করা, এবং তাহারা পরিণামে কিরূপ সৎপথে থেকে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া তোমাদের পারিবারিক জীবনের উদ্দেশ্য। এসম্বন্ধে যে স্ত্রী পুরুষ মিলে

সকল কাজ হয় তাও নয়। তিনি বেশ শিক্ষিত, তুমি অল্প শিক্ষিত; এজন্যও তোমাদের অনেক প্রভেদ। তিনি তোমাকে অর্দ্ধাঙ্গ বলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শিক্ষার ফলের ভাগ দিতে বড় কুণ্ঠিত, তুমি সে জন্য কিছু দাবী দাওয়া কর না, সাংসারিক বিষয়ক দাবী মিটিলেই তুমি সন্তুষ্ট। তুমি তোমার কাজ লইয়া ব্যস্ত, তিনিও তাঁহার কাজ ও চিন্তায় মগ্ন। ক্লান্ত শরীর মন লইয়া রাত্রিতে একত্র নিদ্রিত থাক। একত্র ভাল বিষয় লইয়া আলোচনা, ভাল গল্প করা ইত্যাদির কোন ব্যবস্থা নাই, এরূপ স্থলে পূর্ণ মিল কি প্রত্যাশা করিতে পার?

সরলা। তুমি যা বল্লে সত্য, কিন্তু এর কি কোন উপায় নাই? যদি তাঁতে আমাতে বেশ মিল না হইল তবে বিবাহিত জীবনের পূর্ণ সুখ কি করে হবে?

নির্ম্মলা। তুমি যেমন সংসারের খরচ পত্র এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য তাঁহাকে জোর করে ধর, তেমনি করে এ সকল বিষয়ের জন্য জোর ক'রে ধরিলে অনেকটা ফল হবে। তোমার আগ্রহ দেখিলে তাঁহার উদাসীনতা ক্রমেই চলে যাবে। কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় যা, তা তো তোমাদের হতে পারিবে না। স্ত্রী স্বামী উভয়ে মিলিয়া ঈশ্বরের আরাধনা সাধনা দ্বারাই প্রাণের মিল হয়, এবং প্রাণের মিলনের ফলে হৃদয় ও চিন্তার মিলন হয়, ক্রমে ক্রমে একটি আত্মা অপর আত্মাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যায়। এই রূপ মিলনের কি সুখ, কি শান্তি, কি শক্তি তা আস্বাদন না করিলে অনুভব করা যায় না। ব্রহ্মোপাসনা প্রধান উপায়, তার পর একত্র কথোপকথন একত্র পাঠ ও সদ্ বিষয় চিন্তা একত্র পরার্থ সাধন। এই রূপ করিলে practicle life (ব্যবহারিক জীবন) শুদ্ধ প্রশস্ত এবং সুখী হয়। তৃতীয় উপায় সাধু সন্ধবীর সঙ্গ, ঘরের কোনে ব'সে থাকিলে হবে না, সৎসঙ্গ ও সৎ সম্মিলনী সভা ইত্যাদিতে যোগ দিতে হবে। সময়ে সময়ে যথা সাধ্য ভ্রমণ দেশ দর্শন করিতে হইবে। ছায়ার তলায় যেমন বৃক্ষ ভাল রূপে বর্দ্ধিত হয় না, তীব্র অবরোধ প্রথায় নারী-জীবন উন্নত হয় না। তা বলে বলিতেছি না যে, কি পুরুষ কি নারী স্বেচ্ছাচারী হইয়া যথাতথা বিচরণ ক'রবেন, এ বিষয়ে অনেক বিচক্ষণতার প্রয়োজন। যাহাদের মধ্যে অবরোধ প্রথা নাই, তাহাদের মধ্যেও এরূপ ব্যবস্থা আছে যদ্দ্বারা স্বাধীনতা প্রথার অপব্যবহার অনেকটা নিবারিত হয়।

সরলা। আজ অনেক কথা হইল, কিন্তু আসল কথা ইংরাজেরা কেমন করে এবং কেন এদেশে আসলেন, সে বিষয় হইল না।

নির্ম্মলা। তা পরে বলিব। আমি কেন ইংরাজ রাজাদের প্রতি কৃতজ্ঞ তাহা বলি, তাহাদের ব্যবস্থায় তাঁহাদের স্থাপিত কালেজে পড়িয়া তাঁহাদের দ্বারা শিক্ষিত স্বামী লাভ করিয়া যে কি সুখী হইয়াছি তা কি এক মুখে বলিতে পারি? দেশের মেয়েদের দুর্দ্দশার বিষয় যখন ভাবি তখন আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই

দুর্দ্দশা দূর করিবার এক মাত্র উপায় শিক্ষা বিস্তার। নরনারী যতই শিক্ষিত হইবে ততই দেশের অন্ধকার দুর্দ্দিন ঘুচিবে। যে ইংরাজ রাজ্য এই শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আপামর সাধারণ এবং নর নারীকে বিদ্যা শিক্ষার সমান অধিকার দিয়াছেন, বিদ্যাদানে নবযুগ আনয়ন করিয়াছেন, সে রাজ্যের প্রতি আমার প্রাণ চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে ঋণী থাকিবে। আমি চিরদিন সে রাজ্যের মঙ্গল প্রার্থনা করিব।

প্রাপ্ত।

আর্য্যনারী সমাজের উৎসব বিবরণ।

আজ আবার এক বৎসর পরে আমরা আর্য্যনারীগণ নবদেবালয়ে সম্মিলিত হইলাম। সম্বৎসরে আমরা কত উন্নত হ'য়েছি, কত কু-অভ্যাস, কত দোষ পরিত্যাগ করিতে পেরেছি, ক্ষণকালের জন্য এস—আমরা চিন্তা করি। আত্মোন্নতির জন্য সেই বলদায়িনী জননীর নিকট বল ও প্রসাদ ভিক্ষা করি। তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। যদি গত বৎসরের চেয়ে এ বৎসরে আমাদের চরিত্র আরও বিশুদ্ধ, রিপু দমন আত্মসংযম শিক্ষা না হইল, যদি পরমেশ্বরে ভক্তি বিশ্বাস না বাড়িল তাহা হইলে এই এক বৎসরকাল ধরিয়া প্রার্থনা ও উপাসনা করার ফল কি হইল?

এখন আমরা কোথায় এসেছি এ সুন্দর স্থান—নবদেবালয়ে সকলে সমাগত। এখন আমাদের হৃদয় সুন্দর দেবভাবে পূর্ণ হ'য়েছে; এখন আর মনের বিকার সংসারের মায়া মোহান্ধকার নাই; মন জ্যোতির্ম্ময় দেবীর জ্যোতিতে পুলকিত হ'য়েছে, প্রার্থনা করি—এই ভাব যেন হৃদয়ে চিরস্থায়ী হয়।

ব্রহ্মানন্দের নবদেবালয়ে আজ আমরা কি বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি। সকল শোক তাপ ভবের জ্বালা দূর হয়েছে. হৃদয় স্বর্গীয় শান্তিতে এখন পূর্ণ।

এখানে ভক্ত জননীর আসন এবারে শূন্য। কিন্তু তাঁর চিন্ময়ী আত্মায় আমাদের এ দেবালয়—আমাদের হৃদয় পূর্ণ। ভক্ত কন্থার আদর্শ চরিত্র জীবন সুমধুর ভাবগ্রাহী প্রার্থনা, উপাসনায় প্রতিফলিত। শুষ্ক মরু-হৃদয়ে কত ভাবরসের সঞ্চার করিল কত নিদ্রিত জীবনকে জাগ্রত করিয়া তুলিল। এ নীরস হৃদয়ে সেই মহান্ পরব্রহ্মের সত্ত্বা অনুভব করিলাম।

প্রার্থনা ও উপাসনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

হে পূর্ণ সত্য ভগবান্! তুমি প্রাণ স্বরূপ, নিত্য সত্য জাগ্রত জীবন্ত দেবতা, কার সাধ্য তোমায় ছেড়ে এ ভবে থাকে, দুর্ব্বল নারী আমরা—সংসারে কেবল "আমি" "আমি" ক'রে ঘুরে বেড়াই—সবই আমার আমার বলি। তুমি পদে পদে ব'লে দিচ্ছ—তোমার তুমিত্ব নাশ কর—বন্ধু হ'য়ে বিপদে কত শিক্ষা সান্ত্বনা দিচ্ছ।

আমার এ জীবন অস্থায়ী—তবে কেন

আমিত্বের পূজা করি। যে জীব সংসারে সপরিবারে তোমার পূজা করে, তার জীবন সুখী হয়। এ চক্ষু মুদলে কিছুই সঙ্গে যাবে না। আমি আমি করি এ আমিত্ব কি থাকবে? তুমি এসেছ সঙ্গে, তুমি সঙ্গে যাবে, তোমার সঙ্গে সকলের সঙ্গে যদি যোগ হয় তবেই ধন্য হবো। তোমার শক্তি বিনা কিছুই হয় না। এ আমি কিছুই নই। তুমি নিদ্রিত জীবকে জাগিয়ে দাও। আর যেন কেউ নিদ্রিত থাকে না।

হে জীবন্ত প্রভু! নববিধানের দেবতা! এই ভাবে যেন সকল জীবন বলে—প্রভু! তুমিই সব তুমিই মূলাধার—মহাশক্তিশালী ইহকাল পরকালের আশ্রয় সর্ব্বমূলাধার। এ জগতের চারিদিক দেখি ব্রহ্মময়। চক্ষু মুদে ভাবি এ জীবন কোথা থেকে এলো। যদি তুমি না আনতে তবে কোথায় থাকতাম? জড়দেহ তৃপ্ত কর্বার জন্য শোভাময় সুন্দর জগৎ সৃজন করেছ। জড় সংসারে যে তোমাকে দেখছে, সুখ সম্ভোগ ক'চ্ছে সেই যথার্থ সুখী।

হে অনন্তদেব! তুমি অগম্য অসীম, সংসারেত দুঃখ কষ্টের শেষ নাই। কত দুঃখের বোঝা নিয়ে কত তাপিত প্রাণ তোমার দ্বারে এসে পড়লো। শোক জ্বালার ভার বহিবে কি রূপে অবসন্ন শ্রান্ত হ'য়ে ভীত প্রাণ এসে তোমার চরণে বোসলো। আর ভাবতে পারে না। অনন্ত রাজ্যের দ্বার খুলে দাও। আমরা তোমার সন্তান; ছোট ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে দুর্লভ মানবজন্ম মলিন ক'চ্ছি। অনন্ত স্বর্গদ্বার খোলা দেখে প্রাণ কত সুখী তোলো। তুমিই আমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা। তোমার পূজা ক'রে আমরা চির উন্নতি লাভ কোরবো। তুমি আমার এমন দেবতা—তবে কেন নিরাশ হব? তোমার রাজ্যে নিরাশা নাই, দুঃখ নাই। বড়র সন্তান আমরা বড় হব। ক্ষুদ্র জীব তোমার উপাসনা ক'রে অনন্তে মিশবে। তোমার অনন্ত ভাণ্ডার সদাই পূর্ণ। সকলকে ডাকছো, যে যা চাও, নেবে এস ব'লে ডাক্‌ছ।

হে প্রেমময়ী জননী! যদি মানব জীবন কেবল বৈরাগ্য জন্যে সমস্ত বন্ধন কেটে ব'সে থাকতো তবে এ সংসারে তোমার প্রেমের এমন পরিচয় পাওয়া যেতো না। মা হ'য়ে ব'সে এ সংসার তুমি প্রেমের বন্ধনে বেঁধেছ। এত স্নেহ করুণা আমাদের ওপর বর্ষণ কোচ্ছো। পিতা মাতা ভাই ভগ্নী, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র কন্যা তোমার প্রেমে বেঁধেছ।

এ সংসারে যে তোমার মঙ্গলময় হস্ত নিরত দেখে—সেই বড় সুখী। রন্ধনশালে, উপাসনা গৃহে, সর্ব্বত্র তুমি বিরাজিত। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম—তুমি এক—প্রাণে তুমি, বাহিরে সর্ব্বস্থানে তুমি; সকল ঘরে তুমি আছ। নানারূপে নানাভাবে আছ। তুমিই সর্ব্বমূলাধার, তবে কেন সকলে এক সুরে তোমার অদ্বিতীয় স্বরূপের পূজা করি না, জানি যখন একদিন একাই যেতে হবে, তখন কেন তোমাকে নিয়েই থাকি না? যে সরল মনে তোমায় ডাকে,

তাকে তুমি দেখা দাও। সে সদা নির্ভয়ে থাকে, রিপুদল তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারে না। সে হৃদয় প্রাণ মন তোমার চরণে দিয়ে সুখী হয়।

তুমি ইহ পরকাল। গৃহলক্ষ্মী হ'য়ে আছ, ভব পারাবার পার কর। তোমায় ছেড়ে যেন কোথাও না যাই। আশা ভরসা তুমি। তুমিই ভুবনীর একমাত্র তুমি অদ্বিতীয় আরাধ্য দেবতা।

হে নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক দেবতা! ভয় হয় প্রাণীর প্রাণে পুণ্যস্বরূপ দেখে তবে কি পুণ্যের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবো না। সংসারে দিবানিশি, মায়া মমতার কথা ভেবে, স্বর্গে প্রবেশ কোরবে কি ক'রে। আর অমানিশার অন্ধকার নাই। পুণ্যের জ্যোতিতে সব অন্যায় দুষ্কর্ম্ম দূরে গেল। পুণ্যময় রূপ দেখে সব দূর হ'য়েছে। স্বর্গ থেকে যেমন এসেছিলাম, তেমনি হ'য়ে ব'লে। তুমি মুখে বল "বেশ হয়েছে এখন আর পাপী নও, আমার সন্তান হ'য়ে আমার চরণে এসেছ।" তোমার পুণ্য বিনা কারও অধর্ম্ম, বিন্দুমাত্র পাপ, কলঙ্ক যাবে না, তোমার পুণ্যের বলে জন্মাবধি পাপীর পাপ দূর হয়। নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্ম, স্বর্গরাজ তুমি। আনন্দ তুমি, সুখ শান্তিময়ী মা। অনেক পথ হেঁটে শ্রান্ত দেহে, দুর্ব্বল নারী তোমার ঘরে এসেছে. কত হৃদয়ে শোক দুঃখ জ্বালা এসেছিল, সব চ'লে গেছে। মা, একটু শান্তি সুখ দাও। আনন্দের রাজ্যে কেবল মিলন, চিরমিলন। এখানে যে সুখ, সে সুখে দুঃখ মিশ্রিত নাই; নিরানন্দ নাই। যে তোমাকে হৃদয়ে ল'য়ে সংসারে থাকে সে তোমার হাসিকণা পেয়ে সবারে হাঁসায়। এস সন্তান ব'লে সকলকে ডাকছো। তোমার শ্রীচরণ ভিন্ন নিরাপদ আরামের স্থান আর কোথাও নাই। শান্তি সুখময়ী অমরধামের মা! ভক্তহৃদয়বিহারিণী পতিত উদ্ধারিণী মা! তোমাকে বার বার প্রণাম করি। ক্ষণকাল আনন্দময়ীর ধ্যান করি; দয়া ক'রে তিনি আমাদের হৃদয়ে আসুন। সংসারের ভাবনা দূর হোক্। ধ্যানের রাজ্যে যাই। তাঁর চরণতলে ব'সে তাঁকে দেখি, ধ্যান করি।

শেষ প্রার্থনা—আর্য্যনারীগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আনন্দময়ী মা হ'য়ে এ বৎসর আবার তাঁর চরণ তলে আমাদের ডেকেছেন। রত্ন রাশি ভাণ্ডার খুলে, উপাসনান্তে যাকে যা দেবার নিয়ে ডাকছেন। সকল হৃদয়ের কথা জানেন একবার দয়া ক'রে দাসী ব'লে আশীর্ব্বাদ করুন সকলের হৃদয়ে দাসী নাম অঙ্কিত হোক্। উপযুক্ত দাসী, পরিচারিকা হ'য়ে আমরা জীবনে কার্য্যে এই ব্রত পালন ক'রে ধন্য হই। তা'হলেই ব্রহ্মানন্দের মনের সাধ পূর্ণ হবে।

আমাদের সুখী করবার জন্য তোমার স্নেহ করুনা সদাই ব্যস্ত। এখন কমলকুটীর শোকাচ্ছন্ন। তুমি কি বাহিরের শোকের ভাব দেখতে পার? তাই তুমি অমরাত্মাদের সঙ্গে আমাদের মিলন করেছ, স্বর্গধামের শোভা দেখাচ্ছ। কেবল বোলছ বিচ্ছেদের এ যাতনা কেবল দুদিনের, তোমার কাছে অনন্ত মিলন—আনন্দ, শান্তি। উৎসবে আনন্দ নিয়ে এসেছ আজ, সকলকে দেবে

গেলে। যত দুঃখ কষ্ট দূরে গেল। এ ভয় ভাবনা দুঃখ শোক বিপদ পূর্ণ পৃথিবীতে আমাদের ভয় কিসের? আমরা নববিধানের হরি ভক্ত জননীকে চিনেছি।

বড় ভালবাস, আমাদের কত দয়া কর তাই প্রতি ঘটনায় বুঝিয়ে দিচ্ছ। কি আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইল। প্রথমে বড় ভয় হ'চ্ছিল। এখানে কত আসন শূন্য! এক এক খানি ক'রে এখানকার আসন খালি হ'চ্ছে সেখানে এক এক খানি ক'রে পূর্ণ কোচ্ছ। তাঁদের সঙ্গে প্রাণ আজ নিশ্চয়ই মিলেছে। গত বৎসর মাতামহী এ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। এ বৎসর তাঁর আত্মা এখানে উপস্থিত। যদি নববিধান আমরা না চিন্‌তাম তাহ'লে পরকাল বাসীদের সঙ্গে কিরূপে অচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত হ'তাম? নববিধান এমনি ক'রে সাজিয়েছ যে পরকাল এ ঘরের ভিতরে। আমরা তোমার দাসী তোমার সেবা কাজ কোর্‌বো

ক্রমশঃ।

মহিলাদিগের রচনা।

মাতৃহৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস।

কোথারে বিমল ধন বলি এ সময়,
আয় তোরে কোলে নিয়ে জুড়াই হৃদয়।
জঠরে ধরিয়া শেষে হলনা করম দোষে,
মম ভাগ্যে বুকে রাখি হেরিতে তোমায়
কঠোর জঠরে শুধু ধরিলাম হায়!
কি দোষেতে বাছা তুই মোদের ত্যজিয়ে,
জনমের মত হায় গেলিরে চলিয়ে?
স্নেহের পুত্তলি মোর বিমল রতন,
সমভাবে সবাকার আদরের ধন।
অশ্রদ্ধাত কোন দিন করি নাই তোরে,
কেনরে ছাড়িয়া গেলি দুঃখিনী মায়েরে?
দরিদ্রা আমি রে বাছা নাই কোন ধন,
এক মাত্র ধন তুই আমার জীবন।
হারা হয়ে তোমা ধনে যে ভাবেতে আমি,
কাটিতেছি নিশিদিন জানে অন্তর্যামী।
পিতার দুলাল তুই বিমল রতন,
পিতা ছাড়া তুমি নাহি থাকিতে কখন।
তব পিতৃদেব যদি সন্ধ্যার সময়,
কার্য্য হেতু না আসিত আপন আলয়।
বিলম্ব হেরিয়ে তুমি পিতার লাগিয়ে,
কত কান্না বাপধন কেঁদেছ ফুঁপিয়ে।
এখন ছাড়িয়া বাপ, গেলিরে কোথায়,
হল নাকি দয়া তোর কঠিন হিয়ায়?
তোমা ছাড়া হয়ে বাপ জনক তোমার,
নীরবে সতত হায় ফেলে অশ্রুধার।
তোর দীদী তোর লাগি ব্যাকুল হইয়ে,
নিশিদিন কান্দে হায় বিরলে বসিয়ে।
ছোট বোন আভা তোর কান্দে অনিবার,
দাদা, দাদা, বলি হায় খুজে চারিধার।
খেলার জি নষ তোর যতন করিয়ে,
আসিয়া খেলিবে বলি রাখে গুছাইয়ে।
খেলার সাথীরা বাছা তোমায় খুজিয়া,
নিরাশ হৃদয়ে সবে যায়রে ফিরিয়া।
অসহ্য লাগেরে মোর হেরিয়ে এসব,
মনের বেদনা হায় কার কাছে কব।
তোমা বিনে বাছাধন হৃদয় আমার,
জ্বলিয়া পুড়িয়া সদা হতেছে অঙ্গার।
স্নেহের শৃঙ্খল মোর কাটি অনায়াসে,
উড়িয়া গেলিরে বাপ অনন্ত আকাশে।
মম স্নেহ প্রীতি ভাল লাগিল না তোর,
গেলিরে পালায়ে বাছা কাটি মায়া ডোর।

কি বলিব হায়, হায়, বুক ফেটে যায়,
সোণার পুতুল মোর গেলিরে কোথায়?
আয়রে সোণার বাছা কোলে করি আয়,
কাতরেতে ডাকে তোর অভাগিনী মায়।
কোথা গেলে তোরে বাপ, পাইব দেখিতে,
এই আশা সততই হয় মোর চিতে।
পাগলের মত চাদ দেখি নিরখিয়ে,
কোথায় বিমল ধন রয়েছ পালায়ে।
কোন খানে বাছা তোর দেখা নাহি পাই,
তৃষিত চাতক সম ঘুরিতেছি তাই।
আকাশে নক্ষত্র রাশি উঠিলে ফুটিয়া,
আকুল হইয়া বাছা দেখি নিরখিয়া।
এই যে আকাশে হেরি তারা অগনণ,
তাদের সঙ্গেতে কিরে হয়েছ মিলন।
অথবা নন্দনবনে সুরগণ সনে,
বসিয়ে মন্দার ছায় প্রফুল্ল আননে।
পারিজাত মালা গাঁথি ভক্তিপূর্ণ মনে,
পূজিছ যতনে দিয়ে দেবের চরণে?
তুই বুঝি ছিলি বাছা স্বরগের ফুল,
বিধি দিয়েছিল তোরে করে অতি ভুল।
পুণ্যময় বাছা তুই শোভায় অতুল,
পাপ ধরা হতে গেলি হইয়ে আকুল।
সংসারের পাপ তাপ দেখে ভয় পেয়ে,
সেদিকে বিভুর পদ গেলিরে চলিয়ে।
অশান্তি সংসারে হেরি দুঃখ হাহাকার,
আগেই গেলিরে চলে শান্তির আগার।
শুদ্ধ চিত্তে শান্তি ধামে গেলিরে চলিয়ে,
অশান্তি ফেলিয়ে গেলি আমার হৃদয়ে।
তব পদে দয়াময় এই নিবেদন,
আমার স্নেহের ধন তোমার ভবন।
তাহার আত্মার প্রভু করহে সদগতি,
তব পদে দুঃখিনীর এই সে মিনতি।
তুমি দিয়াছিলে প্রভু বিমল রতন,
আবার তুমিই প্রভু করিলে হরণ।
বুঝিতে না পারি হরি মহিমা তোমার,
দিয়ে নিধি কেড়ে লও কেমন বিচার।
না না তুমি দীনবন্ধু দয়ার সাগর,
দয়াময়ে করি কেন দোষী নিরন্তর।
পূর্ব্ব জন্মে কত শত করেছিনু পাপ
সেই পাপে আমি হরি পাই মনস্তাপ।
অদৃষ্টের ফল ভোগ করিতেই হবে।
অদৃষ্টের দোষ কার খণ্ডিয়াছে ভবে
যাওরে বিমল ধন শান্তিনিকেতনে
থাকি আমি দগ্ধ প্রাণে এশূন্য ভবনে
কবে দিনে তোমা ধনে কোলে নিব আমি
সেই প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকি দিন যামী

পাঁচদোনা, ঢাকা।

দুঃখিনী মা।

মনের প্রতি উপদেশ।

খেলিতে আসিয়ে এভবের খেলা
শেষ হ'য়ে এলরে জীবন বেলা
আর কেন মন কর তুমি হেলা
কর্ত্তব্য তব লহ সাধিয়ে।
সঙ্গেতে তোমার সঙ্গী ছিল যারা
দুষ্কৃত-রত তুমি দূরে গেল তারা
ভবারণ্যে একা হবে পথহারা
কাল সন্ধ্যা ওই আসিছে ধেয়ে।
সুসঙ্গ হারায়ে মজিয়ে কুসঙ্গে
মগন রহিলে বিষয় প্রসঙ্গে
প্রীতি পবিত্রতা এনেছিলে সঙ্গে
করমের দোষে সব হারালে।
খেলিতে যখন এসেছিলে হেথা
কি আদেশ তোমায় করেন পিতা

ভুলিয়া থা'কয়ে সে সকল কথা
অলীক আমোদে দিন কাটালে।
সাধু সঙ্গে থাকি সদাচারী হবে
সর্ব্বজীবে সদা দয়া প্রকাশিবে
দুঃখ নাশি সন্তোষে রবে
হৃদয়ে জপিবে তাঁহার নাম।
ভেবে দেখ দেখি ওরে মূঢ় মন
সে আদেশ কিছু করেছ পালন।
এখনও জাগ হওরে চেতন
প্রাণপণে সাধ বিভুর কাম।
হৃদয় তোমার কহিছে কাতরে
পাপ বোঝা আর ব'হতে না পারে
কে আছে এমন ক্ষণেকের তরে
মুক্তি দেয় তারে এভারতে।
তাই বলি মন শুনরে যুকতি
সুবেশ চরণে রাখরে ভকতি
প্রাণ ভরি ডাক চাহরে সুগতি
দুর্গতি(র) গতি দেখাবেন পথে।
ষড়রিপু আর এ ইন্দ্রিয় গ্রাম
সবে জয় করি জপ ব্রহ্মনাম
অনায়াসে যাবে সেই নিত্যধাম
পবিত্র হবে সে পদ পরশে।
পরাণে পাইবে পরম আরাম
অনিত্য জীবনে ভোগি স্বর্গধাম
আনন্দ অমিয়া পি'বে অবিরাম
ত্রিতাপে ছোঁবে নারবে হরষে।

কোন ভিখারিণী।
ধ্যাটন, বর্ম্মা।

শোকাশ্রু।

আজি কি শুনিনু কথা শোক নিদারুণ,
সোণার প্রতিমা হেম হল বিসর্জ্জন।
অকালে কালের গ্রাসে, ফেটে যায় প্রাণ,
হায় একি বিনা মেঘে অশনি পতন!
অই চিন্তা মনে আসি অশ্রান্ত অধীর
ঝরে আঁখি বারিধার না পারি বারিতে,
স্নেহের প্রতিমা হেম এধরাতে নাই
একথা গালির মত প'শছে শ্রবণে।
হায়রে হয়েছে শিশু মাতৃহীন সবে,
পাবেনা মায়ের স্নেহ এজনমে আর
উঠিবে না মার কোলে ফুরাল মা বোল
জলদের মত কটি ভাসিল পাথারে।
এই কিগো হেম তব যাবার সময়
সোণার সংসার পানে চাহিলে না ফিরে?
জীবন কর্ত্তব্য তব হয়েছে কি শেষ?
মিটেছে কি সুখ সাধ সকলি তোমার?
জীবন কুসুম তব প্রস্ফুট গোলাপ
না হতে বিকীর্ণ তার মধুর সৌরভ,
চলে গেলে, লয়ে গেলে অপূর্ণ বিষাদ
কি অভাব ছিল হেথা, লইলে বিদায়,
ছিলে পতি সোহাগিনী, পরিজন পাশে
লভিয়াছ যশ; ছিল দয়া প্রীতি মধু
দরিদ্র গৃহেতে তব, তোমার অভাবে
কত হাহাকার আজি কত অশ্রুজল।
অনাথ সন্তান তব লুটায় ভূতলে।
ব্যথিত ব্যাকুল চিত্ত প্রাণেশ তোমার
ওই দেখ শোক অশ্রু ঝরে ঝর ঝর।
পরিজন কান্দে হায় বিরহে তোমার।
হেন গেহ আনন্দিত সুখময় স্থান,
ফেলে কেন গৃহলক্ষ্মী মুদিলে নয়ন।
কোথা গেলে হেমময়ী কনক কমল
বারেক জননী কথা স্মরিলে মা মনে
গাইব তাঁহারি নাম গাব তাঁর জয়
হয় কিবা হক তাতে জন্ম কি অজয়।

শুভ পরিণয়।

(মাতৃহীনা দৌহিত্রীর উদ্বাহ দিনে
মাতামহীর উক্তি।)

ওরেরে কমল বালা কে লবে বরণ ডালা,
আজি তোর বিবাহের দিনে।
দেড়বছরের কেলে, তোর মা গেছেরে চলে,
রাখি তোরে সংসার কাননে॥
আজি শুভদিনে হায়, মম বুক ফেটে যায়
কোথা গেলি রাজ বে আমার?
তোর কমলের শিরে, ধান দূর্ব্বা হাতে করে,
আশীর্ব্বাদ দেবে শিরে তার।
আসিয়া সংসারবাসে, কেঁদেকেটে অবশেষে
স্নেহ রজ্জু করিয়া ছেদন।
স্বর্গধামে চলেগেলি, বাপমারে না চাহিলি,
বেখে গেলি করিতে রোদন।
কাঁদিতে সংসারে এলি, কাঁদাইয়া চলে গেলি
তাই আজি ডাকি বার বার।
ওরে স্মৃতি কি করিলি, শুভদিনে জাগাইলি,
শোক ব্যথা হৃদয়ে আমার?
যাবে স্মৃতি চলে যারে, করিরে মিনতি তোরে
প্রাণে হোক্ আনন্দ সঞ্চার।
না,না,মোর সে আগুন,জ্বলিবে যে সর্ব্বক্ষণ,
নিভিবেনা জীবনে আমার॥
রাখিয়া দূরে বিষাদ, করি তোরে আশীর্ব্বাদ,
সুখী হও কমল রতন।
সংসারের অনাচারে,যেন নাহি ছোঁয়তোরে,
স্বামীসহ সুখী অনুক্ষণ॥
পতিপ্রেমে প্রীত হয়ে, তনয় তনয়া লয়ে,
পদে মতি রেখ বিধাতার।
তাঁহার প্রসাদ মাগি, মস্তক উপরে রাখি,
মাগি বর করি নমস্কার॥

প্রার্থনা

হে জগদীশ, বরিষ বরিষ,
বিমল শান্তির বারি।
পতি পদতলে, প্রফুল্লকমলে,
রাখ দিবা বিভাবরী॥
যেন দোঁহে মিলে, থাকে হে কুশলে,
দূরে রাখি পাপরাশি।
পতী পত্নী হয়ে, অভিন্ন হৃদয়ে,
হরগৌরী রূপে মিশি॥
মেঃ—কাকিনা।

সংবাদ।

ইতিমধ্যে আমরা পূর্ব্ববঙ্গের একটি পল্লীগ্রামে বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সেই পাঠশালায় ১৯২০ বালিকা লেখা পড়া শিক্ষা করিতেছে। আমরা তাহাদিগকে প্রসঙ্গক্রমে বর্ম্মদেশীয় রমণীদের আকৃতি প্রকৃতি আচার ব্যবহার ভোজ্য পরিচ্ছদাদির বিষয় কিছু বলিয়াছিলাম, পরে বর্ম্মদেশ হইতে আনীত বর্ম্মরমণীদের বুদ্ধ মন্দিরাদির কতকগুলি ছবি, এবং কলিকাতায় ক্রীত ২১১টী নারীর ছবি তাহাদিগকে সাদরে উপহার স্বরূপ দিতে চাহিয়াছিলাম, তাহারা বিলাতী জিনিষ বলিয়া অনাদর প্রকাশ করিয়া সেসকল গ্রহণ করে নাই। তাহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। সেই পল্লীর ভদ্র পরিবারের অনেক বালক, ইংরাজ রাজা অত্যাচারী ইত্যাদি কথা সগর্ব্বে বলিয়া থাকে। কি ভয়ানক ব্যাপার! দূরস্থ পল্লীগ্রামের অন্তঃপুরে স্বদেশীর কি বিষম প্রভাব।

সম্প্রতি ঢাকা নগরস্থ ইডেন ফীমেল স্কুলে বড় গোলযোগ গিয়াছে। উক্ত স্ত্রীবিদ্যালয়ের লেডী সুপারিটেণ্ডেণ্ট শ্রীমতী সরলা রক্ষিত বি, এ সেই গোলযোগের জন্য চট্টগ্রামে স্ত্রীবিদ্যালয়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় সস্ত্রীক ইংলণ্ডে পঁহুছিয়াছেন। তিনি গত ১০ই মার্চ্চ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া পার্লেমেণ্ট মহাসভায় যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার জন্মস্থান ঢাকা জিলার অন্তর্গত ভাটপাড়া পল্লী। তিনি বিলাতে যাত্রার কিয়দ্দিন পূর্ব্বে জন্মভূমি দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। দেশস্থ লোকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত আদর অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাহাজের ঘাট হইতে ভাটপাড়া পল্লী ন্যূনাধিক পাঁচ মাইল দূরে। নদীর ঘাট হইতে সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া গৃহে লইবার জন্য বহু লোক সমাগম হইয়াছিল, কয়েকটী হস্তী উপস্থিত করা গিয়াছিল। তিনি হস্তীর উপর আরোহণে সদলে স্বভবনে গিয়াছিলেন স্বদেশী ভলণ্টিয়ারগণ সঙ্গে ছিল। নদীর ঘাটে এবং অন্য কয়েক স্থানে সুদৃশ্য তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পল্লীর মহিলারা হুলুধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, মিষ্টান্ন প্রস্তুত ও নানা প্রকার সুরস ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়াছিলেন। গ্রামস্থ ছোট বড় অনেকের বাড়ীতে যাইয়া দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছেন। গুপ্ত সাহেব ভাটপাড়ার অদূরস্থ পাঁচদোনা গ্রামে মাতুলালয়ে গিয়াছিলেন তথা হইতে মাধবদি গ্রামে মাতুল শ্বশুরের আলয়, পরে ডুপধারা পল্লীতে শ্বশুরালয় হইয়া নারায়ণগঞ্জে গিয়াছিলেন। সর্ব্বত্র সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গে প্রতিদিন উভয় প্রদেশে যাত্রিকদল লইয়া ৭।৮ খানা বড় বড় জাহাজ গমনাগমন করিতেছে। গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জে দুই খানা জাহাজ, চাঁদপুরে একখানা, খুলনা হইতে বরিশাল অঞ্চলে একখানা, কলিকাতা হইতে সুন্দর বনের পথে একখানা, গোওয়ালন্দ হইতে সিরাজগঞ্জ ও জগন্নাথগঞ্জ অঞ্চলে ২ খানা নিয়মিতরূপে প্রতিদিন চালিত হইতেছে। প্রতিদিন প্রত্যেক জাহাজ আরোহিবর্গে পরিপূর্ণ থাকে। শত সহস্র স্ত্রীলোক বালক বালিকা নিরাপদে উভয় প্রদেশে নিরাপদে প্রাতিদিন গমনাগমন করিতেছে। বরং দিন দিন যাত্রিকের বৃদ্ধি হইতেছে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ও বিচ্ছেদ কিছুই বুঝা যায় না। পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা নগরের বৃহৎ আয়তন হইতেছে, পুরাতন নগরের উত্তর সীমা হইতে ৬ মাইল ব্যাপিয়া নূতন নগর স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট প্রাসাদ এবং রাজকীয় নানাবিধ বড় বড় বিচারালয় ও কার্য্যালয় নির্ম্মিত হইতেছে। কলেজগৃহ এবং কুর্জ্জন হল অতি প্রকাণ্ড ও রমণীয় হইয়াছে। চট্টগ্রাম নগরের পর্ব্বত শ্রেণী পরিষ্কৃত করিয়া তদুপরি অনেক অট্টালিকার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। চট্টগ্রাম নগর বঙ্গোপসাগরের অদূরে স্থিত, উহা প্রধান বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠিতেছে, তথায়ও গভর্ণমেণ্ট প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের ইতস্ততঃ প্রশস্ত, ও রেলওয়ে বিস্তার হইতেছে।

ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়।

জীবাণু। *

বোধ হয় আপনাদের মনে আছে, জীবাণু সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে যাহা একবার বলে-ছিলাম। কোন জায়গায় যদি কাঁটা ফেটে সেই স্থানটাতে সব রক্ত এসে জমে। একথার সঙ্গে সাপের বিষের যোগ আছে। কতকগুল সাপ আছে তাদের বিষ অত্যন্ত উগ্র। কামড়াবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মানুষ মরে যায়। আজ আমি বলব সাপে কামড়ালে কি করে বাঁচান যাইতে পারে। সাপের মাড়ীর দুই পাশে দুটো দাঁত জন্মায়। একটা থলির মত আছে তাতে বিষ জন্মায়; ভিতরটা ফাঁপা। যাই সাপে কামড়ায় তৎক্ষণাৎ ঐ থলি হতে খানিকটা বিষ নলের ভিতর দিয়ে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। এই বিষ কি করে দূর করে মানুষকে বাঁচান যায় তা ফ্রান্স এবং এডিনবরাতে কাউমর ফ্রেসার কতকটা উদ্ভাবন করেছেন। আমাদেরও ঐ রকম থলি আছে। সাপেদের যেমন বিষ জন্মায় মানুষের তেমনি সেই থলিতে লালা থাকে। সেই থলি থেকে বিষ যদি বের করে নেওয়া যায় তবে দেখা যায় আবার অনেক দিন পরে একটা ছোট থলি জন্মায়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বিষাক্ত সাপ প্রায় পাওয়া যায় না। তাঁরা কষ্ট করে ভারতবর্ষ থেকে সাপের বিষ নিয়ে গিয়েছেন। সেই বিষ দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। একটা খরগোসকে কি এমন কোন জন্তুকে অল্প পরিমাণে অর্থাৎ পরিমাণে প্রথমে অল্প করিয়া বিষ প্রয়োগ করিয়া ক্রমে মাত্রা বাড়াইলেন। সকল বিষই মাত্রা বাড়াইয়া অনেক অভ্যাস করা যায়। যাহারা আফিং খায় প্রথমটা অতি অল্প পরিমাণে আরম্ভ করিয়া ক্রমে এত বেশী মাত্রা চড়াইয়া দেয় যে, এক ব্যক্তি প্রতিদিন যত খানি আফিং খায় তাহাতে ১০ জন লোক মারা যাইতে পারে। সেইরূপে সেই সাহেব পরীক্ষার জন্য প্রথমে ১০০ ভাগের ১ ভাগ, পরে ৩ ভাগ, শেষে দেখা গেল যা একটা জন্তু খাইয়া বাঁচিয়া রহিল তাহাতে ১০টা জীবের প্রাণ সংহার হয়। আর একটা এই হয় সেই বিষ প্রয়োগ করা জীবের রক্তের সঙ্গে আর একটা বস্তু ভিতরে জন্মাইতে থাকে, তাহাকে বিষঘাতী বলা যায়। বিষকে সে সংহার করে; অতএব তাহাকে বিষঘাতী বলে। রাসা-য়নিক উপায় দিয়ে রক্ত হতে বিষঘাতী পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়। যখন কোন মানুষকে বিষাক্ত সাপে কামড়ায় তখন সেই বিষঘাতী তাহার শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে সেই

---

*। ১৯০২ সনের ৪ঠা এপ্রেল অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহালানাবিশ মহাশয়ের বক্তৃতামূলক।

বিষঘাতীতে বিষ ক্ষয় হইয়া সেই মানুষ বাঁচিয়া যায়। এইরূপে পরীক্ষা করিয়া আর একটা দেখিলেন একটা জন্তুর এক পাশে একটু বিষ প্রবেশ করাইয়া অপর দিকে বিষঘাতী প্রবেশ করাইলে মরে না অর্থাৎ বিষ ধরে না বিষঘাতীতে নষ্ট হইয়া যায়। বিষ ও বিষঘাতী দুইকে মিলিয়ে দিয়ে দেখা হয়েছে অনিষ্ট হয় নাই। তবে এখন সর্পে কামড়াইলে বাঁচিবার অব্যর্থ ঔষধ বাহির হইয়াছে; কিন্তু তৎক্ষণাৎই দিতে হয়। অল্প সময়ের মধ্যে সে অব্যর্থ ঔষধ বিষঘাতী না দিলে মরিয়া যায়। সেই জন্য যাহাতে কামড়াইবার অনেকক্ষণ পরে দিলেও বাঁচাইতে পারা যায় তাহার বিশিষ্ট রূপ চেষ্টা হইতেছে। তাহা জানিলে পরে আপনাদিগকে জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

২য়।

ক্ষেপা কুকুরে কামড়াইলে যে ব্যারাম হয়, তাহাকে Hydrophobia জলাতঙ্ক রোগ বলে। সে রোগে জল দেখিলেই ভয় হয়। এমন কি তরল পদার্থ পান করিবার কথা ভাবিলেও রোগী শিহরিয়া উঠে। আমি যত দূর জানি বলিতে পারি, এই জলাতঙ্ক রোগ একবার হইলে সে ব্যক্তি আর বাঁচে না। অনেকে বলে গোঁদলপাড়ার ঔষধ প্রভৃতিতে সারিয়া যায় কিন্তু আমার সেরূপ বিশ্বাস হয় না। বিলেতেও এই রোগে বিস্তর লোক মারা যায়। কুকুরদের মধ্যে এই রোগ প্রধানতঃ আশ্বিন কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসেই হয়। সেই জন্যে কোম্পানী সেই সময় নিয়ম করেন যদি কাহারও কুকুর বাহিরে আনা হয় তবে মুখে তারের জাল ও গলায় শিকল দিয়া রাখিতে হইবে। কুকুরদের ঐ সময় এক প্রকার রোগ হয় তাহাতেই তাহারা ক্ষেপে যায়। খুব রাগী কুকুর হলেই যে ক্ষেপা কুকুর হয় তা নয়, কুকুরের যদি ঐ জলাতঙ্ক রোগ না হয় আর যদি সেই কুকুর খুব রেগে কামড়ায় তাহলে না হয় খানিক রক্ত পড়লো, জলাতঙ্ক রোগের মত মারাত্মক নয়। কোন কুকুরের যখন ঐ জলাতঙ্ক রোগ হয়, প্রথমতঃ তার সব চেয়ে কুকুরেরই উপর রাগ হয়। সে সময় তার এমনি ইচ্ছা হয় যেন পাইলে কামড়াই। টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলে। কিন্তু জলাতঙ্ক রোগ যে কুকুরের হয় তার জল দেখলে ভয় হয় না সে যাহাকে কামড়ায় তাহার যে কি যাতনা হয় ও জলেতে একটা ভয়ঙ্কর ভীতি ভাব হয় বর্ণনাতীত। যখন কাহারও এই রোগ হয় প্রথমে একটা কেমন নিঝুম হয়ে বসে থাকিবার ভাব হয়। নির্জ্জনে একা একা থাকিতে ভালবাসে। কাহারও সহবাসে থাকিতে চায় না। অবশেষে ঐরূপ যাতনাময় জলাতঙ্ক ও কামড়ান আঁচড়ান আরম্ভ হয়। সচরাচর মানুষকে ক্ষেপা কুকুরে কামড়াইলে ৬ সপ্তাহ পরে রোগ প্রকাশ পায়। এ রোগের কিছুতেই নিস্তার নাই। এমন কি কয়েক বৎসর পরেও লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। ঐ ক্ষেপা কুকুরে কামড়াইলে কখনই নির্ভাবনা হইবার যো নাই। Lui Pasture এই জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথমে যে কুকুরে কামড়ায় তাহাকে কাটিয়া

সেই কুকুরের মাথাটা সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। পরীক্ষা করিয়া যদি দেখা যায় সে ক্ষেপা কুকুর নয় তবেতো আর কোনই ভয়ের সম্ভাবনা রহিল না। মাথার ভিতরই ঐ রোগ হয়। সেই মাথা দেখলেই প্রথমে তিনি দেখলেন মেরুমজ্জা ও মস্তিষ্কের ভিতরেই এই রোগের বিষ পাওয়া যায়। ঐ মেরুমজ্জা অপর একটা কোন জন্তুর ভিতরে প্রবেশ করাইলে ২ ঘন্টার মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঐ মেরুমজ্জার ভিতর একটা দড়ির মত থাকে। দড়িটা বেশী মোটা নয় এই মনে করুন আমার আঙ্গুলটার মত মোটা। পিটটা কেটে মেরুমজ্জাটা কোন কাঁচের আবরণের ভিতর শুষ্ক বায়ুতে ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। ১৪ দিন পরে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে বিষ একেবারে চলিয়া যায়। তখন একটা খরগোসকে সেই ১৪ দিনের মজ্জা হইতে ১৩ দিনের ঝোলান মজ্জা একটু নিয়ে সুরুয়া দিয়ে মিশিয়ে খাওয়ালে কিছু অনিষ্ট হল না। পরে ১২ দিনের দিয়ে দেখা গেল কিছু হল না। এইরূপে ক্রমে একদিন করে কমিয়ে সহান গেলে একেবারে টাটকা মজ্জা এক টুক্‌রা ও একটু সুরুয়া একত্রে মিশাইয়া দেওয়া গেল ক্রমে এমন সহ্য হইয়া গিয়াছিল যে সেই টাট্‌কা মজ্জা দেওয়াতেও কোনই অনিষ্ট হইল না। এই রকমে দেহটাকে বিষসহ করা যায়। কোন সুস্থ মানুষের শরীরে যখন কুকুরে কামড়ায় তখুনি সেই কুকুরের মাথাটা সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। পরীক্ষা দ্বারা যদি বোঝা যায় সে কুকুরটা জলাতঙ্ক রোগাক্রান্ত নয় তা'হ'লে তো কোনই ভাবনা রইল না। বিষে বিষক্ষয় যে একটা প্রবাদ আছে ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সেই মাথা পরীক্ষা করে যখন দেখিতে পাওয়া যায় জলাতঙ্ক রোগ, তখনই সেই কুকুরদষ্ট মানুষটীকে চিকিৎসকের নিকট পাঠান উচিত। ৩ সপ্তাহের ভিতরে সেই বিষ ঐ মানুষের মধ্যে উপরি উক্ত প্রকারেই প্রবেশ করাইয়া সারাইয়া দেওয়া যায়। Pasture Instituteএ কত যে এই সব ক্ষেপা কুকুরের মেরু মজ্জা ঝোলান আছে ১৪ দিনের ১৩ দিনের ২ দিনের এই রকমে ১৪ দিনের পর্য্যন্ত কাঁচের ঢাকনার ভিতর সব ঝোলান আছে। শুষ্ক বাতাসে এই সব মেরু মজ্জার বিষ অপসারিত হয়। বিলেতে ফ্রান্সে এই প্রকারে কত শত রোগী যে আরোগ্য লাভ করছে শুনিলে আনন্দিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। ক্ষেপা কুকুরের লালা রস বিষাক্ত হয় সেই জন্য কামড়াইলেই সেই বিষ যাহাকে কামড়ায় তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

১১শ বৎসর।

শ্রীমতী চঞ্চলা নিয়োগী,	হাজারীবাগ	২৲
শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র শাহা,	কুচবিহার	২৲
„ সতীশ চন্দ্র দত্ত,	সীতারামপুর	১৲
„ শশাঙ্কমোহন দাস,	ঢাকা	১৲

১২শ বৎসর।

শ্রীমতী সরোজিনী চৌধুরী,	বাঁকা	২৲
„ শরৎকুমারী দেবী,	টাঙ্গাইল	২৲
„ জ্ঞানদাসুন্দরী মজুমদার,	ভবানীপুর	২৲
„ আমোদিনী ঘোষ,	হায়দরাবাদ	২৲
„ ভূপেশনন্দিনী সেন,	মুঙ্গের	১৲
„ কুসুমকুমারী,	পিঙ্গনা	২৲
শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র শাহা,	কুচবিহার	২৲
„ দেওয়ান জগন্নাথ রাও,	বোদ	২৲
„ কালীপদ দাস,	হাবড়া	২৲
„ সুরেশচন্দ্র বসু,	কলিকাতা	১৲
„ শশিভূষণ সেন,	ঢাকা	১৲
„ জয়চন্দ্র দাস,	„	২৲
„ ক্রোধেশ চন্দ্র সেন,	টিরক	১৲
„ শশাঙ্কমোহন দাস,	ঢাকা	২৲
„ মহেন্দ্র নাথ সেন,	ডিব্রুগড়	২৲

১৩শ বৎসর।

শ্রীমতী কিরণকুমারী মিত্র,	কলিকাতা	২৲
„ প্রসন্নতারা গুপ্ত,	„	২৲

শ্রীমতী কুসুমকুমারী ঘোষ,	কলিকাতা	২৲
„ রাণী রায়,		২৲
„ ভূপেশনন্দিনী সেন,	মুঙ্গের	১৲
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত,	কোহিমা	২৲
„ সুরেশচন্দ্র বসু,	কলিকাতা	১৲
„ দুর্গাদাস বসু,	বাখিল	২৲
„ শশাঙ্কমোহন দাস,	ঢাকা	২৲
Mrs A Rahaman	Bogra	২৲

মাসিক পত্রিকা

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ

১০শ ভাগ] চৈত্র ১৩১৪ ; এপ্রিল ১৯০৮। [৯ম সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

সৈনিক পুরুষেরা রণজয়ী হইলে বীর-পুরুষ বলিয়া খ্যাতি ও সম্মান লাভ করে। নারী রণক্ষেত্রে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বীর নারী বলিয়া জগতে পূজিত হইয়াছেন এরূপ নারী বিরল। পুরাকালের দুই চারিটী রমণীকে মাত্র ইতিহাস এই খ্যাতি প্রদান করিয়াছেন। সমরক্ষেত্রে শত্রু-সংহারের জন্য কোমলাঙ্গী নারীর শারীরিক বলবিক্রম প্রকাশ করা স্বাভাবিক নহে। তবে চরিত্রবলে, সতীত্ববলে, ইন্দ্রিয়দমন ও রিপুসংহার করিয়া বহু নারী বীরনারী বলিয়া জগতে পূজিতা হইয়াছেন।

পুরাণে বর্ণিত সীতা সাবিত্রী দমরন্তী [illegible] নারীগণ বীরনারী ছিলেন। তাঁহাদের আত্মসংযম, [illegible] ধৈর্য্য সহি-ষ্ণুতা তাঁহাদের আন্তরিক মহাবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছে। কেবল বাহুবলে নগর জয় করিতে পারিলেই বীর হয় না। যিনি ধর্ম্মবলে ও চরিত্রবলে ও আত্মসংযম দ্বারা জীবনে শান্তি কুশল স্থাপন করিতে পারিয়াছেন তিনি প্রকৃত বীর। এইরূপে বীরত্বের পরিচয় দান করিয়া জগতে অনেক নারী ধন্যা হইয়াছেন। শারীরিক বল বীর্য্য অপেক্ষা আত্মিক বল বীর্য্য বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

যে নারী সহজে ক্রুদ্ধ হন, ক্রোধ দমন করিতে না পারিয়া আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে কলহ বিবাদ করেন, যিনি লোভ রিপু দ্বারা পরাজিত হইয়া পরস্বাপহরণে সঙ্কুচিত নহেন, যিনি মিথ্যা প্রবঞ্চনা এবং নানা নীচ ভাবের অধীন, তাঁহার বল বীর্য্য কোথায় ? তিনিই প্রকৃত কৃপাপাত্রী অবলা। তাঁহার জীবন অতীব দুঃখের জীবন। মাতৃগণ, ভগিনীগণ, কন্যাগণ, তোমরা চরিত্রবলে সতত্ববলে জগতের দুর্নীতি দুরাচার সকল সংহার করিয়া বীর নারীর খ্যাতি লাভ কর। তোমরা যে বিশ্বজননী পুণ্যময়ী মহাশক্তির কন্যা নিজ নিজজীবনে তাহার পরিচয় দান কর।

জাতীয় সমুত্থান ও নারী-জাতির উন্নতি।

কোন দেশে জাতীয় সমুত্থান সেদেশের কেবল পুরুষ জাতির প্রভাব ও সমুন্নতিতে হয় না। স্ত্রীপুরুষ উভয়ের সম্মিলনে মানব জাতি। জাতীয় সমুত্থান অর্থে জাতিগত সমগ্র উন্নতি বুঝায়। যেমন দেহের বামাঙ্গ বিকল থাকিয়া কেবল দক্ষিণাঙ্গের উন্নতিতে দৈহিক উন্নতি হয় না, তদ্রূপ নারী জাতিকে ছাড়িয়া কেবল পুরুষ জাতি সমুন্নত হইলে, আংশিক জাতীয় সমুত্থান হয়, জাতীয় অর্দ্ধাঙ্গের উন্নতি হয়, পূর্ণ নহে।

যখন কোন দেশে কোন জাতির অধঃপতন হয়, সেই জাতি পাপ দুরাচারের বশীভূত এবং নির্জীব ও নিরুদ্যম হইয়া পড়ে, তখন ভগবানের বিশেষ কৃপায় অলৌকিক প্রভাবশালী বিশ্বাসী মহাপুরুষ সেদেশে অভ্যুত্থিত হইয়া ধর্ম্মবিধান প্রচারে সেই জাতিকে জাগ্রত ও সজীব করিয়া তোলেন; সেই মহাপুরুষের অভ্যুদয়ে সকলের নিজ নিজ-পাপ ও দুর্নীতির প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তাঁহার বিশ্বাস ও ভক্তির প্রভাবে তাহাদের মন ঈশ্বরের দিকে উন্মুখীন হয়, তাহাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহারা চৈতন্য লাভ করিয়া সাধন ভজন দ্বারা জাতীয় জীবনের এবং ব্যক্তিগত ভাবে নিজ নিজ জীবনের উন্নতি বিধানে উৎসাহ ও উদ্যম প্রকাশ করে। এইরূপে প্রকৃত জাতীয় সমুত্থান হয়; ইহাতে এক একটি জাতির নূতন জীবন হইয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষ সকলে সমবেত ভাবে এই উন্নতির অংশী হয়, নরনারী সকলের মধ্যে নব জীবনের স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে।

তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন এদেশের নরনারীর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের চরিত্রের উপর কোন শাসন ছিল না, তাহারা যাগ যজ্ঞাদি ধর্ম্মের বাহ্যিক কর্ম্মকাণ্ড লইয়া কেবল ব্যস্ত ছিল, তখন নির্ব্বাণ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহামুনি শাক্যসিংহের অভ্যুদয় হয়। তিনি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অসারতা প্রতিপাদন করেন, যোগ সমাধি আত্মসংযম ও রিপু দমনে সিদ্ধ না হইলে জীবের শান্তি ও সদ্গতি নাই এই সত্য স্বীয় জীবন দ্বারা প্রচার করিতে থাকেন, নিজে নির্ব্বাণ ধর্ম্মে সিদ্ধ হইয়া উপদেশ ও দৃষ্টান্তের প্রভাবে সহস্র সহস্র লোকের অন্তশ্চক্ষু বিকশিত করেন, তাহারা সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া নির্ব্বাণপথের পথিক হয়, চিত্তশুদ্ধি ও সংযম সমাধিসাধনে এবং তৎপ্রচারে প্রাণপণে যত্ন করে। কেবল পুরুষে নয়, শত শত নারী সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রত, সংযম ও নানা প্রকার কৃচ্ছ্র সাধনে প্রবৃত্ত হন, মহামুনি বুদ্ধদেবের অনুশাসনানুসারে নিয়ম নিষ্ঠার জীবন যাপন করিতে থাকেন। মহারাজ অশোকের রাজ্যশাসনকালে বুদ্ধদেবের প্রতিষ্ঠিত এই নির্ব্বাণ ধর্ম্ম ভারতের সর্ব্বত্র এবং দ্বীপ দ্বীপান্তরে প্রচার হয়। তখন পরম বৈরাগী আত্মত্যাগী প্রচারকগণ দেশদেশান্তরে প্রচারে অশেষ কষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। নারীগণও প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে

নানাস্থানে দ্বীপদ্বীপান্তরে যাইয়া প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। মহারাজ অশোকের কুলপাবন পুত্র কুমার মহেন্দ্র দুর্ল্লঙ্ঘ্য সাগর অতিক্রম পূর্ব্বক সদলে লঙ্কা দ্বীপে যাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন, এবং তথাকার ভূপালকে প্রজাবর্গসহ বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। রাজকুমার মহেন্দ্রের ভগিনী আর্য্যা সঙ্ঘমিত্রা, কতিপয় ব্রতধারিণী প্রচারিকা সহ লঙ্কাতে যাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তথাকার রাজমহিষী ও নারীগণ তাহা দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। লঙ্কা দ্বীপস্থ অনুরাধাপুরে রাজকুমারী সঙ্ঘমিত্রার প্রচারের কোন কোন চিহ্ন এক্ষণও বিদ্যমান। সেই যুগে রাজপরিবারের ও অন্য সম্ভ্রান্ত বংশের বহু মহিলা বিলাস বিভব বিসর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সন্ন্যাসিনীর বেশে নির্ব্বাণধর্ম্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা সংসারের কোন আকর্ষণে আকৃষ্ট হন নাই। ইহাকেই বলে জাতীয় সমুত্থান ও নারী জাতির সমুন্নতি। কেবল পুরুষ জাতির জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতিতে কোন দেশের প্রকৃত জাতীয় সমুত্থান হইতে পারে না, যদি তাহাদের সঙ্গে নারী জাতির যোগ না থাকে। বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবীতে জয়যুক্ত হইয়াছে, কোটি কোটি নর নারী এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এক্ষণ জীবন যাপন করিতেছে। যদিচ কালক্রমে বুদ্ধদেবপ্রতিষ্ঠিত সেই ধর্ম্মের এক্ষণ অতিশয় বিকৃত অবস্থা ঘটিয়াছে, উহার আধ্যাত্মিকতা বিনষ্ট হইয়াছে, তথাপি বৌদ্ধ পুরুষদিগের সঙ্গে বৌদ্ধ নারীগণ সাধন ভজন ও ব্রত নিয়মপালনে নিযুক্ত থাকিয়া ধর্ম্মভাবকে জাগরিত রাখিয়াছে।

বৈদান্তিক যুগে পরাশর যাজ্ঞবল্ক্যাদি মহর্ষিগণ যেমন যোগ তপস্যাতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ গার্গী মৈত্রেয়ী ইত্যাদি ব্রহ্মবাদিনী আর্য্য মহিলাগণ বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মসাধনে, যোগ ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন। তান্ত্রিক যুগে দেব দেবীর পূজার্চ্চনা, শক্তিপূজা পরিবার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, মহিলারাই সেই দেব দেবীর পূজা শক্তিপূজা পরিবার মধ্যে জাগরিত রাখিয়াছেন। তাঁহাদের নিয়ম নিষ্ঠা ও একাগ্রতার প্রভাবে এক্ষণও শাক্ত পরিবার সকলে পূজার্চ্চনাদি চলিতেছে। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ভক্তিবিধানে ভক্তকুলশিরোমণী শ্রীচৈতন্যের জীবন প্রভাবে এই বঙ্গ দেশের নরনারীর ভক্তিপ্রেমশূন্য শুষ্ক হৃদয়ে ভক্তির মহাপ্লাবন হয়। তখন পুরুষদিগের ন্যায় নারীবৃন্দও বৈরাগ্যাবলম্বনে ভক্তিপ্রেমে মত্ত হইয়া উঠেন। সেই ভক্তি প্রবাহ এক্ষণ যদিচ ক্ষীণ ও বিকৃত হইয়াছে, কিন্তু একেবারে নিঃশেষিত হয় নাই। শত সহস্র নারী হরিনামের প্রভাবে সংসার ত্যাগ করিয়া হরিগুণ কীর্ত্তন করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন।

দুই সহস্র বৎসর হইল জুডিয়া দেশে শ্রীঈশা কর্ত্তৃক ভগবদিচ্ছাপালনের বিধান যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার প্রভাবে আজও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র মহিলা, বিলাসবাসনা এবং সর্ব্ববিধ ঐহিক সুখ সম্পদ্ বিসর্জ্জন করিয়া ব্রত নিয়ম পালন ও ভগবদগুণ কীর্ত্তন ও এবং নানা

কৃচ্ছ্র সাধনে প্রবৃত্ত আছেন, দেশদেশান্তরে ও দুর্গম স্থানে যাইয়া প্রাণপণে পরসেবায় নিযুক্ত হইতেছেন। প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের বহু মহিলা ও উক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত পুরুষ প্রচারকদিগের ন্যায় স্বদেশে বিদেশে ধর্ম্ম প্রচার, ঈশার গুণকীর্ত্তন ও পরসেবা করিয়া বেড়াইয়া থাকেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহাদের গতিবিধি রহিয়াছে। সাধ্বী ক্যাথেরাইন প্রভৃতি জগন্মান্যা মহিলাগণ সর্ব্বত্যাগী ও দুঃখ ব্রতধারিণী হইয়া দুরারোগ্য রোগীর সেবায় জীবনদান পূর্ব্বক জগতে অতুলকীর্ত্তি রাখিয়াছেন। কত পুণ্যবতী মহিলা অবিশ্রান্ত কুষ্ঠ রোগীর সেবা করিয়া পরিশেষে সেই ভয়ঙ্কর সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া মহাক্লেশে ঐহিক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এইরূপে ব্যাপারকে জাতীয় সমুত্থান ও নারীজাতির সমুত্থান ও সমুন্নতি বলে।

১৩ শত বৎসর হইল মহাপুরুষ মোহম্মদ কর্ত্তৃক আরব দেশে একেশ্বরবাদ এস্লাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। তখন সামরিক যুগ ছিল, আরব্য লোকেরা ঘোরতর সামরিক জাতি ছিল। সমুদায় অংশিবাদী পৌত্তলিক কোরেশবর্গ উক্ত মহা পুরুষের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। দল বল বৃদ্ধি হইলে তিনিও করবাল ধারণ করিয়াছিলেন, যুদ্ধ করিয়া ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তখন মোসলমান নারীগণও পুরুষ দিগের সঙ্গে সমরক্ষেত্রে যাইয়া বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বীর ভাবের উদ্দীপক সঙ্গীত করিয়া বীর পুরুষ দিগকে সমরে সমুত্তেজিত করিতেন, অস্ত্রাহত মোসলমান সেনাদিগের ক্ষত স্থানে ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। মহাপুরুষ মোহম্মদের দ্বিতীয় স্থলাভিষিক্ত ওমরফারুকের নেতৃত্বকালে রোমরাজ্যে বহু সহস্র মোসলমান সেনা প্রবিষ্ট হইয়া অস্ত্রবলে সে দেশ অধিকার করে, তাহাদের সঙ্গে তাহাদের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শত্রুসেনা দিগকে হতাহত করিয়াছিলেন। একটী ভয়ঙ্কর যুদ্ধে সাগরতরঙ্গ তুল্য অরাতিসেনা ব্যূহের আক্রমণে হতবীর্য্য হইয়া মোসলমানগণ পলায়নে সমুদ্যত হইয়াছিল, তখন স্ত্রীলোকেরা অগ্রসর হইয়া শস্ত্র চালনায় অতুল বিক্রম প্রকাশ করে। তাহাতে শত্রু সেনা ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়ে, বিজয়লক্ষ্মী মোসলমানদিগের প্রতি প্রসন্ন হন। মোসলমান নারীগণ পুরুষদিগের ন্যায় যথা বিধি নমাজ রোজা ব্রত নিয়মাদি পালন করিয়া থাকেন। মহাপুরুষ মোহম্মদের ধর্ম্মপ্রচারে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী খদিজা দেবীর ও প্রিয়তমা কন্যা ফতেমা দেবীর ধর্ম্ম জীবনের আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াবসোরা নগরনিবাসিনী তপস্বিনী রাবেয়া ও অন্য বহু নারীর অসাধারন ধর্ম্মোন্নতি হয়। ধর্ম্মগতপ্রাণ স্ত্রীপুরুষ এই দুইয়ের যোগে পরিবার মধ্যে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিত এবং দেশদেশান্তরে ধর্ম্মপ্রচার হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধানে সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়, সকল দেশের সকল সম্প্রদায় ও সকল জাতির সঙ্গে মিলন, সুস্পষ্টতঃ এই মহাসম্মিলনের ভাব ব্যক্ত হইতেছে। এই যোগ

ও সম্মিলনেই এই যুগের জাতীয় সমুত্থান নির্ভর করিতেছে, তদ্ভিন্ন অসম্ভব। যেস্থলে বিচ্ছেদ, বর্জ্জন. সেস্থলে সমুত্থানপ্রলয়, অধঃপতন। আমাদের অনুন্নত ও পতিত দেশ এই মহাসম্মিলনের যুগে, বিধাতার বিচিত্র বিধানে জ্ঞান সভ্যতা ও শক্তি সামার্থ্যে সমুন্নত ইংরাজ জাতির শাসনাধীন ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগসূত্রে বদ্ধ হইয়াছে। ইংলণ্ডের দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য এ দেশের জাতীয় সমুন্নতির কারণ হইয়াছে, পাশ্চাত্য দেশের খ্রীষ্টীয় নীতি এ দেশের নীতিকে সংস্কৃত ও উচ্চ করিতেছে, ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগে এ দেশের সুখ সমৃদ্ধি ও সভ্যতার বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই যোগ ছিন্ন কর, এ দেশের দুর্ভাগ্যের সীমা থাকিবে না। এই মহাসমন্বয়ের যুগে উচ্চ ধর্ম্মকে লোপ করিয়া ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল নিজের বিদ্যা বুদ্ধি ও শক্তি সামার্থ্যর অহঙ্কারে কে জাতীয় সমুত্থান সাধন করিতে পারে? অসম্ভব ব্যাপার। ইংরাজ-শাসনে ইংরাজ জাতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় সকল রহিত হউক কল কারখানা সকল এবং খনি ইত্যাদির কার্য্য উঠিয়া যাউক, রেলওয়ে ষ্টিমারাদির গতি বন্ধ হউক, আজ দেখিবে এ দেশের কি হীনাবস্থা ও কি দুর্দ্দশা! জাতীয় সমুত্থান কোথায় থাকে! নারী জাতির কি ভয়ঙ্কর দুঃখের অবস্থা ঘটে! সমুন্নত ভিন্ন জাতির সঙ্গে মিলন এবং তাঁহাদের সদ্গুণরাশি গ্রহণ না করিয়া প্রত্যাখ্যান ও বর্জ্জনে ও হিংসাদ্বেষে জাতীয় সমুত্থান হইতে পারে না, বরং পতন হয়। দুঃখের বিষয় হিংসা দ্বেষ, রাজার প্রতি অভক্তি ও অকৃতজ্ঞতা ইংরাজ বর্জ্জন ও বিলাতী বর্জ্জন এইরূপ নীচ কুৎসিত ভাব অন্তঃপুরস্থ মহিলা দিগের অন্তরে এমন কি বালিকা দিগের মনে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। একদা আমরা পূর্ব্ববঙ্গস্থ একটী পল্লীগ্রামের বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম, কথাপ্রসঙ্গে বর্ম্মদেশীয় রমণীদিগের আকৃতি প্রকৃতি এবং আচার ব্যবহারের বিষয় কিছু বলা গিয়াছিল, পরে সে দেশের নারীদিগের ছবি ও অপর কয়েক খানা ছবি তাহাদিগকে উপহার দেওয়া যায়। তাহারা বিলাতী ছবি ভাবিয়া অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক সে সকল গ্রহণ করে নাই। এরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে বালিকারা বলিয়া থাকে, ইংরাজ রাজা অত্যাচারী রাজা, আমরা তাহাকে মানি না, ইংরাজেরা স্বার্থের জন্য এ দেশে রেলগাড়ী ও জাহাজ চালাইতেছে; আমরা তাহা চাহি না। আমাদের দেশের নৌকাই ভাল। যে ব্যক্তি বিলাতী লবণ খায় ও বিলাতী কাপড় পরে উহার সঙ্গে আমরা কথা কহিতে চাহি না। স্বদেশী নেতারা এই সকল কুভাব মেয়েদের মনে প্রবেশ করাইয়া নারী প্রকৃতিসুলভ বিনয় ও কোমলতাকে বিনষ্ট করিতেছেন, ইহা দ্বারা কি নারী জাতির সমুত্থান হইবে? উপকারীর উপকার অস্বীকার করিয়া, ঘোরতর অকৃতজ্ঞ হইয়া, উন্নত জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন পতিত জাতি কি কখনও সমুন্নত হইতে পারিয়াছে? যদি কখনও নারী জাতীয় সমুত্থান হয় জাতীয় ভাব উচ্চ

ধর্ম্ম ভাব ও উচ্চ নীতিতে, প্রেম ও সম্মিলনে হইবে। এ দেশের জাতীয় ভাব রাজভক্তি, উপকারস্বীকার, বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিধানের ভাব সকল জাতির সঙ্গে যোগস্থাপন, উন্নত জাতির গুণ গ্রহণ, এই সকল ভাব যদি নারীজাতির অন্তর হইতে ধৌত প্রক্ষালিত হইয়া বিলুপ্ত হয়, তাহাদের মহাপতন অবশ্যম্ভাবী। তাহারা বর্ত্তমান উত্থানকারী যুবাদিগের ন্যায় লাঠী মারিয়া মারিয়া পুলিশ ও ইংরাজদিগকে তাড়াতে প্রবৃত্ত হইয়া অস্বাভাবিক বীরত্বের পারিচয় দান করিবে। বিধাতার জ্বলন্ত বিধানকে উপেক্ষা করিয়া দ্বেষ হিংসা ও বিদ্বেষ ও বর্জ্জনের ভাব অন্তরে পোষণ করিয়া ২। ১টা সৎকার্য্য, সেবাকার্য্য করিয়া নারীজাতির বা পুরুষজাতির সমুত্থান হইবে না। যোগ, সম্মিলন ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকে উপেক্ষা করিয়া জাতীয় সমুত্থানসাধনে যত্ন চেষ্টা করা দুরাশা মাত্র।

কেশব জননী সাধ্বী সারদা দেবী।

১৮৯ পৃষ্ঠায়।

সকলে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বকিতে লাগিলেন। আমি একদিকে রহিলাম। তাঁহার মুখে জল ইত্যাদি দিলে ক্রমে পুনরায় তাঁর জ্ঞান হইল। আমি সমস্ত দিনই তাঁহার শিয়রে বসিয়া রহিলাম। তিনি এক এক বার আমার দিকে মুখ তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু একটীও কথা কহিলেন না, পাছে আমার সেই রকম কষ্ট হয়। তখন আমার বড় ছেলে নবীনের বয়স ১৩।১৪ বৎসর হইবে। নবীনকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন—"বাবা, তুমি আমাকে বাঁচাও, তাহা হইলে তোমাদের কত ভাল হইবে।" কিছুক্ষণ পরে যখন ট্যাঁকশালের সাহেব তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, তিনি নবীনের ও সাহেবের হাত ধরিয়া বলিলেন "সাহেব" আমার এই ছেলে আর তুমি রইলে আমার কাছে ইহার বেশী আর কিছু বলিতে পারিলেন না।" সাহেব তাঁহাকে বলিলেন "তিনি যেন ছেলেদের জন্য না ভাবেন।" সাহেবের পূর্ব্বে মতিশীল তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। আমার শ্বশুর মৃত্যুর পূর্ব্বে যে উইল করিয়া যান তাহাতে মতিশীল, রাজা রাধাকান্ত দেব, দুই জন সাহেব, আর পিস্‌তুতো ভাশুর কর্ত্তা ছিলেন। মতিশীল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার মনে কি আছে বল।" তিনি বলিলেন, "এখন বলিব না, দাদা আসিলে বলিব।" মতিশীল বলিলেন, "তুমি দাদার এত প্রিয় যে এই অবস্থাতেও দাদা না আসিলে কিছুই বলিবে না।" এই বলিয়া দুঃখিত হইয়া উঠিয়া গেলেন। তার পর যখন আমার ভাশুর আসিলেন তখন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দাদা, তুমি আমার কাছে বসো; তোমার বুদ্ধি ঠিক আছে আমার বুদ্ধি ঠিক নাই।" ভাশুর বলিলেন "ওসব কথা এখন নয়, পরে হইবে।" এই বলিয়া উঠিয়া গেলেন। তার পর আমার ননদ বিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বিন্দু এখানে কে কে আছেন?" তিনি বলিলেন, "আমি ও মেজ বৌ" বোধ হয় অজ্ঞান ভাবেই পুনরায়

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ মেজ বৌ?" ছোট ঠাকুর ঝি (বিন্দু) বলিলেন "আমাদের মেজ বৌ, নবীনের মা"। ইহা শুনিয়া বিন্দুকে বলিলেন "তোমরা এখানে থাক"। তার পর আমার পিঠে হাত দিয়া বলিলেন "তুমি আমার কাছ থেকে যেও না।" তোমাকে আমি বড় ভাল বাসিতাম্ এখন তুমিই বা কোথায় রইলে আর আমিই বা কোথায় চলিলাম।" এই তাঁর শেষ কথা, তার একটু খানিক্ পরেই তিনি গেলেন।

আমি তাঁহাকে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে আমার স্বামীর এই কয়টী গুণ বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। প্রথম, তাঁহার ধর্ম্মে অতি মন ছিল। প্রায় চারিটার সময় উঠিয়া হরিনাম করিতেন ও পূজা ইত্যাদি করিতেন, তার পর ভোরে স্নান করিয়া সমস্ত গায়ে হরিনামের ছাপ পরিতেন ও কপালে তিলক কাটিয়া নামাবলী গায়ে দিতেন। আপিসে যাইবার সময় নামের ছাপের উপরেই পোষাক পরিতেন, কিন্তু কপালের তিলক ধুইয়া ফেলিতেন। তিনি দেখিতেও অতি সুন্দর ছিলেন। যখন চেলির কাপড়, মালা ও সর্ব্বাঙ্গে ছাপ পরিয়া বাহির হইতেন, তখন সকলেই বলিতেন, "গোঁসাই যাইতেছেন।" তিনি পাখী বড় ভাল বাসিতেন, যখনই বাহির হইতেন তাঁহার সঙ্গে সেই বড় বড় খাঁচা করিয়া পাখীদের লইয়া যাইতে হইত। তাঁহার দানশক্তি অত্যন্ত অধিক ছিল, যখন দেশে যাইতেন সঙ্গে বাক্স ভরিয়া টাকা ও পয়সা লইয়া যাইতেন, এবং তাহা সকলকে বিলাইয়া, শুধু বাক্স লইয়া চলিয়া আসিতেন। পূজার সময় যখন যাত্রা ইত্যাদি হইত তখনও বাক্স শুদ্ধ টাকা লইয়া সভায় বসিতেন, দিতে দিতে যখন সমস্ত টাকা ফুরাইয়া যাইত তখন উঠিয়া আসিতেন। তিনি রাগী ছিলেন না। চাকর চাকরাণীদের কিম্বা ভাই ভগ্নী কাহাকেও কখনও কিছু বলিতেন না। ছেলে মেয়েদের প্রতি কখনও রাগ করিতেন না। তিনি বেশী কথা কহিতেন না। বড় কম কথা বলিতেন। গুরুর প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি ছিল। তিনি হিন্দুকলেজে পরীক্ষা দিয়া মেডেল পাইয়াছিলেন। ইংরাজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত, ও ফার্শিতে তিনি অতি পণ্ডিত ছিলেন। গান ও বাজনাতে তাঁহার অতি দখল ছিল। হারমোণিয়ম্ এসাজ, পাখোয়াজ ইত্যাদি অতি সুন্দর বাজাইতেন। অধিক সময় বিশেষ কুঠি হইতে আসিয়া সেতার লইয়া থাকিতেন। তিনি অতি সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিতে পারিতেন। তিনি কুস্তি দেখিতে বড় ভাল বাসিতেন। তারি জন্য সর্ব্বদা দুই জন পালোয়ান সঙ্গে রাখিতেন। তাঁকে চাকর খানসামারা পর্য্যন্ত ভালবাসিত। তাঁহার এক বিশ্বাসী খানসামা ছিল সে তাঁহার মৃত্যুর পর কাগজ পত্রের বাক্স এবং তিনি সর্ব্বদা যে হীরার আংটি ব্যবহার করিতেন তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পাছে ঐ সব জিনিষ কেহ আমাদের হাত হইতে লইয়া যায়। আংটিটী এক দেয়ালের গায়ে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। শেষে যাইবার সময় সে নবীনকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছিল।

আমার বিধবাবস্থা বা দুঃখের কথা।

স্বামীর মৃত্যুর দিন পনের পরেই আমার সেজ দেবর প্রথম আমার উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। তেতালার ঘরে যে বড় খাটে আমার স্বামী শুইতেন ঘরের কপাট ভাঙ্গিয়া সে খাট খানি আমার সেজ দেবর লইয়া গেলেন, আমি কাঁদিলাম। জিনিষের লোভে যে আমি কাঁদিলাম তাহা নয়, কাঁদিলাম এই জন্য যে, তিনি যাইতে না যাইতেই ইহাঁরা আমার সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। আমার শাশুড়ী মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন, তাহাতে আমার বড় ভয় ও দুঃখ হইল। ভাবিলাম আমি কেন কাঁদিলাম। তাতেইত তিনি এই কষ্ট পাইলেন। মনকে বলিলাম তাহাদের ভাইএর জিনিষ তাহারা লইবে আমি কেন দুঃখ করিব? আমিত আর বাপের বাটী হইতে আনি নাই। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমার ক্রমে ক্রমে এক ভয় হইল। আমি সব সময় আমার ছেলে মেয়েদের লইয়া এক ঘরে দরজা দিয়া পড়িয়া থাকিতাম। ভয়ে ভয়ে ভাবিতাম যদি ইহারা আমাকে ছেলে মেয়ে শুদ্ধ তাড়াইয়া দেন তবে আমি কোথায় যাইব? এইরূপে আমার দিন যাইতে লাগিল। তিনি বৈদ্যনাথে যাইবার পূর্ব্বে ভাগের যে সব শাল সিন্ধুকে চাবি দিয়া তাঁহার মার নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই সিন্ধুক খুলিয়া আমার সেজ দেবর সমস্ত শাল বাহির করিয়া লইয়া গেলেন। ভাশুর বলি- [illegible] আমি তোদের নূতন শাল কিনিয়া দিব। তিনি নিজে যে দুই খানি শাল ব্যবহার করিতেন তাঁর চিহ্নস্বরূপ আমি সেই দুই খানি শাল চাহিয়া পাঠাইলাম। তাহার এক খানি মাত্র দিলেন। ইহার পর আর আমি কিছুই বলিলাম না। কোনও কথাতেই থাকিলাম না। স্বামী যাওয়ার এক বৎসর পর আমার বড় মেয়েটীর মৃত্যু হয়। আমার এই মেয়েটী বড় ভাল ছিল, তাহার শোকে আমি একেবারে অধীর হইয়া পড়িলাম। এই শোকের কিছুদিন পরেই আমার শাশুড়ীর মৃত্যু হয়। সেই বৎসরেই আমার প্রিয়তমা ননদ বিন্দুরও মৃত্যু হয়। এই উপর্য্যুপরি শোকেতে আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিলাম। পাগলের মত হইয়া বাহির হইলাম।

সাধ্বী ফাতেমা দেবী।

সাধ্বী ফাতেমা এস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মোহম্মদের প্রিয়তমা কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। তিনি খদিজা দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি মক্কা নগর। তিনি মদিনা নগরে মহাত্মা আলির সঙ্গে উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন, মহাপুরুষ মোহম্মদের পরলোকযাত্রার অব্যবহিত পরে দুইটি শিশু পুত্র কুমার হসন ও কুমার হোসয়নকে পৃথিবীতে রাখিয়া পরলোকে যাত্রা করিয়াছিলেন।

ফাতেমা দেবী স্বীয় পিতৃদেবের প্রতি [illegible] ভক্তিমতী ছিলেন। তাঁহার

প্রবল ধর্ম্মভাব ও জ্বলন্ত বৈরাগ্য ছিল। মহাপুরুষ মোহম্মদ মক্কা নগরে অংশিবাদী পৌত্তলিক কোরেশ জাতির মধ্যে এস্লাম ধর্ম্ম—একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের পূজা-বিধি প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি পৌত্তলিক কোরেশ দল ভয়ঙ্কর অত্যাচার করে, তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়।

একদা কোরেশগণ কাবা মস্জেদের প্রাঙ্গণে সম্মিলিত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করে যে, মোহম্মদকে পাইবামাত্র তাহার শিরশ্ছেদন করিব। প্রতিজ্ঞার কথা ফাতেমা দেবী শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হন। তখন হজরত মোহম্মদ স্থানান্তরে ছিলেন, কিয়ৎক্ষণ অন্তর গৃহে যাইয়া দেখেন ফাতেমা অতিশয় বিষণ্ণা ও শোকাকুলা। তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অবিরল অশ্রুবৃষ্টি হইতেছে। কন্যার এই অবস্থা দেখিয়া পিতা আকুল হইলেন, এবং সস্নেহ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে, তোমার কি দুঃখ উপস্থিত? তুমি কেন কাঁদিতেছ, প্রকাশ করিয়া বল" তখন কুমারী বলিলেন, "দেব, শত্রুবর্গ তোমাকে হত্যা করিবার জন্য শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আজ কিছুতেই রক্ষা পাইবার উপায় দেখিতেছি না।" ইহা শুনিয়া উক্ত মহাপুরুষ বলিলেন, "কল্যাণি, চিন্তা করিও না, কাহার সাধ্য তোমার পিতাকে বধ করে। আমি বিশ্বাসরূপ বর্ম্মে আচ্ছাদিত, প্রার্থনারূপ অস্ত্র আমার হস্তে আছে। ভয় কাহাকে করিব?" এই বলিয়া তিনি নমাজে প্রবৃত্ত হন, সেই উপাসনাতে অলৌকিক তেজ ও জ্যোতি, সাহস ও বীর্য্য লাভ করিলেন; উপাসনান্তে যেখানে কোরেশদল তাঁহাকে বধ করিবে বলিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল সেই স্থান দিয়া গমন করিলেন। তাহারা তাঁহার তেজঃপুঞ্জ মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, এমন এক স্বর্গীয় তেজ মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। প্রহার করিতে হস্তোত্তলন করিবে দূরে থাকুক, কাহারও একটী কথা কহিবার ক্ষমতা হয় নাই। সেই সময় পিতৃদেবকে বিপদুত্তীর্ণ দেখিয়া ফাতেমা দেবীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

এক দিন হজরত মোহম্মদ একটি প্রকাশ্য স্থানে নমাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন অনেক ক্ষণ ভূতলে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক ভাবে মগ্ন হইয়া প্রণত ছিলেন। অদূরে একটি উষ্ট্রের অস্ত্রপুঞ্জ পতিত ছিল। ইতিমধ্যে হজরত মোহম্মদের প্রধান শত্রু আবুজহলের ইঙ্গিতক্রমে এক দুরাত্মা কোরেশ শোণিতলিপ্ত সূক্ষ্ম অন্ত্র সকল কুড়াইয়া আনিয়া হজরতের স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করে। তিনি তদবস্থাতেই প্রণতভাবে থাকেন, আঁত সকল আপন পৃষ্ঠে বহন করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া শত্রুগণ অট্টহাস্য করিয়া এক জন অন্য জনের উপর পড়িতেছিল। ফাতেমা দেবী পিতার এই অপমান ও লাঞ্ছনার বিষয় শুনিয়া গৃহ হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আইসেন, এবং পূজনীয় পিতার পৃষ্ঠদেশ হইতে অন্ত্র সকল তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন।

হেজরী দ্বিতীয় বৎসরে রজব বা সফর মাসে মহাপুরুষ মোহম্মদের একান্ত প্রেমাস্পদ মহাত্মা আলির সঙ্গে ফাতেমা দেবীর শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। যে মাসে বিবাহ হইয়াছিল তাহার পরমাসেই জফাফ অর্থাৎ যথারীতি তিনি স্বামিসন্নিধানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ফাতেমা হজরত মোহম্মদের একান্ত স্নেহ ও আদরের পাত্রী ছিলেন। খদিজা দেবী মৃত্যুকালে তাঁহাকে হজরতের হস্তে সমর্পণ করিয়া তৎপ্রতি বিশেষ স্নেহ দৃষ্টি রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। উপযুক্ত সৎপাত্রের সঙ্গে তাঁহার উদ্বাহবন্ধন হয় হজরতের নিতান্ত আগ্রহ ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, স্বীয় প্রেমাস্পদ ভ্রাতা নব যুবক আলিই ফাতেমার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। পরম রূপবতী ও গুণবতী ফাতেমা দেবীর যৌবন কাল, ধনৈশ্বর্য্যশালী সম্ভ্রান্ত কোরেশ যুবকগণ তাঁহার সঙ্গে পরিণয়ের প্রার্থী। হজরত তাঁহাদের প্রার্থনাতে কিছুই মনোযোগ বিধান করিতেছিলেন না। ইহা দেখিয়া এক দিন হজরতের প্রচারবন্ধু আমির আবুবেকর হজরতের নিকটে ফাতেমা দেবীর বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তাহাতে তিনি বলেন, "ঈশ্বরের আজ্ঞার উপর এ কার্য্যে নির্ভর স্থাপন করিয়াছি। আমি আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতেছি।" অন্য এক দিন আমির আবুবেকর তাঁহার বন্ধু ওমরফারুক ও সয়িদ প্রভৃতি পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করেন, "কোরেশ দলপতিগণ এই কন্যারত্নকে গ্রহণ করিবার জন্য লালয়িত, কিন্তু হজরত কাহারও প্রার্থনা শ্রবণ করিতেছেন না। আলি এক্ষণও বিবাহ করেন নাই, এবং তিনি বিবাহের ইচ্ছাও প্রকাশ করেন নাই। বোধ হয় দরিদ্রতাই তাঁহার উদ্বাহের প্রতিবন্ধক হইয়াছে। আলির জন্যই ফাতেমার পরিণয় ক্রিয়ার বিলম্ব হইতেছে। ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ আলির সঙ্গে ফাতেমার পরিণয়ই অনুমোদন করিয়াছেন। আলি যদি অর্থাভাববশতঃ বিবাহে আপত্তি করেন, আমরা তাঁহাকে সাহায্য দান করিব।" এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া তাঁহারা তিন জনে মিলিয়া আলির নিকট গমন করেন। আমির আবুবেকর কথা প্রসঙ্গে বলেন, "আলি, তুমি হজরতের অতিশয় আদরের পাত্র, তাঁহার নিকটে তোমার যেরূপ গৌরব এরূপ অন্য কাহারও নয়। কোরেশ বংশীয় প্রধান পুরুষগণ কুমারী ফাতেমার পাণিগ্রহণের প্রার্থী হইয়াছিলেন, হজরত তাঁহাদের কাহারও প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই। আমার বোধ হয় তিনি তোমার হস্তে ফাতেমাকে অর্পণ করিতে চাহেন। তুমি কেন ফাতেমার পাণিগ্রহণের প্রার্থী হইতেছ না?" আলি এই কথা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিলেন, "দেব আবুবেকর, আর বায়ু সঞ্চালন করিবেন না, মনের অনুরাগানলকে অনেক কষ্টে প্রশমিত করিয়া রাখিয়াছি। এ বিষয়ে আমার ইচ্ছা আছে কি না আপনি আর আমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন? এ সম্বন্ধে আমার যেরূপ অভিলাষ বোধ করি অন্য কাহারও সেরূপ নহে,

কিন্তু দরিদ্রতা ইহার প্রতিবন্ধক হইয়াছে, এই কথা উত্থাপন করিবারও আমার ক্ষমতা নাই।" আবুবেকর বলিলেন, "আলি, এ প্রকার বলিও না, ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের নিকট পার্থিব সম্পত্তির কোন মূল্য নাই, সম্ভবতঃ অর্থকৃচ্ছ্র ও দরিদ্রতা কোন প্রকার এ বিষয়ে প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না।" ইহা শুনিয়া আলি মহাপুরুষ মোহম্মদের নিকট চলিয়া যান। হজরত মোহম্মদ তখন তাঁহার অন্যতর সহধর্ম্মিণী ওম্মসোলমার গৃহে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। আলি উপস্থিত হইলে তাঁকাকে পরম সমাদরে গ্রহণ ও আশীর্ব্বাদ করিলেন। যেমন কাহারও কোন বিষয়ে অভিলাষ আছে, সে লজ্জাবশতঃ তাহা ব্যক্ত করিতে না পারিয়া অধোমুখে বসিয়া থাকে, সেই ভাবে আলি অবনত মস্তকে উপবিষ্ট রহিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আলি, বোধ হইতেছে তোমার মনে কোন আকাঙ্ক্ষা আছে, তুমি লজ্জাবশতঃ তাহা বলিতে পারিতেছ না। কি অভিলাষ বল, সঙ্কুচিত হইও না। আমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে যত্নবান্ হইব।

ক্রমশঃ।

দুর্ভিক্ষে মহিলাদিগের কর্ত্তব্য।

মহিলার পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকে এমন আছেন যাঁহাদের ক্ষুধা না হইতেই আহারীয় সামগ্রী উপস্থিত হয়, যাঁহারা একরকমের খাবার জিনিষ দুদিন খাইতে বাধ্য হইলে অত্যন্ত বিরক্ত হন, তাঁহাদিগের নিকটে দুর্ভিক্ষের কথা বলা একটু কঠিন। তবে বিধাতার বিচিত্র ব্যবস্থাতে ক্ষুধার জ্বালা সকলকেই কোন না কোন সময়ে অনুভব করিতে হয়। এই জন্য দুর্ভিক্ষের কথা বলিতে পেটের ক্ষুধার জ্বালার কথা মনে করাইয়া দিয়া আরম্ভ করিতেছি। পাঠিকা, একবার ক্ষুধার যাতনার কথা মনে করিয়া দেখুন! তখন কেমন ক্লেশ হয়, কিয়ৎক্ষণ আহার না পাইলেই হাত পা ঝিম্ ঝিম্ করিতে থাকে, দাঁড়াইতে হাঁটু কাঁপে, সর্ব্বাঙ্গ কাদার মত ঘামে ভিজিয়া থাকে। এই অবস্থা আরও দীর্ঘকাল হইলে ক্রমে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যায়, কাণ আর শুনিতে চায় না, পেটের ভিতরে ভয়ানক জ্বালা হয়, পরে শরীর একেবারে ভগ্ন হয়, মানুষ পাগলের মত হইতে থাকে। এত দূর পর্য্যন্ত অবশ্য সাধারণতঃ কাহারও ঘটে না—যাঁহার যতটুকু ঘটিয়াছে তিনি তার পরের অবস্থা কতটা অনুমান করিয়া বুঝিতে পারেন। এই অন্নের অভাব যদি ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হয়, দিন দিন অধিকতর অভাব হইতে থাকে তবেই আমরা বলি দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ উপযুক্ত পরিমাণে উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী না পাইলেই নানারূপে উদর পূর্ণ করিতে চেষ্টা করে—কখনও গাছের পাতা, কখনও কচুর ডাঁটা, মাটি পর্য্যন্ত খায়, তাহাতে কাহারও২ পেট অত্যন্ত বড় হয়—সর্ব্বাঙ্গ শুকাইয়া যায়, শেষে এমন আকার হয় যে, মানুষের মুখ বানরের মুখের মত হয়; দেখিয়া পুরুষ কি, নারী চিনিতে পারা যায় না; পাকস্থলী পরিপাক

করিতে কিছু না পাইয়া আপনার আগুনে আপনি পুড়িতে থাকে, শেষে পাকস্থলী অত্যন্ত ছোট হইয়া যায়, এবং পরিপাক করিবার শক্তি আর থাকে না। এ সময়ে দুর্ভিক্ষার্তব্যক্তি পাগলের মত হইয়া বেড়ায়, কোন স্থানে কোন আহারীয় প্রচুর পরিমাণে পাইলে আকণ্ঠাপূর্ণ করিয়া আহার করে, তাহাতেই অনেক সময় মরিয়া যায়; কখনও বা ক্রমে ক্রমে আহার দিতে আরম্ভ করিলেও পরিপাক শক্তি আর ফিরিয়া আসে না—আমাশার মতন রোগ ও সম্পূর্ণ অক্ষুধা হইয়া মরিয়া যায়। মানুষের মরিতে হইবেই—মৃত্যুকে ভয় করা কিছু বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়, কিন্তু দুর্ভিক্ষের মৃত্যু—অতি ভয়ানক মৃত্যু—এ মৃত্যু স্মরণ করিতেও শরীর রোমাঞ্চ হয়। অথচ আমাদের দেশে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ হইতেছে। পূর্ব্বকালেও দুর্ভিক্ষ হইত, তবে তখনকার তেমন পরিষ্কার দুর্ভিক্ষ বিবরণ লেখা নাই, কিন্তু ইদানীং এ দুর্ভিক্ষের অনেক বর্ণনা আমরা শুনিয়া থাকি, এবং স্বচক্ষেও অনেকে দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা দেখিয়াছি। আমাদের দেশের বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তৃগণ দুর্ভিক্ষনিবারণের অনেক চেষ্টা করিয়া থাকেন। ক্রমে এ বিষয়ে তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীও উত্তম হইতেছে, এবং এ জন্য প্রভূত অর্থব্যয় ও অনেক সুযোগ্য সহকারী কর্ম্মচারীও নিযুক্ত থাকেন। মার্চ্চ মাসের শেষে এক অযোধ্যা ও আগ্রাযুক্ত প্রদেশে প্রায় ১৪ শত লোক দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীদিগের নিকটে যত লোক দুর্ভিক্ষপীড়িত বলিয়া উপস্থিত হইয়াছে প্রকৃত দুর্ভিক্ষ পীড়িতের সংখ্যা তাহা হইতে অনেক অধিক, ইহা নিশ্চয় কথা। ইহা ব্যতীত উড়িষ্যা ও অন্যান্য স্থানেও অনেক লোক অন্নাভাবে মারা যাইতে বসিয়াছে। এবার আমাদের গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের নিবারণের জন্য চারি কোটী টাকা ব্যয় করিতে বোধ হয় প্রস্তুত। ইহাতে মহিলার পাঠিকাগণ মনে করিতে পারেন যে, সরকার হইতে কোটী কোটী টাকা ব্যয় হইবে তবে আর তাঁহাদের এ বিষয় কিছু করিবার বা ভাবিবার প্রয়োজন নাই। এখানে একটী কথা বলিলে পাঠিকারা আপনাদের গৌরবের স্থান ও দেবতার অধিকার বুঝিতে পারিতেন। সদ্যজাত বা অতি ক্ষুদ্র শিশুর সেবা বা অত্যন্ত ক্ষীণরোগীর শুশ্রূষা হাঁসপাতালে ভাল হয়? না শিশুর মা, অথবা রোগীর স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নী বা অন্য আত্মীয়া দ্বারা ভাল হয়? হাঁসপাতালে টাকার অভাব নাই, জিনিষ পত্রের অভাব নাই, জ্ঞান বা কৌশলের অভাব নাই, কিন্তু হাঁসপাতাল যে কল, কৃত্রিম ব্যবস্থা, স্বভাবের জীবন্ত ভাব সেখানে আসিবে কিরূপে? গবর্ণমেণ্টের লোক আছে, টাকা আছে জ্ঞান আছে, কিন্তু সেবা করিতে যে মায়ের প্রাণ চাই, নিঃস্বার্থ প্রেম চাই, তাহা গবর্ণমেণ্ট পাইবেন কোথা হইতে? সরকারী ব্যবস্থাতে মজুর শ্রেণীর লোকেরা স্ত্রীপুরুষে খাটিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে। সরকারী ব্যবস্থাতে অত্যন্ত দুর্ব্বল ব্যক্তিরা বসিয়া আহার পাইতে পারে; কিন্তু যেখানে

মানুষ মরিতে প্রস্তুত, তথাপি দরখাস্ত করিয়া আপনার স্ত্রী, মাতা কন্যা প্রভৃতির বয়স ইত্যাদির বর্ণনা দিয়া, দারিদ্র্য জানাইয়া সাহায্য চাহিতে প্রস্তুত নয় যে স্থানে ২।৪টী কোমল প্রাণ লোক অল্প সাহায্য দিয়াও অনেক গৃহস্থের আত্মসম্মান ও প্রাণরক্ষা করিতে পারেন। খৃষ্টিয়ান প্রচারকগণ শত শত লোককে আহার দিয়া এইরূপে বাঁচাইতেছেন, আর্য্য সমাজের সেবকগণ কত অনাথ বালক বালিকার ভার লইয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে এলাহাবাদে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার সেবার কার্য্য করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দিরের উপাসকমণ্ডলী কয়েক জন সেবককে অযোধ্যা অঞ্চলের দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সেবার জন্য পাঠাইতেছেন। ইঁহারা সকল সহৃদয় ব্যক্তিগণের দান গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের শারীরিক পরিশ্রম ও নিঃস্বার্থ প্রেমে সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে ইচ্ছা করেন। দুর্ভিক্ষে কেবল অন্নের অভাব হয় তাহা নয়, বস্ত্রেরও ভয়ানক অভাব হয়। বরং লোকে ভিক্ষা করিয়া এক মুষ্টি অন্ন কখনও পায়, কিন্তু বস্ত্র প্রায় কোথাও পায় না। এজন্য পুরাতন বস্ত্র একখানি পাইলে গরিবদের লজ্জা নিবারণ হয়। অনেক পুরাতন কাপড়ের বদলে দুই এক খান হালকা খেলো বাসন ইত্যাদি লওয়া কলিকাতার মেয়েদের অভ্যাস। এসময়ে যদি সেই সামান্য লাভটা ভুলিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের জন্য পুরাতন কাপড় দুর্ভিক্ষের স্থানে পাঠাইয়া দেন তবে গরিবদের মহা উপকার হয়।

মহিলার পাঠিকাগণের নিকট দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের জন্য আকুল নিবেদন করিতেছি, দেশের শত সহস্র নরনারী অন্ন বস্ত্রের অভাবে মহাক্লেশ পাইয়াছেন, সকলে সাহায্য করুন, এই বলিয়া মহা চিৎকার উপস্থিত করিতেছি, ইহাতে কি মহিলাগণ মনে করিবেন যে, ভগবান্ বড় বিপদে পড়িয়াছেন, তিনি আপনার পুত্র কন্যাগণকে অন্ন বস্ত্র দিতে পারিতেছেন না, সেইজন্য মানুষের সাহায্য চাহিতেছেন? এরূপ মহাভ্রম যেন কেহ করেন না। আমাদের ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও অনন্ত দয়া। তিনি স্বয়ং সকলের জীবনের সকল ভার আপনি বহন করেন, আমরা যে প্রতিদিন প্রচুর অন্নজল পাই ইহার প্রতি কণা তাঁহার কৃপার দান, তিনি আপনি প্রেম করিয়া ক্ষান্ত নহেন, তিনি তাঁর পুত্র কন্যাগণকে নিঃস্বার্থ সেবা শিখাইবেন, মানুষের ভিতরের গুপ্ত শুদ্ধ প্রেম জাগাইয়া তাহাকে প্রেম স্বভাব প্রেমময় করিবেন বলিয়া এক একটা বিশেষ ঘটনা উপস্থিত করেন। দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের দুঃখের কথা শুনিয়া যাঁহার প্রাণে দুঃখ হইবে, এবং সেই দুঃখে যিনি শ্রদ্ধার সহিত অন্ন বস্ত্র দান করিতে পারিবেন তিনি প্রেম স্বভাব অর্থাৎ দেব স্বভাব লাভ করিবেন। যদি শুদ্ধ প্রেমে পৃথিবীর অর্থ শক্তি বা প্রাণ দিলে প্রেমময়কে লাভ হয়, যদি মানুষকে ভাল বাসিয়া সেবা করিয়া দেশে মঙ্গলময়ের রাজ্য বিস্তার হয়, আমরা সকলে প্রেমরাজ্য প্রবেশ করিতে পারি, তবে এমন শুভ সুযোগ যেন কেহ ত্যাগ না করেন।

আমরা নীচ সংসারী, আমাদের শুদ্ধ প্রেম শিক্ষা দিতেই এ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, ইহা মনে রাখিয়া সকলে এসময়ে দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে যাহা দিতে পারেন তাহা দিয়া কৃতার্থ হউন। পাঠিকাগণের নিকট নিবেদন, দুর্ভিক্ষবিষয়ে যে সকল কঠোর জ্ঞানের কথা আছে; সরকারের সমালোচনা করিয়া যে ক্ষুদ্র তৃপ্তি আছে তাহা ভুলিয়া দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া বা দুঃখের সংবাদ শুনিয়া যে স্বাভাবিক দয়া উপস্থিত হয় তাহা দ্বারা পরিচালিত হইয়া দান করুন। ভগবানের সন্তান ক্ষুধায় ক্লেশ পাইতেছে. ভগবান্ আপন ক্ষুধার্ত্ত সন্তানকে কোলে করিয়া নিঃশব্দে বলিতেছেন, ভিক্ষা দাও! কোন্ মহিলা এসময়ে সাধ্যানুসারে দান করিতে বিরত থাকিবেন?

শোকাতুরা জননীকর্ত্তৃক শিশুর চরিত্র বর্ণন।

"১৩০৮ সনের ২৭শে আষাঢ় তাহার জন্ম হয়, ১৩১৪ সনের ১০ই বৈশাখ সে আমাদিগকে ছাড়িয়া বিশ্বজননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহার বয়স পূর্ণ ছয় বৎসর হইয়াছিল, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তাহার যেরূপ বুদ্ধি ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ছিল, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। তাহার যখন ১০ মাস বয়ঃক্রম তখন ঢাকা নগরীতেখুব ভাল এক জন জ্যোতির্বিদ্ দ্বারা তাহার জন্মপত্রিকা রাখি, জ্যোতির্বিদ্ তাহার কুষ্ঠি তৈয়ার করিয়া আসিয়া বলিল, "এ ছেলে বাঁচিলে কালে এক জন মহৎ লোক হইবে, মাহেন্দ্রক্ষণে তাহার জন্ম হইয়াছে, সে বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে রাজ-সম্মান পাইবে, এবং খুব ধার্ম্মিক হইবে। কিন্তু পূর্ণ ছয় বৎসরের সময় একটা বৃহৎ ফাঁড়া আছে, এই ফাঁড়া কাটিলে সে এক জন মহাপুরুষ হইবে। এখন ভগবান্ ভরসা, তাহার কি ইচ্ছা তিনিই জানেন।" তারপরও আমি কয়েক জনকে কুষ্ঠি দেখাইয়াছি সকলেই খুব ভাল বলিয়াছেন, কিন্তু ফাঁড়ার কথা কেহ বলেন নাই। আমাদের পরিবারে সকলেই তাহার কুষ্ঠির কথা জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন, কিন্তু আমার হৃদয়ে বিষাদের কালিমা অজ্ঞাতে রহিয়া গেল, তাহার পাঁচ বৎসর বয়স হওয়ার পর হইতে সর্ব্বদাই প্রাণ কাঁপিত। তখন হইতে সে যখন যাহা খাইতে চাহিত, আমি যেরূপেই পারিতাম তাহাকে দিতাম, আমার মনে হইত আর বুঝি তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। গত বৎসর চৈত্র মাসেও আমার প্রবল জ্বরের অবস্থায় তাহাকে আমি নানারূপ মিষ্টি তৈয়ার করিয়া দেই। এজন্য সকলেই বলিত আমার মাথা খারাপ হইয়াছে।

"সে অতিশয় পিতৃভক্ত ছিল, দেড় বৎসরের বয়স হইতে সে তাঁহার সঙ্গে খাওয়া, স্নান, রাত্রে শোওয়া সবই করিত, সময় সময় যদি তাঁহাকে ছাড়া হইত কাঁদিয়া অস্থির হইত, এবং অসুখে ভুগিত। তিনিও বিমলকে ছাড়িয়া বেশী দিন থাকিতে পারিতেন না। পরমেশ্বরের প্রতি তাহার বেশ অনুরাগ ছিল, ২॥০ বৎসর বয়স হইতেই সে ঈশ্বরের উপাসনা

করিত, বাড়ীতে পূজা করা, ফুল আনা ইত্যাদি কাজ তাহার খেলা ছিল। ঈশ্বর কোথায়, ঈশ্বর জিনিষটা কি ইত্যাদি বিষয়ে কত প্রশ্ন করিত। ৪।৫ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় দুবেলা নিয়মিত সময়ে উপাসনা করিত। আমাকে সর্ব্বদাই বলিত, মা আমাকে একটা মন্ত্র শিখাইয়া দেও না কেন? তাহার অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া আমি অসহায় শিশু আমি, ক্ষুদ্র আমি, ইত্যাদি একটা যে সুন্দর কবিতা আছে তাহা লিখিয়া দেই, সেও দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত দু বেলা উহা পাঠ করিত, অন্যান্য বাসায় গেলে ঈশ্বরবিষয়ে কত গল্প করিত। যদি তাহাকে কেহ বলিত, ঈশ্বর আবার কি? তাহাতে সে তর্ক করিয়া বলিত, "আপনি বলেন কি, ঈশ্বর সবখানে আছেন, ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না, ঈশ্বর সব দেখেন। বাবা বলিয়াছেন, ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরই তো আমাদের সব দিয়েছেন।" অমুক কাজ করিলে পরমেশ্বর ভাল বাসিবেন, এসব বিষয়ে খুব দৃষ্টি ছিল, আমি একদিন বলিয়াছিলাম, বাপ রে বাপ, কি দুষ্ট। এমন দুষ্ট ছেলে কোথাও দেখি নাই। সে তাহার উত্তর করিল, "আমার কি দোষ, ঈশ্বর দুষ্ট করিলেন কেন?" আমি বলিলাম, ঈশ্বর কি তোমাকে দুষ্টামি করিতে বলিয়াছেন? সে বলিল, "মা ঈশ্বর বলিবেন কেন, সংসারে সব ঈশ্বর দেন, দুষ্টামিও ঈশ্বরই দিয়াছেন। আমি তো উপাসনার সময় বলি যে, আমাকে ভাল কর, আমার খাবার জিনিষ দেখিলেই বড় লোভ হয়, তাহা দূর কর, কিন্তু আমি পারি না, জিনিষ দেখিলেই খাইতে ইচ্ছা হয়।" সে উপাসনা করিয়া আমাদের প্রণাম করিত। ধ্রুব প্রহ্লাদ, ও চন্দ্রহাঁসের গল্প ছাড়া অন্য গল্প শুনিতে চাহিত না, ধ্রুব যখন বিমাতার বাক্যে বনে যান, এবং কাপড় পরিবার জন্য কান্না করিয়াছিলেন, চন্দ্রহাঁসকে যখন দস্যুরা বনে কাটিতে গিয়াছিল, এসব বলার সময় তাহার চক্ষু ছল ছল করিত। এত বিপদে তাহারা ঈশ্বরের কৃপায় রক্ষা পাইল, এসব বলিয়া কত কথা বলিত। তাহার মনে এইটা খুব বিশ্বাস হইয়াছিল, ভগবান্ সহায় থাকিলে কোন দুঃখ হয় না। এক জনের অনুরোধে যদি অন্য গল্প বলিতে চাহিয়াছি, কাণে আঙ্গুল দিয়া রহিয়াছে। সেসব গল্প বলিলে সারাদিন এক জায়গায় থাকিলেও বিরক্ত হয় নাই। পড়াতে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, একবারের বেশী দুবার তাকে একদিনও পড়িতে দেখি নাই। দ্বিতীয় ভাগে এত যে কঠিন শব্দ, তাহাও একবার ছাড়া দুবার পড়ে নাই, অথচ একদিনও পড়াতে ঠেকে নাই। স্কুলের মাষ্টার তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। প্রাতে উপাসনা ও নিজের পড়া না পড়িয়া কিছু করে নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে এত দুষ্ট ছিল, কেহ কোন দিন তাহার দুষ্টামিতে বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই, বরং হাফলংএ প্রত্যেকের বাসাতেই বেশী রকম আদর পাইয়াছে। সকলেই বলিত এমন বুদ্ধিমান্ ও প্রিয়দর্শন বালক আমরা দেখি নাই, আর এরূপ মিষ্ট কথা খুব কমই শুনি। একদিন আভা আমার কাছে একটা কলা চাহিয়াছিল। তাহার জ্বর থাকাসত্বে

আমি বলিয়াছিলাম, কলা নাই, সন্ধ্যা বেলা আমি তাহাকে দুধের সঙ্গে কলা দিয়াছিলাম. সে তৎক্ষণাৎ আমার মুখের কাছে আঙ্গুল নাড়িয়া বলিতে লাগিল "সত্য বাক্য সমাদর পায় যথা তথা, সদা সত্যবাদী হও ত্যাজ মিথ্যা কথা।" আমি বলিলাম. তুই ভারি বেয়াদব হইয়াছিস। সে বলিল, 'আমার কি দোষ, তুমি ঘরে কলা থাকা-সত্ত্বে কেন নাই বলিলে? এইটী মিথ্যা কথা হইলনা?' একদিন ছুটুকে তোর কথা গুলি বড় নীরস ইত্যাদি বলিয়া মন্দ বলিয়াছিলাম সে তাড়াতাড়ি ছুটুর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া 'নীরস কুবাক্য সদা মুখে ফুটে যার, লোক সনে ঐক্য সৈখ্য রহে না তাহার।' বলিয়া দৌড়িয়া অন্য বাসায় চলিয়া গেল। এই রূপ কত দিনের কত কথা লিখাও দুষ্কর, এত সময়ও আমার নাই। তাহার কিছু হাপানীর দোষের মত হইয়াছিল, জোর জোর খুব টান উঠিত. সে সর্ব্বদাই বলিত, মা, তুমি আমার একটা ঔষধ দেও, তবেই ভাল হইব। তার পর একট টোট্‌কা ঔষধ কবচে দিয়া হাতে বাঁধিয়া দেই, এবং বলি, দুবেলা উপাসনা করিবে, এবং ঠাণ্ডা লাগলে কিন্তু ঈশ্বর রাগ করিবেন। কবচের নিয়ম না রাখিলে কবচ হাতে থাকিবে না। সে ইহার নিয়ম বেশ প্রতি-পালন করিয়াছে। যদি কোন দিন দেরী হইত, তবেই বলিত আমার আসল কাজ রহিয়াছে, কবচের কাজ বাকী আছে। ঈশ্বরের উপাসনা করি নাই, আমার মনে না থাকিলে তোমরা কেন মনে করাও না?

মৃত্যুর ৮।৯ দিন পূর্ব্বে সে এক দিন অত্যন্ত বিরস বদনে স্কুল হইতে আসে। আমি বলিলাম, আজ বুঝি পড়া বলিতে পার নাই? মাষ্টারমহাশয় বুঝি মারিয়াছেন। সে বলিল, 'না আমি এক দিনও পড়াতে ঠেকি নাই, মাষ্টার মহাশয় আমাকে খুব ভাল বাসেন, বাবা যে সেদিন আমাকে খুব শাসন করিতে মাষ্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন তাতে পণ্ডিত মহাশয় আমার পিঠে হাত বুলাইয়া বলেন, 'এমন ছেলেকেও কিছু বলা যায়? এরূপ মিষ্ট কথা! এরূপ দুষ্টামী করিলে কি হয়? আমাকে তাহারা কিছু বলে না, আমি আজ একটা কথাতে বড়ই মনে কষ্ট পাইয়াছি, স্কুলে পণ্ডিত মহাশয়ের পড়া দিবার জন্য পড়িতেছি, যে মানুষ মরিলে শ্মশানে নিয়া ছাই করে, আমি ইহা পড়িবামাত্র আমার পিছন থেকে একটা নাগা ছাত্র বলিয়া উঠিল যে, বিমল মরিয়াছে, বিমলকে শ্মশানে লইয়া ছাই করিয়াছে। সে ইহা বলিয়া কাঁদিয়া বলিল, 'মা আমাকে সত্য করিয়া বল, যদিই আমি মরিয়া যাই, তবে সত্যই কি আমাকে শ্মশানে লইয়া গিয়া ছাই করিবে? আমার যে ভাবিতে কেমন লাগে। তাহার এই কথাতে আমার প্রাণটা যেন কাঁপিয়া উঠিল, আমি তাহাকে কোলে লইয়া অন্য কথায় ভুলাইতে লাগিলাম। তার পর উনি আফিস হইতে আসিলে তাঁহার কাছেও বলিতে লাগিল, তিনি কোলে লইয়া তাকে আদর করিতে লাগিলেন। সে কাঁদিয়া আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। উহা আমার হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া

রহিয়াছে, তাহার আকস্মিক মৃত্যুর ৩। ৪ ঘণ্টা আগেও আমাকে সে বলিয়াছে, 'মা, আমার মাথাটা জানি কেমন করে? বেদনায় অস্থির, আমি তো আজ কবচের নিয়ম পালন করিতে পারিলাম না, উপাসনা করিতে পারি না, বসিতে পারি না।' আমি বলিলাম, আচ্ছা ভাল হইলে উপাসনা করিও। সে ব'লল, 'শুইয়া শুইয়া আমি ঈশ্বরের কাছে আমার কষ্ট দূর করিতে, মাথার যন্ত্রণা দূর করিতে বলিয়াছি।' দয়াময় তাহার সরল ও ভক্তিপূর্ণ আহ্বান শুনিয়া তাকে শান্তিধামে লইয়া গেলেন, দুঘণ্টার মধ্যে ময়না পাখী চিদাকাশে উড়িয়া গেল। আর লিখিতে পারিলাম না, প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে।

"তাহার গরীব দুঃখীদের প্রতি বড় দয়া ছিল, অন্ধ কিম্বা ভিক্ষুক আসিলে, কেবল চাউল দিয়া সুখী হইত না, ঘর হইতে তরকারী তৈল লুন মরিচ ইত্যাদি সব আনিয়া দিত, আর পয়সা দিত, যেদিন খুঁজিয়া পয়সা পায় নাই সেদিন বলিত, 'দেও না মা, একটী পয়সা, দুঃখী লোক চাহিতেছে।' যদি আমি কোন দিন ভিক্ষুককে শুধু চাউল দিতাম, তবেই পাকঘরে গিয়া সে আমার অজ্ঞাতসারে অন্যান্য জিনিষ দিত। আমি টের পাইলে আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিত। এক দিন তাহার গায়ের একটি ভাল কোট খুলিয়া এক গরিব ছেলেকে দিয়া আইসে, বাসায় আসার পর বলিল, 'রাজবাড়ী হইতে যে জেঠামহাশয় কোট দিয়াছেন তাহা আমি আজ দিয়াছি।' আমি বিরক্ত ভাবে বলিলাম, তোর সাথে আর পারি না, কেন ঘরে যে পুরাণ পিরাণ আছে তাহা দিতে পারিলে না? আমাদের জিজ্ঞসা না করিয়া কিছু দিও না। আর এত বড় ছেলেটীর গায় তোমার পিরাণ লাগিবে না। তখন সে বলিল, 'শীতে কাঁপিতেছে, বেরামে শরীর জীর্ণ শীর্ণ, পেটটা মোটা, বড় কষ্ট, তাই দিলাম; পিরাণ বেশী ছোট হয় নাই, হাতে ও পেটে কিছু ছোট হইয়াছে।' একগুয়ে স্বভাব ছিল। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে চালান যাইত না। সেজন্য একদিন কোন বিষয়ে নিজে সে কাজ করায় আমি বলিয়াছিলাম, তোমাকে দুজোড়া জুতা ব্যবহার করিতে নিষেধ করি, তবুও তুমি নূতন জুতা ব্যবহার কর। তার পর এক যোগে সব ছিঁড়িলে, কেমন হবে? এ শহর জায়গা নয় যে, সব সময় সব জিনিষ পাওয়া যায়। আর আমাদের ন্যায় গরীবের এত বাবুগিরি কেন? সে নিতান্ত দুঃখিতভাবে বলিল, 'মা, তুমি বল কি আমরা গরীব গরীব বলে কাদের? যারা লুণ লঙ্কা ভাতও পায় না। তিন বেলা চারি বেলা খাইতেছি, কাপড় পরি, সাট কোট পরি, জুতা মুজা পরি, দুধ মাছ তরকারি নানা প্রকার মিষ্টি খাইতেছি ঈশ্বর যে, সব দিয়াছেন গরীব কেমনে হইলাম।' সর্ব্বদাই বলিত, 'আমি বড় হইলে ডাক্তার সাহেব হইব. গরীব দুঃখীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিব, আর দুঃখীদের খুব টাকা পয়সা দিব।" এক দিন সে নিশান প্রস্তুত করিয়া বন্দেমাতরম্ বলিয়া খেলা করিতেছিল, ইহাতে একটি ভদ্রলোক হাসিয়া বলিল, 'খোকা, তোমার বাবা সরকারী কাজ

করে, তুমি বন্দেমাতরম্ বল, দেখিও সাহেব তোমাকে কি শাস্তি দেন।' সে বলিল, 'বা! আপনিতো বেশ মজার লোক, বাবা চাকরী করে বলিয়া বন্দেমাতরম্ বলিব না আমাদের দেশে সবাই বলে। সাহেব ভাল বিচার করে, অন্যায় বিচার করে না, বন্দেমাতরমের অর্থ জানেন কি? হে মাতৃ ভূমি তোমাকে বন্দনা করি। আমার দেশের কথা বলিব, তাতে সাহেব কেন আমাকে শাস্তি দিবে? আমি তো তাঁহাকে কিছু বলি না, আপনারা কেবল আমাকে ভয় দেখান।' আর কত লিখিব? তাহার বিষয় আমি ভুলিতে পারি না।"

সেবিকা—আপনার স্নেহের বৌমা।

প্রাপ্ত।

আর্য্যনারীসমাজের উৎসব-বিবরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্ত্রীর কণ্ঠস্বর প্রবল হলে বলে লজ্জা নাই। দাসী যারা, কোমল তাদের ব্যবহার হবে। কেবল জগজ্জননীকে সব ভালবাসা দিয়ে যাব। নিয়ে যাবো না। আমাদের যে মার কাছে অনেক জিনিষ চাবার আছে। শূন্য নিরাশ মনে যেন কেউ ফিরে না যায়; কেউ যেন বিষণ্ণ হয়ে ফিরে না যায়। আজ, যে যত পারি দেবার জন্য যেন সব নিয়ে যাই।

আমি সকলের বড় হব, যেন এ সাধ কারো না থাকে। দাসী হব, মার সেবা করবো, মার কাজ করবো।

মা নাম শিখেছি-আজ প্রাণ ভরে ডাকি। রত্নরাশি যা মা দিয়াছেন, যেন নষ্ট না করি। সবারে দিয়ে যাবো। দিবানিশি দাসী হয়ে সবার সেবা করবো। যেন মা, অহঙ্কারের দাসী না হই। প্রাণের ভিতর এসো। তোমায় মা ব'লে বক্ষে নিই। আজ দাসী নাম হৃদয়ে জীবনে অঙ্কিত হোক্। এ জীবন, সংসারে থেকে মলিন যেন না হয়। আনন্দলীলা দেখাচ্ছ। নিরাশা অন্ধকার দুঃখ কষ্ট ক্রন্দন ফেলে এসে আনন্দ স্রোতে ভেসে যাই। ভগ্নীগণ, এস মার কাছে যাই; মস্তকে বক্ষে হৃদয়ে তাঁর অভয় চরণ লয়ে যাই। সকল স্বর এক হোক্, মা তোমার নাম গান করবার উপযুক্ত হই। তাহলে সবাই বোলবে, এঁরা আর্য্যনারীর কাজ ক'রে গেছেন।

আজকার উৎসবের বিশেষ দিনে আমরা দাসীব্রত গ্রহণ ক'রে জগৎসংসারে ভক্তপরিবারে অমর হয়ে থাকি।

হে বিশ্বজননী, তোমার পুত্র কন্যা, ভক্ত সতী সাধ্বী কোলে ক'রে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ। শান্তিঃ। শান্তিঃ।

মহিলাদিগের রচনা।

বর্ত্তমান সময়ে নারীজাতির কর্ত্তব্য।

বিশ্বপতি ভগবান্ তাঁহার সৃষ্টির রমণীজাতিকে প্রকৃতি ও চরিত্রে অতি সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। লজ্জা, বিনয়, ধর্ম্মশীলতা পাতিব্রত্যপ্রভৃতি সদ্গুণে ভূষিত করিয়া কত সৌন্দর্য্য দান করিয়া-

ছেন! অতি প্রাচীন কালের রমণীগণের কত সদ্‌গুণ ও সতীত্বের মহিমার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তখনকার স্ত্রীলোকেরা কেবল গৃহকর্ম্ম করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, নানারূপ বিদ্যালোচনা করিয়া কত শিক্ষা লাভ করিতেন। তাঁহারা গণিত শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতি কত বিদ্যায় পণ্ডিতা নাম ধারণ করিয়াছিলেন। খনা লীলাবতী, মৈত্রেয়ী, দুর্গা, মীরাবাই এর জীবন রমণীকুলের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। সীতা সাবিত্রী দ্রৌপদী দময়ন্তী,এদের জীবন সতীত্বের জলন্ত দৃষ্টান্ত। সন্তানলালন সন্তানের চরিত্রগঠন প্রভৃতি গার্হস্থ্য জীবনের উন্নতিসাধনে নারীজাতি প্রধান অধিনায়িকা। ভারতের আদর্শ নারীগণ ভারতের সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। ভারতের এই আদর্শ নারী-চরিত্র সমগ্র সভ্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এ আদর্শ জীবনের গৌরব পাশ্চাত্যপ্রদেশেও প্রবেশ করিয়াছে। সুসভ্য ইংলণ্ড ভূমিও এই নারী চরিত্রের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছে। ভারতের কোন্ পুরাতন যুগে এই আদর্শ নারীসমূহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এখনও তাঁহাদের জীবনের প্রতিভা পৃথিবীতে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ইতিহাস ইহাদের উচ্চ আদর্শ জীবনের সাক্ষ্যপ্রদান করিবে। আবার যদি আমরা প্রাচীন নারী জাতি হইতে পাশ্চাত্য নারী-চরিত্রের দিকে ও দৃষ্টীপাত করি তাহা হইলে সে দেশের ও আদর্শ নারী-চরিত্রে একটা সুন্দর আভাস বুঝিতে পারি। পাশ্চাত্য ভূমিতে ও উচ্চ নারী-চরিত্র সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। সেবাপরায়ণা রমণী নাইটিঙ্গেলের জীবন-চরিত্র আলোচনা করিতে গিয়া কে না তাঁহাকে ভক্তির চক্ষে দৃষ্টিপাত করে? আতুর ও পীড়িতলোকদের সেবা ভক্তিমতী পাশ্চাত্য রমণীদিগেরর জীবনের অত্যন্ত মহৎ কার্য্য। এইরূপ অনেক পাশ্চাত্য আদর্শ নারীর ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই আদর্শ নারী-চরিত্রের অনু-করণে ভারতেও অনেক খৃষ্টীয় মহিলা দুঃখী দিগের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এদেশেও ইহাদের ভগিনী দল স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া দুঃখীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এইরূপ স্বর্গীয় আদর্শ নারী-চরিত্র কি আমাদের অনুকরণীয় নহে? আমাদের সম্মুখে সেবা ও কর্ত্তব্যের প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা কি এই সুবিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করি-বার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হই নাই? আমাদের উপর তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছায় কি একটা গুরুতর দায়িত্বের ভার আসে নাই? যদি আমাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য থাকে তবে আমরা দেখিতে পাইব যে, জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমাদিগের উপরে গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার আসিতেছে। আমরা যদি ভগবানের ইচ্ছা ও ইঙ্গিত না বুঝিয়া চলি, আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন পশু জীবন অপেক্ষা ও অকিঞ্চিৎকর হইবে। মঙ্গলময় বিধাতা আমাদিগের সহায় হউন, যেন আমরা প্রতিদিন তাঁহার শুভ ইচ্ছা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া জীবনের পথে অগ্রসর হতে পারি।

কুচবিহার শ্রীমতী বি—

পিতৃদেবের স্বর্গারোহণে।

স্বর্গগত পিতৃদেব পুণ্যশীল রাজেন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয়ের ভোগদেহত্যাগের দিবস,—২৭শে শ্রাবণ ১৩১৩ সাল রবিবার, তিথি জন্মাষ্টমী। মৃত্যুর সময় সন্ধ্যা ৭টা কয় মিনিট। দাহস্থান কলিকাতার নিমতলা ঘাট। সময় আন্দাজ রাত্রি ১২টা, কলিকাতা পটুয়াটোলা লেনে ৯। ২নং বাটীতে মৃত্যু হয়।

এই কবিতার ভাব তাঁহার মৃতদেহ গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার সময় মনে উদিত হইয়াছিল, পরে সৎকার-স্থানে যেরূপ মনের ভাব আইসে ও তারপরে যেরূপ ভাব মনে উদয় হয় তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি। এই কবিতা একরূপ ছন্দোবন্ধহীন, কিন্তু সংশোধন করিতে গেলে ইহাতে মিথ্যা ভাব আসিবে, এইরূপ মনে ভাব আইসে। অর্থাৎ যেমন লেখা হইয়াছে এইরূপ থাকিলেই যেন ভাল হয়। সেই জন্য ইহা অপরিবর্ত্তিত ভাবে প্রকাশ করাই আমার ইচ্ছা। ইহার প্রত্যেক কথাটীই সত্য বিজড়িত, অতএব ইহার কোনটীই হরণ পূরণ যুক্তিসঙ্গত নহে, মনে করি।

কি ফুরাল ?

ফুরাইল জীবনের মহামায়া ঘোর
আর ফুরাইল সেই অশেষ বাসনা
(যেন সাধের স্বপন সহ)
চিরতরে অস্তমিত জীবন জ্যোছনা !!

* * * * *

যাও বৎস !

মরণের রাজ্য ত্যজি
যে দেশে পশিলে আজি
তথা নাহিক মরণ !
নাহি তথা রোগ শোক
এ ভব ত্রিতাপ ভোগ
সর্ব্বজ্বালা-হর স্থান
সে, যে শান্তির সদন !

২

তুমি যেই গর্ভে জন্ম
সে, গর্ভধারিণী ধন্য
পুণ্যময় জনকের
তুমি, পুত্র পুণ্যময়।
পিতৃগুণে অলঙ্কৃত
ছিলে বহুগুণধাম।

৩

কর্ম্মব্রতে যেন বীর
সুখে দুখে সদা ধীর,
সমাজজ্ঞ, পররত
রাখিতে পরের মান,—
সয়েছ লাঞ্ছনা কত
নিজে হ'য়ে হতমান।

৪

শত্রু মিত্র সদসদ্
সর্ব্ব স্থানে প্রিয়ম্বদ
উচ্চনীচে সমাদর
সদাই করেছ দান,
পৌরুষের গুণে গণ্য
কভূ নহে অবসন্ন
মৃত্যুর শয়নে শুয়ে
ছিল উন্নতির ধ্যান !!

প্রকৃতি সে গুণরাশির
দিয়েছেন যোগ্যদান,—
(তাই) তোমার বিয়োগ তরে
লোকে হাহাকার ক'রে
এ মহা শোকের মাঝে
করিতেছে শান্তিদান !!

৫

চাঁদ মুখে চুমো দিয়ে
আলিঙ্গিয়া কলেবর
সবে করি ধরাধরি
শোয়াইয়ে চিতাপর
দাঁড়ায়ে চিতার ধারে
এবে হ'তেছে ধারণা,—
এ নহেত নিদারুণ
মানবদেহ-দাহন
(ভবরণ পরিশ্রান্তের)
এ, যে বিশ্রাম শয়ন !!
তবে যাও বাবা !
বিশ্বজননীর কোলে
থাকি মহা কুতূহলে
কর সে মায়ের কাছে
প্রবাস-বাস বর্ণনা।
সে দেশ শান্তির ধাম
নাহিক পাপের নাম
নাহি তথা "স্বার্থ দ্বন্দ্ব
দুর্জ্জনের প্রতারণা
কাপট্য, কাঠিন্য নাহি
অসত্যে সত্য ছলনা" !!

*   *   *   *

তবে থাক বাবা !
ঘুমাও মায়ের কোলে
লভ চির নিরবাণ।
ক্ষিত্যপ্ তেজ মরুদ্ব্যোমে
ভোগ দেহ সমাধান।
(কিন্তু) তোমারি ও চিতামত
জ্বলিবেগো অবিরত
যত দিন ধরাপরে
রবে দীন-দেহ খান,—
তব দেহত্যাগে তপ্ত
আমার এই তুচ্ছ প্রাণ !!

তোমার আদরের 'মা' ভিখারিণী
শ্রীসরোজবাসিনী চৌধুরী মুখোপাধ্যায়।

আশা-মরীচিকা।

আশায় ছিলাম আমি চেয়ে যার পানে।
সে কোথা চলিয়া গেল রাখিয়া এখানে ॥
ভেবেছিনু একদিন আবার আমার!
এই ঘরে শোভা সুখ হইবে বিস্তার ॥
শুক শারী শ্যামা পিক কতই আসিবে।
তাদের মধুর স্বরে শ্রবণ জুড়াবে ॥
ডাকিব তাদের যবে চুমকড়ি দিয়া।
আনন্দেতে কোলে পিঠে পড়িবে লুটিয়া ॥
তাহাদের বুকে ধরে পরাণ জুড়াব।
অতীত দুঃখের স্মৃতি মনে না আনিব ॥
হায়! আশাতরু আমি করিয়া রোপণ।
দেখিতেছিলাম কত সুখের স্বপন ॥
হেনকালে কোথাহতে আসি কাল ঘোর।
কেড়ে লয়ে গেল হায় হৃদ্‌পিণ্ড মোর ॥
বুকে যাহা পুরেছিনু যতন করিয়া।
কোথায় যে লয়ে গেল পাই না খুঁজিয়া ॥
ভাবি নাই একদিন হইবে এমন।
কাল ঘোর সব মোর করিবে লুণ্ঠন ॥
ওরে নিদারুণ কাল কি বলিব আর।
কেড়ে নিলি একে একে সমস্ত আমার ॥

বহুলোকে পূর্ণ ছিল যে গৃহ আমার।
সে গৃহ ধরেছে আজ শ্মশান আকার॥
সর্ব্বস্ব হারায়ে আমি পাগলিনী প্রায়।
আমার বলিয়া ধায়ে কোলে নিনু যায়॥
শুনিনু নিঠুর বাণী, সে আমার নয়।
তীক্ষ্ণ তীরে বিদ্ধ যেন করিল হৃদয়॥
এমন কঠিন কথা শুনিলাম কাণে।
যেন কোন সম্বন্ধ ছিল না তার সনে॥
সংসার-সাগরে তাই ভাসিয়া বেড়াই।
ডেকে দুটো কথা বলে হেন জন নাই॥
অকূলে পড়িয়া সদা করি হাহাকার।
সান্ত্বনা কে করে হায়! কে আছে আমার॥
কত আর সবে মোর এ ক্ষুদ্র পরাণে।
তাই প্রাণ কিবা যেন খোঁজে রাত্রি দিনে॥
কি নাই কি নাই সদা খুঁজিয়া বেড়াই।
কি করে প্রাণের মাঝে কারে বা জানাই॥
এক বার কেহ মোরে দেখে না চাহিয়ে।
প্রবল দুঃখের স্রোতে যেতেছি ভাসিয়ে॥

মোঃ—কাকিনা।

প্রেরিত।

পতিব্রতা নারী।

বিধাতৃবিধানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ইংরাজ রাজাশ্রয়ে শান্তিসুখের অধিকারী, কিন্তু দুঃখের বিষয় একমাত্র শিক্ষার অভাবে অদ্যাপিও হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে জানিতে পারেন নাই, উভয়ের মধ্যে সম্প্রদায়গত বিদ্বেষভাব এবং কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। অধুনা অধিকাংশ হিন্দুই উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা এত অল্প যে, তাঁহাদিগকে অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়। যাহা হউক আবার মুসলমান রমণীগণের অবস্থার বিষয় স্মরণ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। স্ত্রী শিক্ষা যে কি অমূল্য ধন তাহা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। অর্থাৎ নিজের ও পরবর্ত্তী পুরুষদিগের চরিত্রগঠন অতীব বহুমূল্য বস্তু, তাহা তাঁহারা বোঝেন না। স্ত্রীশিক্ষার ভিতর তাঁহাদের পরিবারস্থ সমস্ত লোকের সুখাসুখ নিহিত রহিয়াছে। তাঁহারা তাহা জানিয়া শুনিয়াও দূরে থাকিতে চেষ্টা করেন। স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা "জাতীয় চরিত্র গঠিত হয়, একথা উচ্চৈঃস্বরে শত বার বলিলেও তাঁহারা ঔদাস্য প্রদর্শন করেন। স্বার্থপরতা তাঁহাদের হৃদয়কে বজ্রতুল্য কঠিন করিয়া এতদূর দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়াছে যে, শত সহস্রবার লক্ষ লক্ষবার আঘাত করিলেও টলে না। তাঁহারা স্বার্থপরতার দাস হইয়াছেন—কিরূপে আপন সন্তান সন্ততির এবং স্বজাতির চরিত্র গঠনের জন্য যত্নবতী হইবেন? ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান্ যে গৃহের স্ত্রীগণ দ্বারা পুরুষদিগের চরিত্র শৈশবাবস্থা হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। যদি ইঁহারা শিক্ষিতা ও গুণবতী হন, তাহা হইলে পুরুষের চরিত্র উন্নত ও মহৎ হয়, এবং তদ্বিপরীত হইলে অধোগামী হইয়া থাকে। যে সকল দেশ অধুনা সভ্যতা ও উন্নতির উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছে, সেই সকল দেশে স্ত্রীশিক্ষা অত্যন্ত আদৃত ও সম্মানিত হইতেছে। বস্তুতঃ একমাত্র শিক্ষা দ্বারাই স্ত্রীগণ গুণবতী হইতে

পারেন। শিক্ষা ব্যতিরেকে সদ্‌গুণ সমূহের সম্যক্‌ বিকাশ হয় না; মনের কুপ্রবৃত্তি দ্বেষ, হিংসা, কলহপ্রিয়তা প্রভৃতি দমনের ক্ষমতা থাকে না। ভারতের পরবর্ত্তী বংশধরগণের চরিত্র যাহার উপর নির্ভর করিতেছে, তদুপরি ভারতের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যও অবস্থিত রহিয়াছে। অতএব প্রত্যেকের উচিত যে, তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার প্রতি মনোযোগী হয়েন। স্ত্রীজাতির দুরবস্থার জন্য ভারতের এরূপ দুরবস্থা হইয়াছে,এবং যত দিন হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের রমণীগণ শিক্ষিতা এবং সচ্চরিত্রা না হইবেন, তত দিন ভারতের সৌভাগ্য বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছে জানিতে হইবে। সততই আমরা দেখিতে পাই, ভার্য্যা শিক্ষিতা ও গুণবতী হইলে, স্বামী তাঁহার সংসর্গে উন্নত ও মহৎ হয়, এবং অশিক্ষিতা ও নীচাশয়া হইলে তাঁহার সঙ্গে স্বামীরও অধঃপতন হয়। ভার্য্যার প্রবর্ত্তনায় কত শত ব্যক্তি উন্নত ও মহৎ হইয়াছেন, এবং তাঁহার সান্ত্বনায় ও সহিষ্ণুতায় কত ব্যক্তি যে ঘোরতর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, তাঁহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। বস্তুতঃ যৌবন কালে ভার্য্যার সংসর্গে স্বামীর জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন হয়। ভার্য্যা যদি সুশীলা ও গুণবতী না হন, তাহা হইলে গৃহে কিরূপে প্রকৃত সুখশান্তি বিরাজ করিবে? আবার শিক্ষিতা হইয়া ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিলে পরিবারে কখনই সুখশান্তি অব্যাহত থাকিবে না। যাহাতে তাঁহাদের মনে ধর্ম্মভাব প্রবল হয়, তাঁহারা সেবাপরায়ণা হইয়া পতি এবং পুত্রদিগকে ধর্ম্মের পথে, পুণ্যের পথে আকর্ষণ ও পরিবারের শোভা বর্দ্ধন করেন, অতি যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। শ্বশুর এবং শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনের সেবা করিবেন; স্বামী রোষপরবশ হইয়া তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিলেও তিনি তাঁহার প্রতিকূলাচারিণী হইবেন না; ভৃত্যবর্গের প্রতি অতিশয় অনুকূলা থাকিবেন; সুখ সৌভাগ্যে গর্ব্বিতা হইবেন না, এই রূপ সদ্ব্যবহার দ্বারা যুবতীরা গৃহিণী পদের উপযুক্তা হয়েন; ইহার প্রতিকূল ব্যবহার করিলে পতিকুলের যাতনাস্বরূপ হইয়া থাকেন। পত্নী হইলে বিশেষ বিশেষ গুণের আবশ্যক। নতুবা তাঁহাকে পত্নী না বলিয়া অপপত্নী বলা যাইতে পারে। সতী স্ত্রী জগতের পূজনীয়া এবং স্বর্গ অপেক্ষাও গরীয়সী। যিনি পতিকে কখনও উপেক্ষা করেন না, যিনি কায়মনোবাক্যে পতিতে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারই অনুগতা থাকেন, তিনিই সতী, তিনিই যথার্থ পতিব্রতা। পতিব্রতার আলৌকিক তেজ দর্শন করিলে সমস্ত লোকে কম্পমান হয়। পতিব্রতার চরণ যে স্থান স্পর্শ করে, সেই স্থানের ভূমি আপনাকে ভারহীন এবং পবিত্রজ্ঞান করিয়া থাকে। সূর্য্য, চন্দ্র এবং সমীরণও স্বকীয় শুদ্ধি সাধনের জন্য ভয়ে ভয়ে পতিব্রতার পবিত্র দেহ স্পর্শ করে; নতুবা অন্য অভিপ্রায়ে নহে। যাঁহাদের গৃহে পতিব্রতা বিরাজ করেন, তাঁহারাই ধন্য! ধন্য তাঁহার জনকজননী, ধন্য তাঁহার শ্রীমান্‌ পতি। পতিব্রতার পুণ্যবলে তাঁহার

পিতৃকুল মাতৃকুল এবং পতিকুল এই তিন কুলেই স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে। যাঁহার গৃহে পতিব্রতা নারী বিরাজ করেন, তিনিই প্রকৃত গৃহস্থ। স্বামীর আদেশ পালনই স্ত্রীগণের একমাত্র ব্রত, একমাত্র উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম; অতএব সতী স্ত্রী কখনও পতিবাক্য লঙ্ঘন করিবেন না। পতি ধনী বা দুরবস্থাপন্ন হউন, সুখী কিম্বা দুঃখীই হউন, তাঁহাকে লঙ্ঘন করা কখনও উচিত নহে। পতির হর্ষে তাঁহার হর্ষ, পতির বিষাদে তাঁহার বিষাদ, পতির সম্পদ্বিপদে তাঁহার সম্পদ্‌বিপদ; ফলতঃ পতিব্রতা নারী সকল সময়েই পতির অবস্থার অনুরূপা হইবেন।

এম, এ, জলিল।
মিঞাবাড়ী, মাণিকাচড়—ধুবড়ী।

সংবাদ।

বিগত ২৫শে চৈত্র নববিধান প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী মির্জাপুর অঞ্চলের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সেবা করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন, আপাততঃ ব্রাহ্মযুবা শ্রীমান্ বিনোদ বিহারী রায় তাঁহার সহকারিরূপে গিয়াছেন। সায়ংকালে মণ্ডলীস্থ বহু উপাসক ব্রহ্মমন্দিরে সম্মিলিত হইয়া উপাসনা ও প্রার্থনান্তে তাঁহাদিগকে বিদায় দান করিয়াছেন। আরও কয়েক জন দয়ার্দ্র উৎসাহী যুবা অচিরেই উক্ত কার্য্যক্ষেত্রে যাইয়া ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর সহকারী হইবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজ কমিটীর দুর্ভিক্ষ ফণ্ড হইতে তাঁহারা দুই সহস্র টাকা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। আরও কিছু দান সংগ্রহ হইয়াছে, এবং হইবে। লাহোর ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার দয়ার আবেগে এলাহাবাদে যাইয়া তথাকার দুর্ভিক্ষ-নিপীড়িত লোকদিগের সেবাতে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনিও ব্রাহ্মসমাজ কমিটী হইতে দুই সহস্র টাকা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। কলিকাতাস্থ নববিধানমণ্ডলী দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যনিমিত্ত লোকের দয়া ভিক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের দ্বারা একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে, ১৯১২০ জন ব্রাহ্ম উক্ত কমিটীর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র, এবং অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন কমিটীর সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। যে কোন দয়াবতী মহিলা অন্নদান করিয়া অন্নাভাবগ্রস্ত মুমূর্ষ লোকদিগের জীবন রক্ষা করিতে চাহেন আপনাদের দাতব্য যেন তাঁহাদের নিকটে পাঠাইয়া দেন। সামান্য দানও আদরের সহিত গৃহীত হইবে। বহুলোক বস্ত্রাভাবে ক্লেশ পাইতেছে। ছিন্ন পুরাতন বস্ত্র দান করিলেও বিশেষ উপকার হইবে।

সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং কিয়দ্দিন পূর্ব্বে আলীপুরের গভর্ণমেণ্ট উকিল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি অনুসারে স্বীয় বিধবাকন্যাকে বিবাহ দিয়াছেন। উভয় বিবাহে হিন্দুসমাজের বহু সম্ভ্রান্ত লোক উৎসাহপূর্ব্বক যোগদান করিয়াছেন। বিরোধীর সংখ্যা বড় অধিক নয়।

ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়।

স্বার্থপরতা, জাতিগত ও ব্যক্তিগত। *

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিহাস লেখার উদ্দেশ্য এই কোন্ রাজার পর, কোন্ রাজা রাজত্ব কোরেছিলেন, কোন্ কোন্ ঘটনার পর, কোন্ কোন্ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাই জানাইবার উদ্দেশ্যে ইতিহাস লেখা। শুধু তাহাই নহে, কোন্ রাজার রাজত্ব সময়ে প্রজারা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিয়াছে। কোন্ রাজা প্রজাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, কোন্ রাজাই বা পৃথিবীতে বড় বড় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি সমুদায় জানিবার এবং লোককে জানাইবার উদ্দেশ্যেই ইতিহাস লেখা। আমাদের দেশের অবস্থার সম্বন্ধে সকলের ধারণা বোধ হয় এক নহে। ইংরাজ-শাসনের সময়ে মাঝখানে কিছুকাল জাতীয় পতন হ'য়েছিল। কি কারণে এবং কাহার দ্বারা এই জাতীয় পতন হয়েছিল তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে। দুর্ব্বল জাতির প্রতি সবল জাতির অত্যাচার, এইরূপ অত্যাচার মানুষ মানুষের প্রতি করে কেন? পাশ্চাত্য লোকেরা বলিবেন, আমরা যাহা করি তাহাই আমাদের ধর্ম্ম। আমাদের ধর্ম্মই শত্রুদমন করা। এই জন্য যদি আমাদের লোকে মন্দ বলে বলুক। রক্তপাত আমাদের ধর্ম্ম। কিন্তু আমরা একথা স্বীকার করিব না। আমরা বলিব, এরূপ অত্যাচার, পশুর ন্যায় অত্যাচার, পশুর ন্যায় বল বিক্রম। আমাদের বল নাই, শক্তি নাই. আমাদের কোমলতা আছে। আমাদের এই কোমলতাকে তাঁহারা ভীরুতা বলিবেন। তাঁহারা প্রতাপান্বিত, ইচ্ছা করিলেই আমাদের পরাধীন করিয়া রাখিতে পারেন। আমরা তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে ইচ্ছা করি না। আমাদের চরিত্রে দুর্ব্বলতা ও কোমলতা এমন ভাবে মিশে গিয়েছে যে, আমরা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। আমরা যেটাকে কোমলতা ভাবছি, সেটা আমাদের দুর্ব্বলতা। কিন্তু আমরা তাহা দুর্ব্বলতা বলিয়া স্বীকার করি না। এই কোমলতা ও দুর্ব্বলতা আমাদের জাতীয় অবনতি ও পতনের কারণ হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের লোকের মধ্যে এই ভাব দেখা যায় যে, শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র অতিশয় কোমল ছিল। তিনি খুব কোমল স্বভাবের যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর প্রাণ একটুতেই গলে যেত। তিনি লোকের কষ্ট দেখিলে তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না, সেই জন্য মায়ামৃগ দেখিয়া এবং সীতার তাহার প্রতি আগ্রহ দেখিয়া তাহা লইবার জন্য তিনি একা লক্ষ্মণের প্রতি ভার দিয়া মৃগ অন্বেষণার্থ ছুটিয়া ছিলেন। আবার বাল্মীকির চরিত্র দেখিলে দেখা যায় যে, তিনি শ্রীরামের বীরত্ব দেখাতে গিয়ে কোমলতা প্রকাশ কোরেছেন। তাহাতে তাঁহারও কোমলতা প্রকাশিত হয়েছে। যুধিষ্ঠিরও ঐরূপ মহাভারতের প্রধান নায়ক। তাঁহার চরিত্রে ধর্ম্মের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ধার্ম্মিক অর্জ্জুন অসীম যোদ্ধা হইলেও ঐরূপ কোমল স্বভাবাপন্ন ছিলেন। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার মন চঞ্চল হইল। তিনি যুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত হইলেন। তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কত প্রকারে বুঝাইতেছেন,

---

* ২৬শে নবেম্বর তারিখে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন তন্মূলক।

কত প্রকারে তাঁহাকে বোঝাতে হয়েছিল যেখানে বীরত্ব রয়েছে সেখানেও কেমন কোমলতা। রাজপুরুষদের অনেকের মধ্যে এইরূপ কোমল ভাব দেখা যায়। তাঁহাদের বীরত্বের সহিত কোমল ভাব মিশিলে তাঁহাদের চরিত্র বড়ই সুন্দর ও মধুময় হয়। এরূপ দৃশ্য বড়ই সুন্দর।

তাহার পর মুসলমানেরা শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলে সেই বীরত্ব যেন নিভে যেতে লাগলো। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা জাতীয় উৎসাহ, সমস্তই যেন লোপ পাইল। যে রকম ভাব থাকিলে বাস্তবিক মানুষকে মানুষ করে সেই রকম ভাব সকলের মধ্যেই থাকা উচিত। আমাদের চরিত্রে যদি একেবারেই কোমলতা না থাকে, আমরা যদি খুব কঠোর স্বভাবান্বিত হই তবে আমাদের সে চরিত্র ঠিক্ নহে। একজন মানুষ বাড়ীতে কি রকম, অর্থাৎ তিনি বাড়ীতে মানুষের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন ইহা খুব ভালরূপে দেখিলে, তিনি ইতিহাসে কিরূপ স্থান লাভ করিতে পারিবেন তাহা সহজেই বোঝা যায়। তাঁহার বাড়ীর ব্যবহারের উপরে ইতিহাসের ফলাফল নির্ভর করে।

কোমলতার উপর বীরত্ব, ইহাতে স্বার্থপরতা ও ভালবাসার ভাব দেখা যায়। স্বার্থপরতা ভালবাসার আকারে হৃদয়কে অধিকার করে। ভালবাসার মূলে স্বার্থপরতা মিশানো থাকে। এই জন্যই পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে মানুষের বাড়ীর জীবন দেখিলে তাঁহাকে যথার্থ ভাবে চেনা যায়। স্পাটানরা তাঁহাদের পরিবারে কি প্রকারে বীরত্ব শিক্ষা দিতেন তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়। যখন স্পার্টানদের সন্তান যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে যান, সেই সময় প্রত্যেক জননী তাঁহাদের ছেলেদের এইরূপে শিক্ষা দেন যে, হয় যুদ্ধ করিতে করিতে সমস্ত শত্রু পরাজিত করিয়া জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিবে, আর নতুবা শুয়ে আসবে। কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না। জীবনের জন্য অথবা পরিবারের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। যে সময়ে যুদ্ধ করিবে সেই সময়ে মনে যেন এই একই ভাব থাকে যে জয়ী হইতে হইবে, কখনই পরাজিত হইব না। আর কখনও পালিয়ে এস না। সন্তানেরাও সেইরূপ জীবন সমর্পণ করিতেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে। যুদ্ধের সময়ে তাঁহাদের অন্য কোনরূপ ভাব আসিয়া চিত্ত চাঞ্চল্য জন্মাইত না। একজন যুদ্ধ করিতে গিয়া যদি ভাবে যে আমি মরিলে আমার স্ত্রীর অথবা সন্তান সন্ততির কি অবস্থা হইবে? তাঁহাদের হৃদয়ে কি প্রকার আঘাত লাগিবে, তাঁদের কিরূপ কষ্ট হইবে, ইত্যাদি প্রকারের ভাব সমুদায় আসিলে তাহার অন্তর নরম হইবে, তাহার মধ্যে কোমলতা আসিবে, কোমলতা আসিলে আর সে যুদ্ধ করিতে পারিবে না। এইজন্য স্পার্টানেরা খুব নির্দ্দয়, কঠোর ও কষ্টসহিষ্ণু হইতে শিক্ষা দিতেন। সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তাঁহারা ভাবিতেন, অথবা জোর করিয়া ভাবিতে হইত যে, আমি যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দেই ইহাতেও আমার কত আনন্দ। আমি যদি যুদ্ধে পরাজিত হই, তবে নিশ্চয়ই সেখানে প্রাণত্যাগ করিব। এই ভাব আসিয়া তাহার মনে কত সাহস আসিত। অন্তরে যে সমুদায় দুর্ব্বলতা থাকে সে সমুদায় দূর করিয়া দিয়া সে শক্ত হ'য়ে দাঁড়ায়।

ক্রমশঃ।

মাসিক পত্রিকা

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১১শ ভাগ] বৈশাখ ১৩১৫; মে ১৯০৮। [১০ম সংখ্যা

স্ত্রীনীতিসার।

এক গৃহিণী প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ভক্তিভাবে ভগবানের স্তব স্তুতি করেন ও তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া প্রণাম করেন, তৎপর তিনি গৃহকর্ম্মাদিতে প্রবৃত্ত হন। মাতার এইরূপ ঈশ্বরে ভক্তি বিশ্বাস দেখিয়া শৈশবকাল হইতে তাঁহার বালক বালিকাদের মনে ধর্ম্মানুরাগ ও ভক্তির সঞ্চার হয়। মাতার এই সুদৃষ্টান্তে তাহাদের মনে কেমন আশ্চর্য্যরূপে ধর্ম্মভাব মুদ্রিত হইয়া থাকে।

উক্ত গৃহিণী বেলা ৮।৯টা পর্য্যন্ত গৃহ কর্ম্মাদিতে ব্যাপৃত থাকেন, পরিবারস্থ কাহার কোন্ বিষয়ের অভাব তাহার অনুসন্ধান লইয়া যত্নপূর্ব্বক সেই অভাব মোচন করেন, দাসদাসী পরে পাচিকাদিগকে তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য আদেশ উপদেশ করিয়া থাকেন, পতি পুত্রাদির রুচিকর ব্যঞ্জনাদি সাদরে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া স্নানান্তে প্রিয়তম স্বামী ও পরিবারস্থ সকল আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মিলিত হইয়া নিষ্ঠা সহকারে ঈশ্বরার্চ্চনা করেন, পারিবারিক পূজার্চ্চনার পরে সকলের [illegible] অন্নের ভোজনান্তে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া থাকেন।

অপরাহ্ণে শিল্প ও চিত্রবিদ্যার চর্চ্চা শাস্ত্রপাঠ ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক সায়ংকালে পুত্রকন্যাদিসহ ধর্ম্মসঙ্গীত ও ধর্ম্মালোচনাদি করেন, পরে নিশাকালে আহারাদির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। সকলের ভোজনের পর নিজে ভোজনান্তে শয্যা আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ ও তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করেন এবং সুনিদ্রায় রাত্রি যাপন করিয়া থাকেন। ইঁহাকেই গৃহলক্ষ্মী দেবী ও সুগৃহিণী বলে। ইঁহা দ্বারা পতি পুত্রাদির ও প্রতিবেশীর পর্য্যন্ত অশেষ কল্যাণ হয় এবং পরিবার মধ্যে কুশল শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইরূপ গৃহিণী ধন্য।

নারী সুন্দর, না পুরুষ সুন্দর ?

অনেকে বলেন, পুরুষজাতির সৌন্দর্য্য নারীজাতির সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অধিক। পুরুষজাতীয় পশু পক্ষ্যাদির সৌন্দর্য্য নারী জাতীয় পশু পক্ষ্যাদির সৌন্দর্য্যকে পরাস্ত করে। সিংহ শার্দ্দুল ঘোটকাদি পুরুষ জাতীয় পশু, ময়ূর, পারাবত কুক্কুটাদি পুরুষ জাতীয় পক্ষী সেই সেই জাতীয় নারী পশু পক্ষী অপেক্ষা যে অধিক সুন্দর কে ইহা অস্বীকার করিতে পারে ? মানিলাম, অধিকাংশ পুরুষ জাতীয় পশু পক্ষী স্ত্রী জাতীয় পশু পক্ষী অপেক্ষা সমধিক দৈহিক সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত। কিন্তু মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে একথা ঠিক খাটে না। মানবজাতীয় পুরুষ যে স্ত্রীজাতিকে সৌন্দর্য্যে পরাস্ত করে ইহা বলিলে সত্য বলা হয় না। পুরুষের দৈহিক সৌন্দর্য্য ও নারীর সৌন্দর্য্য এক প্রকার নহে, পরস্পরের মধ্যে ভিন্নতা আছে। পুরুষের দেহ বলবীর্য্য প্রধান, উহা কঠিন উপাদানে সংগঠিত, তাঁহার শরীর বীর্য্য সামর্থ্য কাঠিন্য প্রকাশ করে, সেই শরীরে এক প্রকার বীরত্ব সূচক কান্তি প্রতি-ফলিত। নারীর দেহে প্রেম লাবণ্য অভি-ব্যক্ত, উহা কোমল উপাদানে গঠিত। তাঁহার তনু কোমলতা সূচক কান্তির প্রকাশভূমি। পুরুষের বীরত্বসূচক কান্তি দর্শনে মনে ভয়ের সঞ্চার হয়, নারীর কমনীয়তা সূচক লাবণ্য লোকের মনকে কোমল করে, এক প্রকার অনুপম আনন্দ দান করিয়া থাকে। তবে নারী বিকৃত ও অস্বাভাবিক-ভাবাপন্ন হইলে তাঁহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হয়। জরা বার্দ্ধক্য ও রোগাদি দ্বারা আক্রান্ত হইলে নারী লাবণ্য হারাইয়া বিরূপ হইয়া যান, তিনি দর্শকের মনে দুঃখ ক্লেশ উৎপাদন করেন। কি পুরুষ কি স্ত্রী শৈশবে, বাল্যে যৌবনে বিধাতার বিধানে ভিন্ন ভিন্ন লাবণ্য প্রাপ্ত হন। শারীরিক কান্তি লাবণ্য পরিবর্ত্তনশীল, অস্থায়ী। দুই চারি বৎসর পরে এতদূর পরিবর্ত্তন হয় যে বাল্যকালে যাহাকে দেখা গিয়াছে তাহাকে যৌবনে দেখিলে হঠাৎ চিনিয়া উঠিতে পারা যায় না। দৈহিক অবস্থার নিত্য পরিবর্ত্তন হয়। অল্পকাল মধ্যে ধূলার শরীর ধূলীতে মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

দৈহিক সৌন্দর্য্য বা অসৌন্দর্য্যে মানব জাতির গৌরব বা অগৌরব নাই। মানব জাতি পশু পক্ষ্যাদি ইতর জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মানসিক ও আত্মিক সৌন্দর্য্যের জন্য সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া উচ্চা সন প্রাপ্ত। স্ত্রী পুরুষের সেই সৌন্দর্য্য না থাকিলে তাঁহারা পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বিশুদ্ধ জ্ঞান, মার্জ্জিত বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতায় এবং ধৈর্য্য সহিষ্ণুতায় মানসিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়, ভগবদ্‌ভক্তি, বিশ্বাস প্রেম ও পবিত্রতায় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হয়। এই সৌন্দর্য্য শারীরিক সৌন্দর্য্যের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর নহে, ইহা অনন্তকাল স্থায়ী, চিরউন্নতিশীল। শরীরের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। শরীর কুৎসিত বিকৃত জরা ব্যাধিগ্রস্ত, বা ধ্বংশ হইলেও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের কোন ক্ষতি হয় না। যে নারীর বা পুরুষের এই সৌন্দর্য্য নাই, তিনি

কৃপা-পাত্র দীন। ভগবানের সঙ্গে যত গাঢ় যোগে এবং ভগবানের প্রতি যত প্রেম ভক্তির বৃদ্ধি হয় তত এই সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে —

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা,
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।"

অর্থাৎ ভগবানেতে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি আছে সমুদায় দেবগুণ আসিয়া তাঁহাতে স্থিতি করে। হরিতে অভক্ত ব্যক্তির মহদ্‌গুণের সম্ভাবনা কোথায়? কেননা মনোরথ যোগে সে বাহিরে বাহিরে অসদ্‌বিষয়ে ধাবমান।

এক একটি ভক্তিমতী সতী নারীর পরসেবা পরায়ণা সাধ্বীর কি কম সৌন্দর্য্য? তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের নিকটে কি সাধারণ পুরুষের সৌন্দর্য্য দাঁড়াইতে পারে? পাঠিকারা পুরাণে বর্ণিতা সীতা সাবিত্রী, এবং দময়ন্তী দেবীর পতিভক্তি ও সতীত্বের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য কাহিনী পাঠ করিয়া থাকিবেন, পরসেবা পরায়ণা সাধ্বী কাথরাইন এবং আগাথা প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় সাধ্বী রমণীদিগের জীবনের সৌন্দর্য্যের জ্যোতিতে সে দেশের রমণীকুলের মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল হইয়াছে। একদা এদেশের হরিভক্তি পরায়ণা একটী হিন্দুরমণী এক জন অভ্যাগতের প্রশ্নমতে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্বন্ধে দুঃখিত অন্তরে এরূপ বলিয়াছিলেন, "যেমন নাট্যমন্দিরে ঝাড় লণ্ঠনাদি সাজান রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে আলো নাই, এক আলোর অভাবে সে সকলের শোভা হয় না, তদ্রূপ আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনেক সদ্‌গুণ আছে, কিন্তু তাহার অন্তরে হরিভক্তিরূপ আলো নাই, তজ্জন্য সেই সকল সদ্‌গুণ দীপ্তিলাভ করিতেছে না।" বসোরা নগর নিবাসিনী রমণীরত্ন তপস্বিনী রাবেয়া একান্ত শারীরিক সৌন্দর্য্য বিহীনা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যে জগৎ আলোকিত হইয়াছিল, তাঁহার তপস্যার বল ও বিশ্বাস ভক্তি দর্শনে সাধুপুরুষগণ মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পদানত হইয়াছেন। চরিত্রের সৌন্দর্য্য নাই, এমন বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা সৌন্দর্য্য গর্ব্বিতা কুলটা নারীর কি কোন সৌন্দর্য্য আছে। সাধুলোকদিগের চক্ষে সে নিতান্ত কুরূপা ও কৃপাপাত্রী, সে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ঘৃণার পাত্রী।

মাতৃগণ, ভগিনীগণ, কন্যাগণ, তোমরা চরিত্রের সৌন্দর্য্য সযত্নে বৃদ্ধি কর। বস্ত্রালঙ্কার রাশিতে দেহকে সজ্জিত করিলে কি হইবে? সে সকল অসারের অসার। ধর্ম্মবলে পুণ্যবলে সতীত্ববলে বীরপুরুষদিগকে পরাস্ত কর, ভক্তি প্রেম পুণ্যের সৌন্দর্য্যে জগৎকে মোহিত কর, দেবীরূপে সকলের হৃদয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ কর। এই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

সাধ্বী ফাতেমা দেবী।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

তখন আলি বলিলেন, "প্রভো, আপনি আমাকে শৈশবাবধি জনক জননী হইতে গ্রহন করিয়া স্বীয় পবিত্র সহবাসে রাখিয়া-

ছেন, এবং আন্তরিক ও বাহ্যিক শিক্ষাদানে আমার কল্যাণ বিধান করিয়াছেন, যে অনুগ্রহ ও উপকার আমি আপনার নিকটে লাভ করিয়াছি, তাহার দশমাংশও স্বীয় পিতামাতার নিকটে প্রাপ্ত হই নাই। পরমেশ্বর আপনার সাহায্যে আমাকে পৈতৃক অসত্য ধর্ম্ম হইতে মুক্ত করিয়া সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় দান করিয়াছেন। আপনি আমার জীবনের সম্বল, সুখ ও শান্তির মূল। দেব, এক্ষণতো আমি আপনার পদসেবাতে নিযুক্ত থাকিয়া সবল ও ভাগ্যবান্ হইয়াছি, এবং ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ ও সমুন্নতি লাভ করিয়াছি, কিন্তু আমার নিজের কোন রূপ গৃহ ও গৃহসম্পত্তি নাই, হৃদয়সখী ভার্য্যা নাই, যিনি সুখ দুঃখে আমার সঙ্গে সহানুভূতি করিবেন ও আমার সর্ব্বজ্ঞা হইবেন। কিছুকাল হইতে এই ইচ্ছা যে কুমারী ফাতেমার পরিণয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি, কিন্তু দুঃসাহসিকতা হইবে ভাবিয়া এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারি নাই। ইহা সম্পন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা আছে কি?" আলির মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া হজরতের মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি আলির প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আলি, বিবাহ করিতে যাহা যাহা প্রয়োজন তৎ সম্বল কি তোমার আছে?" আলি বলিলেন, "আর্য্য, আপনি আমার অবস্থা যেরূপ জানেন, আমার অন্য কোন আত্মীয় বন্ধু সেরূপ অবগত নহেন। আপনার নিকটে কিছুই গুপ্ত নহে, আমার একটি করবাল, একটি বর্ম্ম ও একটি উষ্ট্র-মাত্র আছে। এ সকলের আপনিই অধিপতি, যাহা বিহিত বোধ করেন তাহাই হইবে।" হজরত বলিলেন, "তোমার জন্য করবালের প্রয়োজন, অনেক সময় ধর্ম্ম-দ্রোহী শত্রুর সঙ্গে তোমাকে সংগ্রাম করিতে হইবে। তোমার আরোহণের জন্য উষ্ট্রেরও আবশ্যক। আমি কেবল তোমার বর্ম্মটি চাই, তাহাতেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে। আলি, তোমাকে আমি সুসংবাদ দান করিতেছি যে, ঈশ্বর তোমার সঙ্গে ফাতেমার বিবাহ মনোনীত করিয়াছেন, স্বর্গে তোমাদের উভয়ের পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।" এই বলিয়া তিনি কিছু অলৌকিক বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। পরিশেষে বলেন, "আলি, এই শুভ কার্য্যে আমি ঈশ্বরের আজ্ঞা লাভ করিয়াছি, গাত্রোত্থান কর, চল মন্দিরে যাই। মদিনাস্থ সমুদায় সম্ভ্রান্ত পুরুষের সাক্ষাতে শুভানুষ্ঠান সম্পাদন করিব।" হজরতের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দিতমনে আলি গৃহের বাহিরে চলিয়া আসিলেন, এবং দ্রুতগতি মন্দিরের অভিমুখে চলিলেন। পথে আবুবেকর ও ওমরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, "হজরত আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছেন, তিনি আমার পশ্চাতে আসিতেছেন। এরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, বন্ধুবর্গ মন্দিরে উপস্থিত হইবেন, সেখানে এক্ষণই সকল সম্ভ্রান্ত লোকের সন্নিধানে শুভ পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।" ইহা শুনিয়া আবুবেকর ও ওমর সহর্ষে আলির সঙ্গে মসজেদে চলিয়া আসিলেন। হজরতও তাঁহাদের

সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার মুখমণ্ডল হর্ষে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল। তিনি মন্দিরে উপনিত হইয়াই বেলালকে বলিলেন, "বেলাল, মোহাজের ও আনসার দলের সমুদায় লোককে উপস্থিত কর।" বেলাল আজ্ঞানুসারে সকলকে ডাকিয়া আনিলেন তদনন্তর হজরত বেদীতে আরোহণপূর্ব্বক ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিয়া বলিলেন, "মোসলমান বন্ধুগণ, জেব্রিলযোগে সংবাদ পাইয়াছি যে, প্রভু পরমেশ্বর স্বর্গলোকে দেবমণ্ডলীর মধ্যে স্বীয় দাসী ফাতেমাকে আপন দাস আলির সঙ্গে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি আদেশ হইয়াছে যে বন্ধুবর্গের সাক্ষাতে এই শুভানুষ্ঠানকে নবীভূত করিয়া তুলি, যথারীতি সাক্ষিগণের সাক্ষ্য গ্রহণাদি দ্বারা ইহাকে দৃঢ়ীভূত করি।" তৎপর বলিলেন, "আলি, তুমি দণ্ডায়মান হও ও খোৎবার নিয়ম পালন কর।" তৎক্ষণাৎ আলি সভাস্থলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ঈশ্বরের গুণানুবাদ ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দান, এবং হজরতের প্রশংসা করিলেন। তখন হজরতের কন্যার কাবিনস্বরূপ বরের বর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইল। আলি বলিলেন, "আমি ইহাতে সম্মতি দান করিলাম। সভাস্থ বন্ধুগণ, আপনারা এ বিষয়ে হজরতের সম্মতি জিজ্ঞাসা করুন, এবং ইহার সত্যতাসম্বন্ধে সাক্ষী থাকুন।" সমাগত সম্ভ্রান্ত মোসলমানগণ হজরতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, এই রূপেই কি উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদন বিহিত করিয়াছেন?" হজরত হাঁ বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন সভার চতুর্দ্দিক হইতে "ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন" এই ধ্বনি উত্থিত হইল। তদনন্তর হজরত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং আলিকে বলিলেন, "যাও স্বীয় কবচ বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য লইয়া আইস।" আলি সেই বর্ম্ম চারি শত দেরহম মুদ্রা মূল্যে আমির ওস্মানের নিকটে বিক্রয় করেন। কেহ কেহ বলেন ওস্মান চারি শত যাট দেরহমে উহা ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই কবচ অতি উত্তম ও সুদৃঢ় ছিল, করবালের আঘাত তাহাতে বিন্দুমাত্র বসিতে পারিত না। বর্ম্ম ওস্মানকে প্রদান করিয়া মূল্য গ্রহণ করা হইলে পর ওস্মান বলিলেন, "আলি, তুমিই এই বর্ম্মের উপযুক্ত পাত্র, তোমার অঙ্গেই ইহা শোভা পায়, ইহা আমি তোমাকেই প্রত্যর্পণ করিলাম।" আলি আমির ওস্মানের এই প্রীতি ও বদান্যতা দেখিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দান করিলেন, এবং তখনই হজরতের নিকটে যাইয়া মুদ্রা ও বর্ম্ম দুই তাঁহার নিকটে রাখিয়া দিলেন। হজরত মোহম্মদ কবচ বিক্রয় না করিয়া মুদ্রা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া গেল ইহা জিজ্ঞাসা করিলে আলি ওস্মানের বদান্যতার কথা জানাইলেন। হজরত শুনিয়া পুলকিত অন্তরে ওস্মানকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি উক্ত মুদ্রাপুঞ্জ হইতে কিছু মুদ্রা গ্রহণ করিয়া আবুবেকরের হস্তে প্রদানপূর্ব্বক বিবাহিতা কন্যার জন্য উপঢৌকন সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিতে বলিলেন। দ্রব্যজাত বহন করিয়া আনিবার জন্য সোলমান ও

বেলালকে তাঁহার সঙ্গে পাঠাইলেন। আবুবেকর তদ্দারা ফাতেমার নিমিত্ত এই সকল যৌতুক সংগ্রহ করিলেন; যথা— সুকোমল উর্ণাপুঞ্জে নির্ম্মিত মেসর দেশীয় শয্যাবিশেষ, এবং এমন একটি চর্ম্মময় গদি যাহার ভিতরে খোর্ম্মাবল্কলের তন্তুসকল নিহিত ছিল, এবং পবয়রের একখানা কম্বল, এবং কতকগুলি মৃণ্ময়পাত্র ও একটি কোষের যবনিকা আবুবেকর এ সমস্ত হজরতের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। হজরত এই সকল সামগ্রী দর্শন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন, "পরমেশ্বর, যাহাদের মৃণ্ময়পাত্র প্রিয়সামগ্রী সেই সমস্ত লোককে তুমি আশীর্ব্বাদ কর।" অনন্তর তিনি ইচ্ছানুরূপ অন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত ক্রয় করিবার জন্য অবশিষ্ট মুদ্রা ওম্মসোলমার হস্তে অর্পণ করিলেন। কিছু সুগন্ধ দ্রব্য ক্রীত হইল।

ক্রমশঃ

দুর্ভিক্ষে মহিলাদের কর্ত্তব্য।

২য়।

আমরা বিগত চৈত্র মাসে ভারতের নানা স্থানে যে ঘোরতর দুর্ভিক্ষের আক্রমণ, শত সহস্র লোকে অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে, এবং কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়া মহা ক্লেশে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, পাঠিকাদিগের নিকটে তদ্বিবরণ কিছু বলিয়াছি। নববিধান মণ্ডলী হইতে নববিধান প্রচারক শ্রীযুক্ত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয় ব্রাহ্মযুবা শ্রীমান্ ডাক্তার বিনোদবিহারী রায়কে সঙ্গে করিয়া মির্জ্জাপুর নগর হইতে ১৮ মাইল দূরে লালগঞ্জ নামক স্থানে অন্নাভাবগ্রস্ত মুমূর্ষু লোকদিগের সেবা করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ কমিটী হইতে দুই হাজার টাকা, এবং ভিক্ষা দ্বারা কয়েক শত টাকা প্রাপ্ত হইয়া যে গিয়াছেন আমরা তাহাও পাঠিকাদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছি তাহার পরে আরও তিন জন দয়ার্দ্র হৃদয় উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবা সেস্থানে গিয়াছেন। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাঁহাদের যত্ন পরিশ্রম অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। তাঁহারা প্রত্যহ ৬০০ শত লোককে অন্ন দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, রুগ্ন দুর্ব্বল মুমূর্ষুপ্রায় শিশুদিগের প্রাণরক্ষার জন্য দুগ্ধের অভাব ছিল, এক সের পরিমাণ দুগ্ধের সংস্থান করা দুষ্কর হইয়াছিল, এক্ষণ যত্ন চেষ্টায় ও বিহিত উপায়ে প্রতিদিন দুই মণ দুগ্ধ পাইবার যোগাড় হইয়াছে। রুগ্ন শিশুদিগকে দুধসাগু, বয়স্থ নরনারীদিগকে রুটি বা অন্যরূপ খাদ্য দেওয়া হইয়া থাকে। মির্জ্জাপুরের কলেক্টর ও জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং কোন কোন প্রধান উকিল ও রেলওয়ে ডাক্তার হইতে তাঁহারা সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেছেন। অপিচ তাঁহাদের প্রতি অনেকে অতিশয় সদয় ব্যবহার করিতেছেন। মির্জ্জাপুর নগর হইতে লালগঞ্জ পর্যন্ত ১৮ মাইল পথ দুর্গম, এক্কারোহণে অতি ক্লেশে সেখানে যাইতে হইয়াছে। সেই স্থানে তৃণ লতিকা বিহীন, তথাকার পানীয় জল পাওয়া দুষ্কর; রৌদ্রের উত্তাপে সমুদায় যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে সেবকগণ একটি সামান্য খোলার ঘরে

স্থিতি করিয়া আহারের কষ্ট এবং রৌদ্রের তীব্র উত্তাপকে অগ্রাহ্য করিয়া অক্লান্তভাবে পবিত্র সেবার কার্য্য করিতেছেন। এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ডাক্তার শ্রীমান্ বিনোদবিহারী অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, সম্প্রতি ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী সমুদায় ব্যবস্থা করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেস্থানের লোকেরা মনে করিতেছে যে অন্ন ভাবে মৃতপ্রায় লোকদিগের জীবন রক্ষার জন্য ইঁহারা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইঁহারা দেবতা। গভর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যথোচিত অর্থ ব্যয় ও যত্ন চেষ্টা করিতেছেন, হৃদয় শূন্য কর্ম্মচারীদিগের দোষে সকল স্থানে সফলকাম হইতে পারিতেছেন না। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মক্ষম পুরুষ ও নারীদিগকে মাটীকাটার কাজে নিযুক্ত রাখিয়া দুই আনা ও ছয় পয়সা করিয়া পারিশ্রমিক দান করিয়া থাকেন, সেই অর্থে তাহারা উদরপূর্ত্তি করিয়া খাইতে পারে না, দিন দিন অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। কাজকর্ম্মের অনুপযুক্ত লোকগণ অন্যরূপে সাহায্য পাইয়া থাকে।

ব্রজগোপাল বাবু ২৯শে এপ্রিল ব্রহ্ম মন্দিরে দুর্ভিক্ষ বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, লালগঞ্জের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে অন্ততঃ জুনমাস পর্য্যন্ত সাহায্য দান করা প্রয়োজন। প্রত্যহ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হইতেছে। কলিকাতায় কতিপয় ব্রাহ্মযুবা ভিক্ষার ঝুলিসহ আত্মীয় বন্ধুদিগের বাড়ী বাড়ী যাইয়া চাউল ও পয়সা ভিক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা এক এক পরিবারে এক একটী হাঁড়ী রাখিয়া দিয়াছেন, গৃহিণীগণ রন্ধনের সময় এক এক মুষ্টী চাউল এবং বাজার খরচের জন্য টাকা ভাঙ্গাইলে দুই একটী পয়সা সেই হাঁড়ীতে রাখিয়া দেন। যুবকগণ ২৪ দিন পরে বা সপ্তাহান্তে সেই চাউল ও পয়সা সংগ্রহ করিয়া চাউল বিক্রয় করেন, তাহাতে যে অর্থলাভ হয় তাহা দুর্ভিক্ষক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেন। দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত লোকেরা বস্ত্রাভাবে কষ্ট পাইতেছে, যুবক সেবকগণ জীর্ণ ও ছিন্ন বস্ত্র পুঞ্জ পরিমাণে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া লালগঞ্জ অঞ্চলে পাঠাইয়া দিয়াছেন। কেহ কতকগুলি চট পাঠাইয়াছেন, তাহা দ্বারা রৌদ্রের উত্তাপ হইতে গৃহহীন আশ্রয়হীন দুঃখী লোকদিগকে ছায়াদান করিয়া রক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনা অঞ্চলেও দুর্ভিক্ষের ভীষণ আক্রমণ, সেখানেও অর্থাদি প্রেরিত হইতেছে। এই দয়ার কার্য্যে মহিলাদের কি সহানুভূতি হইবে না? যিনি যাহা দিতে চাহেন, দুর্ভিক্ষ কমিটীর সম্পাদক প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের নিকটে বা নববিধান প্রচার কার্য্যালয়ে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন।

গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ পীড়িত ১২ লক্ষ লোককে সাহায্য দান করিতেছেন, ক্রমে সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। অযোধ্যা প্রদেশের সীমান্ত বড়াই জিলাতে দুর্ভিক্ষের ভয়ানক প্রকোপ, উড়িষ্যার স্থানে স্থানে এবং

এলাহাবাদের জিলাতে দুর্ভিক্ষের প্রবল আক্রমণ। ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী সেদিন ব্রহ্মমন্দিরে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে দুর্ভিক্ষের আক্রমণ চিরদিনের জন্য বন্ধ হইতে পারে সে বিষয়ে সার সার কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন, লোকের অজ্ঞানতা ও শ্রম বিমুখতা দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ার প্রধান কারণ। এস্থলে এবিষয় অদ্য আলোচ্য নহে। ভাই ব্রজগোপাল দুর্ভিক্ষ ক্ষেত্র হইতে যেক্রমে দুই খানা পত্র পাঠাইয়া ছিলেন এস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

মির্জাপুর, ১২ই এপ্রিল, রবিবার।

বিনোদ ও আমি গত বুধবার ভোর বেলায় মিরজাপুর ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছি। বাবু রাধারমণ ঘোষ রেলের ডাক্তার তাঁর বিষয় পূর্ব্বে অনেক সুখ্যাতি শুনিয়াছিলাম কিন্তু কখনও দেখি নাই, এখানে আসিয়া তাঁহারই আশ্রয় লইতে হইয়াছে, তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত যত্ন ও ভালবাসা প্রকাশ করিতেছেন। লোকটি নীরবে আমাদের সকল বিষয় সাহায্য করিতেছেন ও দুবেলা বিবিধ উপচারে আহার দিতেছেন। বুধবার দিন এখান হ'তে চারি মাইল দূরে দুর্ভিক্ষের কর্ম্মচারী ২১ জনের সঙ্গে দেখা করিয়া সংবাদ লইলাম। মিরজাপুর সহরে ও নিকটবর্ত্তী স্থানে দুর্ভিক্ষ নাই, এ সহরের নিকটেও একটা গরিব খানা poor house খোলা হইয়াছে তাহাতে অধিক লোক নাই, ব্যবস্থা ভাল দেখিলাম। রামনবমীর দিন বিন্ধ্যাচলে বড় মেলা হয় তাহা দেখিলাম, অনেক হাজার লোক উপস্থিত ছিল আমরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ও রোগগ্রস্ত কোন কোন লোক পাইলাম।

সংবাদ পাইলাম লালগঞ্জ, রবার্ট্‌স্‌ গঞ্জ, পন্নুগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষের খুব প্রকোপ। কাল শনিবার আমরা লালগঞ্জ গিয়াছিলাম। এ স্থানটি একটা ছোট বাজার, এ স্থান হ'তে ১৮ মাইল দক্ষিণে এখানে একটা বাঁধের কাজ হইতেছে। প্রায় পাঁচ হাজার লোক আছে ইহার অর্দ্ধেক শিশু। ব্রাহ্মণ হইতে চামার কোল সকল জাতিই মাটি কাটা, বওয়া, পিটা ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত, ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই মেট, খাটায়, ভয়ানক রৌদ্রে লোকেরা কাজ করে, তাদের ছেলে মেয়েদের রৌদ্রে কাপড় চাপা দিয়া টুকরী ইত্যাদিতে শোয়াইয়া রাখে অনেক শিশু অনাহারে ভয়ানক কৃশ, শুনিলাম রোজ ২।৪ জন শিশু মরিতেছে। সরকার হ'তে অতি অল্প দুধের বন্দোবস্ত আছে, শিশুদের জন্য আহারেরও বন্দোবস্ত আছে তাহাতে প্রায় লোক যায় না, এখানেও গরিবখানা আছে কিন্তু তাহাতে কেবল বিদেশী লোক লওয়া হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও ভয়ানক কষ্টের কথা শুনিলাম। আমরা লালগঞ্জকেই আমাদের কার্য্যের স্থান বিশ্বাস করিতেছি। কাল এখানকার জয়েণ্টমাজিষ্ট্রেট্ লালগঞ্জেই ছিলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করিলাম, তিনি আমাদের কাজের কথা শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তবে বিশেষ অনুমতি কলেক্টর সাহেবের নিকট হইতে লইতে হইবে। আমরা উপস্থিত শিশুদের

জন্যই বন্দোবস্ত করিব। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় যে চট দিয়াছেন তাহা কালই বিতরণ করিব, তাহাতে শিশুরা একটু ছায়া পাইতে পারে—তারপর বোধ হয় পরশু হ'তেই দুধ যোগাইতে পারিব। এইরূপে শিশুদের সেবা আরম্ভ করিয়া অন্য সকল কার্য্যও উপস্থিত হইবে। এখানকার ২।৩টি বড় মহাজন ও ঠিকাদারের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের কার্য্যের সহায়তা করিবেন। লালগঞ্জে ভাল বাড়ী পাওয়া যাইবে না, এদিকে ডাকাতের ভয় বেশ আছে, এজন্য একসঙ্গে অধিক টাকা আনাইবার উপায় নাই। আমাদের সঙ্গে যাহা ছিল তাহার কতক অংশ খরচ হইয়াছে; আজ বৈকালে কিছু টাকার জিনিষ কিনিয়া কাল লালগঞ্জে লইয়া যাইতে হইবে। এজন্য বিনয়েন্দ্র বাবুকে এখন মনিঅর্ডার করিয়া ৫০৲ টাকা পাঠাইতে বলিতেছি। পুরাতন কাপড় যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা পার-শেল করিয়া ডাঃ রাধারমণ ঘোষ মিরজাপুর ষ্টেশন ঠিকানায় পাঠাইবেন। কাপড়ের অভাব বড় বেশি। জামা ও ধুতি, সাড়ী রকমের কাপড় পাঠাইবেন, সেবারের মত কলর নেকটাই যেন না আসে। এখানে একটু দূরে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে সেজন্য বেশি লোকের দরকার। এখন আর দুজন লোক আসিলে ভাল হয়। নীল চশমা লইয়া আসিলে রৌদ্রে বড় কষ্ট হবে না। লালগঞ্জে চাল, ডাল, আলু, ঘী পাওয়া যায়। অন্য বিষয়ে বড় অসুবিধা হবে না। কাজ খুলিবার সময় একটু ঘোরাঘুরী দরকার, এখন কেহ কেহ আসিলে ভাল হয়। লালু বাবু যদি ভাল হইয়া থাকেন, তবে যামিনী, নগেন্দ্র বিশ্বাস, প্রবোধ, বিনয় ইহাদের মধ্যে দুই জন আসিলে ভাল হয়। আমরা ভাল আছি।

মির্জাপুর, ১৫ই এপ্রিল।

শ্রীচরণকমলেষু।

দলে দলে অতি কৃশ শিশু ও বৃদ্ধ আমাদের নিকট আসিতেছে। কাল ৫০।৬০ জনকে দুদ শাগু দেওয়া হইয়াছে, চট দিয়া ছায়া করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পুরাতন আলকাতরা মাখান চট পাইলে বড় উপকার হয়। যে পুরাতন কাপড় সংগ্রহ হইয়াছে তাহা পাঠাইবেন। দিন দিন অধিকতর দুঃখ দেখা যাইতেছে আরও সেবকের দরকার। দুই ক্রোশ যাইয়া কাজ করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারেন এইরূপ ২জন লোক আসিলে ভাল হয়। আজ সকালে ৫০।৬০ জনকে দুধ-সাগু দেওয়া হইবে। অন্য কতকগুলি লোককে অন্যরূপে সাহায্য করা যাইতেছে।

বিনোদ খুবই বৈরাগী, ধুলা মাছি রৌদ্র গরম বাতাস সকলই সহ্য করিতেছেন। আহার ভাত, দাল, আলু, ছোলাভাজা মাত্র, আমি যেমন তেমনই প্রায় চলিতেছি তবে শরীরটা তেমন ভাল হয় নাই। আরও সেবক আসিলে কাজ বাড়াইতে হইবে। সম্ভবতঃ কাল একশত জনকে রুটী খাওয়াইতে পারিব, লোকজন রাখিয়া আমাদের কাজের ব্যবস্থা করিয়া লইতেছি। খবরের কাগজ কিছু পাঠাইবেন।

সেবক শ্রীব্রজগোপাল নিয়োগী।

প্রাপ্ত।

মহাশয়,

অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক মৎপ্রেরিত পত্র খানিকে আমাদের মহিলার এক পার্শ্বে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

সুনীতিকলেজে পারিতোষিক দান।

বিগত ৮ই এপ্রেল বুধবার ৪॥ ঘটিকার সময় সুনিতি কলেজের ছাত্রীগণকে পারিতোষিক দান অত্যন্ত সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধেয় মহারাজা বাহাদুর ও শ্রদ্ধেয়া মহারাণী মহাশয়া পারিতোষিক বিতরণ ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। মহারাজা বাহাদুর স্বয়ং স্বহস্তে পারিতোষিক দান করিয়াছেন। স্থানিয় ল্যান্সডাউন-হলে বিতরণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পারিতোষিক দানের কার্য্যারম্ভ হইবার পূর্ব্বে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট বালিকা সমস্বরে সঙ্গীত ও বাঙ্গলা কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। শ্রীমতী বিধান নন্দিনী মজুমদার নাম্নী জনৈক বালিকা সঙ্গীত দলের নেতৃত্ব গ্রহণ ও একটী সুন্দর ইংরাজি কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। মহারাজা বাহাদুর ও মহারাণী মহাশয়াকে ভক্তি উপহার দিবার জন্য যে দুইটী কবিতা করিয়া ও মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা ৪০ জন বালিকা কর্ত্তৃক সমস্বরে আবৃত্ত হইয়া মহারাজা ও মহারানীর হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল। শ্রীমতী বিধান নন্দিনী মজুমদার ও শ্রীমতী শান্তি দায়িনী মজুমদার ও শ্রীমতী খণা নাই টিঙ্গেল মজুমদার ও শ্রীমতী মৃণালিনী দত্ত পর্য্যায় ক্রমে প্রদত্ত ভক্তি উপহার সমস্বরে আবৃত্তি করিয়াছিল তৎপরে কলেজের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিসেস্ মজুমদার বাৎসরিক বিবরণী পাঠ করেন। শ্রীমতী বীণাপানি বন্দ্যোপাধ্যায় নাম্নী যে বালিকা বিগত নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় সমগ্র কুচ বিহার বিভাগে বালক বালিকাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল, স্বদেশ হিতৈষিনী বিদ্যোৎসাহিনী মহারাণী মহাশয়া তাহাকে একটী মূল্যবান্ স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছেন। পারিতোষিক বিতরণান্তে ভক্তিভাজন স্বদেশ হিতৈষি বিদ্যোৎসাহী মহারাজা বাহাদুর তাঁহার স্বাভাবিক সুমিষ্ট ইংরাজী ভাষায় উপস্থিত বালিকা দিগকে কিছু বলিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ নিম্নে লিখিত হইল।

"প্রিয় বালিকাগণ! আমি! আজ"
"তোমাদের পারিতোষিক দান করিয়া"
"যার পর নাই আনন্দ লাভ করিয়াছি।"
"তোমরা দিন ২ আরও শিক্ষোন্নতি"
"লাভ করিয়া পরিবারের উপযুক্ত"
"হও ইহাই একান্ত প্রয়োজন। আমি"
"ইউনিভার্শিটীর নিয়মানুসারে তোমা"
"দের শিক্ষার পক্ষপাতী নই। তোমা"
"দিগকে বিএ এমএ উপাধি লাভ"
"করিবার জন্য বলিতেছি না। তোমরা"
"যাহাতে পরিবারে গৃহ কার্য্যের"
"উপযুক্ত হও ইহাই তোমাদিগকে"
"শিক্ষা দিতেছি।"

প্রধান শিক্ষয়িত্রী যে বাৎসরিক বিবরণী

ও বালিকাগণ মহারাজা বাহাদুর এ মহারাণী মহাশয়াকে প্রদত্ত "ভক্তি উপহার" যাহা আবৃত্তি করিয়াছিল তাহাও মহিলাতে প্রকাশার্থ প্রেরিত হইতেছে।

সুনীতি কলেজের বাৎসরিক বিবরণ।

(১৯০৭ সালের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে)

সুনীতি কলেজের বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করিতে গেলে এদেশীয় নারীজাতির প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতি স্বতঃই জাগিয়া উঠে। দক্ষিণ বঙ্গে যেমন ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আভাস দেখা গিয়াছে, সেইরূপ এই সুদূর হিমালয়ের পাদদেশস্থিত কুচবিহার ভূমে এই সুনীতি কলেজের প্রতিষ্ঠা এ দেশের নারিজাতির মধ্যে জ্ঞানালোক বিস্তারের যে একটা পথ প্রস্তুত করিতেছে তাহা কে না স্বীকার করিবে? ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীর প্রভাতে যেমন বিমল-সূর্য্য রশ্মি সমস্ত পৃথিবিকে আলোকিত করিতে থাকে, সেইরূপ এই সুনীতিকলেজও যে এদেশের নারীজগতের চির সঞ্চিত তমসা রাশি ভেদ করিয়া জ্ঞান ও সভ্যতালোক বিস্তার করিবার জন্য দণ্ডয়মান হইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? কুচবিহারের অতীত ইতিসাস ও অতিত স্মৃতি এখনও যাঁহাদের হৃদয়ে অস্ফুটাকারে বাস করিতেছে, তাঁহাদিগকে এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে এই সুনীতি কলেজ ও কুচবিহারের উপনগর সমূহে প্রতিষ্ঠিত নারীবিদ্যালয় সমূহ নারীজগতে একটা যুগান্তর উপস্থিত করিতেছে। এই ক্রমোন্নতিশীল নারিশিক্ষা যে এদেশীয় দিগের মধ্যে আদর্শ নারীপরিবার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্বরূপ তাহার আর সন্দেহ নাই।

বিগত কয়েক বৎসর হইতে সুনীতি কলেজের কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। মাননীয় দানশীল মহানুভব কুচবিহারাধিপতি ও মাননীয়া দানশীলা কুচবিহারাধীশ্বরীর বদান্যতাই এই বিদ্যালয়ের প্রাণ। একমাত্র রাজ সাহায্যের উপরই এই বিদ্যালয়ের ভিত্তি সংস্থাপিত। বর্ষে বর্ষে অনেক বালিকা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পরিক্ষা বিশেষে উত্তীর্ণ হইয়া দেশে দেশে সুখী পরিবারের পথ প্রস্তুত করিতেছেন। বিগত নিম্ন-প্রাথমিক পরীক্ষাতেও সুনীতি কলেজ খুব আশাপ্রদ ফল প্রদর্শন করিয়াছে। যে সকল বালিকা উক্ত পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথম বিভাগে

কুমারী বীণাপানি বন্দ্যোপাধ্যায়
,, খনা নাইটিঙ্গেল মজুমদার
,, মৃণালিনী দত্ত
,, মৃণালিনী মিত্র
,, চারুবালা সেন

দ্বিতীয় বিভাগে

,, সুভাষিণী রায়

ইহা আমাদের পক্ষে খুব আনন্দজনক ও আশাপ্রদ যে উপরোক্ত বালিকাদিগের মধ্যে কুমারী বীণাপাণি দেবী সমগ্র কুচবিহার বিভাগে ছাত্র ছাত্রীগণের মধ্যে প্রথম

স্থান অধিকার করিয়াছে এবং বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ১৫০ কিন্তু গড় উপস্থিত ৭০।৭৫ জন। অল্প বয়স্ক ছাত্রীর সংখ্যাই অধিক। তাহারা নিয়মিত রূপে উপস্থিত হইতে পারে না।

উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে উদারচেতা মহারাজা ভূপ বাহাদুর এবং স্বদেশহিতৈষিণী মহারাণীর সাধু সঙ্কল্প সমূহ দেবকৃপায় কার্য্যে পরিণত হইয়া স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করুক ইহাই প্রার্থনীয়।

সুনীতি কলেজ কুচবিহার। ৮ই এপ্রেল ১৯০৮	সুমতি মজুমদার প্রধান শিক্ষয়িত্রী।

আশেষগুণসম্পন্ন বঙ্গকুলতিলক

শ্রীল শ্রীযুক্ত কোচবিহারাধিপতি জি, সি, আই, ই ; সি, বি, মহারাজ বাহাদুর করকমলেষু।

ভক্তি উপহার।

(সুনীতি কলেজে বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে)

(১)

এস এস মহারাজ, বড় শুভদিন আজ
নতশিরে ভক্তিভরে করি নমস্কার।
সুপ্রভাত আমাদের, নাহি সীমা আনন্দের
দীনা কন্যা ব'লে তুমি দিবে পুরস্কার।

(২)

তব শুভ আগমন, রাজমুখ দরশন
বড় ভাগ্য হয় আজ আমাদের তাই।
রাজর্ষি জনক সম, তব গুণ অনুপম
শুভদিনে সবে মিলে তব যশঃ গাই

(৩)

আশা পূর্ণ প্রাণে সবে, শুভদিনে শুভোৎসবে
এসেছি আমরা আজ আনন্দে ছুটিয়া।
শুভদিনে সবে আজ, আসিয়াছি মহারাজ
উদ্যম আশায় কত পরাণ বাঁধিয়া।

(৪)

ধন্য ধন্য তব নাম, রাজর্ষি যেমন রাম
ভক্তি শ্রদ্ধা ভরে সবে করি নমস্কার ;
কেন্দ্র হতে কেন্দ্রান্তরে, সুমেরু কুমেরু পারে
সুনাম সুখ্যাতি তব সর্ব্বত্র প্রচার।

(৫)

আমাদের তরে কত হিত ব্রতে সদা রত
দেশের কল্যাণে ব্যস্ত যথায় তথায়।
আমাদের ভাল বেসে, তব যশঃ দেশে দেশে
চলেছে কোথায় আজ সাগর বেলায়।

(৬)

শত ধন্যবাদ আজ, দিই তোমা মহারাজ,
দিই আজ নমস্কার চরণে তোমার।
হৃদয় খুলিয়া সবে, গাই আজ উচ্চরবে
গাই তব গুণ সবে—গাই শতবার।

(৭)

গাই মোরা ভগ্নীদলে, মিলি সবে এই স্থলে
আনন্দে সকলে গাই সুযশঃ তোমার।
নাহি কিছু আমাদের, ভক্তি শ্রদ্ধা হৃদয়ের
আছে মাত্র আমাদের তোমাকে দিবার।

(৮)

লও তাই স্নেহে আজ, লও তুমি মহারাজ,
লও আমাদের এই প্রীতি নমস্কার।
আমরাও ভক্তিভরে, আমাদের ক্ষুদ্র করে
লই আজ সবে মিলে তব পুরস্কার।

কোচবিহার সুনীতি কলেজ, ৮ই এপ্রিল ১৯০৮ ইং।	আপনার স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী সুনীতিকলেজের ছাত্রীগণ

অশেষগুণসম্পন্না মাননীয়া—

শ্রীযুক্তা মহারাণী কোচবিহারাধীশ্বরী

সি, আই, মহোদয়া করকমলেষু।

ভক্তি উপহার।

(সুনীতি কলেজে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণোপলক্ষে)

(১)

আজি শুভ দিনে উৎসব অপার,
আজি কি আনন্দ হৃদয়ে সবার!
বৎসরের পরে,
প্রফুল্ল অন্তরে,
এসেছি আমরা আহ্বানে তাঁহার
রচিত যাঁহার এই পরিবার।

(২)

এসেছি আমরা প্রফুল্লিত মনে,
কেবল তাঁহারি মহিমা কীর্ত্তনে,
কৃপায় যাঁহার,
এই পরিবার
প্রতিষ্ঠিত এই দূর বঙ্গালয়ে,
গাই যশঃ তাঁর প্রফুল্ল হৃদয়ে।

(৩)

বসন্তের পাখী পরাণ খুলিয়া,
গাইছে কাননে বিজনে বসিয়া,
আমরাও গাই,
এস সবে ভাই
আমরাও অই পাখীদের সনে
গাই গুণ তাঁর আনন্দিত মনে।

(৪)

আমাদের আজ আনন্দ অপার,
আমাদের আজ পরাণ সবার
নূতন আশায়,
নূতন তৃষায়,
নূতন উচ্ছ্বাসে ছুটেছে কোথায়
আজ ভক্তি ভরে নমি তাঁর পায়।

(৫)

ভক্তি শ্রদ্ধা দিই তোমারে আবার,
জননী সমান হৃদয় তোমার,
আমাদের তরে,
ব্যাকুল অন্তরে,
আমাদের হিতে উন্নতি কল্পেতে,
ডেকেছ মোদের অপার স্নেহেতে।

(৬)

ধন্য তব নাম সুদূর প্রদেশে
দুঃখিনী নারীর উন্নতি উদ্দেশে,
জ্ঞানশিক্ষা তরে
নগরে নগরে,
যতনে গঠিত নারী বিদ্যালয়,
তব পদে আজ ভক্তি অশ্রু বয়।

(৭)

ভক্ত পিতা তব বিধাতা আদেশে
ক্রুশবাহী মত এ দূর প্রদেশে,
বিধানের কথা—
নূতন বারতা
আপন শোণিতে করিয়া প্রচার
করিলেন ধন্য সুদূর "বিহার"।

(৮)

তাঁর কন্যা তুমি ধন্য মহারাণী,
দয়া ধর্ম্ম তব সবে মোরা জানি,
সুনাম তোমার
সর্ব্বত্র বিস্তার

দীনা কন্যা তব আমরা তোমার
ভক্তি ভরে লই তব পুরস্কার।

কোচবিহার সুনীতিকলেজ ৮ইএপ্রিল ১৯০৮ } আপনার স্নেহাকাঙ্ক্ষিনী সুনীতিকলেজের ছাত্রীগণ

কুচবিহার হইতে প্রাপ্ত।

উৎসবের উপহার।

যুবরাজের জন্মদিন।

সিন্ধু পার হ'তে ভারত ভূমিতে
উত্তাল তরঙ্গ আসিছে ছুটিয়া,
শুভ ইচ্ছা তাঁর, শুভ সমাচার
শুভদিনে গাই সকলে মিলিয়া,
স্নিগ্ধ সমীরণ, পাখীর কূজন
কুমারের কথা কহিছে সবাই,
শুভ জন্মদিনে, আনন্দিত মনে
সবে মিলে আজ তাঁর গুণ গাই।
কৃপায় যাঁহার দূর সিন্ধু পার
গেছেন কুমার সুদূর প্রদেশে,
সাগরের বক্ষে, সীমান্ত অলক্ষ্যে
চলেছেন আজ সাগরের শেষে।
তাঁহারি চরণে এই শুভ দিনে
ভক্তি ভরে আজ সবে নত হই,
সবে গাই তাঁর মহিমা অপার
সবে তাঁর পদে নত হ'য়ে রই।
কুমারের তরে আজি ঘরে ঘরে
ভিক্ষা করি সবে আশীষ তাঁহার,
সুদূর বেলায় কুমার যথায়,
শুভ ইচ্ছা যাক্ তথায় সবার।
প্রাসাদে, কুটিরে, সবে সমস্বরে
শুভ ইচ্ছা তাঁর সবে মিলে গাই,
কেবল প্রার্থনা— তাঁহার করুণা
আর কিছু আজ চাহিবার নাই।
কৃপার ভিখারী আমরা তাঁহারি,
কৃপা ভিন্ন কিছু নাহি চাহিবার,
তাই শুভ দিনে আনন্দিত মনে,
ভিক্ষা করি সবে করুণা তাঁহার।
আমরা হেথায় ভারত বেলায়
তাঁহার মহিমা সবে মিলে গাই
দেশে দেশে বলি, ভাই ভগ্নী মিলি
কৃপা বই তাঁর—আর কিছু নাই।

নববিধান সমাজ, কোচবিহার; ১৩১৫ সাল। } সেবক, শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

উৎসবের উপহার।

ব্রহ্মোৎসব।

সুদূর বঙ্গেতে হিমাদ্রি দেশেতে
এই শুন আজ বিধানের জয়,
বিশ্বাসী মানবে— বাল বৃদ্ধ সবে
বিধানের কথা আনন্দেতে কয়।
বিশ্বাসী মানবে, দেখ আজ সবে
ক্রুশ বিনা কভু নাহি হয় জয়,
ক্রুশের আগমে, এই মর্ত্ত্য ভূমে
খৃষ্টীয় বিধান সমাগত হয়।
এখানেও তাই সবে মিলে গাই—
"কেশবের ক্রুশ হয়েছে এখানে"
সেই ক্রুশ হ'তে আজি এ ভূমিতে
"বিধানের জয়" গাই এক প্রাণে।
কেশবের ক্রুশে আজি এই দেশে
নববিধানের নব পরিবার,
কেশবের ক্রুশে দেখ সবে এসে
নূতন বংশের হতেছে বিস্তার"।

কেশবের কৃপে, আজি দেশে দেশে,
নূতন মানব হয় অভ্যুদয়,
কেশবের কৃপে, আজি আর্য্য দেশে
নূতন ইস্রা'ল বংশের উদয়।
কেশবের কৃপে, হিমাদ্রি প্রদেশে
নববিধানের নব দেবালয়,
কেশবের কৃপে আজি দেশে দেশে
গাই সবে গাই "বিধানের জয়"
কেশবের কৃপে মনের হরষে
আজি এ উৎসবে করি জয় গান,
পাই সবে মিলে আজি প্রাণ খুলে—
জয় যুক্ত আজ্ "নূতন বিধান"।

নববিধান সমাজ, কোচবিহার, ১৩১৫ সাল। — সেবক, শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

প্রাসাদে—পুণ্যাহ।

(১)

আজি কিবা শুভদিন—শুভ দরশন,
আজি কি সুন্দর দৃশ্য নৃপতি আলয়ে।
আজি কিবা শোভা ধরে রাজ সিংহাসন।
আনন্দের স্রোত বহে হৃদয়ে হৃদয়ে।

(২)

শুভ পুণ্যাহের আজ্—উৎসব অপার,
ইন্দ্রের অলকাসম নৃপতি ভবন,
বৎসরের পরে আজ্ দরিদ্র প্রজার
উদ্যম উৎসাহ, আশা আনন্দ বর্দ্ধন।

(৩)

প্রজা-বৎসল রাজা প্রজার কারণ
লক্ষ হৃদয়ের আজ্ শুভ ইচ্ছা লয়ে
লক্ষ প্রজা-বৃন্দ মাঝে রাজর্ষি যেমন
উপবিষ্ট সিংহাসনে সুরম্য আলয়ে।

(৪)

ভক্তিমান্ দেওয়ান কর্ম্মচারী যত
উপস্থিত সবে আজ্ রাজ দরবারে
শ্রদ্ধা ভক্তি ভরে সবে হ'য়ে অবনত,
সমাগত সবে আজ্ আনন্দ অন্তরে।

(৫)

একজন আদরের সাগর বেলায়,
তরঙ্গের বক্ষে আজ্ হিমানী প্রদেশে,
কে জানে তরণী তাঁর ভাসিছে কোথায় ?
কিন্তু স্নেহ-স্মৃতি তাঁর হৃদয়ে পরশে।

(৬)

সেই জ্যেষ্ঠ যুবরাজ—ভাবী নরপতি,
দূর সিন্ধু পারে—তবু হৃদয়ে সবার
জাগিছে তাঁহার স্মৃতি—স্নেহের মুরতি,
তাঁরেও আশীষ আজ্ দরিদ্র প্রজার।

(৭)

দূর সিন্ধু পারে আজ্ পাশ্চাত্য বেলায়
"ভিক্টর" "হিতেন্দ্র" দুটী নৃপতি কুমার
সবে আজ সিন্ধু-প্রান্তে দেবের কৃপায়
লভিছেন শুভ ইচ্ছা দরিদ্র প্রজার।

(৮)

আজি রাজালয়ে সবে রাজ পরিবারে
আজি শুভ দিনে সবে মিলিয়া এখানে
আজি রাজ-সুখ হেরি প্রফুল্ল অন্তরে,
আজি গাই রাজগুণ শুভ অনুষ্ঠানে।

(৯)

আজি রাজপরিবারে নূতন বৎসর,
নূতন আনন্দ আজ্—উচ্ছ্বাস নূতন,
নূতন সকলি আজ—নূতন অন্তর,
নূতন কৃপার দৃশ্য হয় দরশন।

(১০)

নৃপতি, মহিষী আর "জিতেন্দ্র" কুমার
নৃপতি-কুমারী দুটী প্রফুল্লিত প্রাণে

ধন্যবাদ দেন স্মরি করুণা তাঁহার
আজি এই দৃশ্য যাঁর কৃপার বিধানে।

(১১)

ধন্যবাদ দিই আজি তাঁহারে সকলে,
কৃপায় যাঁহার আজ রাজ সিংহাসনে
রাজর্ষি জনক সম বসি এই স্থলে
আমাদের মহারাজ আমাদের সনে।

(১২)

বাসন্তী পূর্ণিমা নিশি—সুবিমল ভাতি,
নবীন তরুর পত্রে নবীন জোছনা,
নবীন তৃণেতে নব জোনাকির পাঁতি
নবীন করুণা আজ করিছে ঘোষণা।

বিধান পল্লী, কোচবিহার, ৩রা বৈশাখ, ১৩১৫। সেবক, শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

কেশব জননী সাধ্বী সারদা দেবী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

মনে করিলাম আর জীবন রাখিব না। আমার বড় ছেলে নবীন বলিলেন "মা এই সময় আমাদের বিষয় ভাগ হইবে তুমি কোথাও যাইও না।" আমি বলিলাম "তোদের দুর্ঘটনাই হোক্ আর বিষয়ই যাক্ আমি থাকিব না।" তখন আমার কৃষ্ণবিহারী তিন বৎসরের। আমি এক খানি কাপড় হাতে করিয়া বলিলাম, "চল্লাম আর তোরা যদি আমাকে যাইতে না দিস্, আমি কিছু চাইনে, এই কাপড় হাতে করে হেঁটেই চলিয়া যাইব। আমি সব মায়া কাটাইবার জন্য ঠাকুরের কাছে এই ভিক্ষা চাইলাম যে হে ঠাকুর, তুমি আমায় শুভ বুদ্ধি দাও, আর যেন এখানে ফিরে আস্তে না হয়। আমি নিতান্ত যখন যাইতে চাইলাম তখন তাঁহারা সব ঠিক করিয়া দিলেন, সঙ্গে লোকজন দিলেন এবং পাল্কীর ডাক বসিল। আমার ভাশুর বাপের বাড়ী থেকে আমার ভাজকে কৃষ্ণবিহারীর জন্য আনাইয়া লইলেন।

২২শে জুন ১৮৯২।

আমি শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিলাম। পথে সকলের চিঠি আসে আমার আর চিঠি যায় না, বড়ই কান্না পাইত। সবাই বলিতেন তুমি যদি এত কাঁদ তবে শেষে ঠাকুর দেখিতে পাইবে না। আমি ভাবিতাম, ঠাকুর কি এতই নির্দ্দয় যে আমার এত শোকেতেও আমায় দেখা দিবেন না। আমার মতন অভাগী কি আর পৃথিবীতে আছে। এতেও কি তিনি দয়া করিয়া আমায় দেখা দিবেন না। পথে আমার বড় ব্যামু হইয়াছিল সে দেশের লোকেরা দইএর সঙ্গে ধুতুঁরার বীচি মিশাইয়া দিত এবং পাতলা চুণ মিশাইয়া দিত। আমি সেই দই খাইয়া প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা একেবারে অজ্ঞান হইয়াছিলাম। মনে হইল কোথায় আসিয়া মৃত্যু হইল, ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না। অন্যান্য যাত্রীরা হরিনাম করিয়া সকলে ভোরে যাত্রা করিতে লাগিল। আমার দরোয়ান আমায় বলিল মা আপনি কি একলা থাকিবেন।

২৭শে ১৯০৩।

আমি অজ্ঞানাবস্থায় সমস্ত রাত্রি উঠানে ছিলাম। ভোরে চেতনা হইল সব যাত্রীদের সঙ্গে আমিও "জয় জগন্নাথ" বলিয়া উঠিলাম। আমি মৃত্যু আশঙ্কা

করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম, ভাবিলাম আমার কোলের ছেলে কৃষ্ণবিহারীকে ফেলিয়া আসিয়াছি। তাহার কথা মনে করিয়া সব সময়ই কাঁদিতাম, আমি যাত্রা করিবার সময় সে বড় কাঁদিয়াছিল, ইহা মনে করিয়া সকল পথই কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়াছিলাম। আমি তাহাকে এইরূপে প্রায়ই ফেলিয়া যাইতাম বলিয়া তাহার বড় কষ্ট হইত। আমায় বলিত "তুমি আমায় অত ফেলিয়া যাও কেন? তোমার কি আমার উপর মায়া হয় না!" আর একদিন বলিয়াছিল "আমার মত দুঃখ কাহারও পৃথিবীতে নাই" আমি বলিলাম "কিসের দুঃখ তোর বল্?" কৃষ্ণবিহারী বলিল না আমি বলিব না, কখনও বলিব না। আমি বলিলাম "বল্ লক্ষ্মী বল্ আমি তোমায় টাকা দেবো, খেলানা দেবো, বল্ তোর কিসের দুঃখ?" কৃষ্ণবিহারী তখন বলিল "বাবুর বাবা (আমার ভাশুর হরিমোহন সেনের ছেলে উপেন্দ্রনাথ সেনকে কৃষ্ণবিহারী বাবু বলিত আর উপেনও কৃষ্ণবিহারীকে বাবু বলিত) গঙ্গায় নাইতে যান আর ফিরিয়া আসেন; কৈ আমার বাবাত আর ফিরিয়া আসিলেন না"। আমি উত্তর দিতে পারিলাম না; আমার বড় মেয়ে সেখানে ছিল সে কাঁদিয়া ফেলিল। আমার ভাশুর এই কথা আমার জার মুখে শুনিয়া কৃষ্ণবিহারীকে আসিয়া কোলে করিলেন এবং বলিলেন তোর কিসের দুঃখ, তুই যখন যা' চাইবি তাই দেবো তোর বাবা নৌকা করিয়া বেড়াইতে গেছেন।" এই সব কারণে কোলের ছেলের জন্য আমার বড়ই মন কেমন করিত। আমি বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চাহিলে আমার সঙ্গে যে দরোয়ান গিয়াছিল সে বলিল মা বাড়ী ফিরে যা'বেন কেন? বাড়ী ফিরিলেও রাস্তাতে মৃত্যু হইবে, আর জগন্নাথ গেলেও রাস্তাতে মৃত্যু হইবে কাজ কি? জগন্নাথই চলুন, আপনার লোকের সঙ্গে গেলে ইহাঁদেরই নিকট মৃত্যু হইবে, আর আমাদের নিকট মৃত্যু হইলে কি হইবে?" তখন আমি বলিলাম আচ্ছা যাইব, আমায় পাল্কীতে তোল। তখন আমি পাল্কীতে উঠিলাম কিন্তু দু'দিগের দরজা খোলা রাখিলাম আর হনুমান্‌সিং দরোয়ান পাল্কীর দরজা ধরিয়া বাতাস করিতে করিতে দৌড়াইয়া চলিল। আমরা বাণেশ্বরবন্ধে পঁহুছিলাম, শেষ রাত্রির হাওয়া লেগে আমার ক্রমে ক্রমে জ্ঞান হইতে লাগিল। তারপর দিন স্নান করিয়া সমস্ত দিন ঘুমাইলাম, কিছু খাইলাম না। কিন্তু অন্যান্য সকলের ভেদবমি হইতে লাগিল শুধু দুই একজন যাহারা পূর্ব্বদিন সেই বিষাক্ত দই খায় নাই, তাহারা ভাল রহিল। গোবিন্দ বাবুর ভগিনী (প্রতাপ মজুমদারের শাশুড়ীর মা) আর একজন বৈদ্যর মেয়েরই অত্যন্ত অধিক হইল। এমন কি তাঁহাদিগকে সমস্ত রাত্রি গাছ তলায় রাখিতে হইয়াছিল। তারপর দিন আমরা সকলে নিজ নিজ পাল্কীতে করিয়া সেই রোগের অবস্থায় পুনরায় যাত্রা করিলাম। নূতন আড্ডায় যখন পঁহুছিলাম তখন জানিতে পারিলাম যে সেই বৈদ্যের মেয়েটীকে রাস্তার ধারে

ফেলিয়া আসা হইয়াছে তখন আমার খুড়শাশুড়ী (মাধব বাবু ও ঠাকুরচরণ বাবুর মাতা) তাঁর চাকর কেষ্টাকে পাঠাইয়া দিলেন, চাকর যাইয়া দেখিল সেই বউটী গাছ তলায় পড়িয়া রহিয়াছে। কেষ্টা তাহাকে ডুলি করিয়া লইয়া আসিল।

এইরূপে চলিতে লাগিলাম। রোজ রাত্রি চারিটার সময় সমস্ত যাত্রী দল বাঁধিয়া রওনা হইতাম, বেলা দশটা পর্য্যন্ত চলিয়া এক জায়গায় আড্ডা লইতাম। সেখানে সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি থাকিতে হইত। এইরূপে দলবদ্ধ হইয়া না গেলে যাত্রীদের ডাকাতে মেরে নিত। যদিও আমাদের সঙ্গে তিন চারি জন দরোয়ান, সরকার, চাকর ও চাকরাণী এবং প্রত্যেক পাল্কীতে আটজন করিয়া ১০।১১ খানি পাল্কীর বেহারা ইত্যাদিতে অনেক লোক ছিল তবুও আমরা অন্য যাত্রীদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া যাইতাম। আমাদের সঙ্গে রাধানাথ সেট্ (বসাক) সহযাত্রী ছিলেন। ইহাঁর সঙ্গে বিস্তর লোক ও জিনিষ ছিল। অনেক ঔষধও ছিল, সেই ঔষধের দ্বারা আমাদের লোকের ভেদ-বমি ব্যমুতে অনেক উপকার হইয়াছিল।

২রা নবেম্বর ১৮৯৩।

শ্রীক্ষেত্রে আমরা কুড়ি দিন ছিলাম, দণ্ডভাঙ্গা নদীতে স্নান করিয়া পুরাতন কাপড় ত্যাগ করিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গ এই নদীতে দণ্ড ভাসাইয়া প্রকৃত সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। স্নানের পর তুলসী চূঁড়োতে আসিয়া ধ্বজা দর্শন করিলাম। এই স্থান হইতে আমরা আর পাল্কীতে উঠিলাম না, হাঁটিয়াই চলিলাম। এই স্থানে আমাদের জন্য দুই ভাঁড় প্রসাদ আসিল। আমরা সকলে এক সঙ্গে খাইতে বসিলাম। আমাদের দেশের এক কৈবর্ত্তের মেয়ে (চাকরের বোন্) সুখী দৌড়ে এসে আমার সঙ্গে এক পাতে বসিয়া গেল। আমার মনে কোনও দ্বিধা ভাব হইল না। আমাকে কেহ কেহ বকিতে লাগিলেন। আমাদের সঙ্গে বাড়ীর ছেলেদের এক গুরু গিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে খেলেন না। কিন্তু পাছে জগন্নাথ দেখিতে না পান এই ভয়ে শেষে সকলে খাইয়া গেলে পাতের উচ্ছিষ্ট খাইতে লাগিলেন। তুলসীতলা হইতে জগন্নাথ দর্শন করিতে চলিলাম। মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে প্রাণে যে কি এক অপূর্ব্ব আহ্লাদ হইয়াছিল, বলিতে পারি না। সকলে ছুটীতে লাগিলাম, পড়িয়া যাইবার ভয় মনে ছিলনা। কিন্তু মন্দিরে ঢুকিয়া মনে ভয় হইল, যদি ঠাকুর দেখিতে না পাই! আমি সমস্ত রাস্তা ছেলেদের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছি। ঠাকুরকে বলিলাম ঠাকুর, আমি বড় গরিব, সমস্ত রাস্তা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছি, আমায় দেখা দিও। কিন্তু এখন বোধ হয় আর সেই রকম কষ্ট হয় না, কারণ আমার মন এখন আর সেই রকম মায়ায় মুগ্ধ নয়। আর এখন বুঝি, যদি তিনি দুঃখীকে না দেখা দিবেন, তবে তিনি কিসের ঠাকুর। আমি একটু পেছনে ছিলাম বলিয়া প্রথমে বলরামের মুখ দেখিতে পাইলাম। শেষে সম্মুখে যখন গেলাম তিন ঠাকুরই দেখিলাম।

আমরা সমস্ত বেড়াইয়া ২ ক্রমে ক্রমে দর্শন করিতে লাগিলাম। রথ যাত্রার কিছু দিন পূর্ব্বে "অটুকে" বাঁধিলাম। শিবু পাণ্ডা আমার নিকট হইতে সমস্ত লিখিয়া লইল। রাজার সরকারে ১২৫ টাকা জমাদিতে হইল, ইহার শুদ্ হইতে প্রতিদিন একজন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে।

সরলা সুন্দরী কান্তগির।

আকস্মিক ঘটনা ও সামান্য রোগাদীর গৃহ চিকিৎসা।

অগ্রহায়ণ ১৩১৪ সংখ্যা মহিলাতে প্রকাশিত অংশের পর।—

অস্থিভগ্ন হওয়ার (Fracture)

যষ্টি বা তাদৃশ কোন কঠিন বস্তু দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে কিম্বা চলিতে চলিতে পদ স্খলিত হইয়া কাষ্ঠ প্রস্তরাদী কঠিন দ্রব্যের উপরে পতিত হইলে, কিম্বা বেগে ধাবিত শকট বা হস্তী অশ্বাদির পৃষ্ঠ হইতে কিম্বা বৃক্ষাদি হইতে পতিত হইলে সচরাচর শরীরের অস্থি ভগ্ন হইয়াথাকে। আঘাতের বা পতনের গুরুত্বানুসারে কখন বা কেবল মাত্র অস্থি ভগ্ন হয়, চর্ম্মের উপরিভাগে কোন আঘাত চিহ্ন দৃশ্য হয় না। কখন বা অস্থির উপরিস্থ মাংসপেশী ও চর্ম্ম ছিন্ন ও ভেদ করিয়া ভগ্ন অস্থির অগ্রভাগ বহির্দ্দেশে নির্গত হইয়া পড়ে; কখন অস্থির একস্থানে মাত্র ভগ্ন হয়, কখন একাধিকস্থান ভগ্ন হইয়াথাকে।

শরীরের কোন স্থানে অস্থি ভগ্ন হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা তাহা জানিতে পারা যায়।

১। যে অঙ্গের অস্থি ভগ্ন হইয়াছে তাহার আকার বিকৃত হয় অর্থাৎ উহা বক্র বা স্ফীত হয় এবং সুস্থ অঙ্গাপেক্ষা খর্ব্ব হইয়া যায়।

২। ভগ্ন স্থান বেদনাযুক্ত হয়।

৩। যে অঙ্গের অস্থি ভগ্ন হইয়াছে তাহা উঠাইবার বা সঞ্চালন করিবার শক্তি থাকে না।

৪। অঙ্গের আকার দৃষ্টি করিয়া যে স্থানে অস্থি ভগ্ন হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়, তাহার কিঞ্চিৎ উপরে ও নিম্নভাগে হস্ত রক্ষা করিয়া উহাকে আস্তে আস্তে সঞ্চালন করিলে উহা সহজে সঞ্চালিত হয়; ঐ রূপে ধরিয়া অর্থাৎ অভগ্ন অস্থি সঞ্চালন করা যায় না, ভগ্ন হইলে উহার দুটী খণ্ড অনায়াসে সঞ্চালন করিতে পারা যায়।

৫। সঞ্চাচলন করিবার সময়ে অস্থি ভগ্ন অংশের পরস্পর সংঘর্ষণে এক প্রকার কড়্ কড়্ শব্দ শ্রুত হয়।

হস্ত পদ অঙ্গুলি ও কণ্ঠ অর্থাৎ যে যে স্থানে সোজা অস্থি আছে এবং যাহার উপরে ও নীচে ধরিতে পারা যায়, সেই সেই স্থানের অস্থি ভগ্ন হলে উপরিলিখিত রূপ পরিক্ষা দ্বারা অবস্থা নির্ণয় করা যায় কিন্তু অন্যান্য স্থানের, যথা,—মস্তকের, পঞ্জরের, বক্ষের ও বস্তির, অস্থি ভগ্ন হইলে তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। মস্তকের অস্থি কখন কখন ভগ্ন হইয়া বসিয়া যায়

তাহা দেখিলেই জানা যাইতে পারে। বক্ষের অস্থি টিপিলে তাহা সামান্য রূপে নড়িয়া থাকে এবং তাহাতে কড় কড় শব্দও সামান্য রূপে শুনা যায়। পঞ্জরের অস্থিও তদ্রূপ। এতদ্ভিন্ন ভগ্ন পঞ্জরাস্থির চতুষ্পার্শ্বে যে স্ফীতি উৎপন্ন হয় তাহার উপরে আস্তে আস্তে টিপিলে এক প্রকার বজ্‌ বজ্‌ শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, এস্থানে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া শ্রবণ করিলে এই শব্দ আরও স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। এইরূপ অবস্থা হইলে বুঝিতে হইবে যে পঞ্জরাস্থি কেবল মাত্র ভগ্ন হইয়াছে তাহা নহে, উহার ভগ্নাগ্রভাগ বক্ষ কোটরস্থ ফুস্‌ ফুসে লাগিয়া তাহার কিয়দংশ ছিন্ন করিয়াছে। এইরূপ হইলে কখন কখন কাশির সহিত রক্তও উঠিতে দেখা যায়।

অস্থি ভগ্ন হইলে কি করা আবশ্যক?

১। সচরাচর হস্ত পদ ও কণ্ঠের অস্থি ভগ্ন হইলে উহার এক ভগ্নাংশ অন্য ভগ্নাংশের উপরে উঠিয়া যায়, এই জন্য ভগ্নাস্থি অঙ্গ সুস্থ অঙ্গ অপেক্ষা খর্ব্ব হয় এবং বক্র দেখায়। অতএব ভগ্ন অস্থিকে প্রথমে টানিয়া সোজা করা আবশ্যক। তাহা না করিলে ভগ্নাস্থি উত্তম রূপে যুক্ত হয় না, এবং যুক্ত হইলেও যথাবশ্যক দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইতে অনেক বিলম্ব হয়, তদ্ভিন্ন অঙ্গটী আজীবন খর্ব্ব ও বক্রাবস্থায় থাকে। প্রথমে সোজা করিয়া পরে বাঁধিয়া দিতে হয়।

২। সোজা করিয়া বাঁধিয়া দিয়ে অঙ্গটী অন্যূন তিনসপ্তাহ কিংবা মাসেক কাল এরূপ ভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে উহার বন্ধন শিথিল না হয়, এবং উহা সম্পূর্ণরূপ নিশ্চল অবস্থায় থাকে।

৩। ঠিক ভাবে রাখিতে পারিলে উপযুক্ত সময়ের মধ্যেই প্রায় সকল ভগ্ন অস্থি অন্য কোনরূপ চিকিৎসা ব্যতিরেকে যুক্ত ও সুস্থ হইয়া যায়। ঐ সময় অতীত হইলে বন্ধন খুলিয়া দিয়াই অঙ্গটী সাবান ও ঈষদুষ্ণ জলে ধৌত করা আবশ্যক এবং তৎপরে সপ্তাহ কাল প্রতি দিন পাচ মিনিট কি দশ মিনিট কোনরূপ তৈল উহাতে মালিস করা আবশ্যক, তাহাতে অঙ্গে রক্ত সঞ্চরণ পক্ষে সুবিধা ও সাহার্য্য হয় এবং উহা অনতিবিলম্বে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

উপযুক্ত চিকিৎসাটী অনভিজ্ঞের পক্ষে নিতান্ত সহজ নহে। ভগ্ন অস্থি বাঁধিয়া দেওয়াতে বিশেষ জ্ঞান ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। চাক্ষুষ দৃষ্টি বিনা কেবল পুস্তক বা ভাষা পাঠ করিয়া সে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে। কেবল মাত্র দৃষ্টি করিয়া ও তাহাতে নিপুণতা লাভ করা যায় না। বাঁধা ঠিক না হইলে অনেক সময়ে অস্থি ভঙ্গের ফলাপেক্ষা বাঁধার ফল অধিকতর রূপে কষ্টদায়ক, এমন কি মারাত্মক ও হইয়া থাকে। এইরূপ দৃষ্টান্ত সাধারণ চিকিৎসালয়ে (সরকারি হাসপাতালে) সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন দূরস্থ পল্লিগ্রামে বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া হয় তো কাহারও হস্ত বা পদ ভগ্ন হইয়াছে, প্রতীবাসীগণ মধ্যে কেহ কেহ জানেন যে হস্ত পদ ভগ্ন হইলে তাহা বাঁধিয়া দিতে হয়, সুতরাং তাঁহারা একখণ্ড

চেলা কাষ্ঠ কিম্বা চেড়া বাঁশের উপরে হাত বা পাটী রাখিয়া দড়ী বা কাপড়ের ফালির দ্বারা এমন করিয়া টানিয়া ও আটিয়া বাঁধিয়া দিয়াছেন যে ভগ্ন অঙ্গে রক্ত সঞ্চরণ একেবারে বন্ধ হইয়া তাহা ভয়ানক রূপে স্ফীত ও প্রদাহ যুক্ত হইয়াছে কিম্বা পচিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় হাসপাতালে উপস্থিত হইতে হইতেই কাহারো প্রাণ-বায়ু দেহ হইতে নির্গত হইতে দেখা যায়, কাহারও বা তাহা রক্ষা করিবার জন্য হস্ত বা পদটী তখনই কাটিয়া ফেলিতে হয়।

অস্থি ভগ্ন হইলে উপযুক্ত চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন হওয়া পর্য্যন্ত কি করা উচিত নিম্নে তৎসম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

মস্তকের অস্থি, কণ্ঠাস্থি, বক্ষাস্থি, পঞ্জর ও বস্তি কোটরাস্থি. মুখের ও চোয়ালের অস্থি, নাসিকার অস্থি, এই সমুদায় ভগ্ন হইলে চিকিৎসকের আগমন পর্য্যন্ত শীতল জলের পটী দিয়া রাখিবে. হস্ত বা পদের অস্থি ভগ্ন হইলে, এবং উহার বক্র বা খর্ব্ব হইয়া গেলে ভগ্ন অঙ্গটী সাবধানে টানিয়া সোজা করিয়া উহাকে এক খানি কাষ্ঠফলকের সহিত, উপরে ও নীচে (হস্ত বা পদের গ্রন্থির নিকটে) কাপড়ের ফালির দ্বারা বাঁধিয়া দিবে। বাঁধিবার পূর্ব্বে অপর দিকের সুস্থ অঙ্গের সহিত মিলাইয়া দেখিবে উহা দৈর্ঘ্যে ও ঋজুতায় তাহার সমান হইয়াছে কি না। কাপড়ের কালি বা ব্যাণ্ডেজ ৩ অঙ্গুলি অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক চৌড়া হওয়া আবশ্যক এবং বাঁধা যাহাতে অতিশয় কঠিন বা অতিশয় শ্লথ না হয় তৎপ্রতি মনোযোগ রাখা আবশ্যক। কাষ্ঠ ফলক খানি ভগ্ন অঙ্গের এক গ্রন্থি হইতে অপর গ্রন্থি পর্য্যন্ত, বরঞ্চ তদপেক্ষা কিঞ্চিদধিক দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক এবং অঙ্গের সমান চৌড়া হওয়া আবশ্যক। যাহাতে ভগ্ন অঙ্গে কাষ্ঠের কঠিনতা অনুভব না হয়, সেই ভাবে তাহার উপরে সমান ও পুরু করিয়া যথেষ্ট তুলা বিছাইয়া দিবে' তুলার উপরে একখণ্ড বস্ত্র রাখিয়া তাহা আবৃত করিয়া দিবে। যদি তুলা উপস্থিত না থাকে, কেবল কাপড় ভাঁজ করিয়া দিলেও চলিতে পারে। সকল সময়ে ও সকল স্থানে আবশ্যকানুরূপ কাষ্ঠফলক পাওয়া যায় না, এতদবস্থায় যথোপযোগী দ্রব্যাদি পাওয়া পর্য্যন্ত, যে কোন ভার বহনোপযুক্ত দৃঢ় ও কঠিন দ্রব্যের সহিত বাঁধিয়া দিলেও হইতে পারে, যথা লাঠি ও ছাতা, রুল বাঁশের তর্জ্জা গাছের ডাল ইত্যাদি। বাঁধা শেষ হইলে যদ্যপি ভগ্ন অঙ্গে বেদনা বা ফুলা থাকে তাহা হইলে বেদনা ও ফুলা যুক্ত স্থানে শীতল জলের পটী দিবে। ভগ্ন অস্থি চর্ম্ম ভেদ করিয়া নির্গত হইলে, তাহাকে নাড়া চাড়া করা উচিত নহে, যথা সাধ্য সোজা করিয়া রাখিয়া তাহাতে শীতল জলের পটী দিয়া শীঘ্র চিকিৎসককে সংবাদ দিবে। যদ্যপি আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে কিম্বা চিকিৎসকের গৃহে পাঠাইবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে ধীরে ধীরে ভগ্ন অঙ্গটী তুলিয়া তাহার অচ্ছিন্ন দিকটী কাষ্ঠফলকের উপরে রাখিয়া ঈষৎ শ্লথ ভাবে বাঁধিয়া দিবে।

সন্ধিচ্যুতি (Dislocation of Joints) বা হাড় সরিয়া যাওয়া।

কঠিন আঘাতে ও পতনে হস্ত পদাদির বা অন্য অঙ্গের গ্রন্থি হইতে অস্থির অন্তভাগ বিচ্যুত হইয়া যায় বা সরিয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় শীঘ্র স্থানভ্রষ্ট অস্থিকে উহার স্বাভাবিক স্থানে সংস্থাপিত করা আবশ্যক ইহাতে যত বিলম্ব করা যায়, ততই সংস্থাপন কঠিন হয়। এই কার্য্যটী শিক্ষিত লোক ভিন্ন অন্যের দ্বারা হওয়া সম্ভব নহে। তবে যে কোন কারণেই হউক বেদনা ও ফুলা উৎপন্ন হইলে শীতল জলের পটী উপকারী, ইহাতেও তাহা প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসককে সংবাদ দিবে, কিম্বা আহত ব্যক্তিকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিবে।

নিম্নলিখিত লক্ষণ গুলির দ্বারা গ্রন্থিচ্যুতি জানা যাইতে পারে।

১। গ্রন্থির আকারের পরিবর্ত্তন, অপর অঙ্গের সুস্থ গ্রন্থির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে ইহা প্রতীয় মান হইবে।

২। গ্রন্থির অস্থি স্থানচ্যুত হইলে অঙ্গ সঙ্কুচিত বা বিস্তৃত করা যায় না। অঙ্গ কোন অবস্থায় খর্ব্ব, কোন অবস্থায় বা দীর্ঘ হয়।

৩। গ্রন্থিতে বেদনা ও ফুলা উপস্থিত হয়।

কখন কখন হাই তুলিতে গিয়া নিম্নের চোয়াল স্থানচ্যুত হইয়া যায়। চোয়াল স্থানচ্যুত হইলে মুখ বন্ধ করা যায় না এবং মুখ হইতে নাল নির্গত হইতে থাকে, একটুকু নিপুণতার সহিত চেষ্টা করিলে উহা তৎক্ষণাৎ বসাইয়া দেওয়া যায়। এক খানি রুমাল কিম্বা তোয়ালে হাতে জড়াইয়া (বিশেষত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুটী) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুটি মুখের ভিতরে চোয়ালের দুই দিকে, কসের দাঁতের উপরে দৃঢ় ভাবে রক্ষা করিয়া এবং হস্তদ্বয়ের বাকি চারিটী অঙ্গুলি বাহিরে চোয়ালের বক্রস্থানের উপরে রাখিয়া প্রথমে উভয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্টের দ্বারা একসঙ্গে চোয়ালটী নিম্নদিকে চাপিয়া পরে পশ্চাতদ্দিকে ঠেলিয়া দিলেই চোয়াল বসিয়া যায়। ইহাতে কিছু মাত্র বল প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না। যদি সামান্য চেষ্টায় বসাইতে পারা না যায় তবে বলপ্রয়োগ করিয়া বসাইতে চেষ্টা করিবে না, তাহাতে ক্ষতী হইবার সম্ভাবনা, চিকিৎসকের হস্তে সমর্পণ করিবে।

দাহ।

ইহা তিন প্রকারে হইয়া থাকে।

১। অগ্নির দ্বারা।

২। উত্তপ্ত দ্রব্যাদীর দ্বারা।

৩। তীব্র দ্রাবকাদির দ্বারা, যথা সলফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, কারবালিক এসিড ইত্যাদি।

দাহের ন্যূনতা ও আধিক্যানুসারে দগ্ধ স্থানের সচরাচর তিনটি অবস্থা হইয়া থাকে যথা।

১। সামান্য প্রদাহের অবস্থা, হইতে দগ্ধ স্থানের কেবল মাত্র রক্তবর্ণ এবং বেদনাযুক্ত হয়।

২। ফোস্কা উঠার অবস্থা।

৩। পুড়িয়া অঙ্গারবৎ হইয়া যাওয়ার অবস্থা।

গৃহে অগ্নি লাগিয়া কিম্বা জলন্ত প্রদীপের বা চুল্লীর অগ্নিতে পরিহিত বস্ত্রাগ্রভাগ পতিত হইয়া সচরাচর শরীর দগ্ধ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন পাকগৃহে উত্তপ্ত জল বা অন্নের ফেন উত্তপ্ত ঘৃত বা তৈল, উত্তপ্ত দুগ্ধ ইত্যাদি অঙ্গে পতিত হইয়া অনেক গৃহিণীকে দাহের কষ্ট সহ্য করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন উত্তপ্ত পাক-পাত্রাদি অঙ্গে লাগিয়াও কখন কখন শরীর দগ্ধ হইতে দেখা যায়।

পরিহিত বস্ত্রে অগ্নি লাগিলে কি করা উচিত বলা বাহুল্য যে উহা তৎক্ষণাৎ উন্মোচন করিয়া ফেলাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল; কিন্তু সকল সময়ে তাহা সম্ভব হয় না, এরূপ অবস্থায় নিকটে জল থাকিলে তাহা শরীরে ঢালিয়া দিবে। যদ্যপি জল নিকটে না থাকে, একখানি মোটা কাপড়, কম্বল, সতরঞ্চি বা কন্থা দাহ্যমান ব্যক্তির শরীরে নিক্ষেপ করিবে। তাহাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দেওয়া-ইবে, যদ্যপি এরূপ বস্ত্রাদিও নিকটে না থাকে, তবে যে অবস্থায় সে থাকে সেই অবস্থাতেই তাহাকে ভূমিতে পাতিত করিয়া তাহার উপরে মাটী, ধূলা, বালি ইত্যাদি যাহা নিকটে পাওয়া যায় বহুল পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে এবং তাহাকে তাহাতে গড়াগড়ি দেওয়াইবে। লেখক একবার গৃহকোণে রক্ষিত এক ধামা ধান্য একটী স্ত্রীলোকের উপরে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে জ্বলন্ত অগ্নির কোপ হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কাপড়ে আগুন লাগিলে কখন ছুটাছুটী করা উচিত নহে, তাহাতে অগ্নি অধিকতর রূপে প্রজ্বলিত হয়।

(ক্রমশঃ)

মহিলাদের রচনা।

মাতৃহীনা শিশুদের জন্য প্রার্থনা।

ওহে বিশ্বাধার, কি বলিব আর,
সকলি জানিছ হায়।
যাহাদের তরে, পুনঃ এসংসারে,
শৃঙ্খল পরেছি পায়॥
শিশুকাল তারা, হয়ে মাতৃহারা,
কি দুঃখে কাল কাটায়।
মা নাই সংসারে, কে আদর করে,
মুখপানে কেবা চায়॥
কাঁদে যে মা কই, কেমনে তা সই,
হৃদয়ের ছিড়ে তার।
দারুণ প্রহার, কত সব আর,
ভেঙ্গেছে বুকের হার॥
অবোধ শিশুরে, বুঝাই কি করে,
কাঁদিছে ধুলায় পড়ে।
মা তার নিঠুর, আছে বহুদূর,
ডাকিলে আসেনা ফিরে॥
নাহি তার সাধ্য, শমনের বাধ্য,
দোষ দেই মিছে তারে।
জোর করে ধরে, রেখেছে তাহারে,
আসিবে কেমন করে॥
শকতি থাকিলে, যাইত কি চলে,
চিরদিন তরে হায়।
পীড়া যদি হত, কতই কাঁদিত,
বিচ্ছেদের আশঙ্কায়॥

মা ডাকে সবাই, মোদের মা নাই,
বলে শিশু কেঁদে সারা।
কঠিন তো নয়, তাহার হৃদয়,
স্নেহ মমতায় ভরা॥
কত সাধ তার, ক'রবে সংসার,
ইচ্ছায় কভু কি যায়।
দিয়াছিলে তারে, পুনঃ 'নলে কেড়ে,
কি আর বলব হায়॥
যা করেছ বেশ, দেখ যেন শেষ,
শিশুরা কেঁদে না ফেরে॥
তুমি হে তাদের, ভাস'লে সাগরে,
কে আর রাখিতে পারে?
এই ভিক্ষা চাই, প্রভু তব ঠাঁই,
পাপ হতে রেখ দূরে।
নিরাপদ কোলে, স্নেহের অঞ্চলে,
রাখ রাখ তাহ'দেরে॥

মোঃ—কাকিনা

পূর্ণিমার আঁধারে।

১

আজি কি পূর্ণিমা তিথি?
কোথা তবে শশধর?
নীল নভে হাসে নাক,
জোতি হীন নিলাম্বর।

২

ডুবে গেছে সুধাকর,
ডুবে গেছে তারাদল,
জলদ গভীর রবে,
ফোটা ফোটা ফেলে জল।

৩

চাহিয়া আবার চাহি,
মলিন হৃদয় তলে,
এই মত ডুবে যাব,
বিষাদ মেঘেরি কোলে।

৪

ক্ষুদ্র তারা ডুবে যায়,
হাসে পুনঃ নভ মাঝে,
ক্ষুদ্র এ জীবন যাক্
সাধিয়া তোমারি কাজে।

পাচ দোনা শ্রীমতী গ—

সংবাদ।

"দুর্ভিক্ষে মহিলাদের কর্ত্তব্য" শীর্ষক প্রবন্ধে পাঠিকাগণ দুর্ভিক্ষে ভীষণ আক্রমণের বিবরণ পাঠ করিবেন। মেদিনীপুর জেলার কাথি সবডিভিশনের দুইটী থানার অন্তর্গত ১৪হাজার লোক অন্নাভাবে বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবে কাঁথিতে যাইয়া এক সভা আহ্বান করিয়া তাহাদের সাহায্যের জন্য চাঁদা তুলিয়াছেন। বর্দ্ধমান জেলার কালনা সবডিভিশনের লোকেরা দুর্ভিক্ষাক্রান্ত হইয়াছে।

মহিলার ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইবার দুই মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে। অধিকাংশ গ্রাহক গ্রাহিকা হইতে ত্রয়োদশ বৎসরের মূল্য এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক অবিলম্বে মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করেন।

ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়

স্বার্থপরতা, জাতিগত ও ব্যক্তিগত। *

মানুষ যখন পিতা মাতা ও আত্মীয়স্বজনের ভাল বাসার বিষয় ভাবে তখন মানুষকে সবল করে। তখন তাহার আর নিস্তেজ ভাব থাকিতে পারে না। মানুষের কত সময়ে কত দুঃখ কষ্ট আসে। আমার যদি প্রাণ যায় তবে আর এক জনের কি হবে। আমি যত দিন ধর্ম্ম পথে আছি, ততদিন মানুষ আমাকে ভাল বাসিবে। ধর্ম্মের জন্য যদি আমার প্রাণ যায়, তাহা হইলে আমার জন্য আমাকে যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহাদের কষ্ট হইবে বটে. কিন্তু সে কষ্টের মধ্যেও তাঁহাদের ভাল বাসা থাকিবে। মানুষ যদি নিজের জীবনের বিষয় ভাবিতে পারেন তবে তিনি কাপুরুষ হন্ না। কষ্টের মধ্যে ও সুখ আছে। স্পার্টাবাসীদের কঠিন নিয়ম ছিল। প্রত্যেককে আইন মানিয়া চলিতে হইত, কেহ সে আইন অগ্রাহ্য করিলে, অথবা সে নিয়মানুসারে না চলিলে তাহার প্রাণ যাইত। তাহারা প্রত্যেক জাতীয় উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করে। যে আইন হইবে সকলেই সেই আইন্ অনুসারে চলিতেই হইবে। এরূপ গুরুতর নিয়ম তাহাদের মধ্যে প্রচলিত যে সন্তান হওয়া মাত্র সেই সন্তান কে রাজ পুরুষদের হাতে সমর্পণ করিতে হইবে। তাহারা সকলেই এ জন্য প্রস্তুত থাকে। ছেলে হওয়া মাত্র, রাজ পুরুষদের লোক আসিয়া সেই শিশু সন্তান কে লইয়া যায়। যদি সেই শিশু দুর্ব্বল, অন্ধ পঙ্গু. অথবা অন্য কোন প্রকারের বিকলাঙ্গ হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিয়া ফেলা হইত। তাঁহারা একটাদিক ভয়ানক দেখিয়াছিলেন, সেটা হ'চ্ছে জাতীয় উন্নতি। তাঁহাদের দৃষ্টি অন্যদিকে ছিলনা। রাজ পুরুষদের শক্তি ও খুব ছিল। স্পার্টাবাসীদের সন্তানেরা ৭ বৎসর কাল রাজ পুরুষদের নিকট থাকিয়া নানারূপ ব্যায়াম ও যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা করিত। লেখা পড়ার ধার ধারিত না। জীমনাষ্টিক ও গান খুব করিয়া শেখান হইত, আর শক্ত করিবার জন্য খুব করিয়া চাবুক মারিত। এমন ভয়ানক করিয়া চাবুক মারিত যে কেহ কেহ সেই চাবুকের মার সহ্য করিতে পারিত না, মরিয়া যাইত। চাবুক মারিয়া মারিয়া তাহাদের শক্ত করা হইত। আর একটা বিষয়ে ইহারা শিক্ষা দিত, সেটা হ'চ্ছে চুরি করা। সকলকে এইরূপ ভাবে শিক্ষা দিত যে. চুরি করিয়া আনিবে কিন্তু কেহই যেন টের না পায়, কেহ যদি জানিতে পারে, তাহা হইলে আবার শাস্তি পাইতে হইত। কথিত আছে একবার একটী স্পার্টার বালক একটী শৃগাল চুরি করিয়া আনিতেছিল সেই শৃগাল কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া পেটের কাপড়ে লুকাইয়া আনিতেছিল, পরে সেই শৃগালটা বিধিমতে চেষ্টা করিয়াও পলাইতে সমর্থ না হইয়া অবশেষে তাহার পেট কামড়াইতে আরম্ভ করিল, শেষে পেট কামড়াইতে কামড়াইতে একেবারে পেট

* ২৬শে নবেম্বর তারিখে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন তন্মূলক।

ছিদ্র করিয়া পেটের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। ইহাতেই পোঝাযায় কি ভয়ানক কষ্টসহিষ্ণু ছিল, প্রাণ যাইতেছে তাহাও অকাতরে সহ্য করিল, তথাপি শৃগালকে ছাড়িয়া দিল না। এই রূপেই তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। যতদূর কঠিন হইতে হয়, তাহারা সেই কঠোরতা শিক্ষা করিত। সেই কঠোরতা যে পরের প্রতিই প্রকাশ করিত, আর আপনার লোকের প্রতি করিত না, তাহা নহে, তাহাদের এই কঠোরতা সকলের প্রতি সমভাব প্রকাশ করিত। তাই বলিয়াই কি আপনারা বলিবেন তাহাদের মধ্যে ভালবাসা ছিল না! মা কি ছেলেকে ভাল বসিতেন না? অবশ্য তাহাদের মধ্যেও ভালবাসাছিল তাঁহারাও তাঁহাদের সন্তানদের ভাল বাসিতেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই ভাল বাসার কোমলতা ছিল না। ভালবাসার মধ্যে ও তাঁহাদের কঠোরতা ছিল। তাঁহারা শিশুদের সেই কঠোরতা শিক্ষা দিতেন, শিশুরাও সেই কঠোরতার মধ্যে দিন ২ বর্দ্ধিত হইয়া খুব শক্ত হইত। এবং খুব বীর হইত। ইহারা এরূপ নির্দ্দয় যে কেহ ভালবাসিয়া সন্তানকে কোন ভাল দ্রব্য আহার করাইতে পারিতেন না, পাছে কোন ভাল দ্রব্য দেওয়া হয়, সেজন্য লোক নিযুক্ত থাকিত এবং দেখিত কোনরূপ ভাল দ্রব্য তাহাদিগকে দেওয়া হয় কি না! তাহাদের খুব সামান্য আহার দেওয়া হইত। বলকারী অথবা সুস্বাদু কোন প্রকার দ্রব্য তাহাদিগকে দেওয়া হইত না। স্পার্টানদের সহিত যখন বিপক্ষ দলের যুদ্ধ হইয়াছিল সে সময় এই স্পার্টারেরা অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। ৫০০০০০ সৈন্য লইয়া ইহাদের দেশ আক্রমণ করিল, একটু সরুরাস্তা ইহাদের মাত্র ৩ শত সৈন্য, তাঁহারা সেই ৩ শত সৈন্য লইয়া রাস্তা আটকাইয়া রহিল। স্পার্টারদের যিনি রাজা তিনি উচ্চাসনে বসিয়া আছেন, আর একবার একবার আসিয়া যুদ্ধের অবস্থা দেখিয়া যাইতেছেন, যতক্ষণ তাঁহারা সেই রাস্তায় থাকিলেন প্রাণ পণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, পরে বিপক্ষ দলের সৈন্যেরা তাঁহাদের সহিত না পারিয়া, অন্য রাস্তা হইতে আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল তাঁহাদিগকে একেবারে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। তাঁহারা সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে খুব বীরত্ব দেখাইয়া ছিলেন, ছোট ২ বালকেরাও অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়াছিল, তাহাদের বীরত্ব অদ্ভুত। তাঁহারা যাহা কিছু করিতেন সমস্তই সমুদায় জাতীর জন্য। যে যাহা কিছু করিবে সমস্ত জাতীর জন্য। এই যে একটা পারিবারিক স্বার্থ বলিদান দেওয়া ইহা কি সহজ? স্বার্থ বলিতে আমরা বুঝি ভালবাসা। ভালবাসার মধ্যে স্বার্থ পরতার ভাব রহিয়াছে। স্পার্টারদের ভালবাসা এ ভাবের নহে! তাঁহারা স্বার্থের দিক মোটেই দেখান না। মা ছেলেকে বলি দিয়াছেন সমুদায় জাতীর জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য। এই ভাব যে স্থানে রহিয়াছে সে স্থানে জাতীয় জীবনের শক্তি খুব বাড়ে।

(ক্রমশঃ।)

মাসিক পত্রিকা

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৩শ ভাগ] জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫ ; জুন ১৯০৮। [১১ম সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

বালিকারা বাল্যকালে উপদেশ ও শিক্ষা না পাইয়া খেলার ঘর প্রস্তুত করে। ভাড়ার ঘর রন্ধনশালা শয়নের ঘর ইত্যাদি তাহাদের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহারা দুই চারিজনে মিলিয়া খেলার ছোট ছোট হাঁড়ী বাসন কড়া বগনো হাতা বেড়ী ইত্যাদি-যোগে খেলার উননে ধূলী বালী ও কাঁচা শাকপাতা ইত্যাদি দ্বারা খেলার ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করে। একজনে গৃহিণী সাজে, সে অন্ন ব্যঞ্জনস্বরূপ সেই ধূলী বালী ও শাকপাতা ছোট ছোট ভোজ্যপাত্রে অন্য বালিকা-দিগকে পরিবেশন করিয়া দেয়; কখনও বা মা হইয়া পুতুলের বিয়ে দিয়া আমোদ করে। সেই বিবাহের ভোজে কোন বালিকা ছোট বটি দা দ্বারা কুটনা কোটে, কেহ বা রাঁধে, কেহ বা ভাড়ার ঘর সাজায়, কেহ ফুলসজ্জার আয়োজন করে, কেহ বা বর ও কেহ কন্যাস্বরূপ দুইটি পুতুলকে কাপড় ও গহনা পরাইয়া দেয়। নারী-জীবনের প্রকৃতি-সিদ্ধ কাজ কি তাহাদের বাল্যজীবন ও স্বভাবের গতি বলিয়া দেয়। সেই প্রকৃতির ভিতর দিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রকাশ পায়। তুমি জোর করিয়া তরবারি ও লাঠী খেলিতে নিযুক্ত করিলে বালি-কাকে অস্বাভাবিক করিয়া বিধাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অদ্ভুত পুরুষ করিয়া তুলিবে।

জননী যেন স্বভাবের গতি দেখিয়া বিধাতার ইচ্ছা নিরূপণ করিয়া শৈশবকাল হইতে স্বীয় কন্যাকে শিক্ষা দেন। বালিকা ও বালক দুই ভিন্ন শ্রেণীর জীব। বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সংসারের নানা কঠিন পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত হইবে, বালিকা সময়ে জননী ও গৃহিণী হইবে, তাহা দ্বারা অনায়াসসাধ্য গৃহকর্ম্ম সকল সম্পাদিত হইবে, বিধাতার এইরূপ ইচ্ছা। তিনি সেইরূপ কোমল প্রকৃতিতে তাহার শরীর মন গঠন করিয়াছেন।

জননী, তুমি প্রকৃতির বিরুদ্ধে স্নেহের কন্যাকে জোর করিয়া চালাইয়া পুরুষ করি-বার চেষ্টা করিও না, তাহার অকল্যাণ হইবে।

হিমাচলশিখরে বঙ্গমহিলা।

পূর্ব্বে হিমাচল অতিশয় দুর্গম ও দুরারোহ ছিল। সংসারত্যাগী যোগী সন্ন্যাসীরা কায়ক্লেশে হিমালয়ে যাইতে পারিতেন। হিমগিরির সমুচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করার কোন প্রশস্ত পথ ছিল না। নিবিড় অরণ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুর ভয়প্রযুক্ত ও স্থানে স্থানে অসভ্য লোকদিগের দৌরাত্ম্যের আশঙ্কাবশতঃ নিম্নভূমির কোন সবলকায় পুরুষও হিমাচলে আরোহণ করিতে সাহসী হইত না। পথে খাদ্যাদি দুষ্প্রাপ্য ছিল, নিশাযাপন করিবার কোন আশ্রয় ছিল না। নিম্নভূমির কোন গৃহস্থ দুঃসাহসী হইয়া হিমাচলচূড়ার শোভাসন্দর্শনোদ্দেশ্যে তদুপরি আরোহণে প্রবৃত্ত হইলে হয়তো পথে হিংস্র জন্তুর করালগ্রাসে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত, কিংবা অসভ্য লোকেরা মারিয়া কাটিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত। তাহার আর স্বগৃহে ফিরিয়া গিয়া পরিবারবর্গের ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে পুনর্ম্মিলনের কোন সম্ভাবনা থাকিত না। তবে যাহারা যোগী সন্ন্যাসী সাজিয়া সকল ক্লেশ বিপৎকে উপেক্ষা করিয়াছে, তাহারা কোন রূপ যত্ন পরিশ্রমে কতক দূর অগ্রসর হইতে পারিত, পাহাড়ী নরনারীদিগের নিকটে খাদ্যসামগ্রী ভিক্ষা করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত, অসভ্য পাহাড়ী লোকেরা যোগী সন্ন্যাসী দিগকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত, তাহাদিগকে আহার ও আশ্রয়দানে কুণ্ঠিত হইত না। এরূপে আর কয়জন লোকে হিমাচলশিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছে। পুরাণে বর্ণিত আছে, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব হিমালয়ের পথে স্বর্গারোহণ করিতে গিয়াছিলেন। ভীমার্জ্জুনাদি তাঁহার চারি ভ্রাতা মহাক্লেশে শীতের তীব্র যাতনায় পথেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কেবল যুধিষ্ঠির স্বীয় পুণ্যবলে সমুদায় দুঃখ ক্লেশ অতিক্রম করিয়া সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারিয়াছিলেন। বোধ হয় হিমানীরঞ্জিত উত্তুঙ্গ হিমগিরির উত্তর পার্শ্বস্থ বৃষবাহন মহাদেবের প্রিয় আবাসভূমি তুষারধবলিত কৈলাস গিরিতে গমন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবের লক্ষ্য ছিল, পার্ব্বতী-পতি পরম যোগী মহাদেবের অধিষ্ঠানজন্য হিমরঞ্জিত রজতগিরিনিভ মনোহর কৈলাস গিরিকে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব দেবভূমি স্বর্গ কল্পনা করিয়াছিলেন। মহাবীর ভীমার্জ্জুনও স্বীয় দৈহিক বলবিক্রমে হিমালয়ের দুরারোহ ও দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে পারেন নাই, কেবল পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠির পুণ্যবলে সকল বিঘ্ন বিপদ অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। হিমাচলশৃঙ্গ মরি পর্ব্বতের এক স্থানে একটি বিশাল শিলাপট্ট স্থাপিত আছে। তথাকার অধিবাসিগণ বলে, "পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা স্বর্গারোহণ করিবার উদ্দেশ্যে এস্থানে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ এই শিলাপট্টে উপবেশনপূর্ব্বক শ্রান্তিদূর করিয়াছিলেন।" বোধ করি পঞ্চ পাণ্ডব মরি পর্ব্বতের পথেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে ইংরাজরাজত্বস্থাপনাবধি ভারতবাসীদিগের পক্ষে যে কত বিষয়ে সুখ সুবিধা হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা

যায় না। তন্মধ্যে দুর্গম হিমাচল সুগম হওয়া প্রধান। পুণ্যভূমি যোগভূমি হিমালয় গমনে আর কোন কষ্ট ও অসুবিধা নাই, অন্তঃপুরিকা বঙ্গমহিলা ও একাকিনী নির্ভয়ে অনায়াসে অভ্রভেদী হিমালয়শিখরে আরোহণ করিতে পারেন। ইংরাজেরা বুদ্ধিবলে বিজ্ঞানবলে ৬।৭ হাজার ফিট উচ্চ হিমাচল-শিখরে পর্যন্ত বাষ্পীয় শকট চালাইয়াছেন। দেখ, হিমালয়ের দার্জ্জিলিংনামক সমুচ্চ শৃঙ্গে ও সিমলা-শৃঙ্গে প্রত্যহ নিম্নভূমি হইতে রেলগাড়ী শত সহস্র স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকা যাত্রিকবর্গকে বহন করিয়া সবেগে আরোহণ করিতেছে। সুস্থ সবল যুবা পুরুষ পদব্রজে কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং পাহাড়ে মহাক্লেশে এক মাসেও যাইতে পারিত কিনা সন্দেহ, আজ পল্লী-নিবাসিনী একটী বঙ্গযুবতী ৮।১০ টাকা ব্যয় করিয়া আনন্দে ১৮।১৯ ঘণ্টার মধ্যে হিমালয়ের অভ্রভেদী সমুচ্চ শিখর দার্জ্জিলিংএ আরোহণ করিতেছেন। অকুতোভয়ে বাঙ্গালী বালকবালিকারাও মেঘমালা ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। কালকানামক স্থান হইতে শিমলা পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ৫০ মাইল পথ বাষ্পীয় শকটারোহণে যাইতে যাত্রিক-দিগকে শতাধিক tannel (পার্ব্বত্য সুড়ঙ্গ) অতিক্রম করিতে হয়। কোন কোন টনেল এক মাইল দীর্ঘ। দুর্ভেদ্য পর্ব্বত কাটিয়া এই সকল টনেল করা হইয়াছে। অদ্ভুত ব্যাপার! আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে-সংক্রান্ত পার্ব্বত্য ভূমির পথে ৩২।৩৩টি টনেলের ভিতর দিয়া রেলগাড়ী নিত্য ছুটাছুটি করিয়া থাকে। এইরূপ অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক কৌশলে উত্তুঙ্গ গিরিশিখরে বাষ্পীয় শকট না চালাইলে আজ এদেশের কয় জন লোকে সুরম্য হিমালয়ের শোভা দর্শন ও হিমালয়-বাসসুখ সম্ভোগ করিতে পারিত? বঙ্গদেশের সীমান্তভাগেই দার্জ্জিলিং পর্ব্বত, গরিব বাঙ্গালীর পক্ষে দার্জ্জিলিংএ গমন এক্ষণ এরূপ সহজসাধ্য হইয়াছে, যে পেটে ব্যথা হইয়াছে বা মাথা ধরিয়াছে এই প্রকার সামান্য রোগের ছল করিয়াও বাঙ্গালীবাবু বা বাঙ্গালী মহিলাগণ দার্জ্জিলিংএ চলিয়া যান। সম্পন্ন লোকের তো কথাই নাই, তাঁহাদের অধিকাংশের মন আর নিম্নভূমিতে টিকে না। তাঁহারা বৎসরের অধিক সময় দার্জ্জিলিংএ আমোদ করিয়া বেড়ান ও তথাকার শীতল বায়ু সেবন করেন। কেবল বর্ষা ও শীত ঋতুতে বৃষ্টি ও শীতের তাড়নায় পলায়ন করিয়া স্বদেশে চলিয়া আইসেন। দার্জ্জিলিংএ বাসকালে বিলাসভোগ ও বাড়ীভাড়া ইত্যাদিতে তাঁহাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অর্থ ব্যয়িত হয়।

বাঙ্গালী যোগভূমি পবিত্র হিমাচলে বাস করিয়া যদি সাধন ভজনে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতেন তাহা হইলে সুখের বিষয় ছিল। দুঃখের বিষয় যে, তাঁহাদের প্রায় কাহারও সেদিকে দৃষ্টি নাই, তাঁহারা অনেকেই সাংসারিকতা ও ভোগবিলাসের ক্ষেত্র করিয়া পবিত্র হিমাচলশৃঙ্গকে কলুষিত করিতেছেন। দার্জ্জিলিংএ যাইয়া সচরাচর দেখা যায় যে, বাঙ্গালী মেয়ে পুরুষ নানা প্রকার ক্রীড়া আমোদে দিবা রাত্রি মত্ত, চা-পান করিয়া তাস পাশা

খেলিয়া গল্প করিয়া কালযাপন করেন। ধ্যান চিন্তায় বা কোন গভীরবিষয়ে একেবারে মনঃসংযোগ নাই, সদালাপ ও সৎপ্রসঙ্গ নাই। কুমার কুমারী যুবক যুবতীদিগের স্বাধীনভাবে বিচরণজন্য বিবাহের সম্বন্ধ সহজে স্থির হইয়া যায়। কাহারও আর এ বিষয়ে ঘটকতা করার বড় প্রয়োজন হয় না। এইরূপ নীচভাবে জীবনযাপন করিয়া পবিত্র উচ্চ ভূমিতে বাস করা অপেক্ষা নিম্নভূমিতে বাসই শ্রেয়ঃ। উচ্চ লক্ষ্য উচ্চ হৃদয় লইয়া হিমাচলে যাইয়া বাস কর, উচ্চ মন হইবে, উচ্চ ফল লাভ করিবে। দেবা-রাধ্য বৃদ্ধ হিমালয়কে, বাঙ্গালীর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্রই সম্মান করিয়াছেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে হিমালয়ে স্থিতি করিয়া পুঞ্জ পুঞ্জ আধ্যাত্মিক রত্ন সঞ্চয় করিয়া লইয়াছেন. তাঁহারা শিক্ষার্থী হইয়া হিমালয়ে গিয়াছেন, গিরিরাজ হিমালয়ের নিকটে অনেক শিক্ষা পাইয়াছেন, ভবিষ্যদ্বংশীয় সাধকদিগের জন্য বহু সত্যরত্ন সঞ্চিত রাখিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যান, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের যোগ শিক্ষার গ্রন্থ, প্রেমিক প্রতাপচন্দ্রের হার্টবীট্স্ ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ কর। হিমালয়ে প্রাপ্ত কত রাশি রাশি রত্ন তাঁহাদের সেই সকল পুস্তকে দেখিতে পাইবে। তাঁহারা কেবল আমোদ করিয়া বেড়াইবার জন্য হিমালয়ে যাইয়া বাস করিতেন না, উচ্চ লক্ষ্যসাধনের জন্য যাইতেন। মহর্ষি কৃত ব্যাখ্যান গ্রন্থ, ধর্ম্মশালানামক হিমালয় শৃঙ্গে তাঁহার সাধনের ফল, যোগীকর্ম্মী কেশবচন্দ্রের শিমলা পাহাড়ে সাধনের ফল যোগগ্রন্থ ও নবসংহিতা ইত্যাদি। হিমাচল শৃঙ্গ থর্শিয়াং পর্ব্বতে প্রেমিক প্রতাপচন্দ্রের সাধনের ফল অনেক পুস্তকে বিদ্যমান। সাধনার্থীদিগকে সেই সমস্ত গ্রন্থ চিরকাল শিক্ষা দান করিবে। তাঁহাদের হিমালয়ে বাস সার্থক হইয়াছে। ইংরাজরাজের প্রসাদে পুণ্যভূমি সুরম্য হিমালয় যখন আমাদের পক্ষে এত সুলভ ও সুগম হইয়াছে, তাহাতে এই যুগে আমাদের প্রতি বিধাতার বিশেষ কৃপা বলিতে হইবে। নিজ দোষে নিজ স্বেচ্ছাচারিতায় আমরা যেন জীবনের সেই মহালাভ হইতে বঞ্চিত না হই। বঙ্গমহিলারা হিমালয়ে যাইয়া বাস করেন সুখের বিষয়, কিন্তু কেবল শারীরিক সুখ ও আমোদ গল্প করিয়া বেড়াইবার জন্য যেন না যান। সেখানে যাইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি, বিষয়বিরাগ, পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য লাভ করিয়া যেন রমণীকুলের মুখোজ্জ্বল করেন, পরে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া নিম্নভূমির মেয়েদিগকে যেন উচ্চ উচ্চ সত্য বিতরণ করিয়া ধন্য হন। তাঁহারা বাসের জন্য হিমালয়ে বিপুলার্গবায়ে রমণীয় বাসগৃহ নির্ম্মাণ করুন, কিন্তু তাহার পার্শ্বে যেন পবিত্র সাধনাকুটীর তপস্যাকুটীর নির্ম্মিত হয়, তাহার যোগে বাসগৃহের গৌরব ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে।

যে মহিলা বিধাতার কৃপায় কবিত্বশক্তি প্রাপ্ত, হিমালয়বাসে তাঁহার সেই শক্তি অধিকতর প্রস্ফুটিত হইবে, যাঁহার হৃদয়ে ভক্তিভাব আছে, হিমালয়ের প্রভাবে

তাঁহার ভক্তির বৃদ্ধি হইবে, যে মহিলা যোগপ্রিয়া তিনি যোগধ্যানে মহাধনী হইবেন, যিনি সেবাপ্রিয়া তিনি হিমালয়ে অধিকতর সেবানুরাগ লাভ করিয়া নিম্নভূমিতে যাইয়া নানা উপায়ে ভগিনীদিগের সেবা করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। উচ্চ হিমালয়বাসেও আমাদের প্রিয় কন্যা ও ভগিনীগণের জীবন উচ্চ, লক্ষ্য উচ্চ, কার্য্যক্ষেত্র প্রশস্ত না হইয়া যদি নীচ ও সঙ্কীর্ণ থাকে তাহা হইলে 'নিম্নভূমিস্থিত অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর সীমা যে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা উচ্চ ভূমিতে চলিয়া গিয়াছেন জীবনে তাহার কোন প্রমাণ হইল না।

মহিলার পাঠিকাদিগের পরিচিতা বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে সুপ্রসিদ্ধা মোসলমান কন্যা সুকবি আর, এস্ হোসেন হিমালয়ের শৃঙ্গবিশেষ খর্শিয়ম্ পর্ব্বতে স্বামী সহ যাইয়া স্বর্গগত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের শৈলাশ্রম ভবনে ইতিপূর্ব্বে কিয়ৎকাল স্থিতি করিয়াছিলেন। সেখানে যাইয়া হিমালয়দর্শনে তাঁহার ভাবের প্রসার ও কবিত্বশক্তির বিশেষ বিকাশ হয়, অন্তরে নব নব ভাব স্ফূর্ত্তিলাভ করে। সেই কন্যা নবভাবের উত্তেজনায় প্রথমে "কূপমণ্ডুকের হিমালয়দর্শন" শীর্ষক হিমালয়ের বর্ণনাসূচক একটি সুবিস্তৃত মনোহর প্রবন্ধ মহিলাতে প্রকাশ করেন। যিনি তাহা পড়িয়াছেন তিনি লেখিকার রচনার লালিত্যে ও ভাবমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়াছেন, সেই প্রবন্ধটি গদ্যে রচিত হইয়াছিল। তাহার কিয়দ্দিন পরে চিরতুষরাবৃত রজতনিভ উত্তুঙ্গ সুবিশাল কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরি উত্তর প্রান্তে দর্শন করিতে পাইয়া কবিতামালায় তাহার যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, যিনি তাহা পড়িয়াছিলেন তিনি যাহার পর নাই আনন্দিত হইয়াছেন। সেই সুকবি কন্যা হিমালয়শৃঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘার বর্ণনায় আশ্চর্য্যরূপে স্বীয় কবিত্বের মাধুর্য্য ও ভাবের গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। স্বভাব কবিই এইরূপ সুন্দর কবিতা সহজে লিখিতে পারেন। ঈশ্বরপ্রদত্ত বিশেষ কবিত্বশক্তিরই পরিচয় তাহাতে হইয়াছে। তিনি শুভ্র সমুজ্জ্বল স্ফটিকনিভ গগনস্পর্শী শিখর সুবিশাল কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিকে কবিত্বের প্রসূতি নির্ম্মলকান্তি বাগ্‌দেবীরূপে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, তুমি নব নব ভাবের উদ্দীপিকা, তুমি কবিত্বদায়িনী দেবী সরস্বতী, তোমার দর্শনে অকবি সুকবি হয়, ভাবহীনের হৃদয়ে ভাবের তরঙ্গ ক্রীড়া করে, আশ্চর্য্য তোমার মোহিনী শক্তি। ইত্যাদি অনেক ভাবের কথা রচয়িত্রী স্বীয় কবিতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনে তাঁহার মন অতিশয় প্রশস্ত ও উন্নত হওয়াতে তিনি কবিতামালায় এরূপ সুন্দর সুন্দর ভাবকুসুম সহজে গাঁথিয়া পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিতে পারিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি দুইটী কবিতায় নব নব ভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘার বর্ণন করিয়াছেন। মহিলার পাঠিকাগণ তাহা পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছেন। হিমালয় এই প্রকার নব নব ভাব যোগাইয়া কবিত্ব শিক্ষাদান করেন, ভক্তিপথাবলম্বীকে ভক্তি, যোগপথের পথিককে যোগ শিক্ষা দেন,

জ্ঞানপিপাসুকে জ্ঞানদানে তৃপ্ত করেন। বলি, বঙ্গবালাগণ, তোমরা হিমালয়ের ক্রোড়ে স্থিতি করিয়া কেবল বাহ্যিক আমোদ প্রমোদে দিনযাপন করিও না, রিক্তহস্তে দেশে ফিরিয়া আসিও না। ইংরাজরাজের প্রসাদে হিমালয়ের রমণীয় উপত্যকা ও অধিত্যকায় ভ্রমণ এবং অবস্থানের এতদূর সুযোগ ও সুবিধা হইয়াছে; তোমরা উচ্চ লক্ষ্য করিয়া যাইয়া তথায় বাস করিও। পুনর্ব্বার বলি, তোমাদের হিমালয় দর্শন ও বাস কেবল শারীরিক ভাবের স্ফুর্ত্তি ও বাহ্যিক আমোদের জন্য যেন না হয়।

কিয়দ্দিন হইল আমরা বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ কলিকাতা হইতে খর্শিয়ঙ্গ পর্ব্বতে গিয়াছিলাম। খর্শিয়ঙ্গ দার্জ্জিলিংএর পথে একটি বড় ষ্টেশন। খর্শিয়ঙ্গ হইতে দার্জ্জিলিং ন্যূনাধিক ২০ মাইল দূরে উত্তরাংশে। দার্জিলিংএর যাত্রিক বিক্রমপুরনিবাসী ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রকুমার মিত্র সস্ত্রীক কলিকাতা হইতে আমাদের সহযাত্রিক হইয়াছিলেন। তিনি যুবা পুরুষ, তাঁহার সহধর্ম্মিণীর বয়ঃক্রম ১৮।১৯ বৎসরের অধিক না হইতে পারে। তাঁহারা উভয়ে দার্জ্জিলিংএ নূতন যাইতেছিলেন, পূর্ব্বে কখনও দার্জিলিং দর্শন করেন নাই। কিয়দ্দিনের ছুটী লইয়া সস্ত্রীক দার্জিলিংএ বেড়াইবার জন্য যাইতেছিলেন। পথে তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের আলাপ পরিচয় হয়। খর্শিয়ঙ্গ ষ্টেশনে বেলা ১০টার সময় গাড়ী পঁহুছিল। তখন আমরা শকট হইতে অবতরণ করিয়া আমাদের গম্যস্থানে যাইবার উদ্যোগী হইলাম। দেবেন্দ্রকুমার ভৃত্য সহ জলের অন্বেষণে গিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী গাড়ীতে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে গাড়ী চালিত হয়, দেবেন্দ্রকুমার দৌড়িয়া আসিয়া দেখেন যে, গাড়ী চলিয়া গিয়াছে। তিনি আপন স্ত্রীর জন্য অতিশয় চিন্তিত হন, বধূমাতাটী তাঁহার অপরিচিত ও অজ্ঞাত স্থান দার্জিলিংএ একা চলিয়া গেলেন, তাঁহার স্বামী খর্শিয়াঙ্গে রহিলেন দেখিয়া আমরাও অতিশয় চিন্তিত হই। দেবেন্দ্রকুমার দার্জিলিংএ যাইয়া সেনিটেরিয়মে সস্ত্রীক বাস করিবেন জানিতাম, পরদিন আমরা মনের আবেগে খর্শিয়ঙ্গ হইতে সেনিটেরিয়মের ঠিকানায় সবিশেষ অবস্থা জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহাকে এক খানা পত্র লিখি, তিনি আমাদের পত্র পাইয়া তদুত্তরে আমাদিগকে গত ২৩শে এপ্রিল এই পত্র লিখেন ;—

"আজ আপনার চিঠি পাইয়া সুখী হইয়াল, আপনার সহৃদয়তা ও সৌজন্যে আমরা মোহিত হইয়াছি। আপনার ন্যায় যাঁহারা সকল লোককে ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন ধন্য। গাড়ী খর্শিয়াঙ্গে অর্দ্ধ ঘণ্টা থাকিবে বিশ্বাসে আমি জলের অনুসন্ধানে গিয়াছিলাম, জল নিকটেই পাইব মনে করিয়াছিলাম, এবং ভাবিয়াছিলাম ফিরিয়া আসিয়া আপনাদের নিকট হইতে বিদায় লইব। এ জন্য আপনাদের সহিত ভাল করিয়া কথা কহি নাই। আশা করি ত্রুটি মাপ করিবেন। আমি সেই ট্রেণে যাইতে পারি নাই। তৎপরবর্ত্তী মেইল ট্রেণে গিয়াছিলাম।

আমাদের গাড়ী পূর্ব্বের গাড়ীর অনুমান ১০ দশ মিনিট পরে দার্জ্জিলিংএ পঁহুছিয়াছিল। আমার স্ত্রী নিতান্ত বিপন্নবোধ করিতেছিলেন, এবং ভয় পাইয়াছিলেন। এক জন প্রাচীন মোসলমান (চাপরাশী বলিয়া বোধ হয়) তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিল, এবং আমি না পঁহুছান পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে ছিল। আমিও এই দুর্ঘটনায় বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলাম। কিন্তু দয়াময়ের উপর নির্ভর করিয়া চিন্তা দূর করিয়াছিলাম।"

যে যে মহিলা দার্জ্জিলিংএ বেড়াইতে যান তাঁহাদের সময়ে সময়ে এরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনাতে পতিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। তখন বিধাতার উপর নির্ভর করিয়া আত্ম মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সপ্রতিভ ভাবে চলা আবশ্যক। তাহা হইলে কোন ভয়ের কারণ থাকে না, অচিরে নিরাপদে যথাস্থানে পঁহুছিবার সদুপায় হয়। যাঁহারা লজ্জা ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়েন তাঁহাদিগকেই কষ্ট পাইতে হয়।

সাহেব বিবীরা শীতপ্রধান দেশের লোক, গ্রীষ্মকালে এ দেশের নিম্নভূমির গ্রীষ্মের তাপ তাঁহাদের পক্ষে একান্ত অসহ্য। উত্তাপের সময় শীতপ্রধান হিমগিরিতে যাইয়া বাস করা তাঁহাদের সম্বন্ধে আবশ্যক হয়। গ্রীষ্মপ্রধান বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া যে সকল মহিলা চিরকাল বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের দার্জ্জিলিংএর শীতল বায়ু সেবন তাদৃশ প্রয়োজন নহে। তাঁহারা আবশ্যকমতে কিছু দিনের জন্য হিমালয়ে যাইতে পারেন, কিন্তু জ্ঞানোন্নতি আত্মোন্নতির জন্য যাইবেন, ক্রীড়া আমোদ করিয়া বৃথা জীবন যাপনের জন্য না যাওয়া শ্রেয়ঃ।

সাধ্বী ফাতেমা দেবী।

(২৫৮ পৃষ্ঠার পর।)

এক মাস কাল অতীত হইতে চলিল, ফাতেমার জফাফের বিষয়ে কোন কথাই হইতেছে না। লজ্জাপ্রযুক্ত আলি, মহাপুরুষ মোহম্মদের নিকটে এ বিষয়ের কিছুই বলিতে পারিতেছিলেন না। কখনও আলির সঙ্গে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হইলে হজরত বলিতেন, "তোমার এই পত্নী সুপত্নী, ইনি জগতের নারীকুলভূষণ।" অনন্তর এক মাস অতীত হইলে, আলির ভ্রাতা আকিল আলির নিকটে যাইয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ, আমরা এই উদ্বাহব্যাপারে অতিশয় সুখী ও আনন্দিত হইয়াছি, কিন্তু ইচ্ছা যে, তুমি অবিলম্বে সেই সম্পাদাকাশের সমুজ্জ্বল তারকার সঙ্গে সম্মিলিত হও, আমরা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করি।" আলি বলিলেন, "আমারও অভিলাষ ইহাই, কিন্তু হজরতের নিকটে তাহা ব্যক্ত করিতে লজ্জা হয়।" তখন অকিল মহাত্মা আলির হস্তধারণ করিয়া হজরত মোহম্মদের গৃহদ্বারে যাইয়া উপস্থিত হন। প্রথমতঃ হজরতের দাসী ওম্ম এয়মনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাহাকে এ বিষয় বলেন। ওম্ম এয়মন বলিল, "আপনারা এ সম্বন্ধে যাহা জানাইলেন তাহাতেই যথেষ্ট হইল, আপনাদের জন্য চেষ্টা উদ্যোগের প্রয়োজন নাই। হজরতের আত্মীয়া

নারী ও পরিজনবর্গের সাহায্যে আমি এ কার্য্য সম্পাদন করিব। ঈদৃশ ব্যাপারে স্ত্রীলোকের কথাই আদরণীয় হয়।” ওম্ম এয়মন এই কথা ওম্ম সোলমাকে জানাইল, তৎপর অন্য অন্য নারীকে জ্ঞাপন করিল। তাহারা সকলে আয়শাদেবীর গৃহে যাইয়া মিলিত হইলেন। হজরত সেই স্থানে ছিলেন। সুধাংশুর চতুষ্পার্শ্বে তারকাবলীর ন্যায় তাঁহারা হজরতকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহার নিকটে খদিজা খাতুনের সদ্‌গুণ ও নৈপুণ্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন যে, “অদ্য তিনি জীবিত থাকিলে ফাতেমার এই শুভানুষ্ঠানে আমাদিগকে কোন চিন্তা করিতে হইত না, তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের নয়ন উজ্জ্বল হইত।” এতচ্ছ্রবণে হজরত বাষ্পপূর্ণলোচনে বলিলেন, “খদিজার দৃষ্টান্ত কোথায়? যখন সকল লোক মিথ্যাবাদী ভণ্ড বলিয়াছে, তখন তিনি আমাকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ও আমার জন্য সমুদায় সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, এবং ঐশ্বরিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহাকে আমি স্বর্গলোকের সুসংবাদ দান করিয়াছি, তিনি স্বর্গে গৃহীত হইয়াছেন।” তখন ওম্মসোলমা বলিলেন, “প্রেরিতপুরুষ, খদিজার যে সমস্ত সদ্‌গুণ বর্ণন করিলেন, তাহা সত্য, আশা করি পরমেশ্বর স্বর্গলোকে তাঁহার সঙ্গে আমাদিগকে সম্মিলিত করিবেন। এক্ষণ আপনার ভ্রাতা ও পিতৃব্যপুত্র ইচ্ছা করেন যে, আপনি তাঁহাকে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকটে উপস্থাপিত করেন, প্রেরিতকুলের এই সমুজ্জ্বলরত্নকে সম্মিলনসূত্রে গ্রথিত করেন।” ইহা শ্রবণ করিয়া হজরত বলিলেন, “ওম্মসোলমা, আলিতো স্বয়ং এ কথা আমার নিকটে উত্থাপন করিল না?” ওম্মসোলমা বলিলেন, “দেব, আলি লাজুক পুরুষ, লজ্জাপ্রযুক্ত ব্যক্ত করেন নাই।” তচ্ছ্রবণে হজরত ওম্ম এয়মনকে আদেশ করিলেন যে, “যাও, আলিকে ডাকিয়া লইয়া আইস।” তখন ওম্ম এয়মন তাঁহার উদ্দেশে বাহির হইল, আলি পথে অবস্থিতি করিয়া সংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ওম্ম এয়মনকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্যাপার কি বল?” ওম্ম এয়মন বলিল, “আসুন, হজরত আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন।” তৎক্ষণাৎ আলি হজরতের নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং লজ্জাপ্রযুক্ত মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। হজরত মোহম্মদ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আলি, তুমি কি স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সন্নিহিত হইতে ইচ্ছা কর?” তখন আলি সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সেই দিন রাত্রিতে বা তাহার পরদিন সম্মিলন হইবে হজরত এরূপ অঙ্গীকার করিলেন। আলি প্রফুল্ল অন্তরে সহাস্যবদনে গৃহে চলিয়া গেলেন। হজরতের আজ্ঞাক্রমে কুলনারীগণ ফাতেমাদেবীকে বেশভূষায় সুসজ্জিত করিলেন, এবং তাঁহার যৌতুক দ্রব্যসকল সাজাইলেন। হজরত মোহম্মদ ওম্ম সোলমাকে যে কয়েকটি মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা হইতে দশ মুদ্রা

আলিকে প্রদান করিয়া খোর্ম্মাফল ও ঘৃত এবং পনির ক্রয় করিতে বলিলেন। আলি পাঁচ মুদ্রার ঘৃত, চারি মুদ্রার খোর্ম্মা, এক মুদ্রায় পনির ক্রয় করিয়া হজরতের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। হজরত এক চর্ম্মময় ভোজ্যপাত্রে স্বহস্তে উক্ত তিন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া হবশী প্রস্তুত করিলেন। ইহা এক সুরস খাদ্যসামগ্রী, ঘৃত, খোর্ম্মা ও পনিরযোগে প্রস্তুত হয়। পরে হজরত মোহম্মদ আলিকে বলিলেন, "আলি বাহিরে যাও, যাঁহাকে দেখিতে পাও সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস।" তখন আলি বহির্গত হইয়া দেখেন যে, বহুলোক সমাগত, তিনি সকলকে আহ্বান করিয়া হজরতের নিকটে চলিয়া আসিলেন, এবং নিবেদন করিলেন যে, "প্রেরিতপুরুষ, বহু লোকের সমাগম হইয়াছে, একযোগে সকলের প্রবেশ অসাধ্য ব্যাপার।" তখন হজরত আদেশ করিলেন, "দশ দশ জন করিয়া আসিতে দাও, দশ জন ভোজন করিয়া গেলে অন্য দশ জন আসিবেন।" তদ্রূপ করা হইল। কথিত আছে, পরে গণনা করা গিয়াছিল যে, সাত শত স্ত্রী পুরুষ উক্ত মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। জফাফের ভোজ্য সম্পন্ন হইলে হজরত মোহম্মদ এক হস্তে আলির হস্ত অপর হস্তে ফাতেমার হস্ত ধারণ করিয়া ফাতেমার মস্তক আপনার বক্ষে স্থাপন ও ললাটদেশ চুম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে আলির হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "আলি, তোমার পত্নী এই ফাতেমা সুপত্নী" এবং আলিকেও ফাতেমার হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "তোমার পতি এই আলি সৎপতি।" তৎপর তাঁহাদিগকে তাঁহাদের আলয়ে পাঠাইয়া দিলেন। স্বয়ং দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বরকন্যাকে শুভ আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

জফাফের তৃতীয় দিবস অন্তে হজরত মোহম্মদ অকস্মাৎ আলির গৃহে উপস্থিত হন। আলি ও ফাতেমা গৃহে একত্র উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের উভয়ের গাত্রে কম্বল ছিল। হজরত আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া তাঁহারা উভয়ে শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া হজরত বলিলেন, "তোমরা যে ভাবে আছ, সেই ভাবেই থাক।" ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদের মধ্যস্থলে যাইয়া বসিলেন। আলি আপন বক্ষে হজরতের দক্ষিণ চরণ ফাতেমা বাম চরণ আলিঙ্গন করিলেন। মহাপুরুষ মোহম্মদ কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া আলিকে কিঞ্চিৎ জল আনিতে বলিলেন। তিনি জল আনয়ন করিলে তদুপরি কোরাণের কয়েকটী বচন পাঠ করিয়া তাঁহাকে তাহার কিঞ্চিৎ পান করিতে আদেশ করিলেন। আলি উক্ত জল কিছু পান করিয়া কিছু রাখিয়াছিলেন। হজরত অবশিষ্ট জল আলির মুখে ও মস্তকে বর্ষণ করিয়া বলিলেন, "তোমা হইতে মলিনতা দূর হউক।" তৎপর আরও জল আনয়ন করিয়া ফাতেমার সম্বন্ধেও এইরূপ আচরণ করিলেন। অবশেষে আলিকে বাহিরে পাঠাইয়া ফাতেমাকে তাঁহার স্বামীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন।

ফাতেমা বলিলেন, "দেব, তিনি নানা উচ্চ গুণে ভূষিত, কিন্তু অনেক কোরেশরমণী আমাকে ভৎর্সনা করিয়া বলে যে, "তোমার স্বামী অতিশয় দরিদ্র।" ইহা শ্রবণ করিয়া হজরত বলিলেন, "বৎস, তোমার পিতা দরিদ্র নহেন ও তোমার পতিও দরিদ্র নহেন। পৃথিবীর ধন সম্পদ আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল, আমি গ্রহণ করি নাই, প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে যে ধন আছে তাহা গ্রহণ করিয়াছি। আমি যাহা বুঝিতে পারিয়াছি তুমি যদি তাহা বুঝিতে, সমুদায় সংসার তোমার দৃষ্টিতে তুচ্ছ হইত। আমি যাহা বলিতেছি তাহা সত্য, তোমার পতি সাধুতা অনুসারে আমার সহচর বন্ধুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানানুসারে তাহাদিগের অগ্রণী, ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যানুসারে তাহাদের অপেক্ষা সমুন্নত। কল্যাণি, তুমি জানিও মর্ত্ত্যবাসীদিগের মধ্যে পরমেশ্বর দুইজনকে গ্রহণ করিয়াছেন, এক তোমার পিতা, দ্বিতীয় তোমার পতি। সাবধান স্বামীর অবাধ্যা হইও না, সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে।" অনন্তর হজরত আলিকে নিকটে ডাকিলেন, এবং তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিলেন, 'তুমি ফাতেমার মন রক্ষা করিয়া চলিবে, তাঁহাকে সুখে রাখিতে যত্নবান্ হইবে। ফাতেমা আমার অংশ, ফাতেমাকে সন্তুষ্ট করিলে আমাকে সন্তুষ্ট করিবে। আমি তোমাদিগকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিলাম।" এই বলিয়া হজরত গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হন। তখন ফাতেমা বলেন, "পিতঃ, গৃহকার্য্য সমুদায় আমাকে স্বহস্তে করিতে হইতেছে, বাহিরের কর্ম্ম স্বামী করেন। একটী দাসী আমাকে প্রদান করিলে কাজকর্ম্মে আমার অনেক সাহায্য হয়। আপনার যাহা ইচ্ছা তাহা করুন।" হজরত বলিলেন, "বৎসে, একটী পরিচারিকা তোমাকে অর্পণ করিব ? না, পরিচারিকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু দান করিব ?" ফাতেমা বলিলেন, "তাহা অপেক্ষা উত্তম কি বস্তু বলুন।" হজরত বলিলেন, "প্রতিদিন তেত্রিশ বার বল, সহবান আল্লা, (পবিত্র ঈশ্বর) প্রতিদিন তেত্রিশ বার বল অল্ হমদো লেল্লাহ, (ঈশ্বরেরই সম্যক প্রশংসা) প্রতিদিন তেত্রিশ বার বল আল্লাহু আকবর, (ঈশ্বর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ) প্রতিদিন তেত্রিশ বার বল লা এলাহ এল্লেলাহ, (ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই)" ইত্যাদি বলিয়া তিনি বহির্গত হইলেন। ফাতেমার জেফাফ উপলক্ষে মোয়াজের পুত্র সাদ একটি মেষ ও অন্য কোন কোন আন্সার কুলের লোক কয়েক সের তণ্ডুল পাঠাইয়াছিলেন, তাহা দ্বারা বন্ধুভোজ হইয়াছিল।

আলি বলিয়াছেন যে, "ফাতেমা কখনও আমাকে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত করিয়া তোলেন নাই, যে পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন কখনও কোনরূপ অবাধ্যতাচরণ করেন নাই, এবং আমিও কোন দিন তাঁহাকে ব্যথিত করি নাই।" ফাতেমা অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা সদ্গুণালঙ্কৃতা উচ্চপ্রকৃতি রূপবতী নারী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে আলির ঔরসে হসন হোসয়ন ও জয়নব এবং ওম্মকলসুম ও রকিয়া এবং মহসন এই কয়টি

পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত সন্তান অকালে প্রসূত হয়, তাহাতে ফাতেমা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন সেই রোগেই পরলোকে যাত্রা করেন। হজরতের পরলোকগমনের ছয় মাস কি পাঁচ মাস পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। মদিনায় তাঁহার সমাধি হইয়াছিল, এক্ষণ সমাধিভূমির কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

আকস্মিক ঘটনা ও সামান্য রোগাদির গৃহচিকিৎসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দগ্ধ ব্যক্তির গৃহচিকিৎসা।

সামান্য দাহে, অর্থাৎ ফোস্কা উৎপন্ন না হইলে একটু নারিকেল তৈল ও চুণের জল মিশ্রিত করিয়া তাহাতে পাতলা নেকড়া ভিজাইয়া দগ্ধ স্থানে পটী দিবে এবং পটীর উপরে একখণ্ড কোমল কদলী পত্র রাখিয়া তাহা বাঁধিয়া দিবে। ইহাতেই অবিলম্বে জ্বালা নিবারণ হইবে এবং দগ্ধ স্থান সুস্থ হইবে।

যে দাহে বহুল পরিমাণে ফোস্কা উৎপন্ন হয় তাহাতেও তৈল এবং চুণের জল উৎকৃষ্ট ঔষধ, উভয় দ্রব্য সমান ভাগ একটী বোতলে মিশ্রিত করিয়া উহাকে খুব নাড়িতে হইবে। এইরূপে নাড়িলে উহা ঘৃত বা মাখনের ন্যায় শ্বেতবর্ণ গাঢ় পদার্থে পরিণত হইবে। এই ঔষধটী ইংলণ্ডের ক্যারণ নামক স্থানে লৌহের কারখানায় (Caron Iron- works) গলিত লৌহের দ্বারা দগ্ধ ক্ষতেতে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া উহাকে ক্যারণ অয়েল (caron oil) বলে। সে দেশে উহা সুইট্ অয়েল (sweet oil, salad oil) অথবা জলপাইয়ের তৈলে প্রস্তুত হয়। যদি নিকটে ডিসপেন্সারি থাকে, ক্যারণ অয়েল চাহিয়া পাঠাইলে তথায় উহা উত্তম রূপে প্রস্তুত করিয়া দিবে, কিন্তু উহা সকল গৃহেই অনায়াসে ও অল্প সময় মধ্যে প্রস্তুত হইতে পারে। আমাদের দেশে নারিকেল তৈল ও চুণের জল সংযোগে মিলিত ক্যারণ অয়েল সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

প্রথমতঃ দগ্ধ ব্যক্তির দেহের বস্ত্রাদী আস্তে আস্তে ছাড়াইবে। যদি কোন স্থানে উহা ফোস্কার সহিত জড়িত হইয়া গিয়া থাকে তবে টানিয়া ছাড়াইবে না। জড়িত বস্ত্রাংশের চারিদিক কাঁচির দ্বারা কাটিয়া দিবে, ফোস্কাতে যে টুকু সংলগ্ন থাকে সে টুকু থাকিতে দিবে। ফোস্কা যাহাতে ছিড়িয়া না যায় তৎসম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। বড় বড় ফোস্কা গুলিকে পিন্ বা ছুঁচের দ্বারা ছিদ্র করিয়া দিবে তাহা হইতে জল নির্গত করিয়া দিবে পাতলা চামড়া টুকু ছিঁড়িবে না। তাহার পর ক্যারণ অয়েলেতে, পরিস্কার প্যাঁজাল তুলা ভিজাইয়া দগ্ধ স্থানের উপরে রাখিয়া দিবে। তুলার যে দিকটা দগ্ধ স্থানের উপরে থাকিবে, সেই দিকটা মাত্র তৈলেতে (ক্যারণ অয়েল) ভিজাইবে, বিপরীত দিকটা শুষ্ক থাকিবে। এইরূপে সমুদায় দগ্ধস্থান তুলার দ্বারা আবৃত করিয়া কাপড়ের কাণি বা ব্যাণ্ডেজ দ্বারা বাঁধিয়া দিবে। প্রতি

দিন এই তুলা পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া আবশ্যক কিন্তু পরিবর্ত্তন সময়ে যাহাতে ক্ষত স্থানে বায়ু না লাগে তদ্বিষয়ে সাবধান হইবে। এক এক স্থান হইতে তুলা উঠাইয়া তৎক্ষণাৎ ক্যারণ অয়েল শিক্ত নূতন তুলা তাহার উপর বসাইয়া দিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত তুলা বদলাইয়া দিবে, কিন্তু কোন স্থানে পুরাতন তুলা যদি ক্ষতের সহিত জড়াইয়া যায় তাহা উৎপাটন করিবে না, তাহার উপরেই নূতন তুলা বসাইয়া দিবে। কেবল মাত্র এই চিকিৎসাতেই অধিকাংশ অগ্নি বা উত্তপ্ত দ্রব্যাদির দ্বারা দগ্ধ ক্ষত শুখাইয়া যাইবে। কিন্তু দগ্ধ ব্যক্তির শরীরে যদি জ্বরের প্রকোপ হয় কিম্বা যদি অবসাদের লক্ষণ দৃষ্ট হয় তবে আভ্যন্তরিক চিকিৎসার প্রয়োজন হইবে, তখন উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিবে। অধিক রূপে দগ্ধ হইলে প্রায়ই জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব হয় না জ্বর ও এতদবস্থায় বড় থাকেনা। কিন্তু দগ্ধ ব্যক্তির ঘন ঘন জল পান করিতে ইচ্ছা করে। ইহাকে সুলক্ষণ মনে করিবে না, এইরূপ অবস্থায় রোগী শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শরীরের কোন অংশ দগ্ধ হইয়া অঙ্গারাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে নারিকেল বা তিলতৈলশিক্ত বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া চিকিৎসকের সাহায্য লইবে। এই অবস্থায় গৃহচিকিৎসা সম্ভব নহে।

সলফিউরিক, নাইট্রিক কিম্বা কার্বলিকএসিড দ্বারা শরীরের কোন অংশ দগ্ধ হইলে উহা কোন খার দ্রব্য মিশ্রিত জলে তৎক্ষণাৎ ধৌত করা আবশ্যক। চুণের জল সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, তাহা উপস্থিত না থাকিলে খড়ি বা সোডা মিশ্রিত জলে ধুইলে ও হইতে পারে। যদি এই সমুদায় কোন দ্রব্যই নিকটে না থাকে তবে কদলীবৃক্ষের রসের দ্বারা ধুইলেও উপকার হইতে দেখা যায়। ধৌত করিবার পর নারিকেল বা তিলতৈলশিক্ত বস্ত্রের পটী দিবে। অধিক রূপে দগ্ধ হইলে ক্যারণ-অয়েল ব্যবহার করিবে।

দগ্ধ ক্ষত সম্বন্ধে একটী কথা বিশেষ রূপে স্মরণ রাখা আবশ্যক। এই ক্ষত শুখাইবার সময়ে ক্ষতের চতুর্দ্দিকস্থ মাংসপেশী পেশীবন্ধ স্নায়ু চর্ম্ম ইত্যাদি শীঘ্র শীঘ্র সঙ্কুচিত হইতে থাকে ইহাতে দগ্ধ অঙ্গ বক্র হইয়া যায়; তদ্ভিন্ন এক অঙ্গ যদ্যাপি অন্য অঙ্গের সহিত সংলগ্ন অবস্থায় রাখা যায় উভয়ে জড়িত হইয়া চীরকালের জন্য পরস্পর সংবদ্ধ হইয়া যায়। হাতের দগ্ধ অঙ্গুলী একত্রে বাঁধিলে কিম্বা অঙ্গুলীগুলি মুষ্টিবদ্ধাবস্থায় রাখিলে সচরাচর এইরূপ ঘটিয়া থাকে। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা চিকিৎসিত হইলে এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত অনেক বালক বালিকা প্রতিবৎসর নানা স্থানে সরকারী হাসপাতালে আনিত হইয়া থাকে। চিকিৎসার সময়ে এসম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক। প্রত্যেক অঙ্গুলী ভিন্ন ভিন্ন করিয়া বাঁধিতে হইবে, প্রত্যেক অঙ্গ সোজা রাখিতে হইবে, কোন্ সময়ে কোন্ অঙ্গ কিরূপ হইতেছে ইহা লক্ষ্য করা অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ লোকের দ্বারা

সম্ভব নহে। উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য প্রয়োজন. লেখক একবার ইহার একটী অতিশয় ক্লেশজনক ও ভয়ানক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলেন। একটী নবম বর্ষীয়া বালিকা চিকিৎসার্থ হাসপাতালে আনীতা হয়। তাহার একটী চক্ষের পাতা বন্ধ করা যাইত না, তার চক্ষুটি সে জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মুখের এক পার্শ্ব সেই দিকের স্কন্ধের সহিত দৃঢ় রূপে সংবদ্ধ ছিল, এক হস্তের সমস্ত অঙ্গুলীগুলি পরস্পর জড়িত এবং মুষ্টিবদ্ধ ছিল, উভয় উরু পরস্পর সংযুক্তছিল। সৌভাগ্যবশতঃ তার এক-বৎসরকাল নানা রূপ অস্ত্র চিকিৎসার দ্বারা ইহার অবস্থা অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারা গিয়াছিল, উরু দুটীও বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল, কিন্তু হস্ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই এবং চক্ষুটীর কোন উপায় করিতে পারা যায় নাই।

স্বর্গগতা দেবী গোলাপমোহিনীর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১৮৫৩ সালে আশ্বিন মাসে দেবী গোলাপমোহিনী, কলিকাতার অন্তর্গত খিদিরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের ৬।৭ দিন পরেই তাঁর মাতার মৃত্যু হয়! অনেক আত্মীয় তাঁহাকে মানুষ করেন। তাঁহার পিতা একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। মাতৃ-হীনা একমাত্র কন্যা তাঁর বড় আদরের ধন ছিল। তিনি অতিশয় পরদুঃখকাতর ও দানশীল ছিলেন, তাঁর অন্তঃকরণ অতি সরল ছিল। খিদিরপুরের পুল এবং তন্নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে তিনি সঙ্গীগণের সঙ্গে শৈশবে খেলা করিয়া বেড়াইতেন।

নয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে একদিন তিনি পুলের উপর খেলা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁর ভাবী ভাশুর তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁদের বাড়ী যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া সানন্দ মনে তাঁকে ভ্রাতৃবধূ রূপে মনোনীত করিলেন, বাড়ী গিয়া বলিলেন "ভালই হইল যে মেয়েটীকে আমি ধূলো কাদায় দেখিলাম। অনেক স্থানে কন্যাদের নানা প্রকার কৃত্রিম প্রণালীতে সাজাইয়া দেখান হয়, তিনি তাহার পক্ষপাতী ছিলেন না।

নয় বৎসর বয়সে দেবী গোলাপমোহিনীর বিবাহ হয়। তাঁর স্বামী (এখানকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার আর এল দত্ত) তখন মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। পিতার একমাত্র সন্তান কাজেই অত্যন্ত আদুরে মেয়ে ছিলেন। পিতৃগৃহে তাঁর সংসার কার্য্য শিক্ষা হয় নাই। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে তিনি অল্পকালের মধ্যেই সকল প্রকার কাজ কর্ম্ম, রন্ধনাদিও শিখিয়াছিলেন। তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন তাঁহাকে "রাঙ্গা বৌ" বলিয়া ডাকিতেন; অতি যত্নপূর্ব্বক নিজ হাতে কাজ কর্ম্ম শিখাইতেন; কোন বিষয় ক্রটী হইলে কখনও বিরক্ত হইতেন না। কালে তিনি অতিশয় পরিশ্রমী সুগৃহিণী হন।

চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, তাঁর একমাত্র পুত্র জহরলালের জন্ম হয়। জন্মের

ছয় মাস পরেই তাঁহার স্বামী ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। আত্মীয়গণ বাধা দিবেন এই ভয়ে তিনি বিলাত যাইবার মতলবের বিষয় সহধর্ম্মিণীর নিকটেও প্রকাশ করেন নাই। সে সময়ও তিনি হাবড়া গ্রামে একজন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন; বিলক্ষণ পশার ছিল ও যথেষ্ট অর্থও উপার্জ্জন করিতেন। সেই অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিলাত যাত্রার আংশিক খরচ চালান এবং একটী ঔষধালয় স্থাপন করিয়া একজন কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত করিয়া যান সেই আয় হইতেই পুত্র ও মাতার সুচারুরূপে জীবিকানির্ব্বাহ হইবে, কাহারও গলগ্রহ হইতে হইবে না এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শৃঙ্খলা অভাবে সে ঔষধালয় চলিল না, উঠিয়া গেল। তখন দেবী গোলাপমোহিনীর অর্থ অভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

তাঁহার স্বামীর দ্বিতীয়বার বিলাতে অবস্থিতি কালে কিছু টাকার অনাটন হয়। তিনি ইহা শুনিয়া নিজের অঙ্গের সমুদায় অলঙ্কার খুলিয়া দেন এবং সেই সকল বিক্রয় করিয়া অবিলম্বে টাকা পাঠাইয়া দিতে তাঁর ভাশুরকে বলিয়া পাঠান।

তিনি অতিশয় আমোদপ্রিয় ও স্বভাবতঃই প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। তাঁহার স্বামী যখন বিলাত হইতে আই, এম, এস্ পাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন, তখন সহধর্ম্মিণীকে লইয়া কর্ম্মস্থানে যাইবেন মনস্থ করেন।

স্বামীর সঙ্গে গেলে ইংরাজদিগের মত আহারাদি অভ্যাস ও রীতিনীতি শিক্ষা করিতে হইবে এবং জাতিচ্যুত হইবেন, হিন্দু আত্মীয় স্বজনেরা এইরূপ অনেক প্রকারে তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন কিন্তু তিনি কাহারও কথা শুনিলেন না। বলিলেন "স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র গুরু অতএব তাঁর অনুগামিনী হওয়া স্ত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য। তোমরা আমাকে ওঁর সঙ্গে যাইতে বারণ করিও না বা বাধা দিও না, আমি তোমাদের কথা শুনিব না"। এইরূপে তিনি অতি সাহসের সহিত হিন্দু দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসেন। কিছুদিনের জন্য মিস্ এক্রো'য়ডের বোর্ডিংস্কুলে বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত ছিলেন। এই স্কুল পরে বেথুন কলেজ নাম প্রাপ্ত হয়।

কিছুদিন পরে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে ইংরাজী ভাষা ও রীতিনীতি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত জনৈক ইংরাজ মহিলাকে গভর্ণেসরূপে নিযুক্ত করেন। তিনি প্রায় ২০ বৎসর তাঁহার সহিত ছিলেন। তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিতে থাকিতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

১৮৯৬ সালে ৪ঠা জানুয়ারী দেবী গোলাপমোহিনীর একমাত্র প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যু হয়। এই দারুণ শোকের পর হইতেই তাঁর শরীর মন দুইই ভগ্ন হইতে আরম্ভ হইল। ১৯০৪ সালে ভাদ্র মাসে তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। বামদিকের হস্ত পদ এক মাস কাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অবশ ছিল। পরমেশ্বরের কৃপায় ক্রমে ক্রমে বাম হস্তটী ভাল হইল কিন্তু বাম পদ প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল, চলিতে বড়ই কষ্ট হইত,

ধীরে ধীরে ঘসিয়া ঘসিয়া চলিতে হইত। এরূপ অবস্থায়ও তিনি অলস হইয়া বসিয়া থাকিতেন না। প্রতিদিন বাসগৃহের শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যসাধনে ব্যস্ত থাকিতেন। কোন কর্ম্মে দাস দাসীদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন না। নিজে সমস্ত দেখিতেন। জীবজন্তু বড় ভাল বাসিতেন। গরু, ঘোড়া, অনেকগুলি কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি নানাবিধ পশু পক্ষী তাঁর পরিবারভুক্ত ছিল। সে সকল পোষা আদরের জীবদিগের সেবা করিতেন, স্বহস্তে তাহাদিগকে খাওয়াইতেন। তিনি অত্যন্ত অমায়িক ও অহঙ্কার শূন্যা ছিলেন। দুঃখী গরিবদিগকে কখনও তুচ্ছ বা অগ্রাহ্য করিতেন না।

প্রথমবার পক্ষাঘাতের পর হইতেই তাঁহার শরীর ক্রমশঃ বলহীন ও নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হইতে লাগিল। চারি বৎসর কাল বাতরোগে এবং হিষ্টিরিয়ায় বড়ই যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে বুকের ভিতর অত্যন্ত ধড়ফড় করিয়া উঠিত, এবং এরূপ অসহ্য যন্ত্রণা হইত যে মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া কোথাও বসিতে পারিতেন না, উদাসীনের ন্যায় চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; আহার নিদ্রা হইতে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত করিত। স্নানের সময় বুকের ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা হইত; সে সময় কেবল "দয়াময়" "দয়াময়" বলিয়া পরমেশ্বরকে ডাকিতেন। স্নানের পর প্রতিদিন ব্রহ্মোপসনা করিতেন এবং রোগের শান্তির জন্য কাতরে প্রার্থনা করিতেন। এত অসুস্থ শরীর লইয়াও প্রতি রবিবারে নিয়মিত ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনায় যোগ দিতেন।

৭ই এপ্রেল কলিকাতার জনতা ও উত্তাপ হইতে বিদায় লইয়া তিনি পরিবার সহ দার্জ্জিলিং পাহাড়ের সুস্নিগ্ধ জ্যোতির ভিতর আসিয়া পৌঁছিলেন। দুই দিন পরে ৯ই এপ্রেল রাত্রি ৮৷৷০টার সময় তিনি দ্বিতীয়বার পক্ষাঘাত রোগে পুনরায় সাংঘাতিক রূপে আক্রান্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইয়া অচেতন হইলেন। সেই সময় হইতে সম্পূর্ণ চেতনা ও বাক্‌শক্তিবিহীন হইয়া ৮ দিন নামমাত্র জীবিত ছিলেন। চক্ষু খুলিবার শক্তিও ছিল না। ডানদিক্ সমুদায় অঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছিল।

১৬ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার পূর্ণিমার রাত্রি ১১টার সময় দেবী গোলাপমোহিনী সংসারের সকল মায়াজাল ছিন্ন করিয়া বিধবা পুত্রবধূ, পৌত্র, পৌত্রীদ্বয় এবং প্রিয়তম স্বামীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন। তিনি প্রতিদিন পরমেশ্বরের নিকট অতি কাতরে প্রার্থনা করিতেন যেন তিনি স্বামীর জীবদ্দশায়ই পরলোক গমনের অধিকারিণী হন; দয়াময় তাঁর প্রতি সদয় হইয়া অচিরে তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

আহা! তিনি যেন ঠিক মার কোলে হাসিতে হাসিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। শেষ মুহূর্ত্তে জীবন শূন্য দেহের লাবণ্য কান্তি পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইল। দেবী গোলাপমোহিনী পবিত্র হিমাচলের ফুটন্ত গোলাপে শোভিত হ'য়ে গোলাপসাথীদের দলে মিশে, ইন্দ্রপুরে, ইন্দ্ররাজের পূজার আয়োজনে চলিলেন। ধন্যা তুমি পুণ্যবতী সতী

লক্ষ্মী ভবগৃহ পরিত্যাগ করে সগৌরবে স্বধামে চলিয়া গেলেন।

দশদিন পরে নবসংহিতা অনুসারে তাঁর শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পৌত্র এবং পৌত্রীদ্বয় প্রার্থনা পড়েন।

জনৈক আত্মীয়ের প্রেরিত একটী প্রার্থনা শেষে পঠিত হয় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"দেবী! আজ তুমি কোথায়? এমন সাধের সুখের সংসার ফেলিয়া, এমন আদরের যত্নের বস্তু সকল ছাড়িয়া, তোমার প্রিয়তম স্বামীকে ভুলিয়া, কোথায় গমন করিলে? যে সংসারকে এত ভাল বাসিতে অনায়াসে তাহা পরিত্যাগ করিলে, এক বিন্দু অশ্রুপাত করিলে না, কাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিলে না। তোমার এত সাধ, এত বাসনা, কিসের আকর্ষণে ঐহিকের মায়া মোহ হইতে ছিন্ন করিল? তুমি এখন যেখানে গিয়াছ, সে দেশের কি এমন মনোহারিণী শক্তি আছে যে সেখানে যাইবার সময় এখানকার কোন হৃদয়ের প্রিয় বস্তুতে আকর্ষণ থাকে না। এমন যে প্রাণের প্রিয় ও যত্নের দেহ, যাহার সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য এত আয়োজন, এত অর্থ ব্যয়, একটু ক্লেশ যাহার পক্ষে অসহ্য, অক্লেশে তাহাকে অনাদরে ফেলিয়া দিয়া পিঞ্জরের পাখীর মত কোন চিন্ময় অদৃশ্য লোকে চলিয়া গেলে? বুঝিলাম এ সংসার তোমার নিবাসস্থান নয়, তুমি এ বিদেশে সংসার পান্থশালায় পথিক হইয়াছিলে, তুমি অমরধামের যাত্রী, পিতার আহ্বানে স্বচ্ছন্দে অমরধামে আনন্দ উল্লাসে প্রস্থান করিয়াছ। তুমি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্রী, আজ সসম্মান ও সসম্ভ্রমে আমরা তোমার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে আসিয়াছি।

হায়! আমরা কি স্থূলদর্শী, হে বিশ্বপতি! তোমার এই সংসারে তোমার শুভ অভিপ্রায় সাধন জন্য তুমি এত সুখের বস্তুতে পৃথিবীকে পূর্ণ করিয়াছ, যে সেই সকল অসংখ্য সুখের বস্তু সম্ভোগ করিয়া আমরা সুখদাতাকে ভুলিয়া যাই। তুমি যে এক হইয়া অসংখ্য বস্তুতে প্রকাশিত রহিয়াছ, তাহাদিগকে দেখিয়া তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইব, তোমার প্রেমে অনুরাগী হইব, তাহা না হইয়া তদ্বিপরীত হয়।

যিনি এই পরিবারের জননী, কর্ত্রী প্রতিপালিকা, রক্ষিকা হইয়া তোমার কার্য্য সাধন জন্য সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি তোমার প্রেরিত প্রতিনিধি হইয়া স্বকার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার অভাবে যাহার মস্তকে সেই সংসারের গুরুভার তুমি অর্পণ করিতেছ, তিনি বলিতেছেন আমি যে লতা পর্ব্বতকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম সেই পর্ব্বতের অর্দ্ধাংশ যে এখন খসিয়া পড়িল। হে অন্তর্য্যামী! তুমি তাহার মনের অবস্থা দেখিতেছ। তিনি যে ইহজীবনের প্রধান অবলম্বন প্রাণপতিকে হারাইয়া তোমাকে পতিরূপে আশ্রয় করিয়াছেন। এইরূপে সংসারে আশ্রয়হীনা হইয়া তিনি যেন তোমাকে পরম আশ্রয় বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং তোমার কৃপায় তোমার প্রদত্ত ভার আজ্ঞাকারিণী দাসীর ন্যায় বহন করিয়া তোমার প্রসন্নতা ও আশীর্ব্বাদ

লাভ করেন এবং নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও সুখী হন।

স্বর্গীয় প্রেম পরিবার স্থাপন সংসারের উদ্দেশ্য। তুমি যাঁহাকে এই সংসারে কর্ত্রী-পদে স্থাপন করিয়াছিলে, তাঁহার সঙ্গে এই গৃহের স্বামী, বধূ ও সন্তানগণকে এক বিশেষ প্রেমের সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়াছিলে। সেই প্রেমের পবিত্র, নিত্য সম্বন্ধ যাইবার নয়। যাহা ধূলির বস্তু তাহা ধূলিতে মিশাইয়াছে। যাহা নিত্য সত্য, তাহা তাহাতেই স্থিতি করিতেছে। আমাদিগের সকলের সঙ্গে মঙ্গলময় বিধাতা তাঁহার যে বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, সে পবিত্র প্রেমের নিত্য সম্বন্ধ আমরা দেহের আবরণে, অনেক সময় দেখিতে পাইতাম না। এখন তিনি অমৃতের সোপান স্বরূপ মৃত্যুকে আনয়ন করিয়া সেই আবরণ হইতে যেমন তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছেন, আমাদিগেরও তেমনি চৈতন্যোদয় হইয়াছে। এখন প্রেম নয়নে অন্তরের মধ্যে আমরা তাঁহাকে দেখিতেছি। তিনি যে সরল হৃদয়, অমায়িক ও উদারচিত্ত ছিলেন, যাহা দেখিয়া তাঁহাকে সকলে সুখ্যাতি করিত তাঁহার সেই রূপ এখন আমরা দেখিতেছি। তিনি যেমন দেহমুক্ত হইয়া এখন দিন দিন অনন্ত জীবনের পথে উন্নত হইবেন, আমরাও যেন দেহের আকর্ষণ সকল হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হই, এবং তাঁহার সঙ্গে নিত্য প্রেমের যোগ ইহকালেই রক্ষা করিয়া, ইহকাল ও পরকালের মিলন ইহ জীবনে সম্ভোগ করিতে পারি। করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন। আমরা যেন তাঁহার চিন্ময় রূপ, বিশ্বাসের আলোকে সর্ব্বত্র দেখিয়া তাঁহার চিন্ময় সন্তানগণকে তাঁহার মধ্যে দেখিয়া চির যোগ সম্মিলনের আনন্দে সুখী হইতে পারি। ওঁ।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমাদের দেশের নারীর একটী অবস্থা।

মহিলারা এদেশে স্বাধীন ভাবে চলাফিরা করিতে পারেন না। গৃহের বাহিরে নির্গত হইয়া রাজপথ দিয়া একাকিনী চলিতে পারেন না। অভিভাবক সহও তাঁহাদের প্রকাশ্যে চলিয়া যাওয়ার অধিকার নাই। কিন্তু কালকাতায় দেখি গঙ্গাস্নান করিতে দলবদ্ধ হইয়া কুলকামিনীরা প্রকাশ্যে রাজপথ দিয়া চলিয়া যান তাহাদের মধ্যে অনেক যুবতী থাকেন। দেখা যায় ধর্ম্মার্থে আমাদের মহিলাদের হাটিয়া যাওয়ার প্রথা আছে। অন্য কোন প্রয়োজনে সে অধিকার তাঁহাদের থাকে না। যদি কলিকাতার রাজপথে পতি পুত্র পিতা ভ্রাতার মধ্যে কেহ আহত কিম্বা পীড়িত হইয়া পড়েন তখন কোন মাতা, স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী প্রকাশ্য পথে চলিয়া গিয়া সেই বিপন্নের সহায়তা করিতে সাহসী হইবেন না। এস্থানে হৃদয়ের আবেগ এবং সাতিশয় উদ্বিগ্নতা নীরবে সহ্য করিয়া গৃহে আবদ্ধ থাকিবেন। গঙ্গাস্নানটাই ধর্ম্ম দেবকার্য্য। কিন্তু রাজপথে শরীর আহত কিম্বা পীড়িত পতি

পুত্র পিতা কিম্বা ভ্রাতার জন্য চলিয়া যাইয়া সহায়তা করাটা এদেশে সেরূপ ধর্ম্ম মধ্যে গণ্য নয় যেরূপ কালীঘাটের কালী দর্শন কিম্বা গঙ্গাস্নান গণ্য হয়। "ঈশ্বরভক্তি মনুষ্যভালবাসাতে প্রকাশ পায়" এইটী এদেশের ভক্তির সংজ্ঞা মধ্যে গণ্য নয়। সাষ্টাঙ্গে দেবতা প্রণাম, ঘটা করিয়া পূজা দেওয়া, দেবালয় প্রতিষ্ঠা, দেবার্চ্চনা উপলক্ষে দান ধ্যান ব্রাহ্মণ ভোজন করান ভক্তির কার্য্য বলিয়া গণ্য। ভক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ না করাতে দেশের মধ্যে বিপন্নের সহায়তা করাটা ভক্তির অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয় নাই। এইরূপ ভক্তির সংকীর্ণ ভাব থাকাতে দেশের কি পুরুষ কি নারীর জীবন সর্ব্বাঙ্গীন প্রস্ফুটিত হয় নাই। নারীর দয়া স্নেহ ভালবাসা ভাল বিকাশ পায় না। সুতরাং নারীদিগের সতীত্ব মূলক তেজ ও তেমন বিকাশিত দেখা যায় না। অনেকে বলেন নারীদিগকে প্রকাশ্য চলিতে দিলে তাহাদের উচ্চ সতী ধর্ম্ম রক্ষা করা সুকঠিন। বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থাতে একথা সমর্থনীয়। তাহা বলিয়া ঈশ্বরের বিধি পালনে এ নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য করিতে হয় না পারিলে জীবন ঈশ্বরের সহ এক হইতে পারে না। বরং নীচু হইয়া যায়। যে সমস্ত নারীর ধর্ম্মজ্ঞান এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস জন্মিয়াছে তাঁহারা সর্ব্বাবস্থায় আপন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সক্ষম। আজ কাল রেল পথে অনেক নারীকে চলিতে হয়। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা তেজস্বিনী তাঁহারা সর্ব্বাবস্থায় আপনার সম্মান রাখিয়া চলিয়া থাকেন। কোন সময়ে আমাদের কোন বন্ধু আপনার দুই কন্যা নিয়া কলিকাতা হইতে ময়মানসিংহ জেলান্তর্গত কিশোরগঞ্জ যাওয়ার পথে নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনে তাঁহার কন্যাদ্বয়কে মেয়েদের গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া তিনি যাইয়া পুরুষদের গাড়ীতে স্থান গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে কয়েকটী যুবক মেয়েদের গাড়ীতে উঠিল। তখন উক্ত দুইটী মেয়ের মধ্যে একজন নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বলিতে লাগিলেন এটি মেয়েদের গাড়ী শীঘ্র চলিয়া যাও। কিন্তু যখন দেখিলেন তাহারা কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিল না তখন প্রথম পিতাকে "বাবা" "বাবা" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, সাড়া না পাইয়া পরে "গার্ড" "গার্ড" বলিয়া খুব উচ্চৈস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। যুবকেরা গার্ডের নাম শুনিবা মাত্র প্রস্থান করিল। এইরূপে মেয়ে দুটী আপন সম্মান রক্ষা করিলেন। তাহাতেই দেখা যায় যাহাদের বিশ্বাস ভক্তি আছে তাঁহারা প্রয়োজনানুসারী আত্মসম্মান রক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। অতএব সকল মেয়ের বিশ্বাস ভক্তি লাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন এবং বিশ্বাসের ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হয় অযথা অবরোধকে অতিক্রমন করিতে হয়। তাহা বলিয়া যথেচ্ছ চলাফিরা করা কখনও ধর্ম্মানুমোদিত হইবে না। মনুষ্য জীবন ধারণ কেবল ঈশ্বর লাভের জন্য, অতএব যাহাতে সেই ধন লাভ হয় তজ্জন্য সর্ব্বথা যত্ন করা একান্তই একমাত্র কর্ত্তব্য জানিবেক।

মহিলাদের রচনা।

দাও ভিক্ষা।

(১)

আঁধার হৃদয় তলে,
কে তুমি দাঁড়ায়ে সখা!
ধীরে ধীরে দাও দেখা
আলোকের শতরেখা।

(২)

বুঝিলে তোমারি কথা
মৃদু মধু কত সুর,
ব'লে যাও কাণে প্রাণে
হৃদয় নিভৃত পুর।

(৩)

আকুল অবশ হিয়া
কভু চাহি ঝরে জল,
কভুবা নীরবে রহি
হেরি প্রেম মুখোজ্জ্বল।

দাও ভিক্ষা,
অর্পিতে সকল সাদ
শ্রীচরণ তলে
কিবা দুঃখ তোমা চাহি
রহিতে ভূতলে।

১৩১২ সন জ্যৈষ্ঠ।

দেবতা ও পিশাচ।

নিঠুর সংসারে; থাকিব কি ক'রে,
ভাবিয়া না পাই দিশে।
কাঁদি দিবা নিশি, চক্ষু জলে ভাসি,
এ বিজন গৃহে বসে॥
দুঃখের জ্বালায়, প্রাণ জ্বলে যায়,
পুড়ে পুড়ে হই ছাই।
অকূল সাগরে, হাবুডুবু ক'রে,
ভাসিয়া সদা বেড়াই॥
নীরস পরাণ, সদা আনচান্,
প'ড়েছি বিষম ফাঁদে।
মরিচিকাময়, হেরি সমুদায়,
বিষাদে পরাণ্ কাঁদে॥
শ্মশান সংসার, করি হাহাকার,
ফুরায়েছে সব আশা।
ভূত প্রেতগুলি, হাঁসে খিলিখিলি
দেখিয়া আমার দশা॥
নিজ হাতে নর, গড়ায় বিস্তর,
কতই সাজায় তারে।
কাঁদিয়া আকুল, হেসে দিকভুল,
পেছনে চাহেনা ফিরে॥
হাসি ভয়ঙ্কর, শুনে লাগে ডর,
বুকে যেন শেল ফোটে।
প্রাণে আই ঢাই, ছুটিয়া বেড়াই,
ধৈর্য্যের বন্ধন টুটে॥
সদা মনে হয়, ছেড়ে লোকালয়,
গহন কাননে যাই।
তরুলতা আছে, কব তার কাছে,
কত যে যাতনা পাই॥
দেখে অনাথিনী, বনে বিহঙ্গিনী,
আদরে শুনাব গান।
সে গান শুনিব, শ্রবণ জুড়াব,
শীতল হইবে প্রাণ॥
স্বন্ স্বন্ ক'রে, অনিল আমারে,
সান্ত্বনা করিবে দান।
আমারে হেরিয়া, শাখা বিস্তারিয়া,
শাখী মোরে দিবে স্থান॥
তাহাদের সনে, রব রাত্রি দিনে,
দুঃখের বারতা কব।

মানুষ আমারে, দিয়াছে সংসারে,
যেরূপ যাতনা সব ;
মানব প্রকৃতি, দেখে মনে অতি,
ঘৃণার সঞ্চার হয়।
কি বলিনু হায়, পাগলিনী প্রায়,
সবাই সমান নয় ॥
সংসারেও কত, আছে শত শত,
দয়াতে হৃদয় ভরা।
কপট বসন, করেনা ধারণ,
ধরাকে ভাবে না সরা ॥
সেই ধন্য নর, হইয়া অমর,
চিরদিন রবে হায়।
আমি বারবার, কোটি নমস্কার,
করিব তাঁহার পায় ॥

সাধন সোপান।

(১)

সত্যের বিরুদ্ধ পথে যে করে গমন।
"অধম" তাহারে ক'ন জ্ঞানী সাধু জন ॥
তুমি সাথী হবে তার,
সদাশয়, নির্ব্বিকার ;
"তুমি" "আমি" ভেদ জ্ঞান শূন্য যেই জন।
আর্ত্ত দুঃখ মুছিবারে সদা ব্যস্ত মন ॥

(২)

কহিব তোমায় এবে সংযমী লক্ষণ।
মানবের তরে যার নিরাকাঙ্ক্ষ মন ॥
শোক কি দুঃখ বিপদ,
যে নাহি ভাবে আপদ ;
সর্ব্ব কাজে তাঁর হস্ত যে করে দর্শন।
সেইত সংযমী ইহা রাখিবে স্মরণ ॥

(৩)

শুনহ এবার তুমি নির্ভর লক্ষণ।
শত্রু যদি হয় তার বিশ্ববাসীগণ ॥
তথাপি তাহার চিত্ত,
হয় না তিলেক ভীত ;
লাভেতে কখন নাহি করে আস্ফালন।
বাধা, তিরস্কারে নাহি টলে তার মন ॥

(৪)

জগতে গৌরবান্বিত হয় সেইজন।
যে করে আপদ কালে ঈশ্বর চিন্তন ॥
যে করে ঈশ্বরে ভর,
সে পায় ঈশ্বরে লয় ;
মায়াময় বিশ্ব হ'তে সত্য সেই জন।
জীবন্মুক্ত নিত্যধামে করে যে গমন ॥

(৫)

রক্ষণ করিতে ধন চিন্তা অকারণ।
বহু যতনেও নাশ নহে নিবারণ ॥
কঠিন দুর্ব্ব্যবহার,
ত্যজিবে করি বিচার,
করহ যতনে নিজ রসনা সংযম।
লাভ হবে আশাতীত মহামূল্য ধন ॥

(৬)

নাহি হেন ধন এই সংসার মাঝার।
যাহাতে হইবে তব আনন্দ অপার ॥
অক্ষয় আনন্দ হায়,
হেথা নাহি নরে পায় ;
অনিত্য অনিত্য সব নশ্বর জগতে।
হইয়ে নিবৃত্ত তুমি চল সত্য পথে ॥

(৭)

সর্ব্বদা করিবে তুমি সত্য আলাপন।
অসত্য হইতে দূরে করিয়া গমন ॥

যে শুনে অসত্য কথা,
হৃদয়ের সুনীচতা ;
প্রকাশি পলায় তার ধর্ম্মভাবগণ।
সাধনায় প্রেমাস্বাদ পায় না সে জন॥

(৮)

চাহ যদি স্বর্গ সুখ রে অজ্ঞান জন।
সংযমী সাধুর পথ কর অন্বেষণ॥
চির সুখ পাবে তবে,
আশা ভগ্ন নাহি হবে ;
আনন্দে অমর ধামে করি বিচরণ।
হবে রে সার্থক তোর মানব জনম॥

(৯)

সর্ব্ব ভাবে তাঁরে করি আত্ম সমর্পণ।
গৃহ কি পর্ব্বত আর ভয়ানক বন॥
কখন যাহার চিত,
হয়না দেখিয়া ভীত ;
পথহারা হইলেও কি দিবা শর্ব্বরী।
পথ প্রদর্শক তার নিজে হন হরি॥

(১০)

এই চারি বিদ্যা তুমি কর অধ্যয়ন।
চতুর্ব্বিধে চতুর্গুণ কহে বুধগণ॥
তত্ত্ববিদ্যা শিখিবারে,
কর যত্ন বারে বারে ;
পরীক্ষায় কৃতবিদ্য হইবে যখন।
জ্ঞানগৃহ দ্বারমুক্ত হইবে তখন॥

(১১)

ঈশ্বর অর্চ্চনা বিদ্যা শিখিবার তরে।
কর প্রাণপণ তুমি দৃঢ় নিষ্ঠাভরে॥
মহান্ অনন্ত জনে,
সেবিতে হয় কেমনে ;
শিখিবে তোমার কাছে গুপ্ত তত্ত্ব যত।
প্রকাশ হইবে তব ইচ্ছা অনুগত॥

(১২)

ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু করিতে রক্ষণ।
পরিচর্য্যা বিদ্যা তুমি কর অধ্যয়ন॥
ত্রিবিধ পদার্থ যাহা,
আছে তাঁর সৃষ্ট আহা ;
কায়মনে তা সবার করিতে সেবন।
হও তুমি যত্নশীল হে মুমুক্ষু জন॥

(১৩)

সামান্য প্রভুর সেবা করিবার তরে।
সযত্নে শিখিতে হয় কত কষ্ট ক'রে॥
মহা প্রভু সেবা জন্য,
শিখো তুমি গুণ অন্য ;
তুমি দাস এই ভাব করিয়া মনন।
কর সেই মহা প্রভুর আদেশ পালন॥

(১৪)

এই পৃথিবীর নাম সংসার সাগর।
পরপারে "পরলোক" কহে জ্ঞানী নর॥
"বিষয় নিবৃত্তি" নাম,
আছে তরি মনোরম,
পর পার যাত্রী তায় করি আরোহণ।
চলিছে লইয়া নিজ স্বোপার্জ্জিত ধন॥

(১৫)

বিশ্বাসের পূর্ণমাত্রা প্রকৃত লভিয়ে,
সাধক থাকেন সদা নিশ্চিন্তে বসিয়ে
বিপদে সম্পদ সম,
ভাবি সেই নরোত্তম
নির্লিপ্ত ভাবেতে করে সংসারে ভ্রমণ।
সংসারে আসক্তি তাঁর বিপদ গণন॥

১৬

যে সম্পদ লাভে নর কৃতজ্ঞতা ভরে।
প্রণমে বিনীত ভাবে দয়ালু ঈশ্বরে॥
সে ধনের নাশ কভু,
না করি দয়াল প্রভু,
শতগুণে বৃদ্ধি করি তার সেই ধন।
কৃতজ্ঞতা গুণে দেন অযাচিত ধন॥

১৭

পৃথিবীতে প্রাপ্ত হ'য়ে ধন, মান, জন।
হও যদি গর্ব্বে স্ফীত তুমি কদাচন॥
নিশার স্বপন প্রায়,
যাবে তাহা জেনো হায়;
রবে নাক চিহ্ন তার অনু পরিমাণ।
দলিত হইবে ভবে ধূলির সমান॥

রেওয়া গ্রাম
বথরা পোঃ অঃ
জেলা মোজফরপুর

ক্রমশঃ
শ্রীমতী রা—

সংবাদ।

ছোট নাগপুর প্রদেশের নানা স্থানে দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর প্রকোপ। রাঁচি জেলায় ভাবী শস্যোৎপত্তির আশায় গবর্ণমেণ্ট বীজের জন্য সাড়ে তিন লক্ষ টাকা কৃষকদিগকে ধার স্বরূপ দিয়াছেন। অনেক ডিপুটী ও সব ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট দুর্ভিক্ষের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

ছোট নাগপুর প্রদেশ বঙ্গদেশ অপেক্ষা অনেক উচ্চ, উহা পার্ব্বত্যভূমি। এখানকার জমীতে ফসল ভাল হয় না, ভূমি কঠিন ও কঙ্করময়। সম্প্রতি আমরা রাঁচিতে আসিয়া মাঠে বেড়াইতে যাইয়া দেখি একজন কোল পুরুষ চাষ আবাদ করিবার জন্য কোদালি দ্বারা মাটী কাটিতেছে, তাহার স্ত্রী কলসী পূরিয়া জল আনিয়া জল ঢা'লিয়া সেই মাটীকে কর্দ্দমে পরিণত করিতেছে। এদেশের স্ত্রীলোকেরা ২।৪ পয়সা উপার্জ্জনের জন্য প্রত্যহ যেরূপ গলদঘর্ম্ম ক'রে পরিশ্রম করে এরূপ কোথাও দেখা যায় না। সমস্ত দিন পেটের জন্য ভয়ানক গরমের মধ্যে অবিশ্রান্ত খাটিয়া রাত্রিতে দল বাঁধিয়া নৃত্য করে। এক এক দিন নৃত্য গীতে রাত্রি ভোর করিয়া থাকে। লাট সাহেব আসুন, যে কোন বড় লোক আসুন না কেন, কোল মেয়েদের নাচ না দেখিয়া যান না।

আগামী আষাঢ় মাসে মহিলার ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইবে। গ্রাহকগ্রাহিকাদিগের নিকটে সানুনয়ে নিবেদন যে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে ইহার বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত ফ্রেজার সাহেবের কার্য্যকাল আগামী নবেম্বর মাসে নিঃশেষ হইবে। বড়লাট সভার অন্যতর সদস্য মাননীয় বেকার সাহেবের তৎপদে নিয়োগ হইবার কথা।

এবার বৃষ্টির অভাবে চারিদিকে হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। গ্রীষ্মাতিশয্যে লোকের আহারে রুচি ছিল না, সুনিদ্রা হইত না, ক্রমাগত লোকে ছটফট করিয়া দিবারাত্রি যাপন করিত। বিধাতার কৃপায় ১লা আষাঢ় হইতে রীতিমত বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে, ধরাপৃষ্ঠ শীতল হইয়াছে, মানুষের দেহ জুড়াইয়াছে।

ইহা সময়ের শুভচিহ্ন যে কোনও কোনও স্থানের মোসলমানগণ স্ত্রীশিক্ষা দানে উদ্যোগী হইয়াছেন।

দেবদাসী—ভারতের কোনও কোনও স্থানে হিন্দুরা আপন কন্যাকে কোন দেবালয়ে সেবাদাসী অথবা দেবদাসী রূপে চিরজীবনের তরে সমর্পণ করিয়া থাকেন। দেবালয়ের দেবতার সঙ্গে তাহাদের বিবাহ দেওয়া হয়; তাহারা চিরজীবন সেই দেবতার সেবাতে নিযুক্ত থাকে। জ্ঞান চৈতন্য বিশিষ্ট মানুষ মৃত্তিকা, কাষ্ঠ কিম্বা প্রস্তর নির্ম্মিত দেবতার প্রেমে কিরূপে তৃপ্ত থাকিতে পারে? তাহা তো সম্ভব নয়। সেই সকল নারী বয়োবৃদ্ধি সহকারে দেবালয়ের পূজক কিম্বা অন্য কোন লোকের কুহকে পড়িয়া আপনার জীবনকে কলঙ্কিত করে; এবং কত লোককে পাপ পথে আকর্ষণ করিয়া থাকে। বোম্বাই অঞ্চলের কোনও কোনও সমাজসংস্কারক এই কদাচার নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সাহায্য চাহিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের আবেদনের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদের জন্য সাধারণের সাহায্যে অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সম্প্রতি ভূপালের বেগম তাঁর রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে কঠোর আইন প্রচার করিয়াছেন, যে অচীরকাল মধ্যে সমুদায় দেবদাসীকে বিবাহ দিতে হইবে। দেশের রাজা মহারাজারা চেষ্টা করিলে কত কুপ্রথা কদাচার অনায়াসে নিবারণ করিতে পারেন।

ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়।

স্বার্থপরতা, জাতিগত ও ব্যক্তিগত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ইংরাজদের সহিত যে সময় বুয়ারদের যুদ্ধ হয়, সে সময় কত শত ইংরাজ সৈন্য মারা গিয়াছিল। বড় বড় লোক, লর্ড দের মধ্যে ও কত জন সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। সে সময়ে মহারাণীর প্রাণ কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিল, তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার নহে। কিন্তু তিনি কিছুই বলেন নাই, তিনি ইহা কি জানিতেন না যে বুয়ারেরা নির্দ্দোষী। তাহাদের স্বাধীনতার উপর ইংরাজদের হস্তক্ষেপ, ইহাতে যে মহারাণীর মত ছিল তাহা নহে, কিন্তু তিনি কি করিবেন সমস্ত জাতির মঙ্গলের জন্য সকলে যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই হইবে, অনিচ্ছা সত্বেও তাহাতে কেহ অস্বিকার করিতে পারিবে না। যাহা ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিবেন জাতীয় গৌরবের জন্য প্রিয় বস্তুও বলিদান দিতে হইবে। গান্ধারীর নিকট যখন দুর্য্যোধন আশির্ব্বাদ লইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাইবার জন্য আসিলেন, সে সময় গান্ধারী বলিয়াছিলেন "পাণ্ডবের জয় হউক"। কই তিনি তো আপন পুত্রদের মঙ্গল সূচক আশির্ব্বাদ করিলেন না। তিনি জানিতেন যে যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয়। সেই জন্যই তিনি পাণ্ডবদের জয় হউক একথা বলিয়াছিলেন। মহারাণীও জানিতেন যে বুয়ারদের জয় হইবে, কিন্তু তিনি গান্ধারীর ন্যায় মুখ ফুটিয়া কিছুই বলেন নাই। মহারাণীর যদি গান্ধারীর ন্যায় জোড় থাকিত তাহা হইলে তিনিও বলিতেন-বুয়ারদের জয় হউক। তাঁহার সেরূপ জোড় ছিল না বলিয়াই তিনি সে কথা বলিতে পারেন নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে তাঁহার মন প্রাণ ভগ্ন হইয়াছিল, এমন কি অনেকে নির্দ্দেশ করেন সেই কারনেই তিনি এত শীঘ্র দেহত্যাগ করিলেন। মনের দুঃখ মনেই চাপিয়াছিলেন, একটী কথাও বলেন নাই। কেন বলেন নাই? তাঁহার মনে জোড় ছিলনা বলিয়া। জোড় থাকিলে তিনিও গান্ধারীর ন্যায় বলিতেন যে খানে ধর্ম্ম সেই খানেরই জয় হইবে। তা হলেই ইহা দেখা যাচ্ছে যে তাঁহারা স্নেহ ভালবাসা বিসর্জ্জন কোরেছেন সমুদায় জাতির জন্য। ধর্ম্মের জন্য স্নেহ ভালবাসা বিসর্জ্জন দে'য়া ইহা কি বাস্তবিকই গৌরবের বিষয় নহে। আমাদের ভালবাসা বা স্বার্থও সেই রূপ ব্যক্তিগত না হইয়া জাতিগত হওয়া উচিত। আমরা যাহা কিছু করিব সমুদয় জাতির জন্য।

মাসিক পত্রিকা

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"
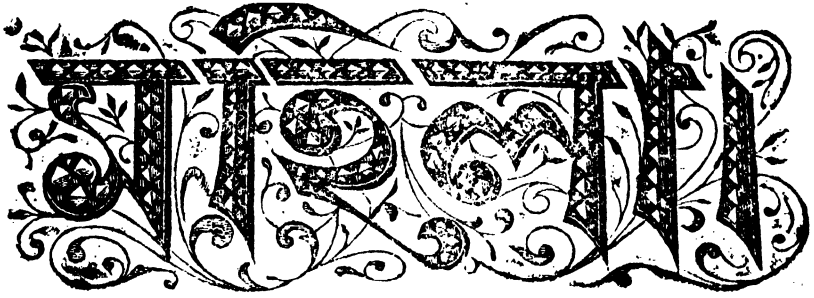
১৩শ ভাগ] আষাঢ় ১৩১৫ ; জুলাই ১৯০৮। [১২শ সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

পল্লীগ্রামে হিন্দু ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়া দেখিতে পাই, বাড়ীর এক পার্শ্বে ঠাকুরঘর বিদ্যমান। বাড়ীর লোকেরা ঠাকুরঘরকে ও ঠাকুর সেবা সম্বন্ধীয় দ্রব্যজাতকে অতিশয় পবিত্র বলিয়া সম্মান করে। গৃহিণী প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্নাতপূত হইয়া ঠাকুর ঘরে ঝাঁট দেন, পূজার বাসন পত্রাদি প্রক্ষালন করেন, ধূপ দীপ নৈবিদ্যাদি পূজোপকরণ যোগাইয়া থাকেন, এবং ভক্তিপূর্ব্বক ঠাকুরকে প্রণাম করেন। তুমি তাঁহার এ কার্য্যকে অসার কুসংস্কার বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতে পার না। ইহা দেখিয়া বালক বালিকার মনে কত পবিত্র ভাবের উদয় হয়। তাহারা কত ভক্তি বিনয় শিক্ষা করে। হস্তনির্ম্মিত পুতুল পূজা করিতে যদি তোমার ইচ্ছা না হয়, না করিলে, সেই দৃষ্টান্তে সেই বিনয় ভক্তি ও নিষ্ঠা সর্ব্বলোকনাথ চিন্ময় পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে তুমি হৃদয়ে লাভ করিলে তোমার পক্ষে মহা লাভ।

আমরা স্থানে স্থানে ব্রাহ্মপরিবারে যাইয়া দেখি, গৃহের এক পার্শ্বে একটি পূজার ঘর নির্দ্দিষ্ট আছে, সেস্থানে উপাসক উপাসিকাদিগের বসিবার আসনাদি স্থাপিত, ধর্ম্মগ্রন্থ ও সঙ্গীত পুস্তক রক্ষিত। নবপল্লব কুসুমাদিতে গৃহটি সজ্জিত। গৃহিণী কন্যাগণকে লইয়া গৃহটিকে সাজাইয়া থাকেন। প্রত্যহ পরিবারস্থ সকলে মিলিত হইয়া ভক্তিভাবে বন্দনা, প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি করেন, দেখিলে মনে কত আনন্দ ও পবিত্র ভাবের উদয় হয়। আবার এরূপ অনেক পরিবার আছে যাহাতে এ সকল ধর্ম্মনিষ্ঠার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ধর্ম্ম কর্ম্ম উপাসনাদিতে গৃহিণীর সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও ঔদাসিন্য দেখিয়া বড় দুঃখ হয়।

নব্য সভ্যশ্রেণীর অনেক মহিলা পূজা উপাসনাদির কোন ধার ধারেন না, কোন ধর্ম্মে তাঁহাদের আস্থা বিশ্বাস নাই। কেবল বালক বালিকার বিবাহাদিতে সমাজের অনুরোধে ঈশ্বরোপাসনা বা কালীপূজা করেন। তাঁহারা পানভোজন আমোদ প্রমোদেই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন, বড় দুঃখের বিষয়।

কোল কামিনীদিগের নৃত্য।

পৃথিবীর সমস্ত সভ্য ও অসভ্য জাতির মধ্যে পুরাকাল হইতে নৃত্য প্রচলিত। আনন্দে মন প্রমত্ত হইয়া উঠিলে নৃত্য হওয়া স্বাভাবিক। শিশুরা তাহাদের আদরের রাঙ্গা পুতুল বা পাকা আম কিম্বা কোনরূপ মিষ্টান্ন পাইলে আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। কোন কোন শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষ আনন্দ না হইলেও লোকরঞ্জন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করার জন্য নৃত্য করিয়া থাকে। এদেশে কুলটা শ্রেণীর ব্যবসায়িনী নর্ত্তকী আছে, তাহারা ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিবাহাদি আনন্দোৎসবে বা পূজা পার্ব্বণে আহূত হইয়া নৃত্য করে, আমোদপ্রিয় দর্শকপুরুষদিগের তদ্দর্শনে মন সচরাচর বিষাক্ত হয়। এ দেশে ভদ্র পরিবারের কোন পুরুষ বা মহিলাবৃন্দ আমোদ উল্লাসের জন্য কখনও নৃত্য করে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় না। পুরাকালে রাজকন্যাগণ নৃত্য করিতেন, তাহাদিগকে রীতিমত নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হইত, পুরাণাদি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়। অজ্ঞাত বনবাসকালে অর্জ্জুন ছদ্মবেশে বিরাট রাজকন্যাকে নৃত্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, মহাভারত বিরাট পর্ব্বে তাহার উল্লেখ আছে। এক্ষণ কোন প্রসিদ্ধ রাজপরিবারে রাজকুমারীগণ রীতিমত নাচ শিখেন ও নাচিয়া থাকেন বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থানে বিবাহ হইয়া গেলে বরযাত্রীদের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য নববধূ তাঁহাদের সম্মুখে নৃত্য করেন এরূপ আমরা জানি। একদা আমরা ভ্রমণোপলক্ষে কাছাড় জিলার সবডিভিসন হালিয়া কাঁদিতে গিয়াছিলাম। সেখানে শ্রীহট্টনিবাসী একটী বন্ধু কথা প্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিলেন, "কিছুদিন হইল এখানে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে একটি বিবাহ হইয়াছে, বরের নিবাস বিক্রমপুরে, কন্যার পিত্রালয় এই হালিয়াকাঁদিতে, আমি বরযাত্রীরূপে বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলাম। বিবাহের পর নববধূ বরযাত্রীদের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করিয়াছিলেন। বধূর নৃত্য দেখিয়া আমি কিছুতেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। হাসিতে হাসিতে সভা হইতে উঠিয়া পলায়ন করিয়াছিলাম। বরযাত্রীদের সম্মুখে নবোঢ়ার নৃত্য এক কৌতুকজনক ব্যাপার। শ্রীহট্ট নিবাসী ভদ্রলোকদের বাড়ীতে কোন নূতন কুটুম্ব উপস্থিত হইলে পরিবারস্থ মহিলারা হুলুধ্বনি করিয়া গীত গাহিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করেন, সেইরূপ হুলুধ্বনি ও সঙ্গীত সহকারে বিদায়দান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা নাচেন না।

এদেশে প্রাচীনকাল হইতে ধর্ম্মজনিত আনন্দের সঙ্গে নৃত্যের ঘনিষ্ঠ যোগ দেখা যায়। দেবর্ষি নারদ বীণা বাজাইয়া হরিগুণকীর্ত্তনে প্রমত্ত হইয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইয়াছেন, যোগিবর মহাদেব যোগোন্মত্ততার অবস্থায় ডুমুরু বাজাইয়া মহানন্দে তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছেন পুরাণশাস্ত্রে এরূপ বর্ণিত। রাসলীলাতে শ্রীকৃষ্ণকে আবেষ্টন

করিয়া গোপিনীগণ আনন্দে নৃত্য করিয়াছেন। প্রেমোন্মত্ত শ্রীচৈতন্য সদলে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া প্রমত্ত নৃত্যে বঙ্গদেশকে বিকম্পিত করিয়াছিলেন, এক্ষণও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য ভক্ত বৈষ্ণবগণ সঙ্কীর্ত্তনের সময় উদ্দাম নৃত্য করিয়া থাকেন। ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মগণও নাচিয়া সোদ্যমা ভক্তির পরিচয় দান করেন। সচরাচর শাক্ত শ্রেণীর লোক শুষ্ক কঠোর হৃদয়, তাঁহাদেরও অনেকে মহিষ বলি, পাঁটা বলি হইয়া গেলে দেবী প্রসন্না হইয়া বলি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আনন্দে নৃত্য করেন। বলির পশুর কণ্ঠ খড়্গের এক আঘাতে ছিন্ন না হইলে শাক্তগণের এরূপ সংস্কার যে দুর্গাদেবী বা কালীদেবী প্রসন্ন হইয়া বলি গ্রহণ করেন নাই, মহিষ পাঁটা এক কোপে কাটা না গেলে, তাঁহারা পরিবারের অতিশয় অমঙ্গল হয় মনে করেন, এ জন্য বলিদানের পূর্ব্বে ভয়াকুল থাকেন। এরূপ দৃষ্ট হইয়াছে যে, শাক্ত পরিবারে দুর্গোৎসবোপলক্ষে মহিষ বলির উপক্রম, কর্ত্তা সুরেশ্বরীর ভক্ত, তিনি কিঞ্চিৎ সুরারস পান করিয়া আত্মীয় স্বজনসহ প্রতিমার সম্মুখে করজোড়ে ভয়াকুল অন্তরে দণ্ডায়মান হইয়া গীতির ন্যায় সুর করিয়া এই প্রার্থনাটী পড়েন,

"ওগো মা, ওগো মা, লহ বলিদান।
বলি লয়ে সেবকের কর মা কল্যাণ॥"

যাই এক কোপে মহিষ কাটা যায়, তৎক্ষণাৎ কর্ত্তা সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়েন, পরে উঠিয়া মহিষের মুণ্ড নিজ মুণ্ডে ধারণ করিয়া ধেই ধেই করিয়া আনন্দে নৃত্য করেন, পারিষদগণও মহিষের রক্তে সর্ব্বাঙ্গ আরক্তিম করিয়া ভৈরব মূর্ত্তি ধারণে প্রমত্ত ভাবে নাচিতে থাকেন, এবং পরস্পর কোলাকোলি করেন। সকল শাক্ত পরিবারে যে বলিদানের পর এরূপ নৃত্য হয় তাহা নয়, অনেক পরিবারে এপ্রকার নৃত্য হইয়াছে আমরা জানি। শাক্তগণ ভক্ত বৈষ্ণবদিগের ন্যায় কালীনামের গান করিয়া নাচিয়া বেড়ান এরূপ নহে। মোসলমান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত প্রেমিক সুফীগণ ভাবে মত্ত হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করেন এরূপ দেখা গিয়াছে; দেওয়ান হাফেজের গজল গান ও অন্যান্য প্রেমোদ্দীপক সঙ্গীত শ্রবণে তাঁহারা প্রেমে বিহ্বল হইয়া নাচিয়া থাকেন।

ইয়ুরোপেই নৃত্যের মহা ঘটা। ইয়ুরোপীয় স্ত্রী পুরুষ প্রায় সকলেই নাচিতে জানেন, এবং নাচিয়া থাকেন। আনন্দোৎসবাদিতে রাজাও নাচেন, রাণীও নাচেন দুঃখী কাঙ্গালিও নাচেন। রাজপ্রাসাদেও Ball (নাচ) হয়, দরিদ্রের কুটীরেও হয়। ইয়ুরোপীয় জাতি সাধারণতঃ অতিশয় নৃত্যপ্রিয়। সাহেব বিবীরা আমোদের জন্য পরস্পর মিলিত হইয়া নৃত্য করেন, ধর্ম্মোন্মত্ততার জন্য নৃত্য করিয়া থাকেন এরূপ বলা যায় না। তাঁহাদের নৃত্য সুরুচি সঙ্গত আমরা বলিতে পারি না। একটি নারীর পরপুরুষের সঙ্গে নানাভাবে নৃত্য, ইহা আমরা কোনও প্রকারে নীতি সঙ্গত বলিতে পারি না। এইরূপ নৃত্যে কখনও যে মনের স্খলন হয় না কে সাহস করিয়া বলিতে পারে। লক্ষ্ণৌ নগরে

একজন পাদ্রি সাহেব বলের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা Ball দেখিও না, তাহা দেখাও পাপ।" সাহেব বিবীদিগের ক্রমে নানা বিষয়ে অসাধারণ উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু পান, ভোজন, পরিচ্ছদে ও নৃত্যে তাঁহাদের অসভ্যোচিত রুচি ও প্রবৃত্তি পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। ফরাসী সূচীজীবিদিগের হস্তে প্রস্তুত বিবীদিগের কতকগুলি বিলাস পরিচ্ছদ কি কুৎসিত ও লজ্জাজনক, তাহাই তাহাদের অতিশয় আদরের পোষাক। তাঁহাদের নৃত্য অপেক্ষা অসভ্য কোন সাঁওতাল খসিয়া গারো প্রভৃতির নৃত্য যে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ তাহা বলা বাহুল্য।

কোল সাঁওতাল গারো খসিয়া অসভ্য লোকেরা সর্ব্বদা নৃত্য করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা অসভ্য হইলেও তাহাদের নৃত্য কোনরূপ অসভ্যতাব্যঞ্জক নহে, বরং সভ্য জনোচিত সুরুচিজনক তাহাদিগের নৃত্য। তাহারা স্ত্রী পুরুষে পরস্পর একত্র মিলিত হইয়া নাচে না। এক পুরুষ অন্য পুরুষের হস্তধারণ করিয়া নৃত্য করে, নারীগণ পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া নাচিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার বীভৎস নৃত্য নাই। কোল কামিনীদিগের নৃত্যের বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা প্রবন্ধের মুখবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ করিয়া তুলিলাম। এক্ষণ মূল বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে।

ছোট নাগপুর প্রদেশের অন্তর্গত রাঁচি ও চাইবাসা জিলাতে কোল জাতির বসতি। ইহারা ঘোরতর কৃষ্ণাঙ্গ খর্ব্বকায় আদিম অসভ্য জাতি। কিন্তু নিরীহ প্রকৃতি প্রফুল্লচিত্ত আমোদপ্রিয়। তাহাদের নিত্য নৃত্যই আমোদপ্রিয়তা ও প্রফুল্লতার পরিচায়ক। কোল কামিনীগণই নৃত্য ক্রিয়ায় অতিশয় নিপুণা। তাহারা দিবাভাগে জীবিকার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে, সায়ংকালে একস্থানে দলবদ্ধ হইয়া নানা প্রণালীতে নৃত্য করিয়া থাকে। কোন কোন দিন তাঁহাদের নৃত্য গীত বাদ্যে রাত্রি ভোর হইয়া যায়। ইহাদের ন্যায় নৃত্যপ্রিয় ও আমোদপ্রিয় পৃথিবীতে অন্য কোন জাতি আছে কি না সন্দেহ। ইহারা প্রায় সকলেই দীন দরিদ্র, কোল মেয়েরা ২।৩ ক্রোশ পথ দূর হইতে বড় বড় কাঠের মোট মস্তকে বহন করিয়া প্রত্যহ হাটে বাজারে বা পল্লীতে পল্লীতে যাইয়া বিক্রয় করে, কাঠ বা ঘাস কিংবা লাউ তরকারি বিক্রয়ে যে দুই তিন আনা পয়সা প্রাপ্ত হয় তাহাদ্বারা দৈনিক আহারের সংস্থান করে। অনেকে নিজের শিশুসন্তানকে পিঠবুচ্‌কীর মত কাপড়ে জড়াইয়া পিঠে বাঁধিয়া দুই মণ আড়াই মণ কাঠের মোট মাথায় বহন করিয়া তাহা বিক্রয়ের জন্য দূরতর বাজার ও পল্লীতে চলিয়া যায়, সায়ংকালে গৃহে ফিরিয়া যাইয়া আহার করে। ভাত ও যৎসামান্য উপকরণই তাহাদের প্রাত্যহিক খাদ্য, প্রথমে ভাতের ফেণ পান করিয়া থাকে, পরে লবণ সংযোগে ভাত খায়, সর্ব্বশেষ শাক তরকারি বা মাছ মাংস কিছু মুখে অর্পণ করিয়া আহার শেষ করে। তৎপর

নৃত্যে প্রবৃত্ত হয়। হাড়িয়া নামক এক প্রকার ধেনো মদ পান করে নৃত্যাবসানে শালপাতার ডোঙ্গায় করিয়া হাড়িয়া পান করে। রাঁচি নগরে লাটসাহেব আসুন বা অন্য কোন বড়লোক আসুন সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কোল কামিনীদের নৃত্য দর্শন করেন।

স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে সম্প্রতি আমরা কিয়ৎকাল রাঁচিতে স্থিতি করিয়াছিলাম। শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সপরিবারে এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রদ্ধাস্পদ যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রাঁচিতে বাস করিতেছিলেন। একদিন অপরাহ্ণে তাঁহাদের আবাসগৃহের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে কোল কামিণীদিগের নৃত্য হইয়াছিল। আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে গিয়াছিলাম। ঠাকুর বাবুদের অনেক আত্মীয় পুরুষ ও মহিলা নিমন্ত্রণ পাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে নিমন্ত্রিত সকলের জন্য জলযোগের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। নাচিবার জন্য পঞ্চাশ জন কোল স্ত্রী ও পুরুষ সমবেত হইয়াছিল। কোলেরা নাচিবার ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ পতাকা স্থাপন করিয়াছিল। প্রথমতঃ কতিপয় কোল পুরুষ তরুর তরুণ শাখা এক একটি হস্তেধারণ করিয়া শ্রেণীবদ্ধরূপে মাদল বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করে। পরে মেয়ের দল আসিয়া সম্মিলিত হয়, তাহাদের অনেকের কবরীর উপর বক পক্ষীর সাদা পালকে প্রস্তুত টোপর-বিশেষ শোভা পাইতেছিল। কিন্তু কাহারও পরিধানে ভাল পরিচ্ছদ ছিল না। শুনা গিয়াছে ভাদ্রমাসে করম পর্ব্ব নামক পর্ব্ববিশেষে কোলদিগের মহা নৃত্য হয়। তখন মেয়েরা সকলে একবিধ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া নৃত্য করে। যাহা হউক উক্ত ঠাকুরবাড়ীতে কোল কামিণীগণ সমবেত হইয়া সকলে পরস্পরের গলা ধরিয়া নৃত্য করিতে থাকে। একজন স্ত্রী বাম বাহুযোগে পার্শ্বস্থ অপর জনের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে কোমর চাপিয়া ধরে, এইরূপ চল্লিশ পঞ্চাশ জনে পরস্পরের পার্শ্বসংলগ্ন হইয়া মাদলের তালে তালে পদস্থাপনপূর্ব্বক একটী সচল শৃঙ্খলের ন্যায় বাম হইতে দক্ষিণে, দক্ষিণ হইতে বামে নাচিয়া বেড়ায়। তাহাদের তুল্য রূপে দ্রুতপাদবিক্ষেপ চমৎকার দৃশ্য। তাহাদিগের নৃত্য দেখিলে মনে হয় যেন সেনাবৃন্দের প্যারেড হইতেছে। করম, খরিয়া, জদ্রা, ঝুমের প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর নৃত্য প্রধান। করম শ্রেণীর নৃত্যে পুরুষেরা মাদল বাজাইয়া থাকে। ঢোলক বা পাখওয়াজের ন্যায় মাদলের আকৃতি। খরিয়া নৃত্যে বাদ্য হয় না, কেবল গান হয়। সমস্ত স্ত্রী পুরুষ সমস্বরে সমতানে গান করে, জদ্রা নৃত্যে গান বাদ্য দুই হয়। ঝুমেরের সঙ্গে কেবল বাদ্যের যোগ হইয়া থাকে। কোল ভাষা আমাদের অবোধ্য নতুবা তাহাদের দুই একটি গান এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইত। সচরাচর প্রত্যহ সায়ংকালে রাত্রি ১১টা ১২টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত কোলকামিণীদের নৃত্য হয়, কোন কোন দিন সোদ্যম নৃত্যে রাত্রি প্রভাত হইয়া যায়। ইহারা নৃত্যে সমস্ত

জাতিকে পরাস্ত করিয়াছে। ইহাদের বিশেষ বিশেষ নৃত্যে ধান্য কর্ত্তন, ধানের চারা রোপণ ও বীজ বপনের ভাব প্রকাশ পায়।

কেশবজননী সাধ্বী সারদাদেবী।

২৬৮ পৃষ্ঠার পর।

(ধর্ম্মমত)

এই পর্য্যন্ত বাড়ীর ছেলেদের কোন খবর না পাইয়া বড় কষ্ট এবং ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু সেই দিনই চিঠি পাইলাম। রথ-যাত্রার জন্য আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আমরা রথের পরদিন, রথের দড়ি ধরিলাম। রথের দড়ি মাথায় দিয়া যাত্রীদের রাস্তার উপর শুইতে হয়। আমরাও অল্পক্ষণের জন্য শুইলাম। আমি মনে করিলাম আমার অতি পুণ্য হইল। কিন্তু এখন হইলে ঠিক সে রকম ভাবিতাম না। তখন একটু ছেলেমী ছিল। এখনও আমি তীর্থ করি, কিন্তু ঠিক পুণ্য হইবে বলিয়া করি না। তীর্থ দেখা ভাল কাজ বেশ বুঝি। আমি এখন ভালবাসার উপর তীর্থ দর্শন করি। যেমন ছেলেপুলে এবং আপনার লোকদের ভালবাসি, সেইরূপ তীর্থ ব্রত ইত্যাদি বাহিরের কর্ম্ম হইলেও আমি ভালবাসি। কিন্তু এই সব করিলেই যে আমার পরিত্রাণ হইবে তাহা আমি বিশ্বাস করি না। মন ঠিক এবং খাঁটি না করিতে পারিলে মানুষের পরিত্রাণ হয় না। পরিত্রাণের জন্য জীবন ভাল চাই। আরও বলি, আমি দশ বৎসর বয়সে এই বাড়ীতে আসিয়াছি, এবং এগার বৎসর হইতে ঘর করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এই এগার বৎসরেই আমি হরিনামের মালা গ্রহণ করি। সেই পর্য্যন্ত এই বাড়ীতে কখনও খারাপ কাজ দেখি নাই, সর্ব্বদাই সৎকর্ম্মে লিপ্ত থাকিতাম। ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম ধর্ম্ম একটা বাই হইল, তাহা হইতে শেষে তীর্থ দর্শনের একটা খুব ইচ্ছা দাঁড়াইল। আমি এখনও নিজে নানারূপ পূজা করি কিন্তু সমস্তই এই ভাব হইতে। আমার প্রাণের বিশ্বাস এই যে এক ঈশ্বর এবং তাঁহার উপাসনা ভিন্ন আমার মুক্তি নাই। মানুষ যে সাকার উপাসনার দ্বারা মুক্তি পায় না, এই কথা আমি ঠিক বলিতে পারি না। নিরাকারের দ্বারা মানুষের মুক্তি হয় ইহা আমি জানি এবং আমার নিজের মুক্তি ও নিরাকারের উপর নির্ভর করিতেছে। আমি যে মুক্তি পাব এই আশা করি না; শুধু তাঁর পাদ-পদ্মে থাকিব এই মাত্র ইচ্ছা। পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধেও আমার এই মত, পুনর্জ্জন্ম যে লোকের হয় তাহা আমি বলিতে পারি না। আর আমি সে বিষয় ভাবিও না। মরণের ভাবনাও আমি ভাবি না, তাঁর হাতে যদি পড়ি, তিনি যেখানে নিবেন্ সেখানেই যাইব, নরকেই নিন্ আর স্বর্গেই নিন্। সেইদিন নব রাত্রির সময় কেহ কেহ বলিতেছিলেন "যে তিনি এইরূপ সুন্দর প্রার্থনা করেন আবার এদিকে এই সব করেন কেন?" ইহার কারণ উপরে যাহা বলিলাম, তাহাতেই প্রকাশ পাইবে।

হারা পঞ্চমীর পরদিন আমরা শ্রীক্ষেত্র হইতে পুনরায় বাড়ীর দিকে রওনা হই-

লাম। কটক পর্য্যন্ত আসিয়া আমার খুড় শাশুড়ীর শক্ত ব্যামু হইল। সেইজন্য কটকে তিন দিন আমাদের থাকিতে হয়। তিন দিন পরে কটক হইতে বাহির হইলাম। কুড়ি দিন পরে কালীঘাটে আসিয়া পৌছিলাম। বাড়ীতে ইতিপূর্ব্বে উলুবেড়ে হইতে লোক পাঠাইয়া দিয়া বলিয়াছিলাম যেন কালীঘাটে আমার ছেলেদের আনিয়া রাখা হয়, আমি যাইয়াই যেন দেখিতে পাই। আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যদি ছেলেদের কাহাকেও কালীঘাটে না পাই তবে বাড়ী আর ফিরে যাইব না। যতক্ষণ না তাহাদের দেখিব ততক্ষণ কালীঘাটেই পড়িয়া থাকিব। কালীঘাটে পৌছিয়াই দেখি নবীন, কেশব, কৃষ্ণবিহারী, আর হারু (আমার দেবর মুরলীধর) দাঁড়াইয়া আছে। দেখে যে আমার কি আহ্লাদ হইল বলিতে পারি না। কৃষ্ণবিহারী আমায় দেখিয়াই কোলে আসিয়া উঠিল, কাপড় ধরিয়া রহিল। অন্যান্য সকলে দেখা করিয়াই চলিয়া আসিল, কৃষ্ণবিহারী আসিল না। বলিল "মার কাছ থেকে আমি আর যাইব না।" আমার খুড় শাশুড়ী বলিলেন "তোর মাকে আবার ধরিয়া লইয়া যাইব।" কৃষ্ণবিহারী বলিল, "আর ছাড়িয়া দিলে ত।" আমাকে পেয়ে যেন বর্ত্তে গেল। তখন তাহার বয়স ৪।৫ বৎসরের হইবে। আমি কালীঘাটে পূজা দিয়া খাওয়া দাওয়া করে বিকালে বাড়ী এলাম।

৮ই নবেম্বর ১৮৫০।

শ্রীক্ষেত্রে যাইবার ছয়মাস পূর্ব্বে আমি গঙ্গাসাগরে যাই। একদিন দুপুর বেলায় আমরা খাইতে বসিয়াছি, সেই সময় আমার মা আমার বাপের বাড়ী গৌরিভা হইতে গঙ্গাসাগর যাত্রা করিবেন বলিয়া আমাকে দেখিতে আমাদের বাড়ী আসিলেন। তিনি গঙ্গাসাগর যাইবেন শুনিয়া আমিও তাঁহার সঙ্গে যাইব স্থির করিলাম। সকলে নিষেধ করিতে লাগিলেন। আমি শুনিলাম না। পাছে আমার ভাশুর যাইতে না দেন এই ভয়ে তাঁহাকে জানাইব না মনে করিলাম।

চুপি চুপি আমার পায়ের মল বিক্রী করিলাম, শেষে কিন্তু তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি প্রথম বারণ করিলেন, শেষে যখন দেখিলেন যে আমি নিতান্তই যাইব স্থির করিয়াছি তখন নবীনকে ডাকিয়া বলিলেন "যদি তোর মা নিশ্চয়ই যান তবে সঙ্গে দরোয়ান এবং লোক জন দিস্, যেন একলা না যান।" আমি শুধু একজন দরোয়ান ও খানসামাকে সঙ্গে লইলাম, এবং কোলের কৃষ্ণবিহারীকে লইয়া মার সঙ্গে যাত্রা করিলাম। রাস্তায় কৃষ্ণবিহারীর জন্য দুধ পাইতাম না, পাণে কিম্বা শালপাতায় করিয়া চাট্টি ভাত দিতাম। দুটী দুটী করিয়া তাই খাইত, এই রকমে প্রথমে কৃষ্ণবিহারী ভাত খাইতে শেখে। আমরা উলুবেড়ে পঁহুছিয়া সকলে কূলে উঠিলাম। শুধু কৃষ্ণবিহারী আর একটী বামুনের মেয়ের কোলের খুকী নৌকায় খেলা করিতেছিল। এমন সময় একখান জাহাজের ঢেউ লাগিয়া নৌকার মুখ ভাঙ্গিয়া গেল, নৌকায় হুহু করিয়া জল উঠিতে লাগিল।

নৌকা ডুবু ডুবু হইল। আমি কাঁদিতে লাগিলাম, মনে করিলাম বুঝি ছেলেটীকে হারাইলাম। মাঝিরা জলে সাঁতার দিয়া নৌকা কূলে টানিয়া আনিল এবং কৃষ্ণবিহারী ও সেই খুকীকে আনিয়া আমাদের কোলে দিল। চারি দিন পরে সাগর পৌঁছাই, তিন দিন সেখানে ছিলাম, পরে বাড়ী আসিলাম।

আমি শ্রাবণ মাসে শ্রীক্ষেত্র হইতে আসিলাম, তিন মাস পরে সেজ মেয়ে চুণীর বিবাহ স্থির হয়। আমি শ্রীক্ষেত্রে যাইবার পূর্ব্বে,বিধবা হইবার পরে, আমার মেজ মেয়ে ফুলেশ্বরীকে বিয়ে দিই। আমার স্বামীর জীবিতাবস্থায় আমার বড় মেয়ে ব্রজেশ্বরীর বিবাহ হয়। সেই সম্বন্ধ আর আমার ভাশুরের বড় মেয়ে রাজেশ্বরীর (বেহারী গুপ্তের মার) সম্বন্ধ আমার শ্বশুর করিয়া গিয়াছিলেন। জুরুণী ও পত্তর হওয়ার পর আমার শ্বশুরের মৃত্যু হয়। তারি জন্য এক বৎসর পরে এই বিবাহ হয়। এই জুরুণী পত্তর ও বিবাহ আমার জীবনের একমাত্র সুখের দিন। খুব ঘটা করিয়া এই দুই বিবাহ দেওয়া হয়। কাঁচড়াপাড়া নিবাসী শ্রীখণ্ডের বৈদ্য কুলীন প্রধান রায়ের দুর্য্যোদাসের সন্তান লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদারের সঙ্গে আমার প্রথমা কন্যার বিবাহ হয়। তখন পাত্রের বয়স তের এবং কন্যার বয়স দশ বৎসর। এই বিবাহের জুরুণী পত্তরের পর আমার শ্বশুর জামাইএর কুলের জন্য আহ্লাদ করিয়া আমার ননদ বিন্দুকে ডাকিয়া বলিলেন "এবার আমার দরজায় হাতী বাঁধা হলো।" এই জামাইকে লইয়া আমার স্বামী বড়ই আহ্লাদ করিতেন। এমন কি নিজের কাছে রাত্রে লইয়া শুইতেন। আমি তাঁহাকে নিজের ছেলের মত মানুষ করিয়াছি। স্নান করাইয়া দিতাম, গা মুছাইয়া দিতাম এবং মাছ বাছিয়া খাওয়াইয়া দিতাম।

আমার স্বামীর মৃত্যুর ২।৩ বৎসর পরে আমার মেজ মেয়ে ফুলেশ্বরীর বিবাহ হয়। কাঁচড়াপাড়ার কুলীন আনন্দচন্দ্র গুপ্ত আমার মেজ জামাই। বিবাহের সময় ফুলেশ্বরীর বয়স নয় এবং আনন্দের বয়স ১৭ বৎসর ছিল। এই বিবাহের সময় আমার শাশুড়ী জীবিত ছিলেন।

১০ই নবেম্বর ১৮৫৩।

ফুলেশ্বরীর বিবাহের এক বৎসর পরে আমার শাশুড়ীর মৃত্যু হয়। তার এক বৎসর পরই আমার প্রিয়তমা ননদ বিন্দুর মৃত্যু হয়। আমি তাঁহাকে যেমন ভাল বাসিতাম তিনিও আমাকে সেই রকম ভাল বাসিতেন। তাঁহার যাওয়ার সময় আমার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। তাঁহাকে আমি বলিলাম "তুমি চল্লে, আমি কি করিয়া থাকিব? আমি যে কিছুই জানি না।" তিনি বল্লেন, "আমি কি করিব, আমায় নিয়া যাইতেছেন, ইচ্ছা ছিল আরও কিছু দিন থাকিয়া তোমার সংসার গুছাইয়া দিই, তোমার সংসার তুমি গুছিয়ে করো।" বিন্দুর ও শাশুড়ীর শোকের কিছুদিন পূর্ব্বে, আমার স্বামীর মৃত্যুর দুই বৎসর পরে, আমার বড় মেয়ে ব্রজেশ্বরীর মৃত্যু হয়। এই মেয়ে অতি

ভাল ছিল, তেমি গুণ ছিল, মুখে কথাটী ছিল না। এত ভাল ছিল যে ভাত এক দিকে বিড়ালে পেলেও কিছু বলিত না। আমরা যদি কিছু বলিতাম তাহা হইলে বলিতেন "আমি খাব ও খাবে না? খেলেই বা।" স্বামীর শোক সাম্‌লাইতে না সাম্‌লাইতে আমার প্রিয়তমা কন্যাটী যায়, আমি একেবারে অধৈর্য্য হইয়া গেলাম। ঘরে প্রবেশ করিতাম না, বারণ্ডায় পড়িয়া থাকিতাম। আমার সেই মেয়ে বাঁধাকপি খেতে চেয়ে ছিলেন। সেই পর্য্যন্ত আমি তাহা ত্যাগ করিয়াছি। যোগীন, আমার এত কষ্ট হচ্ছে যে ইচ্ছা হয় এই সব বল্‌ছি আর তোমার সম্মুখে এখুনি কাঁদি। স্বামী ও কন্যার ভীষণ শোকের পর শাশুড়ী আমার বড় ছেলে নবীনের বিবাহ স্থির করিলেন। আমার বড় ছেলে নবীনের, আমার ভাশুরের বড় ছেলে যদুনাথের এবং ছোট দেওর মুরলীধরের বিবাহ এক সঙ্গেই হয়। আমি বলিলাম, "আমি এখন উঠিতে পর্য্যন্ত অক্ষম, আমার ছেলের বিবাহ এখন থাক্"। আমার কথা কিন্তু শুনিলেন না, বিবাহ দিলেন। এই তিন বিবাহে অত্যন্ত ঘটা হইয়াছিল। গৌরিভা গ্রামে বিবাহ হয়। পাঁচ ছয় গ্রাম তত্ত্ব বিলান হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে এত রাজা ও বড় লোক গৌরিভায় গিয়াছিলেন যে, গঙ্গার অনেক দূর পর্য্যন্ত বোট এবং বজ্‌রায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। কাঁচড়াপাড়া হইতেই তিন বৌ আনা হইয়াছিল। তিন জনই এক ঘরের (দুর্য্যোধনের) মেয়ে। প্রথম দিন দেবরের, দ্বিতীয় দিন দুই ছেলের বিবাহ হয়। ছেলেরা বিবাহ করিয়া বৌ লইয়া ঘরে আসিলে তখন অনেক টাকা সিকি দুয়ানি ও পয়সা ছড়ান হইয়াছিল। এক মাস পর্য্যন্ত যগ্যি হইয়াছিল। বিয়ের পর দিন শুধু মেয়ে কুটুম্বরা নবীনকে ও বৌকে যে টাকা দিয়াছিল তাহা ১০০০ হাজার টাকারও অধিক হইয়াছিল। এই রকম তিন জনেরই হইয়াছিল। ফাল্গুন মাসে এই বিয়ে হয়, আর সেই কার্ত্তিকে আমার শাশুড়ীর মৃত্যু হয়। তিনি রক্তামাশয়ে মারা যান। আমার ছেলে যখন বিয়ে করিয়া বৌ লইয়া ঘরে আসিলেন তখন শাশুড়ী বৌকে আমার কোলে দিয়া বলিলেন, "তুমি যেই মেয়ের জন্য শোক করিতেছ এই সেই মেয়ে। ইহাকে সেই মেয়ের মতন দেখিয়া সব দুঃখ ভুলিয়া যাও।" আমি কোলে লইলাম, কিন্তু কাঁদিয়া বলিলাম, কৈ ব্রজেশ্বরীর শোকত ভুলিতে পারিলাম না। আমার শাশুড়ী ননদের মৃত্যুর পর আমি তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইলাম। সাগর ও শ্রীক্ষেত্রের কথা বলিয়াছি। শ্রীক্ষেত্র হইতে আসিয়া আমার সেজ মেয়ে চুণীর বিবাহ দিই।

সরলাসুন্দরী কাস্তগির।

সাধ্বী মুক্তকেশী দেবীর শেষ জীবন।

সাধ্বী মুক্তকেশী দেবী লাহিরিয়াসরাইস্থ শ্রদ্ধাস্পদ ভাই দীননাথ মজুমদার মহাশয়ের প্রিয়তমা ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। তিনি

বিগত ১লা আষাঢ় অমরধামে যাত্রা করিয়াছেন। মুক্তকেশী দেবী সুপত্নী সুমাতা ও সুগৃহিণী এবং অতিশয় ধর্ম্মানুরাগিণী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তাঁহাকে আদর্শ ব্রাহ্মিকা মহিলা বলা যায়। সময়ে তাঁহার পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত মহিলার পাঠিকাদিগকে উপহার দিতে পারিব, আমরা এরূপ আশা করি। এবার তাঁহার ভক্তিভাজন স্বামী তাঁহার শেষ জীবনের বৃত্তান্ত আমাদিগকে যাহা লিখিয়া জানাইয়াছেন, তাঁহার পত্র হইতে উহা এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;—

"দুর্ব্বিষহ জ্বালা ও যন্ত্রণা তিন সপ্তাহ যাবৎ আশ্চর্য্য ধৈর্য্যের সহিত বহন করিয়া গৃহিণী সাধ্বী মুক্তকেশী দেবী নিরন্তর হরিনাম ব্রহ্মনাম মা নাম করিতে করিতে ইহলোকেই স্বর্গের সাধু সাধ্বী, মহাজন, স্বর্গগত সন্তানগণ ও দেবদলকে লইয়া অমরধামে, স্বর্গধামে, আনন্দধামে, শান্তিধামে চলিয়া গেলেন। গত ১লা আষাঢ় ১৫ই জুন, সোমবার কৃষ্ণ প্রতিপদ অপরাহ্ণ ৬টা ১৫ মিনিটের সময় হরিধ্বনির মধ্যে মাতৃকোলে চলিয়া গেলেন। দুইদিন বলিলেন, 'জর্দ্দনের জলে নাওয়াও। কোন্ জলে নাওয়াচ্ছ? 'জর্দ্দনের জল ঢালিয়া দাও।' আমি বলিলাম, জর্দ্দনের জল না হইলে তুমি কি ঈশার ন্যায় সহিষ্ণুতার সহিত এই রোগের বিষম জ্বালা ও যাতনা বহন করিতে পারিতেছ? এই যে ঈশা তোমার মস্তকে জর্দ্দনের জল ঢালিতেছেন। প্রতিদিন কত সঙ্গীতের পদ আবৃত্তি করিতেন। —১। 'এই ত—জীবন।' ২। 'অনন্তের টানে ধায় প্রাণনদী অনন্তের পানে'। ৩। 'হরিবল হরি চল যাই বাড়ী'। ৪। 'নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে'। ৫। 'হরি হরি বলে স্বধামে যাই চলে'। ৬। 'আমি ত বাড়ীতে নেই, আমি পরলোকে র'য়েছি'। ৭। দেখসে ওরে কেমন করে পাপী তরে ভব সাগরে'। ৮। 'দিন যায় বয়ে রে তোর সময় যায় বয়ে'। ৯। কেমন করে করিবল সত্যের সাধনা'। ১০। নামের মালা গলায় দিয়ে'। ১১। 'ডাক তাঁরে পিতা বলে চরণ ধরিয়ে'। ১২। 'মায়ের কোলে শুয়ে'। এই রূপ রোজ কত গান করিতেন। কত কথা বলিতেন ও শুনিতে চাহিতেন। জননীর সঙ্গে কত সময় কথা বলিতেন। শেষদিনের চার পাঁচ দিন পূর্ব্বে একদিন মনে হ'লো চলে যাবেন। সকলকে ডেকে বলে কয়ে বিদায় লইলেন। বৌ, ঝিদের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন 'ধর্ম্মই চিরসঙ্গী। সকলের ধর্ম্মে মতি হউক। দোষ করলেও কারও মনে কষ্ট দিও না।' সকল সন্তানদের উদ্দেশে মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। একদিন স্বর্গের মৃদুহাস্যমুখে জানালার দিকে চেয়ে আঙ্গুল নেড়ে ডাকছেন, আর বলছেন, 'দেখ দেখ কে? ভুপেন' আর একদিন ঐরূপ হাসিমুখে ডেকে বলছেন, 'দেখ কে? প্রিয়!' দুইবার চুম্বন করে বল্লেন 'বড় কাহিল'! আর একদিন দেখ সব কারা এসেছেন আমায় নিতে? এসব দেবতারা, ভক্তেরা। শেষদিনের পূর্ব্বদিনে উপাসনাতেও নাম পাঠ করিয়াছেন। নিয়মিত আরাধনা ও প্রার্থনাটা

আর সেদিন করিতে পারেন নাই। তবে পূর্ব্বদিন বল্লেন, 'তোমরা এত বেলা কর উপাসনায়, আমি কি বেলা ক'রে পারি ?'

ভীষণ জ্বালা ও যাতনার মধ্যে তুই একদিন বলিতেন, অতুল ধৈর্য্যের সহিত শান্ত ভাবে বলিতেন 'উঃ অসহ্য! আর পারি না মা, নাও না মা ?' শেষদিনের পূর্ব্বরাত্রে অবিরত 'আমায় নাও না মা' বলিয়াছেন। চারি পাঁচ দিনের অনাহারের পরে (কিছুই খাইতেন না, ঔষধও না) শেষদিন প্রাতে দাস্ত হইল, তার পর ভিন্ন ভিন্ন সময় তিনবার এক ছটাক করিয়া দুধ খাইলেন, বলিলাম, 'হরি বল' বলিলেন, 'দয়াল হরি', কণ্ঠরোধ হইল। শেষ মুহূর্ত্তে কয় বার চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন। নাম করিবার জন্য উদ্যম করিলেন, শব্দ বাহির হইল না। পরে সচ্চিদানন্দ হরিধ্বনির মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস বাহির হইল।

শয্যাগত হইয়া আর কোনও কথা বলেন নাই, কেবল তাঁর নাম। ছেলে মেয়েদের সংবাদের জন্য চিরকাল ব্যাকুল হইয়া ডাক আসিবার প্রতীক্ষা করিতেন। এসময় দুমাস আর কাহারও কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না। প্রিয় ও বিনয় লাহোর হইতে আসিতেছেন শুনিয়া বলিলেন, 'আসুন'। প্রিয় এক সপ্তাহ যথেষ্ট সেবা করিয়া চলিয়া গেলেন। নরেণের কাছে পূর্ব্বে দুমাস থাকিয়া আসিলেন। পরে নরেণ নিদারুন সংবাদ পাইয়া এক সপ্তাহ আসিয়া ছিলেন। সুরেণও এপ্রিল মাসে এক সপ্তাহের জন্য আসিয়াছিলেন, তথন সামলাইয়া গেলেন। শেষকালে তাঁরা কেহ থাকিতে পারেন নাই।

বিধাতা কৃপা করিয়া তাঁর আত্মার সঙ্গে আমার আত্মার যেরূপ নিত্য আরাধনার সঙ্গে বিজড়িত করিয়া দিয়াছিলেন, মৃত্যু তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই। সুতরাং আমায় তাঁর বিচ্ছেদ ভোগ করিতে হয় নাই ও হইতেছে না। বরং সময় সময় কোনও কোনও কথা মনে হইয়া আমাকে আরও আনন্দিত করিতেছে। কি ধর্ম্মই আসিয়াছিল! ধন্য বিধাতা! ধন্য ব্রহ্মানন্দ! আপনি একবার আসিলে অনেক ব্রহ্মলীলা দর্শন ও সঞ্চয় করিতে পারিতেন ও সুখী হইতেন।"

আয়শা দেবী।

আয়শা দেবী এস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মোহম্মদের দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন। প্রথমা পত্নী খদিজা দেবীর পরলোকযাত্রার পর উক্ত মহাপুরুষ তাঁহাকে উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর, আয়শা দেবীর অনধিক সাত বৎসর বয়স ছিল। আয়শা হজরত মোহম্মদের প্রচার বন্ধু আবুবেকর সেদ্দিকের প্রিয়তমা কন্যা ছিলেন। তিনি পরমা সুন্দরী অতি বুদ্ধিমতী ধর্ম্মানুরাগিণী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। প্রেরিতপুরুষ মোহম্মদের প্রেরিতত্বলাভের দশম বৎসরে অর্থাৎ তাঁহার মদিনা প্রস্থানের পূর্ব্ব বৎসর শওয়াল মাসে হকিমের কন্যা খবিলার

যোগে আয়েশার সম্বন্ধ স্থির হয়। হজরত মোহম্মদের বহু প্রণয়িনী ছিলেন ; তন্মধ্যে তিনি একমাত্র আয়েশা দেবীকেই কৌমার্য্যাবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন, অপর সকলেই বিধবা ছিলেন। হজরত আয়েশাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রেম করিতেন।

হেজরির প্রথম বৎসরে শওয়াল মাসে বুধবারে হজরত মোহম্মদ স্বীয় পত্নী আয়শার জফাফ অর্থাৎ স্বামিসন্নিধানে গমন উপলক্ষে তাঁহার পিতা আবুবেকরের গৃহে পদার্পণ করেন। আন্‌সার সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক নরনারী সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন। তখন আয়শা দেবীর নবম বৎসর বয়ঃক্রম ছিল। তিনি নিজে স্বীয় জফাফবৃত্তান্ত এই রূপ বর্ণন করিয়াছেন, 'আমি বনিহারেসের পল্লীতে বালিকাদিগের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে জননী আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন, আমার কেশবিন্যাস ও মুখমণ্ডল প্রক্ষালন করিলেন, এবং আমাকে টানিয়া হজরত যে গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন সেই গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত লইয়া আসিলেন। আমি মাতার হস্তে বদ্ধ হইয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম, আমার প্রাণ কষ্ট বোধ করিতেছিল, মনকে শান্ত করিবার জন্য কিয়ৎক্ষণ এক স্থানে স্থির থাকা আবশ্যক হইয়াছিল। মা আমাকে লইয়া হজরতের নিকটে উপস্থিত করিলেন। আমি দেখিলাম যে, হজরত আমাদের গৃহস্থিত সিংহাসনে রাজার ন্যায় বসিয়া আছেন। জননী বলিলেন, 'প্রেরিত পুরুষ, এই কন্যা তোমার সহধর্ম্মিণী, ঈশ্বর তোমা দ্বারা ইহার মঙ্গল করুন, এবং ইহার দ্বারা তোমার মঙ্গল সাধন করুন।' সে দিবস আমাদের বাড়ীতে কোনরূপ ভোজ হয় নাই, উষ্ট্র বা মেষ বলিদান করা হয় নাই। এবাদার পুত্র সাবেতের গৃহ হইতে এক ভাণ্ড দুগ্ধ প্রেরিত হইয়াছিল, সেই শুভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত নরনারীগণ তাহাই মাত্র পান করিলেন। পরে সকলে ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। অবশেষে হজরত আমাকে আপনার আলয়ে লইয়া আইসেন।"

মরাল ইসার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন কালে আয়শাদেবীর চরিত্রসম্বন্ধে যে কলঙ্ক রটনা হইয়াছিল তদ্বিষয়ে তিনি স্বয়ং এইরূপ বলিয়াছেন, "যখন হজরত স্থানান্তরগমনে সমুদ্যত হইতেন তখন স্বীয় পত্নীবর্গের নামে চিঠি খেলিতেন, যাঁহার নাম উঠিত তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। মরাল ইসার যুদ্ধযাত্রাকালে আমার নাম উঠে, আমি তাঁহার সঙ্গিনী হইয়াছিলাম। সেই সময় যোষিদ্বর্গের অবরোধসম্বন্ধীয় প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছিল। আমার জন্য একটি হাওদা নির্ম্মিত হয়, সেই হাওদা উষ্ট্রপৃষ্ঠে স্থাপন ও আবশ্যকমতে তাহা হইতে অবতারণ করা হইত। উক্ত সংগ্রাম নিষ্পত্তি হইলে পর আমরা ফিরিয়া আসিতেছিলাম, নানা গ্রাম ও প্রান্তর অতিক্রম করিয়া মদিনার সন্নিকটে আসিয়া রাত্রি যাপন করি। রজনীর অবসানসময়ে যাত্রার ধ্বনি হইল। তখন প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিবার জন্য আমি শিবির হইতে কিয়দ্দূর অন্তর চলিয়া গিয়াছিলাম।

ফিরিয়া আসিয়া আমি বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া দেখি কণ্ঠাভরণ নাই, তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থানে দৌড়িয়া গেলাম, অনেক অনুসন্ধান করিয়া তথায় উক্ত আভরণ প্রাপ্ত হইলাম। যে সময়ে আমি তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তখন আমার হাওদাবাহকগণ মনে করিয়াছিল যে, আমি হাওদার ভিতরেই আছি। আমার বয়স অল্প ছিল, শরীর গুরুভার বিশিষ্ট ছিল না, বিশেষতঃ পথে ক্রমাগত কয়েক দিন অল্পাহার করাতে দৈহিক ভারের অনেক লাঘব হইয়াছিল; তজ্জন্য বাহকগণ যখন হাওদা উঠাইয়া পশুপৃষ্ঠে স্থাপন করিতেছিল, তখন আমি যে তন্মধ্যে নাই অনুভব করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারা হাওদা উঠাইয়া চলিয়া যায়, আমি শৌচ-ভূমি হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখি যে, সমুদায় লোক চলিয়া গিয়াছে। অগত্যা আমি সেখানে স্থিতি করিলাম, ভাবিলাম যে, আমাকে না পাইয়া আমার অনুসন্ধানে অবশ্য এখানে লোক আসিবে। আমি কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলাম, পরে নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িলাম, চাদর দ্বারা মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করিলাম। সৈন্যশ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগে সফ্ওয়াননামক ব্যক্তি হজরত কর্তৃক নিযুক্ত ছিল, তাহার প্রতি এই কার্য্যের ভার ছিল যে, কেহ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়া থাকিলে তাহাকে সৈন্যশ্রেণীতে লইয়া যাইবে, বা কেহ কোন দ্রব্য হারাইলে তাহা কুড়াইয়া আনিয়া তৎস্বামীকে প্রত্যর্পণ করিবে। প্রাতঃকালে উক্ত সফ্ওয়ান তথায় উপস্থিত হইল, সে আমাকে শয়ান দেখিয়া উচ্চধ্বনি করিয়া উঠিল। আমি তাহার নিনাদে জাগরিত হইলাম। সফ্ওয়ান স্বীয় উষ্ট্র বসাইয়া দূরে দণ্ডায়মান হইল, এবং আমাকে বলিল, 'উষ্ট্রোপরি আরোহণ কর।' আমি আরূঢ় হইলাম। সফ্ওয়ান কোন কথা না বলিয়া উষ্ট্রের রজ্জু আকর্ষণ করিয়া চলিল। যখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রখর কিরণ বিকিরণ করিয়া ধরাপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করিয়াছিল, তখন আমি শিবিরে উপস্থিত হইলাম। সেই সময় সেনাবৃন্দ গমনে নিবৃত্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেছিল। দৈবাৎ কপট লোকদিগের পটমণ্ডপের নিকট দিয়া আমার গতি হইয়াছিল। তাহারা আমার সম্বন্ধে যে সমস্ত কুৎসিত ভাব আপনাদের হৃদয়ে উদিত হইল, পরস্পর বলিতে লাগিল। আবুসলুলের পুত্র অবদোল্লা প্রথমতঃ দুর্নাম রটনা করে, হস্‌সার ও মস্তাহ প্রভৃতি মোসলমানগণও এই কুৎসিত আন্দোলনে তাহার সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল। আমি মদিনায় পঁহুছিয়া পীড়িত হই, লোকসমাজে যে কলঙ্ক রটনা হইয়াছিল আমি তাহার কিছুই জানিতাম না। কিন্তু এই পীড়ার অবস্থায় আমার প্রতি হজরতের ভাবের অনেক ব্যতিক্রম দেখিতে পাইলাম। পীড়িত হইলে পূর্ব্বে যেমন তিনি আমার সংবাদ লইতেন, আমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিতেন এবার সেরূপ করিলেন না। তাহার কারণ কিছুই জানিতে পাইলাম না। এক দিন রাত্রিতে আমি মস্তাহের মাতার সঙ্গে শৌচাগারে যাইতেছিলাম,

চাদরে পা জড়িত হওয়াতে সে ভূতলে পড়িয়া যায়, পতিত হইয়া স্বীয় পুত্রকে গালি দিতে থাকে। আমি বলিলাম, তোমার যে পুত্র বদরের যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, তুমি তাহাকে গালি দিতেছ কেন? সে বলিল, 'আয়শা, তুমি শ্রবণ কর নাই যে, সে কিরূপ কুকথা বলিয়াছে?' জিজ্ঞাসা করিলাম, কি বলিয়াছে আমি কিছুই জানি না। তখন মস্তাহের মাতা মস্তাহ কর্তৃক আমার কলঙ্ক রটনার কথা আমাকে জ্ঞাপন করিল। তচ্ছ্রবণে আমার পীড়া বৃদ্ধি হইল, তৎক্ষণাৎ জ্বর হইল, যে জন্য যাইতেছিলাম তাহা বিস্মৃত হইলাম, নিদারুণ মনঃপীড়ায় বোধ হইতে লাগিল যে, এক প্রকার বিষম শিরঃপীড়া হইয়াছে, পরে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম, কিয়ৎক্ষণানন্তর চৈতন্য লাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। হজরত আমার নিকটে আসিলেন, আমি তাঁহা হইতে অনুমতি গ্রহণ করিয়া পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলাম। মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার নামে কেন ভয়ানক কথা রটিল? মাতা বলিলেন, 'বৎসে, দুঃখ করিও না, শান্তভাবে থাক। কোন গৌরবান্বিতা যুবতীর প্রতি তাহার স্বামী একান্ত অনুরক্ত হইলে সেই যুবতীর যদি বহু সপত্নী থাকে তবে সচরাচর তাহার সম্বন্ধে এই প্রকার কথা রটনা হয়।' আমি বলিলাম, সবহান আল্লা, জনসমাজে একি ভয়ানক কথা রটিয়াছে, প্রেরিতপুরুষের কর্ণগোচর হইয়াছে, আমার পিতাও শ্রবণ করিয়াছেন। আমি ইহা বিন্দুমাত্র জানি না। ইহা বলিয়াই আমি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। আমার পিতা গৃহান্তরে কোরাণ পাঠ করিতেছিলেন। তিনি আমার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জননী বলিলেন, 'যে জনরব হইয়াছে সে এক্ষণ শুনিতে পাইয়াছে।' ইহা শুনিয়া পিতা ক্ষণকাল রোদন করিলেন, পরে আমাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, 'অধীর হইও না, স্থির হও। দেখ পরমেশ্বর এ সম্বন্ধে কিরূপ আদেশ করেন।' সেই দিন রাত্রিতে আমার নিদ্রা হইল না, উভয় নয়ন হইতে অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণ হইল। তৎপর হজরত আমার চরিত্রবিষয়ে আমার দাসী বুরিদাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন। সে নিবেদন করে, 'দেব' যে ঈশ্বর আপনাকে বস্তুতঃ প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার নামে আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, 'একাল পর্য্যন্ত আমি আয়শার সঙ্গে আছি, কখনও তাঁহার চরিত্রে কোন দোষ দর্শন করি নাই। আমি তাঁহাকে চিরকাল শুদ্ধচরিত্রা বলিয়া জানি। সুবর্ণবণিক্ আরক্তিম সুবর্ণকে যেমন কলঙ্কবর্জিত বিশুদ্ধ ব্যতীত অন্য কিছু মনে করে না, আমিও আয়শাদেবীকে বিশুদ্ধ ভিন্ন জানি না। বরং প্রশুদ্ধ কাঞ্চন অপেক্ষা আয়শাদেবী পবিত্রা। লোকে যাহা বলিতেছে তাহা সত্য হইলে অবশ্য পরমেশ্বর আপনাকে জ্ঞাপন করিতেন।' বুরিদার মুখে এই কথা শ্রবণানন্তর হজরত আপন প্রচারবন্ধু ওমর, ওস্মান ও আলিকে এ বিষয়ে

জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা সকলেই আমার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়া আমার শুদ্ধতা সমর্থনপূর্ব্বক দুষ্ট কপটাচার লোক সকল মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়াছে এরূপ দৃঢ়তার সহিত বলেন। হজরত তাহাতে আহ্লাদিত হইয়া আমার পিত্রালয়ে উপস্থিত হন। আমি গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে তিনি আমার নিকটে আসিয়া সেলাম করেন, এবং আমার সম্মুখে উপবিষ্ট হন। প্রায় এক মাস যাবৎ কলঙ্করটনা হইয়াছিল, তিনি তদবধি আমার নিকটে কখনও বসেন নাই। এবার হজরত উপবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরগুণানুবাদানন্তর আমাকে বলিলেন, 'আয়শা, লোকে তোমার সম্বন্ধে আমাকে এই সকল কথা বলিয়াছে, তুমি এই কলঙ্ক হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিলে পরমেশ্বর অচিরেই তোমার শুদ্ধতা প্রকাশ করিবেন। তোমা হইতে অপরাধ হইয়া থাকিলে, ক্ষমা প্রার্থনা ও অনুতাপ কর, এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, যে ব্যক্তি অনুতাপ ও আপন পাপ স্বীকার করে, পরমেশ্বর তাহার অনুতাপ গ্রাহ্য করেন, তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকেন।' হজরত এইরূপ উক্তি করিলে আমি অশ্রুবর্ষণ করিয়া পিতৃদেবকে বলিলাম, প্রেরিতপুরুষের কথার উত্তরস্বরূপ তুমি কিছু বল। পিতা বলিলেন, 'আমি জানি না, কি উত্তর দান করিব।' পরে বলিলেন, 'অজ্ঞানতার অবস্থায় আমরা যখন পুত্তলপূজক ছিলাম, ঈশ্বরোপাসনা কাহাকে বলে জানিতাম না, তখনও কোন ব্যক্তি আমাদের কুলে এরূপ গর্হিত কলঙ্কারোপ করিতে পারে নাই, এক্ষণতো আমাদিগের গৃহ এস্‌লামধর্ম্মের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান, আমাদিগের হৃদয়াগার তত্ত্বজ্ঞান ও একত্ববাদের আলোকে আলোকিত হইয়াছে, তথাপি আমাদিগের সম্বন্ধে লোকে এরূপ বলিতেছে। প্রেরিতপুরুষ, এ বিষয়ে আমি আর কি বলিব?' তৎপর আমি জননীকে বলিলাম, মা, তুমি আমার পক্ষ হইয়া হজরতকে উত্তর দান কর। মাতা বলিলেন, 'আমি অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিতা কি বলিব জানি না।' অবশেষে আমি স্বয়ং উত্তর দানে সমুদ্যত হইয়া বলিলাম, নাথ, আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, যে ভয়ানক কথা তুমি শ্রবণ করিয়াছ, এবং তাহা তোমার অন্তরে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে ও তুমি তাহা সত্য মনে করিয়াছ এ অবস্থায় যদি বলি আমি নির্দ্দোষ, আমার নির্দ্দোষিতা ঈশ্বর জানিতেছেন, তুমি অবশ্য বিশ্বাস করিবে না। বরং যে বিষয় হয় নাই, তাহা হইয়াছে বলিয়া যদি স্বীকার করি তুমি প্রত্যয় করিবে। ইয়ুসোফের পিতা ইয়কুব যেমন বলিয়াছিলেন, 'ধৈর্য্য ধারণ করিতেছি, দেখি প্রভুর করুণা কি কার্য্য করে।' আমিও তাহাই বলিতেছি। আমার যখন অপরাধ নাই, তখন আমি এরূপ মনে করিতেছি যে, ঈশ্বর আমার চরিত্রের বিশুদ্ধতা সমর্থন করিবেন। আমি হজরতকে এই প্রকার বলিলাম, কিন্তু মনে করি নাই যে, আমার সম্বন্ধে কোরাণের বচন অবতীর্ণ হইবে, এবং চিরকাল জন-

সমাজে তাহা পঠিত হইবে। যেহেতু আমি মহিমান্বিত পরমেশ্বরের মহোচ্চপ্রতাপ ও গৌরব জানিতাম, এবং নিজের দীনতা দুর্ব্বলতা ও নিরাশ্রয়তার প্রতি আমার লক্ষ্য ছিল। পরমেশ্বর আমার সম্বন্ধে কথা কহিবেন আমি আপনাকে তাহার অনুপযুক্ত মনে করিতাম। এক্ষণও হজরত গাত্রোত্থান করেন নাই, কোন ব্যক্তি গৃহ হইতে চলিয়া যায় নাই, ইতিমধ্যে প্রত্যাদেশের লক্ষণ হজরতের মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইল। তিনি বিহ্বল হইয়া শয়ন করিলেন। হজরত যখন প্রত্যাদিষ্ট হইতেন তখন নিকটে যাহারা উপস্থিত থাকিত তাঁহার শরীরের লক্ষণ দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেন যে, প্রত্যাদেশ হইতেছে। তদ্রূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আমার জননী একটি উপাধান তাঁহার মস্তকের নিম্নে স্থাপন করিলেন ও এক খানা চাদর দ্বারা তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর, হজরত স্বয়ং আপনার মুখ হইতে চাদর অপসারিত করিলেন। মুক্তাবিন্দুর ন্যায় ঘর্ম্মবিন্দু সকল তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে নির্গত হইতেছিল। তিনি হাসিয়া প্রথমতঃ এই কথা বলিলেন 'আয়শা, পরমেশ্বর তোমাকে নিষ্কলঙ্ক করিয়াছেন, এবং তোমার শুদ্ধতাবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন।' তখন জননী বলিলেন 'বৎসে, উঠ, হজরতের সম্মুখে যাও, তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দান ও তাঁহার গুণানুবাদ কর।' আমি বলিলাম, না মা, এই ব্যাপারে আমি একমাত্র পরমেশ্বরকে দেখিতেছি, তাঁহারই গুণানুবাদ করিব, অন্য কাহারও নয়। যেহেতু তিনি আমার শুদ্ধতা সংস্থাপনের জন্য আয়ত পাঠাইয়াছেন। অনন্তর হজরত সেই আয়ত পাঠ করিলেন, যথা—'নিশ্চয় যাহারা তোমার সম্বন্ধে অপবাদ উপস্থিত করিয়াছে, তাহারা তোমাদের একদল, তোমরা তাহা আপনার নিমিত্ত অকল্যাণ মনে করিও না, বরং তোমাদের জন্য তাহা কল্যাণ, (অপবাদ দ্বারা) তাহারা যে পাপ উপার্জ্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এবং তাহাদিগের যে ব্যক্তি উহাকে জঘন্যতর করিয়াছে তাহার জন্য মহাশাস্তি আছে।' এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বচন কোরাণের নুরে ব্যক্ত হইয়াছে। হজরত এই সকল আয়ত পাঠ করিলে পর পিতৃদেব আবুবেকর উঠিয়া আমার মস্তক চুম্বন করিলেন। হজরত গৃহ হইতে বাহির হইয়া মন্দিরে গেলেন, এবং বন্ধুবর্গকে আহ্বান করিয়া আনিয়া খোতবা পাঠানন্তর আমার সম্বন্ধীয় নবাবতীর্ণ আয়ত সকল উচ্চারণ করিলেন। তাহাতে সকলের হৃদয়দর্পণ হইতে সংশয়-কালিমা নিষ্কাশিত হইল।

— —

আকস্মিক ঘটনা ও সামান্য রোগাদির গৃহচিকিৎসা।

(২৮৯ পৃষ্ঠার পর।)

জলমগ্ন হওয়া।

আমাদের দেশে অনেক বালকবালিকা ও স্ত্রীলোক প্রতি বৎসর জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। সন্তরণ না জানাই ইহার প্রধান কারণ। এই নদী ও পুষ্ক-

রণী বহুল দেশে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলে ই সন্তরণ শিক্ষা করা উচিত। যাহারা সন্তরণে সমর্থ তাহারা জলে পতিত হইলে ভীত বা জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব হারায় না এবং প্রায়ই আপন চেষ্টাতে আত্মরক্ষা করিয়া নির্বিঘ্নে তীরে উঠিতে পারে। যাহারা সন্তরণ জানে না তাহারা জলে পতিত হইবামাত্র ভয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া যায় এবং কেহ কেহ বা তখনী মূর্চ্ছিত হইয়া জল মধ্যে নিমগ্ন হয়। যাহারা তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হয় না তাহারা ভাসিয়া থাকিবার চেষ্টা করে এবং তজ্জন্য অস্থিরতার সহিত লক্ষ্যহীন ভাবে হাত পা ছুঁড়িতে থাকে, তাহাতে ভাসিয়া থাকা দূরে থাকুক বরঞ্চ বারম্বার হাবুডুবু খাইতে থাকে, এবং কেবলমাত্র শীঘ্রই ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তাহা নহে প্রতি নিশ্বাসের সহিত ফুস্ ফুসে ও উদরে জল প্রবেশ করিতে থাকে। ফুস্ ফুসে জল প্রবেশ করা হেতু নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রীয়া বন্ধ হইয়া আইসে। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ জল মধ্যে ধড় ফড় করিতে করিতে ক্রমশঃ ক্লান্ত, রুদ্ধশ্বাস ও উদরে প্রবিষ্ট জল দ্বারা স্ফীত ও ভারাক্রান্ত হইয়া সন্তরণশক্তি হীন ব্যক্তি জল মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়।

সন্তরণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জল হইতে উদ্ধার করিতে যাওয়াও কম বিপদ জনক নহে। কখন কখন সবল ও সন্তরণ পটু লোক জলে নিমগ্নোন্মুখ ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে গিয়া, আপনি নিমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। ইহার কারণ এই যে সন্তরণে অসমর্থ ব্যক্তি জলে পতিত হইলে সে যাহা কিছু নিকটে প্রাপ্ত হয় তাহাই আটিয়া ধরিতে চেষ্টা করে। জল হইতে যে তাহাকে উদ্ধার করিতে যায় সময়ে সময়ে তাহাকে এমনি কঠিনরূপে জড়াইয়া ধরে যে তাহার সাঁতার দিবার শক্তি থাকে না। এই অবস্থায় সাহায্যকারী ব্যক্তি স্বভাবতঃ নিমগ্নোন্মুখ ব্যক্তির হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করে এবং নিমগ্নোন্মুখ ব্যক্তি আরও প্রাণপণে তাহাকে জড়াইয়া ধরে। এইরূপ পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া অবশেষে উভয়েই জলমগ্ন হয়।

নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে সন্তরণে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি অনেক ক্ষণ জল মধ্যে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

১। মুখ জলের উপরে এবং ঊর্দ্ধদিকে রাখা।

২। ফুস্ ফুস বায়ুপূর্ণ করিয়া রাখা অর্থাৎ সুদীর্ঘ নিশ্বাসে বায়ুগ্রহণ করিয়া তাহা যতক্ষণ সাধ্য বদ্ধ করিয়া রাখা, কিম্বা নিশ্বাস ক্রিয়া (অভ্যন্তরগামী) দীর্ঘ এবং প্রশ্বাসক্রিয়া (বাহ্যগামী) খর্ব্ব করিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিচালন করা।

৩। বাহুদুটী জলে নিমগ্ন রাখা। ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না যে জলে ভাসমান অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া যদ্যপি বাহুদুটী জলের অভ্যন্তরে নিমগ্ন রাখা যায় তবে মুখ স্বভাবতঃই জলের উপরিভাগে থাকে, বাহুদুটী জল হইতে উত্তোলন করিবামাত্র মুখ জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়। নদী কিম্বা পুষ্করিণীতে স্নানের সময়ে সকলেই ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। উপরি উক্ত কারণ বশতঃই জলে

পতিত হইয়া হাত ছুঁড়িতে থাকিলে বারম্বার হাবুডুবু খাইতে হয়।

কয়েক জন একত্রিত হইয়া পুষ্করিণী বা নদীতে স্নান কিম্বা নৌকা বিহার করিতে গিয়া কেহ যদি অকস্মাৎ জলে পতিত হয়, এবং উপস্থিত কেহই সাঁতার দিতে না জানে, তাহা হইলে নৌকার দাঁড়, বাঁশ, রজ্জু কিম্বা বস্ত্রাদির অগ্রভাগ তাহার নিকটে নিক্ষেপ করা উচিত। সচরাচর কেহ জলে পতিত হইলে প্রথমে নিমগ্ন হইয়া তখনই পুনর্ব্বার ভাসিয়া উঠে এবং হাতদুটী ছুঁড়িয়া নিকটে যাহা কিছু পাওয়া যায় ধরিতে চেষ্টা করে, এই অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত রূপ কোন সাহায্য পাইলে নিমগ্নোন্মুখ ব্যক্তি অনায়াসে আত্মরক্ষা করিতে পারে। সাঁতার জানা থাকিলেও জলে পতিত ব্যক্তি "হাবুডুবু" খাওয়া ও হাত পা ছোঁড়া অবস্থাতে একেবারে শূন্যহস্তে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে সাহায্য করিতে যাওয়াও নিরাপদ নহে, কেননা, যেমন পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে দুজনে জড়া জড়ি করিয়া মারা যাইবার সম্ভাবনা। জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াও একখণ্ড রজ্জু, বাঁশ কিম্বা কাপড় দূরহইতে তাহার হাতে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করা উচিত। যদি ইহা সুবিধা জনক না হয়, তবে যে ব্যক্তি সাহায্যার্থ জলে অবতরণ করিবে তাহার কটিদেশে একখণ্ড রজ্জু বন্ধন করিয়া তাহা তীরস্থ কোন ব্যক্তির হাতে রাখা উচিত।

জল নিমগ্ন ব্যক্তি সময়ে সময়ে বহুক্ষণ জল মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়াও প্রাণ ধারণ করিতে পারে। লেখক একদা একটী বালিকাকে প্রায় আট ঘণ্টাকাল জলমধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও বাঁচিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলেন। তখন তাহার অবস্থা দেখিয়া তিনি একমূহুর্ত্তের জন্য ও মনে করেন নাই যে তাহার দেহে প্রাণ আছে। তাহার শরীর বিবর্ণ শীতল ও অসাধারণ রূপে স্ফীত হইয়াছিল, নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও রহিত হইয়াছিল। উপরিউক্ত কারণ বশতঃ নিতান্ত নির্জ্জীবাবস্থা প্রাপ্ত দেখিলেও জলমগ্ন ব্যক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত উপায় সকল অবলম্বন করা যাইতে পারে।

১। জলমগ্ন ব্যক্তিকে জল হইতে উঠাইয়া উন্মুক্ত স্থানে একখানা টেবিল কিম্বা তক্তপোষের উপরে রাখিবে। টেবিল অপেক্ষা তক্তপোষই সুবিধা জনক।

২। টেবিল কিম্বা তক্তপোষের উপরে রাখিবার সময়ে তাহাকে এমনিভাবে উঠাইবে যে তাহার পদযুগল নীচ এবং মস্তক উচু ভাবে থাকে। তৎপর তাহাকে উল্টাইয়া উদরের উপরে উত্তান ভাবে শয়ন করাইবে, উদর ও বক্ষের নীচে একটী বালিস কিম্বা একখানি ভাঁজ করা কাপড় রাখিয়া দিবে এবং একটী বাহু বক্র করিয়া কপালের নীচে রাখিবে। এইসময়ে মস্তক দেহের অপর ভাগ হইতে কিঞ্চিৎ নীচের দিকে হেলান ভাবে থাকা আবশ্যক।

৩। তৎপর তাহার ওষ্ঠদ্বয়, মুখের অভ্যন্তর এবং নাসারন্ধ্রদ্বয় পরিস্কার করিয়া পুঁছিয়া দিবে এবং জিহ্বাটী শুষ্ক বস্ত্রাবৃত হস্তের দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক বাহির করিবে এবং একটী ফিতা কিম্বা কাপড়ের ফালিদ্বারা এরূপ ভাবে নিম্নস্থ চোয়ালের সঙ্গে বাধিয়া দিবে যেন মুখের ভিতরে পুন প্রবিষ্ট হইতে না পারে।

৪। তৎপর সিক্ত বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তন করিবে এবং শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা উত্তম রূপে ঘর্ষণ করিয়া সমস্ত শরীর পুঁছিয়া দিবে। পুঁছিতে পুঁছিতে উদরের বিপরীত দিকে পৃষ্ঠের উপরে ঈষৎ চাপদিতে থাকিবে, এই রূপ করিলে মুখদিয়া উদরস্থ জল সমুদায় নির্গত হইতে থাকিবে।

আমাদের দেশে পল্লিগ্রামে, অনেক সময়ে, জল নিমগ্ন ব্যক্তির উদর হইতে জল নিঃসৃত করাইবার জন্য তাহার মস্তকটী নীচের দিকে ঝুলাইয়া পা দুটী উচ্চে কিছুতে বাঁধিয়া রাখিয়া থাকে, শিশু হইলে পা দুটী ধরিয়া ঘুড়াইতে থাকে, ইহাতে উদরস্থ জল নির্গত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু অকস্মাৎ মৃত্যু ও ঘটিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে জলে নিমজ্জিত ব্যক্তির মস্তিষ্কের শিরা সমুদয়ে অসঞ্চারিত রক্তেতে প্রায়ই পরিপূর্ণ হইয়া থাকে এতদবস্থায় মস্তক নিম্নদিকে রক্ষা করিয়া তাহার দেহ সঞ্চালিত করিলে এই সমুদায় শিরা কোন্ কোনটী ছিন্ন হইয়া যায় এবং মস্তিষ্কের মধ্যে রক্ত স্রাব হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

৫। জল নির্গত হইয়াগেলে স্মেলিং-সল্ট (smelling salt) কিম্বা দগ্ধ লঙ্কা ইত্যাদি নাসারন্ধ্রের নিকটে রাখিয়া কিম্বা তন্মধ্যে তামাকুপত্রের ডাঁটা এইরূপ কোন কটুকটে দ্রব্য প্রবেশ করাইয়া দিয়া হাঁচি উৎপাদন করিবার চেষ্টা করা উচিত। দুএকবার হাঁচি হইলে ক্রমশঃ নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য আরম্ভ হয়, যদি তাহা না হয় তবে পীড়িত ব্যক্তিকে চিৎকরিয়া শয়ন করাইয়া তাহার মুখে ও বক্ষে পর্য্যায়ক্রমে সজোরে গরম ও শীতল জলের ছিটাদিবে কিম্বা গড়ম ও শীতল জলে তোয়ালে ভিজাইয়া তদ্দ্বারা বক্ষে আঘাত করিবে। কয়েকবার (অন্যূন দশ বার বার) এইরূপ করিলেই নিশ্বাস প্রশ্বাসক্রিয়া আরম্ভ হইবে। যদি ইহাতেও না হয় তবে কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাসপ্রণালী (artificial respiration) অবলম্বন করিতে হইবে।

এই কার্য্যটী কিছু শারিরীক সামর্থ্য সাপেক্ষ, মহিলার পাঠিকাগণের সাধ্যায়ত্ত কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু মহিলাদের পক্ষে ইহা একান্ত অসাধ্য নহে। পশ্চিম প্রদেশে অবস্থান কালে লেখক কিয়ৎকাল তদ্দেশীয়া কয়েকটী স্ত্রীলোককে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষাদানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দাই-ক্লাশের ছাত্রীদিগকে সদ্যপ্রসূত মৃতপ্রায় শিশুদিগের শ্বাসপ্রশ্বাস প্রচলন জন্য কৃত্রিম প্রক্রিয়া শিক্ষা করিতে হইত। এই ক্লাসের একটী দাই এই প্রক্রিয়ার দ্বারা একদা একটী অষ্টাদশবর্ষীয়া জলমগ্না যুবতীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। সে লেখকের সাক্ষাতে অতি সুচারুরূপে এ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল।

কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস কিরূপে করাইতে হয় নিম্নে তাহা বিবৃত হইতেছে।

রুগ্ন ব্যক্তিকে মেজেতে, তক্তপোষে, কিম্বা টেবিলের উপরে চিৎ করিয়া শয়ন করাইবে, এবং পৃষ্ঠের নীচে একটী বালিস বিম্বা ভাঁজকরা কাপড় রাখিয়া মস্তকটী একটুকু নীচের দিকে ঝুলাইয়া দিবে। জিহ্বাটী টানিয়া বাহির করিয়া নিম্নের চোয়ালের সঙ্গে বাঁধিয়া দিবে যেন উহা মুখের ভিতরে পতিত হইয়া শ্বাসপ্রণালীর পথ রুদ্ধ করিতে না পায়। তৎপর তাহার মস্তকের পশ্চাদ্দিকে জানু পাতিয়া বসিবে (পীড়িত ব্যক্তি মেজেতে শয়ান থাকিলে এরূপে বসিতে হইবে, নীচু তক্তপোষে শয়ান থাকিলেও এইরূপে চলিবে, কিন্তু টেবিলে শয়ান থাকিলে দাঁড়াইতে হইবে,) এবং তাহার কনুইএর উপরিভাগে হস্ত রক্ষা করিয়া, তাহার বাহু দুটী দৃঢ়রূপে ধরিবে, পরে উহা ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিয়া তাহার মস্তকের উপর দিকে যতদূর সাধ্য লইয়া যাইবে, এইরূপ অবস্থায় ৩ ৪ সেকেণ্ড রক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার তাহা বক্ষের দুই পার্শ্বে পাঁজড়ার হাড়ের উপরে লইয়া যাইবে এবং বক্ষটী উহার দ্বারা দুই পাঁজরা হইতে সম্মুখের দিকে কিঞ্চিৎ জোরের সহিত চাপিয়া পূর্ব্ববৎ মস্তকের উপরদিকে টানিয়া লইবে। প্রতি মিনিটে অন্যূন পোনেরবার এইরূপ করিবে। কিছুক্ষণ (অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত) এইরূপ করিতে করিতে পীড়িত ব্যক্তির বক্ষ আপনা হইতে ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হইতে থাকিবে, এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য স্বাভাবিক ভাবে চলিতে থাকিবে।

স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া আরম্ভ হইলেই পীড়িত ব্যক্তির শরীর যাহাতে উত্তপ্ত হয় তাহার চেষ্টা করিবে। এই জন্য উহাকে উন্মুক্ত স্থান হইতে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যাইবে। প্রবল বায়ু বহিতে না থাকিলে দ্বার জানালা বন্ধ করিবে না। গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া শয্যাতে শয়ন করাইবে এবং কম্বল বা অন্য কোন উষ্ণ বস্ত্রের দ্বারা শরীর আবৃত করিবে, তৎপরে বস্ত্রাভ্যন্তরে হাত প্রবেশ করাইয়া শুষ্ক ফ্লানেল (Flannel) কিম্বা তোয়ালে কিম্বা কেবল মাত্র হস্তের দ্বারা তাহার শরীরকে নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে, অর্থাৎ পা হইতে মাথার দিকে ঘর্ষণ করিতে থাকিবে। এতদ্ভিন্ন বোতলে গরম জল পুরিয়া তাহার কুক্ষিতে, পঞ্জরে, পেটের উপরে উরুদ্বয়ের মধ্যস্থলে এবং পদতলে রাখিবে। বোতল যদি অত্যধিক গরম হয় তাহা কাপড়ে জড়াইয়া দিবে। পীড়িত ব্যক্তি যদি গিলিতে পারে, তবে এ সময়ে তাহাকে কিঞ্চিৎ গরম জল, বা চা বা দুগ্ধ পান করাইবে। ইহাতে যদি শরীর একঘণ্টাকাল মধ্যে গরম না হয় এবং নাড়ীর গতি ভালরূপে অনুভব করা না যায় তবে চার চামচায় চারি চামচা ব্রাণ্ডি (Brandy) তাহার দ্বিগুণ মাত্রা গরম জলের সহিত খাওয়াইয়া দিবে, কিন্তু এই অবস্থায় চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করাই বিধেয়। অবস্থা নিতান্ত মন্দ না হইলে উপরিলিখিত চিকিৎসাতেই সচরাচর আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

রাঙ্গামাটী } নবীনচন্দ্র দত্ত।
১৯ আষাঢ় ১৩১৫

মহিলাদের রচনা।

ব্রজবালার প্রতি।

(জীবিত কন্যা)

শুষ্ক মরুভূমি প্রাণে বারির সঞ্চার।
একমাত্র ব্রজবালা তুইরে আমার ॥
না পেলে তোমার পত্র করি আনচান।
কিছুই লাগেনা ভাল পাগল পরাণ ॥
দূর দেশে রেখে তোরে কঠিন হৃদয়।
আসিলাম চলে হেথা মাগিয়া বিদায় ॥
সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগে জলভরা আঁখি।
মনে হয় পাখী হয়ে উড়ে যেয়ে দেখি ॥
কতদিনে দেখিবরে তোরে প্রাণধন।
পথ পানে চেয়ে আছি চাতক যেমন ॥
চাতক বারির আশে চাহে মেঘ পানে।
জুড়াতে তৃষিত প্রাণ ঘন বরিষণে ॥
আর কবে দেখিবরে তোর সে বয়ান।
জুড়াইব শোকদগ্ধ তাপিত পরাণ ॥
আশার কণিকা নাই হা হুতাশ ভরা।
হৃদাকাশে একমাত্র তুই ধ্রুব তারা ॥
তোর মুখ চেয়ে ধরি এ পোড়া জীবন।
এ উদাস প্রাণে তুই একটি বাঁধন ॥
বলে সবে মোরে, কেন ভাব অকারণ।
অবোধ পরাণ মোর না মানে বারণ ॥
আমিই কি ভাবি শুধু সন্তানের তরে!
মোর মত কেহ কিরে ভাবেনা সংসারে?
বুঝেও বুঝেনা লোক অপরের জ্বালা।
এ ভবে মায়ের প্রাণে কি আগুন ঢালা ॥
শোকে তাপে পরিপূর্ণ নিঠুর সংসার।
কোথায় রাখিব তোরে ব্রজরে আমার ॥
ইচ্ছা করে বুকে ধরে রাখিরে তোমায়।
কোনই আপদ যেন ছোঁয় না তোমায় ॥
কিন্তু বুকে বহিতেছে সদা হা হুতাশ।
কেমনে পাইবি তথা শান্তির বাতাস ॥
নিরাপদে থাকিবিরে রাখিলে যথায়।
তাই ফেলে রাখিয়াছি বিধাতার পায় ॥

কাকিনিয়া। মো—

এসনা।

এসনা এসনা কাছে স'রে যাও সরে যাও
একটু নীরবে রহিগো সময় দাও।
নিওনা নিওনা টেনে ওই দিগে আর
তুলিও না ওই কথা শ্রুতির মাঝার।
সাধিতে সুন্দর কাজ সাধ তুমি বাদ
হরষের মাঝে হায় আনিছ বিষাদ
চাহিনা তোমার ওই আমোদিত মন
অসার বিলাস লিপ্সা সুখ অনুক্ষণ।
চাহিনারে দুষ্টমতী তব মধুসঙ্গ
একেলা থাকিব সাদ সতত নিঃশঙ্ক।
হে দুষ্ট, এসনা কাছে ভুলাইতে মন
প্রচ্ছন্ন রয়েছে তোর সদা প্রলোভন।
শুনিতে তোমার কথা আপাতঃ মধুর
তমজালে বন্ধ করে হৃদি অন্তঃপুর।
এসনা হৃদয় পুরে যাও চলি যাও
তোমারে চাহিনা আমি মুহূর্ত্তে পালাও।
অশেষ অনিষ্ট তুমি অহিতের মূল
এইক্ষণ যাও ছাড়ি হৃদয় আমূল।
থাকিব তাঁহারি সঙ্গে কিসেরি একক
সকল সময়ে যিনি হৃদয় রক্ষক।
শ্রবণে নাহিক চাহি অন্য কোলাহল
হউক সে মধুর ভাষে হৃদি সুশীতল।
ভাবিলেনা জননীর কি ভীষণ দশা
সেই দিন হয়ে গেছে হায় সর্ব্বনাশ।

বৈধব্য বহ্নিতে জলি, এবে তাহে তুমি
দিলে পুনঃ স্বতাহুতি রহিবে কি প্রাণ ?
আজি পিতা পুত্রী তবে মিলেছে কোথায়
এখানের স্নেহ প্রেম আদর যতন।
কিছুই কি নাহি ভাল লাগিল তোমার
তাই ত্যজি ত্বরা গেলে এ মরত ভূমি।
কাঁদায়ে সবার ; যথা সুরবালাগণ
রাজিছেন নিত্যসুখে দেবের সমাজে।
যাও তবে সতী লক্ষ্মী যাও অমরায়
আজি রেখে পতি পুত্র কন্যা পরিজন
যাও ওগো পুণ্যবতী ভুঞ্জ নিত্যসুখ
পরিহরি এখানের পাপ মলিনতা॥
লও দেব পুতপায় ফুল নিরমল
ঢাল শান্তিজল এই তপ্তপ্রাণে আজি।
কর উদ্ভাসিত ; তব প্রেম পুণ্য জ্যোতি
জননী হৃদয়ে, তুমি শান্তনা মধুর।

পাঁচদোনা। শ্রীমতী গ—

সংবাদ।

কোল নারীগণ উদরান্নের জন্য যেরূপ কঠিন পরিশ্রম করে কোন দেশের কোন স্ত্রীলোককে সেরূপ পরিশ্রম করিতে দেখা যায় না। তাহারা দুই তিন ক্রোশ পথ হইতে প্রকাণ্ড জ্বালানী কাঠের মোট মাথায় করিয়া বাজারে ও পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিক্রয় করে। অনেকের পিঠে ছেলে বা মেয়ে পিঠ বোঝার ন্যায় বাঁধা থাকে। তাহারা সমস্ত দিনের পরিশ্রমে দুই আনা আড়াই আনা উপার্জ্জন করে। একদিন একটী কোল মেয়ে রাঁচির কমিশনার সাহেবের পার্শোনাল আসিষ্টাণ্ট গঙ্গাগোবিন্দ বাবুর নিকটে দুঃখ করিয়া বলে, "দুই বৎসর হইল আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, আমাকে চারিটি সন্তান প্রতিপালন করিতে হয়, আজ সমস্ত দিন খাটিয়া ছয়টী পয়সা মাত্র পাইয়াছি। তখন গঙ্গাগোবিন্দ বাবু দয়া করিয়া তাহাকে কিছু দান করেন।

রাঁচি ও সিংহভূম জিলাতে অসভ্য কোল ও মুণ্ডাজাতি বাস করে। উভয় জাতির ভাষা স্বতন্ত্র। কোলদিগকে উরাওণও বলে। কোন রাজকর্ম্মচারী উরাওণ ভাষা বা মুণ্ডারী ভাষা শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে গবর্ণমেণ্ট হইতে ১ হাজার টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। এবার রাঁচির আবকারীর ডিপুটী কালেক্টর মন্মথনাথ বসু মুণ্ডারী ভাষায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বিগত ২৫শে জুন শুক্রবার ভারতবর্ষের মহামান্য সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের জন্মোৎসব উপলক্ষে রাঁচির ডিপুটী কমিশনার সাহেবের কুঠীর প্রশস্ত ড্রয়িংরুমে সায়ং-সম্মিলন সভা হইয়াছিল। নিমন্ত্রণ পাইয়া কেরাণী শ্রেণী হইতে হাকিম বাবুগণ পর্য্যন্ত প্রায় একশত বাঙ্গালী বাবু ও সেই নগরবাসী সমস্ত ইংরাজ উক্ত জন্মোৎসব সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। ডিপুটী কমিশনর সাহেবের ব্যয়ে কমিশনার সাহেবের পার্শোনেল আসিষ্টেণ্ট গঙ্গাগোবিন্দ বাবুর যত্নে চা ও আইস্‌ক্রিম এবং ফল মিষ্টান্নাদি ইংরাজ ও বাঙ্গালী বাবুদের জলখাওয়ার সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছিল। গীত বাদ্যাদিও হইয়াছিল।

কমিশনার সাহেবের অনুরোধে গঙ্গাগোবিন্দ বাবু সঙ্গীত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাঁচির কমিশনার ও ডিপুটী কমিশনার সাহেব এদেশের হিতাকাঙ্ক্ষী অতিশয় ভদ্রলোক। তাঁহাদের সুমিষ্ট ব্যবহারে উপস্থিত সমস্ত বাঙ্গালী বাবু অতিশয় প্রীত ও আনন্দিত হইয়াছেন।

ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবের বিচারে রাজাবিদ্রোহিতাদি অপরাধে ইতিপূর্ব্বে কতিপয় বাঙ্গালী দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকজন যুগান্তরাদি সংবাদপত্রসংসৃষ্ট লোক ছিল। পরে উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব মজফ্ফরপুরের শেসনজজের পদে নিযুক্ত হইয়া যান। ক্ষুদীরাম ও দীনেশনামক দুইটি বাঙ্গালী যুবা ক্রোধবশতঃ বোমাদ্বারা কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যাকরার উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে গুপ্তভাবে মজফ্ফরপুরে চলিয়া যায়। একদিন সায়ংকালে একটী গাড়ী দেখিয়া তাহাতে উক্ত সাহেব যাইতেছেন ভাবিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষেপ করে। দৈবাৎ সেই গাড়ীতে তিনি ছিলেন না, দুই জন ইয়ুরোপীয় মহিলা ছিলেন। তাঁহারা দুই জন তৎক্ষণাৎ মারা পড়েন। পরে ক্ষুদীরাম ধরা পড়ে, বিচারে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। দীনেশ আত্মহত্যা করিয়াছে। এদিকে কলিকাতায় মাণিকতলার বাগানে হ্যারিসন্ রোড ইত্যাদি স্থানে বোমা তৈয়ারির মালমসলাসহ অনেকগুলি বাঙ্গালী যুবা পুলিশ কর্ত্তৃক ধরা পড়িয়াছে। তাহারা সকলে বিচারাধীন আছে। তন্মধ্যে বন্দেমাতরং পত্রিকার সম্পাদক ও ন্যাশনাল কলেজের প্রিন্সিপাল বাবু অরবিন্দ ঘোষও আসামী শ্রেণীভুক্ত হইয়া হাজতে আছেন। ক্ষুদীরাম বলিয়াছে যে সংবাদপত্র বিশেষ পড়িয়া ও বক্তা বিশেষের বক্তৃতা শুনিয়া তাহার মনে ইংরাজ হত্যার ভাব উত্তেজিত হইয়াছিল। ছোটলাট সাহেবের গাড়ী বোমাদ্বারা চূর্ণ করিবারও চেষ্টা হইয়াছিল, কাকনাড়াতে রেলগাড়ীর ভিতরে বোমা নিক্ষেপ করিয়া তিন জন কলের সাহেবকে জখমী করা হইয়াছে। সেই সকল দেশহিতৈষীরা বোমা ও পিস্তলাদি দ্বারা কয়েক জন সাহেবকে খুন করিয়া এদেশে স্বরাজ্য স্থাপনপূর্ব্বক স্বরাজ হইবেন এই দুরাশায় এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারে প্রবৃত্ত। লেখাপড়া শিখিয়া বুদ্ধি অতিশয় পাকিয়াছে বলিতে হইবে। অনেক পত্রিকা সম্পাদক ও বক্তা চারি দিকে বিষবর্ষণ পূর্ব্বক এদেশের বালক বালিকা ও যুবক যুবতীদিগের মন বিষাক্ত করিয়া তাঁহাদের কি সর্ব্বনাশই করিয়াছেন ও এদেশের ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। এক্ষণ গ্রামে গ্রামে স্কুলের ছাত্রদিগকে লাঠীখেলা শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে লাঠিয়াল বা গুণ্ডা প্রস্তুত করা হইতেছে, গুপ্তসমিতি হইতেছে। উদ্দেশ্য ভাল নয়।

সম্প্রতি বড়লাট সাহেবের সভাতে দুইটী আইন পাশ হইয়াছে। যে সকল সংবাদপত্রে রাজদ্রোহিতাজনক কোন কথা থাকিবে সেই সমস্ত সংবাদপত্র ও ছাপাখানা বন্ধ করা হইবে। তদনুসারে যুগান্তর নবশক্তি ইত্যাদি কয়েকখানা পত্রিকা এবং সেই সকলের ছাপাখানা বন্ধ হইয়াছে।

২য় আইন, দুরভিসন্ধি প্রযুক্ত কেহ বোমা প্রস্তুত করিলে বা তদ্বিষয়ে সাহায্য করিলে তাহাকে দ্বিপান্তর করা যাইবে।

বোম্বাই নগরে রাজবিদ্রোহিতাপরাধে তিলককে পুলিশ গেরেপ্তার করিয়াছে এবং বিচারে তিনি দণ্ডগাতে অর্পিত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান আষাঢ় মাসে মহিলার ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। গ্রাহক গ্রাহিকাগণ এই বৎসরের প্রাপ্য মূল্য ২৲ এবং পূর্ব্ব বাকী থাকিলে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে যেন পাঠাইয়া দেন। যখন যে সকল গ্রাহক গ্রাহিকা স্থানান্তরিত হন তখন যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহারা একখানা পোষ্টকার্ড লিখিয়া নূতন স্থানের ঠিকানা আমাদিগকে লিখিয়া জানান। তাহা হইলে সেই ঠিকানায় আমরা পত্রিকা পাঠাইতে পারিব।

রাঁচি নগরে ঠাকুরদাস নামক একজন ধনী মহাজন প্রতিদিন পাঁচশত দুঃখী দরিদ্র অন্ধ খঞ্জ দুর্ব্বল বৃদ্ধ ৮ম বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক বালিকাকে অন্নদান করেন। তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সকলকে খাওয়ান প্রতি রবিবার দরিদ্রদিগকে ২২ মণ চাউল বিতরণ করেন। এইরূপ দাতার জীবন ধন্য।

অতি শুভ সংবাদ যে ভারতে প্লেগের প্রকোপ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে।

বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার কোন কোন স্থানে এখনও বিলক্ষণ দুর্ভিক্ষের কঠোরতা রহিয়াছে।

পূর্ব্ববাঙ্গলা ও আসাম গবর্ণমেণ্ট তদ্দেশবাসিনী একটী বি, এ পরীক্ষোত্তীর্ণা বালিকাকে এম, এ পাঠের জন্য মাসিক ৩০৲ টাকা এবং দুটী এফ, এ পরীক্ষোত্তীর্ণা বালিকাকে ২০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দান করিয়াছেন। তিনটী বালিকাই বেথুন কলেজে পাঠ করিতেছেন।

শুনিতে পাওয়া যায় পুলিশ কর্ত্তৃক স্ত্রীলোক গোয়েন্দা সকল ভদ্রপরিবারে প্রেরিত হইয়া থাকে।

সেদিন সারাঘাটের নিকটবর্ত্তী স্থানে চলন্ত রেলগাড়ী হইতে একটী চারি বৎসর বয়স্ক বালক হঠাৎ পড়িয়া যায়। শিশুর উদ্ধার জন্য তাহার মাতা তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে ঝম্প প্রদান করিয়া পড়িয়া যান। মাতা ও শিশু উভয়েই আঘাত পাইয়াছে। শিশুদিগকে লইয়া রেলগাড়ীতে চড়িতে আত্মীয়দের অতি সাবধানে থাকা প্রয়োজন।

শ্রীমতী কুমারী নির্ম্মলিণী বসু নাম্নী একটী মহিলা এবৎসর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ উপাধি পাইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোনও ভারতীয় মহিলা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই।

সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কলের কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহাতে মফঃস্বলের ছোট ছোট দোকানদারগণও কল হইতে পাইকারী দরে জিনিষ ক্রয় করিতে পারিবেন। এরূপ বন্দোবস্ত দ্বারা দোকানদারদের বিশেষ সুবিধা হইবে এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যে তাহারা কাপড় বিক্রয় করিতে পারিবে।